সর্বজনীন কল্যাণে
৩০
বছর
বিশ্বমানের
বাংলাদেশ
গড়তে
আমরা নিয়োজিত
ইসলামী ব্যাংক আইডিবি-র নেতৃত্বে বিদেশী উদ্যোক্তার ৭০% এবং বাংলাদেশ সরকারের ৫% শেয়ার নিয়ে ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে।
জে পি মরগান (ইউএসএ) ও ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশসহ ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে ৬০,০০০ দেশী-বিদেশী শেয়ারহোল্ডার।
ইসলামী ব্যাংক ৮০ লক্ষ আমানত ও বিনিয়োগ গ্রাহককে নিয়মিত সেবা দিয়ে আসছে।
২০১২ সালে ১৯ লক্ষাধিক নতুন গ্রাহক ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন।
ইসলামী ব্যাংক বিশ্ব সেরা ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক।
নিউইয়র্ক ভিত্তিক 'গ্লোবাল ফাইন্যান্স' ইসলামী ব্যাংককে ৮ বার সেরা ব্যাংকের পুরস্কার প্রদান করে।
ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের ৪৫% রয়েছে শিল্পখাতে।
তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে দেশের সর্বাধিক বিনিয়োগ করেছে ইসলামী ব্যাংক।
এস.এম.ই তে দেশের মোট বিনিয়োগের সর্বাধিক ১৭% বিনিয়োগ করেছে ইসলামী ব্যাংক।
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের মাধ্যমে ২৫ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
দারিদ্র বিমোচনে পল্লী এলাকায় ৭ লক্ষ নারী ও পুরুষকে বিনিয়োগ দেয়া হয়েছে।
বিশ্বব্যাপী ১১৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক দেশের মোট রেমিটেন্সের ২৮% আহরণ করছে।
ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত

# সাহিত্য সংস্কৃতি

## সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১৩

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

www.pathagar.com

# সাহিত্য সংস্কৃতি

## সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১৩

প্র কা শ কা ল
শ্রাবণ ১৪৩৪
রমযান ১৪২০
জুলাই ২০১৩

প্র চ্ছ দ
মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

প্র কা শ না য়
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৩৩৩২০

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

## সম্পাদনা পরিষদ

### উ প দে ষ্টা
অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর
মজিবুর রহমান মন্‌জু
আসাদ বিন হাফিজ

### স ম্পা দ ক
মোশাররফ হোসেন খান

### স দ স্য
মোঃ আবেদুর রহমান
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
হাসান আলীম
নাসির হেলাল
শরীফ আবদুল গোফরান
হারুন ইবনে শাহদাত
বিল্লাল হোসেন
মোঃ আব্দুল লতিফ

www.pathagar.com

# MANARAT INTERNATIONAL UNIVERSITY MIU

*A Center of Academic & Moral Excellence*

# Admission Open-2013

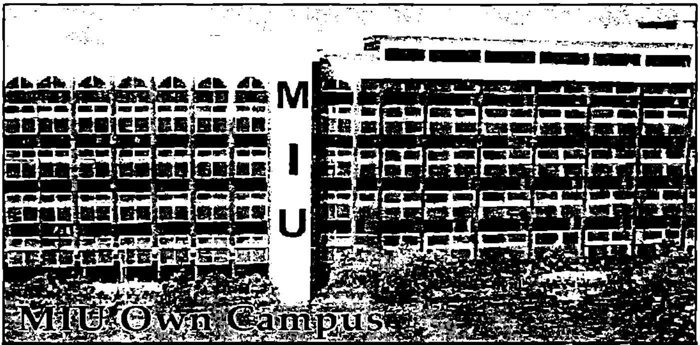


**www.manarat.ac.bd**

**MIU Offers**

**Main Campus**

- BBA
- BA in English
- CSE
- MA in English
- ECE
- MBA (Regular & Executive)

**Open on Friday**

**Mirpur Campus**

- B.Pharm* *Bi-Semester Spring admission
- LL.B. (Hons.)
- Bachelor of Journalism & Media Studies
- MBA (Regular & Executive)
- MA in English (Evening)

## Prof. Dr. Choudhury Mahmood Hasan

**Vice-Chancellor**

Former Dean, Faculty of Pharmacy, DU; Former Chairman, BCSIR

**10% - 100% Waiver** applicable for *** Poor, * Meritorious, * Freedom Fighters & Others Catagories** of Male/ Female Students.

**Main Campus**
Plot-CEN 16, Road-106, Gulshan, Dhaka-1212. Tel : 8817525, 9862251, 9884736, 01920-742423, Fax : 9862226

**Mirpur Campus**
Plot-01, Block-B, Section-01, Mirpur-01, Dhaka-1216. Tel : 8059990, 8059991, Cell : 01918-254628

**Abul Basher Khan, Registrar**

# সূচিক্রম

## সম্পাদকীয়


রাসূলের [সা] আদর্শ ০৯


## প্রবন্ধ


রাষ্ট্রনায়ক মহানবী [সা] ১১
**প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ**
সভ্যতার সঙ্কট নিরসনে রাসূল [সা]-এর অবদান ১৫
**প্রফেসর আবু জাফর**
মানবকল্যাণে মহানবী [সা] ১৯
**ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**
হুদায়বিয়া সন্ধির প্রেক্ষিত ও মক্কা বিজয় ২৬
**ড. আবু নোমান**
আমাদের রাসূল [সা]৩৮
**ড. মাহফুজ পারভেজ**


## চয়ন কবিতা


**আলোর আলো ॥ কাজী নজরুল ইসলাম ৪২**
বিশ্বনবী ॥ গোলাম **মোস্তফা ৪৪**
মুক্তপক্ষ হে আলো ॥ **ফররুখ আহমদ ৪৫**


## প্রবন্ধ


মহানবীর [সা] আদর্শ জীবন ৪৭
**অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান**
মহানবীর [সা] কালজয়ী জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ ৫৫
**ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন**
ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ ৫৮
**হাফেজা আসমা খাতুন**
ঈদে মীলাদুন্নাবী [সা] উদযাপন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৬৭
**প্রফেসর ডক্টর আ ছ ম তরীকুল ইসলাম**
সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষের ওপর বিশ্বাস ৮৫
**শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির**


## ভ্রমণ


কালো গেলাফ ও সবুজ গম্বুজের টানে ৯৫
**মোহাম্মদ আবদুল মান্নান**


www.pathagar.com

## অ নূ দি ত ক বি তা

যাত্রা তোমার শুভ হোক ১১৮
মূল : তাজরীদুল বুখারী
তরজমা : **মনসূরুল হক খান**

## প্র ব ন্ধ

ইসলামে মহিলাদের অধিকার ১২০
**ইকবাল কবীর মোহন**
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বিচারব্যবস্থা ১২৭
**জাফর আহমদ**
মহানবী [সা]-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ১৩১
**নাসির হেলাল**
শ্রমিকের বন্ধু বিশ্বনবী [সা] ১৩৯
**শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া**
খাতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] ১৪৪
**তমসুর হোসেন**

## প্র ব ন্ধ

জীবনশিল্পী মহানবীর [সা] মহানুভবতা ও তাঁর সংগ্রামী জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ ১৫২
**খন্দকার আবদুল মোমেন**
মহামানব হযরত মুহাম্মদ [সা] ১৫৯
**আখতার হামিদ খান**
মদিনা সনদে ইসলামের বিশুদ্ধতা নিরূপন: প্রকৃতি ও পদ্ধতি ১৭৫
**মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান**
উত্তম চরিত্রের ঠিকানায় মুহাম্মদ [সা] ১৮৯
**মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ বেলালী**
রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্বনবী [সা] ১৯৫
**এস এম আবদুছ ছালাম আযাদ**

## ক বি তা

কে জি মোস্তফা-২০৪ ॥ আল মুজাহিদী-২০৫ ॥ জয়নুল আবেদীন আজাদ-২০৭ ॥ হাসান হাফিজ-২০৮ ॥ হাসান আলীম-২০৯ ॥ মুকুল চৌধুরী -২১০॥ আশরাফ আল দীন-২১২॥ জুলফিকার সাইদুল-২১৪ ॥ শরীফ আবদুল গোফরান-২১৬ ॥ মোঃ আমিনুল ইসলাম-২১৭ ॥ মনসুর আজিজ-২১৮ ॥ শহীদ সিরাজী-২১৯ ॥ আলতাফ হোসাইন রানা-২২০॥ নাজমা ফেরদৌসী-২২১ ॥ হোসেন মাহমুদ-২২২ ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী-২২৩ ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল-২২৪ ॥ ইসমাইল হোসেন মুফিজী-২২৫ ॥ মমতাজ মহল মুক্তা-২২৬ ॥ মোঃ হারুনুর রশিদ-২২৬ ॥ মোহাম্মদ আবু ইউসুফ-২২৭ ॥ কাজী তাবাস্সুম- ২২৭॥

www.pathagar.com

## প্র ব ন্ধ


শান্তির দিশারী রহমাতুল্লিল আলামিন ২২৮
**শহিদুল ইসলাম**
মুহাম্মদ [সা]-এর আগমন ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন ২৩২
**গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী**
জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী [সা] ২৩০
**রাফিউল ইসলাম**
বিশ্বের প্রখ্যাত কবিদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ [সা] ২৪৫
**সাকী মাহবুব**
হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর জীবন: সংক্ষিপ্ত পাঠ ২৫০
**মোঃ জিহাদ হোসেন**
পারিবারিক সংকট নিরসনে রাসূল [সা]-এর দর্শন ২৫৩
**মোঃ আব্দুস ছালাম**


## শি ক্ষা


শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরনে রাসূলের [সা] পদ্ধতি ২৫৭
**জুবায়ের হুসাইন**


## স্বা স্থ্য


সুন্নাতে রাসূল [সা] ও স্বাস্থ্য ২৬২
**ডাঃ মোঃ শহীদুল্লাহ**


## বি শে ষ র চ না


শি'বে আবু তালিব উপত্যকায় অন্তরীণ মুহাম্মদ [সা] ২৬৫
**আরিফুল ইসলাম সোহেল**
রাসূলের [সা] আপোসহীনতা ২৭২
**এস.এম.জহির উদ্দীন**
ইহুদীদের অপপ্রচার এবং রাসূল [সা]-এর পবিত্রতা ২৭৬
**রাশেদুর রহমান**
মহামানব মুহাম্মদ [সা] প্রসঙ্গ বিধর্মীদের অপপ্রচার ২৮৩
**জাইদী রেজা**


## মু স লি ম বি শ্ব


মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ২৮৬
**মাস্টার নজরুল ইসলাম**
নবী প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় বিশ্ব মুসলিম ২৮৯
**এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান**


www.pathagar.com

মহানবীর [সা] বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মিশন এবং আজকের মুসলিম উম্মাহ'র দায়িত্ব ২৯৪
**মুহাম্মদ আবুল হুসাইন**

## ছো ট  গ ল্প

আলোকিত আলো ৩৩৮
**নাজিব ওয়াদুদ**
সাগর তলে মানিক জ্বলে ৩৪৩
**মালিক ইমতিয়াজ**
চাঁদ হাসে ঐ আকাশে ৩৪৮
**রিয়াজ পারভেজ**

## মি ডি য়া

ইসলামী চলচ্চিত্র আন্দোলন ৩৫৩
**শেখ আবুল কাসেম মিঠুন**

## সা হি ত্য

কবির জন্য নবীর প্রেম ৩৬৬
**আসাদ বিন হাফিজ**
মহানবীর [সা] সাহিত্যপ্রেম ও আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা ৩৭১
**ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ**
মহানবী [সা]-এর মৌলিক দর্শন ৩৭৫
প্রসঙ্গ কবিতা
**এ কে আজাদ**
কাব্য-সাহিত্য চর্চায় রাসূলের [সা] প্রণোদনা ৩৮৬
**মুস্তাফা মনজুর**
সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব ও তার উৎস গ্রন্থাবলী ৩৯৪
**মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**

## প ত্র  সা হি ত্য

বিভিন্ন বাদশার নিকট রাসূলের [সা] দাওয়াতী পত্র ৪০৬
**হেলাল আনওয়ার**

## শি ল্প

শিল্প ভাবনা ৪০৯
**ইব্রাহীম মন্ডল**

প্রতিবেদন ৪১৭

www.pathagar.com

# স ম্পা দ কী য়

## রাসূলের [সা] আদর্শ

আল কুরআন ও আসসুন্নাহই মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয়। এর বাইরে আমাদের জন্য তৃতীয় কোনো পথ নেই। রাসূল [সা] ছিলেন আল-কুরআনেরই জীবন্ত প্রতীক। সুতরাং তিনিই আমাদের এক মাত্র রাহবার।

নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] আগমনের পূর্বে আরবসহ গোটা পৃথিবীই ছিল অশান্তির কালো ছায়ায় আবৃত। সর্বত্র সংঘাত, ক্ষমতার আস্ফালন, যুদ্ধ, অবিশ্বাস আর হানাহানির সয়লাব বয়ে গিয়েছিল। সুনীতি কিংবা সুবিচার ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল। তখনই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মানুষের তৈরি আইন, মগজপ্রসূত শাসন ব্যবস্থা মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয়ে বরং সার্বিকভাবে অকল্যাণ ও ধ্বংসই ডেকে আনে। মানুষ তখন মুক্তির আশায় চাতকের মত চেয়েছিল। কিন্তু কোন্ পথে মুক্তি আসতে পারে, সেটা তাদের জানা ছিল না।

ঠিক এমনি এক চরম মুহূর্তে, ঘন-ঘোর তমসা ভেদ করে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর শ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে [সা] সেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত ঠা-ঠা মরুভূমির বুকে, মক্কা নগরীতে প্রেরণ করলেন। নবী মুহাম্মদই [সা] আল্লাহর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনাকে কেন্দ্র করে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন আরব উপদ্বীপে। পরবর্তী মাত্র দশটি বছরে তিনি সুখ, শান্তি, কল্যাণ, সুনীতি, ন্যায় ও পবিত্রতার এক অতুলনীয় সমাজ গড়ে তুললেন। এর মাত্র সিকি শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামের সুমহান আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সে ছিল এক বিস্ময়কর বিপ্লব। রাসূলের [সা] এই যুগান্তকারী বিপ্লবের হাতিয়ার ছিল কেবল আল কুরআন। আর আল কুরআন অর্থই তো মানুষ ও পৃথিবীর জন্য এক নির্ভুল জীবন বিধান ও সঠিক দিকদর্শন। এই জীবন দর্শনের বাস্তব নমুনা বা পথপ্রদর্শক ছিলেন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসূলের [সা] যুগে তো বটেই, তাঁর ইন্তিকালের পরও যতদিন রাসূল [সা] প্রদর্শিত আল কুরআনের জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততোদিনই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিশ্ব এক পরম নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার মধ্যে কাল যাপন করেছে। কিন্তু মানুষের



www.pathagar.com

জন্য চরম দুর্ভাগ্য তখনই নেমে এসেছে, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের [সা] প্রদর্শিত পথ থেকে দূরে সরে এসেছে।

বস্তুত এমনটি হতে বাধ্য। ন্যায়ের ভিত্তি আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং তার সর্বকূলপ্লাবী আলো ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই কোথাও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। এর বাস্তব প্রমাণ তো আজকের অস্থির ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ যুদ্ধোন্মুখ পৃথিবী।

আল কুরআন এবং রাসূলের [সা] পথ অনুসরণ না করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কম করা হয়নি। যুগে যুগে তার ব্যর্থতার ইতিহাসই কেবল ভারী হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনের জন্ম হয়েছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেটা কোনো কাজেই আসেনি। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনের মতো একই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলো জাতিসংঘ। কিন্তু নির্মম পরিহাসই বটে! সেই জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম কোনো ভূমিকাই রাখতে সক্ষম হয়নি।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, মানুষের গড়া আইন ও মানুষের তৈরি শাসন ব্যবস্থা এমনি হিংস্র ও পশুসুলভ হতে বাধ্য। বৃহৎ শক্তির দেশ বা শাসক দুর্বলতম দেশকে গ্রাস করার জন্য লালায়িত। সুতরাং তাদের লোলুপ জিহ্বা ক্রমসম্প্রসারণ হবারই কথা। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে অতীতে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আজ এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে না।

মানুষের এই সর্বাঙ্গীন দুর্দশা ও চরম অধ:পতন থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র আল কুরআন তথা রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ। ইতিহাস সাক্ষী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ছিল একমাত্র কল্যাণ রাষ্ট্র।

মানুষ ও মানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন সুমহান আদর্শের বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য। এই আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছিল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর [সা] মাধ্যমে। আজও বিশ্ব শান্তি ও সার্বিক স্থিতিশীলতার জন্য রাসূলের [সা] আদর্শই মানব জাতির একমাত্র অভ্রান্ত মুক্তিরসনদ। অতএব প্রয়োজন রাসূলের [সা] পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের। যত দ্রুত আমরা এই অনিবার্য সত্য উপলব্ধি করতে পারবো, ততোই ত্বরান্বিত হবে আমাদের অশান্ত দাবদাহ থেকে মুক্তি।

রাসূলের [সা] আদর্শ এবং আল-কুরআনের আলোকধারা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টাই হোক আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও জীবনমিশন।



www.pathagar.com

# রাষ্ট্রনায়ক মহানবী [সা]

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ

মানব মুকুটের লেখক মুহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী তার বইয়ের প্রস্তাবনায় লিখেছেন: 'যে সব মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই পাপ-পঙ্কিল পৃথিবী ধন্য হইয়াছে। যাহাদিগের প্রেমের অমৃত সেচনে, দু:খতপ্ত মানবচিত্ত স্নিগ্ধ হইয়াছে। যাহারা মানব সমাজের যুগ-যুগান্তরের কুক্ষিগত কালিমা রশ্মির মধ্য হইতে সূর্যের ন্যায় উত্থিত হইয়া পাপের কুহক ভাঙিয়াছেন, ধর্মের নবীন কিরণ জ্বালাইয়াছেন ও পতিত মানবকে সত্য ও প্রেমে সঞ্জীবিত করিয়া নবীন জীবন পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহাম্মদ [সা] তাহাদের অন্যতম।'

আমি জনাব চৌধুরীর সাথে একমত হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে শুধু এটুকু সংযোজন করতে চাই: 'হযরত মুহাম্মদ [সা] তা ছাড়াও ছিলেন বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কও।' এই ছোট্ট নিবন্ধে শুধু এই সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলতে চাই।

সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মক্কা থেকে যখন হযরত মুহাম্মদ [সা] ইয়াসরিবে পা রাখলেন, ইয়াসরিবের জনসমষ্টি তাঁকে অভূতপূর্ব পরিবেশে অত্যন্ত আবেগঘন আবহে স্বাগত জানালেন। ইয়াসরিব নগরীর চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে শুধু প্রিয়তম ব্যক্তিত্বরূপে আপন করে নিলেন তাই নয়; এই নগরীর পরিচালনার সব দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিলেন। এই স্বীকৃতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াসরিবের জনগণ তাদের প্রিয় নগরীর নামকরণ করলেন 'মদিনাতুন্নবী' অথবা 'মদিনাতুর রাসূল'।

দিনটি ১২ রবিউল আউয়াল। খ্রিষ্টীয় ৬২২ অব্দের ২২ অথবা ২৪ সেপ্টেম্বর। একটি লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে [মদিনা চার্টার] বিশ্বের এই অংশে প্রতিষ্ঠিত হলো জনগণের সম্মতিভিত্তিক, কল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সৃষ্টি হলো অনবদ্য এক দৃষ্টান্ত। সর্বপ্রকার স্বৈরাচারমুক্ত। ব্যক্তি প্রভাবের উর্ধ্বে। প্রভুত্ববাদকে অস্বীকার করে



www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে জনগণের সম্মতিভিত্তিক, চুক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হলো।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক জন লক যে তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেছিলেন, 'সেই রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ যা শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' [That government is the best on which is based on the consent of the governed] সেই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে মদিনায় ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির মূলে ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হযরত মুহাম্মদ [সা]। এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মহানবীর নেতৃত্বে মসজিদে নববী। এই মসজিদই ছিল গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র। আইন প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং ন্যায়নীতির শীর্ষস্থান, বিচার বিভাগের শীর্ষস্থান।

মদিনা রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল মদিনা সনদ- ৫৩ অনুচ্ছেদ সংবলিত লিখিত সংবিধান। এর ভূমিকায় সনদকে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'কিতাব' রূপে এবং আধুনিক অর্থে তা সংবিধান। সনদের ২৩, ৪০, ৪৬ ও ৫১ অনুচ্ছেদে সনদকে উল্লেখ করা হয়েছে 'সহিফা' হিসেবে এবং আধুনিক অর্থে তাও হলো সংবিধান। প্রকৃত প্রস্তাবে মদিনা সনদ ছিল একটি সংবিধান এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটাই হলো সর্বপ্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। পাশ্চাত্যের প্রচারণায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতায় এবং মুসলিম পণ্ডিতদের ঔদাসীন্যের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ছাত্রছাত্রীরা জানে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানই সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৭৮৯ সালে এর প্রায় সাড়ে এগার শ' বছর আগেই রচিত হয়েছে মদিনা সনদ।

রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ [সা] রাজনীতিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞায় বিভূষিত একজন জননেতা। যদি তিনি চাইতেন তিনি হতে পারতেন পরম পরাক্রমশালী সম্রাট। হতে পারতেন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ। মহামহিম সুলতান। আর তখনকার বিশ্বে এইটিই ছিল নিয়ম। সূচনা করতে পারতেন রোমান সম্রাটের অথবা পারস্য সম্রাটের মতো অথবা চীনের রাজাধিরাজের মতো, মিসরের ফেরাউনদের মতো সূচনা করতে পারতেন এক পারিবারিক ধারা [dynastic line]; রাজনীতিক হলে তিনি হয়তো তাই করতেন, কেননা তখনকার বিশ্বে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না। রাজনীতিকরা সবসময় বর্তমান কালেই বসবাস করেন। তাদের দৃষ্টি থাকে ক্ষমতার দিকে এবং ক্ষমতা প্রসূত সুযোগ-সুবিধা অথবা বৈভব-প্রভাবের দিকে। দৃষ্টি থাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা পারিবারিক পর্যায়ে বিলাসিতার দিকে। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ [সা] ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়ক [Statesman]। বর্তমানে বসবাস করেও তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন



www.pathagar.com

মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। মানবজাতির ঐক্য-সংহতির দিকেই তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন। দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাদের পরিপূর্ণ জীবনের দিকে, তাদের ইহকালীন এবং পারলৌকিক সম্পূর্ণতার দিকে।

জনসম্মতির ওপর ভিত্তি করে যে সব রাষ্ট্র পরে গড়ে ওঠে; যেমন ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডের অবস্থা অথবা ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি উপনিবেশের অবস্থা অথবা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটজনক। গৃহযুদ্ধের আগুনে ঝলসে গেছে সমাজ জীবন। অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে গেছে চারদিক। কিন্তু মদিনা রাষ্ট্র বিশ্বময় মাথা তুলে স্থিতিশীলতার আশীর্বাদ নিয়ে সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সম্পদকে মূলধন করে বিশ্বজয়ী হয়ে ওঠে সেই মদিনা রাষ্ট্র। অথচ সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্র গঠনের আগে মদিনার অবস্থা ছিল অনেকটা নৈরাজ্যপূর্ণ। ওই সময়ে মদিনায় ছিল সুসংগঠিত আদি পৌত্তলিক সম্প্রদায়। ছিল দেশী ও বিদেশী ইহুদি জনগোষ্ঠী। তারপরে আসেন মক্কা থেকে হিযরত করে নব্য মুসলিমরা। প্রত্যেক ইতিহাসবিদ এ কথা অত্যন্ত জোরে প্রচার করেছেন যে, তখনকার আরব সমাজ ছিল গোত্র-গোষ্ঠীতে খণ্ডিত, ছিন্ন, শতধাবিভক্ত এবং ওইসব গোত্র-গোষ্ঠী-উপজাতি সব সময় লিপ্ত ছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। হিংসা-বিদ্বেষে, অসুয়াতাড়িত প্রতিহিংসার জিঘাংসায়। সমাজে ছিল না কোনো ঐক্যবোধ, ছিল না সহানুভূতি অথবা সহযোগিতার কোনো সূত্র। সংক্ষেপে, প্রাক-ইসলাম আরবে সমাজ জীবন 'নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুতুল্য এবং স্বল্পায়ু' [Solitary, Poor, nasty, brutish and short]। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর সৃজনশীল নেতৃত্বে এবং সীমাহীন আন্তরিকতায় সেই খণ্ড ছিন্ন শতধাবিভক্ত সমাজ জীবনে অফুরন্ত কল্যাণকামী প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে তা পরে সাত শ' বছরব্যাপী স্থায়ী হয়ে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা-ভাবনাকে আলোকিত করে রাখে। সৃষ্টি করে নতুন নতুন সৃষ্টির প্রাণ যা অতীতে আর কখনো দেখা যায়নি।

মদিনা রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়; নয় কোরাইশদের অথবা মুহাজির বা আনসারদের। এই রাষ্ট্র সবার ধর্ম, এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার। মুসলমান ও ইহুদির। আদি পৌত্তলিক ও অমুসলিমদের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এর প্রতিরক্ষায় সকলেই কৃতসঙ্কল্প। জাতীয়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী হাজারো তাত্ত্বিক আজ পর্যন্ত যে সব জটিল ক্ষেত্রে কোনো সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পথ হারিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে কিভাবে সহজ এবং সরল পথে পথপরিক্রমা শুরু করেছিল তা আজো সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন। আধুনিক জাতীয়তার যেমন রয়েছে আকর্ষণীয় এক সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে বিভাজনের এক প্রবণতা। কিছু সংখ্যক জনসমষ্টি একত্রিত হয়ে যেমন জাতি গঠন করে, তেমনি জাতি হিসেবে



www.pathagar.com

তারা বিশ্ব মানব সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে। মদিনা রাষ্ট্রটি কিন্তু এক উম্মাহর দেয়াল ডিঙিয়ে, ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে, রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সব বাধা বন্ধনকে জয় করে, বিশ্বময় উম্মাহর পথ প্রশস্ত করেছে। যে চুক্তির ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হয় সেই চুক্তিতে নবী করিম [সা] স্বাক্ষর করেন একজন জননেতারূপে সততার মূর্তরূপ জনকল্যাণকামী এক পরিপূর্ণ মানুষরূপে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকত, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব গণতন্ত্রের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে যেত সপ্তম এবং অষ্টম শতকেই।

পাশ্চাত্য আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণইচ্ছা, গণঅধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব করে এবং গর্বভরে বলে থাকে যে, একই ভিত্তিতে উন্নত এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে রাসূলে কারিম [সা] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণসম্মতিভিত্তিক মদিনা রাষ্ট্রের আদর্শ সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হলে মানবজাতি উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিশেষজ্ঞ এবং পর্যালোচকদের চোখে মদিনা রাষ্ট্রের গৌরবজনক বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে ধরা পড়েনি। আমাদের পণ্ডিতদের মনোযোগও এসব বিষয়ে তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। আমরা তাই নিজেদের সোনার খনিকে উপেক্ষা করে অন্যদের কয়লা খনির মূল্য নির্ধারণেই অধিক ব্যস্ত রয়েছি এবং হীনমন্যতার শিকার হয়েছি। এই হীনমন্যতা জয় করতেই হবে।

মানবজাতির শিক্ষক এই মহামানবের রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পর্যালোচনার আগে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ও অত্যন্ত সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। হেরা গুহায় তাঁর ধ্যানমগ্নতা, তারপর বাস্তবতার জগতে তাঁর প্রত্যাবর্তন, এক কথায়, পারমার্থিকতা এবং যুক্তির তথা আধ্যাত্মিকতা এবং কর্মনিষ্ঠার সুষ্ঠু সমন্বয়, এই হলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনের সৌন্দর্য, তেমনি ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। মরমিবাদ দিয়ে যার শুরু, রাষ্ট্রের মধ্যে তার পরিপূর্ণতা। এই তো মানবজীবনের সারবত্তা। এই সারবত্তার বাস্তবরূপ হলেন আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর জীবনী। এক অর্থে, এ তো এক পরশমণি; তাঁর স্পর্শে সব কিছুই সোনা হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব যে অসাধারণ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম বিশ্ব এই পরশমণির স্পর্শ থেকে আজ দূরে। যে কোনো ভাবে হোক মুসলমানদের এই পরশমণির স্পর্শ লাভ করতেই হবে।



www.pathagar.com

# সভ্যতার সঙ্কট নিরসনে রাসূল [সা]-এর অবদান

**প্রফেসর আবু জাফর**

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়ে আসছে। এই বিকাশ মানব বংশের ক্রমাগত অগ্রগামিতা ও নিরন্তর আত্মোপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য এটা সত্য যে, মানবসভ্যতা কখনোই গতি ও আদর্শের প্রশ্নে স্থির লক্ষ্য সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়নি, যে কারণে মানবসভ্যতা নানা রূপ ও রেখায় নানামুখী বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন আধার হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সভ্যতা সর্বমানবিক সমর্থক চৈতন্যের শাশ্বত রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি এবং এই কারণে মানবসভ্যতা সেই আদিকাল থেকে চিরকালই দুই বিপরীতমুখী ধারায় প্রবাহিত, আর এর জন্যই কোনো কোনো সভ্যতা আদিম-প্রবৃত্তিতাড়িত প্রায় অরণ্য-বর্বরতারই সমার্থক, অপরদিকে কোনো কোনো সভ্যতা সর্বমানবিক কল্যাণকামিতা নিয়ে মানব ইতিহাসের প্রচ্ছদপটে সমুজ্জ্বল। আধুনিক পাশ্চাত্য-চিন্তাবিদ হান্টিংটন বলেছেন, 'সভ্যতার সংঘাত' [The Clash of Civilization], যেখানে তিনি ইসলামকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই বিশ্বখ্যাত গবেষকের বক্তব্য আংশিক ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ কারণ, তথাকথিত আধুনিক ইঙ্গ-মার্কিন সভ্যতা ইসলামী জীবনধারার সাথে ঘোরতরভাবে সাংঘর্ষিক বটে, কিন্তু একে সভ্যতার সঙ্ঘাত বলা আদৌ সঙ্গত বা সমীচীন নয়, এই সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তিতাড়িত আদিম বর্বরতার সঙ্গে সত্য শুভত্ব ও শাশ্বত জীবনবোধের সংঘর্ষ। অর্থাৎ একদিকে বন্য-বর্বরতা অন্য দিকে সর্বমানবিক কল্যাণকামিতায় ভাস্বর এক চিন্ময় শুভত্বের আলোকিত অঙ্গীকার। উল্লেখযোগ্য যে, মহানবী মুহাম্মদ [সা] কর্তৃক আনীত ও প্রদর্শিত ইসলামের যে পূর্ণাবয়ব শাশ্বত পয়গাম, তা আসলে সকল ক্ষুদ্রতা ও সকল আদিমতার বিরুদ্ধে এই আলোকিত অব্যর্থ অঙ্গীকার।

মানব বংশের অন্যতম অভিজ্ঞান হলো এগিয়ে চলা। মানুষ কখনোই স্থির অনড় ও অবিচল হয়ে থেমে থাকে না। শুভ অশুভ যাই-ই হোক, এক অন্তর্নিহিত তাগিদে সে নব নব রূপান্তরে নিজেকে বদলে নেয়। পশুপ্রকৃতির সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। অর্থাৎ নিরন্তর অগ্রসরমানতা মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মৌলিক অপরিহার্য অভিজ্ঞান; যে কারণে মানব ইতিহাসে সভ্যতার পালাবদল ঘটেছে, নতুন রূপ ও অবয়বে সভ্যতা বিনির্মিত হয়েছে। এটাই সাধারণ সত্য, কিন্তু এতদসঙ্গে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার



www.pathagar.com

মতো বিষয় তাহলো, মানবসভ্যতা আদিকাল থেকেই দু'টি সুস্পষ্ট ধারায় প্রবহমান। একটি ধারায় নিখাঁদ প্রবৃত্তি ও নিছক আনন্দ-সম্ভোগের স্থূল উপাসনা, ক্ষমতা ও বিত্তবৈভবতাড়িত নিছক অন্ধকার দৃশ্য, পার্থিবতার দাসত্ব; অন্য ধারায় রয়েছে সর্বমানবিক প্রেম ও ইনসাফের আলোকিত জীবনচেতনা, মহামহিমান্বিত স্রষ্টার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যসমৃদ্ধ সভ্য ও সুন্দরের পরম সওগাত।

প্রথম ধারাটি হলো অভিশপ্ত ইবলিসের, যেখানে প্রতিনিধিত্ব করে নমরূদ, ফেরাউন ইত্যাদি ইবলিসের অনুগত কিংকর, যেখানে সপ্রতাপে রাজত্ব করে পাশবিক শক্তিমত্তা, নানাবর্ণ বেহায়াপনা, শোষণ-জুলুম, অবিচার ও স্থূল স্বার্থপরতা, দম্ভ ও দায়িত্বহীন যথেচ্ছাচার, পরদ্রব্য-লুণ্ঠনের মহোৎসব, মানববিদ্বেষ, অন্ধ ও নির্লজ্জ আত্মমুগ্ধতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধারাটি হলো, স্রষ্টার নির্দেশে [Divine Guidance] আলোকোজ্জ্বল নির্মল, নির্ভুল পথরেখা, যা নবী-রাসূলদের দ্বারা প্রদর্শিত, যা পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জিন্দেগির জন্য নিশ্চিত কামিয়াবি, যা মানবসৃষ্ট সকল কুহক ও কুজ্ঝটিকা থেকে মুক্ত এক অব্যর্থ সাফল্যমণ্ডিত জীবনের জন্য সর্বতোমুখী অব্যাহত আশীর্বাদ। এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে মানবপ্রেম, মূর্ত হয়ে ওঠে কুৎসিত স্বার্থপরতার স্থলে পরার্থপরতা, দম্ভ ও নিরেট আত্মমুগ্ধতার স্থলে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ, বেহায়াপনার স্থলে লজ্জা সম্ভ্রমবোধ ও আত্মসম্মান, সর্বোপরি মনুষ্যজীবনে মুখ্য হয়ে ওঠে স্রষ্টার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও মৃত্যুপরবর্তী পারলৌকিক জবাবদিহিতার ভয়। এই পথই বিশ্বমানব সম্প্রদায়ের জন্য প্রকৃত পথ, যেখানে মানবজীবনের সাফল্য ও উৎকর্ষ নির্ধারিত হয় মহান আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের মানদণ্ডে।

যাই হোক, মানবসভ্যতার দ্বিতীয় এই ধারাটি বিকশিত হয়েছে আল্লাহপাক প্রেরিত নবী-রাসূলদের একাগ্র নেতৃত্বে, জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও সাধনায়। আর সভ্যতা বিনির্মাণে নবী-রাসূলদের এই বিপ্লবী আন্দোলনের নামই ইসলাম, যা কেবল ধর্ম নয়, সকল বন্যতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে যা-এক সর্বতোমুখী দুর্নিবার জীবন সংগ্রাম এবং মনে রাখা আবশ্যক, নবী মুহাম্মদ [সা] এই ক্রমবিকশিত ইসলামেরই সর্বশেষ নবী, নেতা ও চূড়ান্ত রূপকার।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক যে, সভ্যতা বলতে আসলে কী বোঝায় বা কী বোঝা উচিত? এ বিষয়ে যিনি যাই বলুন, নিশ্চিতভাবেই এটা সত্য যে, সর্বমানবিক কল্যাণ ও শুভত্ব ও বৈশ্বিক মমতা নিয়ে যে জীবনবোধ ও জীবনব্যবস্থা মানবসমাজে অপরাজেয় সুস্থতা ও সৌন্দর্য নিয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, সেটাই মানুষের সভ্যতা, সেটাই কাঙ্ক্ষিত বিশ্বমানবিক সভ্যতার অভিজ্ঞান। কিন্তু অতীব দু:খজনক যে, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহপাক প্রদত্ত ও নির্দেশিত পথরেখা জাগরুক থাকা সত্ত্বেও কি-এক অমোঘ অভিশাপে মানুষের সভ্যতা মানুষের জন্যই গুরুভার ও বিপজ্জনক হয়ে পৃথিবীকে শাসন করেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে কতিপয় ক্ষমতাবান বিবেকহীন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার এক বর্বর প্রবৃত্তিবিলাস। সুদূর ব্যাবিলন থেকে গ্রিক।



www.pathagar.com

রোমান, ইসলামপূর্ব পারস্য যেখানেই দেখি, সর্বত্রই আমরা আমাদের বক্তব্যের নির্ভুল সাক্ষ্যই অবলোকন করি। এমনকি বহু মনীষীর প্রাজ্ঞতাসমৃদ্ধ আধুনিক যুগও একই সাক্ষ্য বহন করে। কি আলেকজান্ডার, কি সিজর, কি খসরু-পাহলভিদের আমলে ছিল জৌলুস ও জাঁকজমক ও আড়ম্বর, ছিল মানুষের শ্রম-রক্তশোষিত বিলাসবৈভব। আর একালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছত্রছায়ায় গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরিহিত বিশ্বে এমন এক তথাকথিত পরিহাসময় সভ্যতা বীরদর্পে বিরাজমান, যাকে 'সভ্যতা' বলাই রীতিমতো মূর্খতা ও আত্মপ্রতারণা। বরং যা বলা উচিত তাহলো, 'সভ্যতা' একটি মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর শব্দ মাত্র। আসলে বিশ্বমানবতা বরাবরই এক আদিম দানবীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও অন্ত রীণ। এই অকথ্য অবস্থা থেকে মানববিশ্বকে মুক্তিদানের অভিপ্রায় নিয়ে বহু মনীষী বহুভাবে চেষ্টা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, নিজেদের জীবনকে কোরবানি করে দিয়েছে, কিন্তু তাদের কাছে কোনোরূপ স্রষ্টা প্রেরিত নির্দেশনা না-থাকার কারণে, তাদের কোনো চেষ্টাই ফলবতী হয়নি, তিমিরাচ্ছন্ন পৃথিবী বরং আরো দুর্ভেদ্য ও আরো গাঢ়তম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। আর এইখানেই রাসূল মুহাম্মদ [সা]-এর বিকল্পহীন অবিসংবাদিত ভূমিকা, যা বিপন্ন সভ্যতার নিরাময়কল্পে মানব মুক্তির অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র।

উল্লেখ করা আবশ্যক, রোগগ্রস্ত বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বমানবতাকে ব্যাধি মুক্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করেই আল্লাহপাক মুহাম্মদ [সা]কে ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয়, এই কঠিন দায়িত্ব পালনে আল্লাহপাক তাঁকে বিরাট কোনো সৈন্যদল দ্বারা সাহায্য করেননি, বিরাট কোনো অর্থভাণ্ডারও দান করেননি। একবারে আক্ষরিক অর্থেই নিঃস্ব, রিক্ত নিঃসম্বল একটি মানুষ, তাঁরই স্কন্ধে অর্পিত হলো বিশ্বসভ্যতার সঙ্কটমোচন ও পুনর্গঠনের কঠিনতম গুরুভার। লোকবল, অস্ত্রবল, বিত্তবৈভব বলতে কিছু নেই, আছে শুধু আল্লাহপাক প্রেরিত একটি মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের শাশ্বত পয়গাম আল কুরআন। আর ২৩ বছরের নাতিদীর্ঘ নবুওয়তি-জীবনে এই আল কুরআনের পরম নির্দেশনাকে পাথেয় করেই রাসূল [সা] সহস্র বৈরিতার মোকাবেলায় দৃঢ়পদে লড়াই চালিয়ে গেলেন, বর্বর জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করে মানব বিশ্বের সম্মুখে জাগিয়ে দিলেন শুভ আলোকোজ্জ্বল এক শাশ্বত, প্রশস্ত, অভ্রান্ত রাজপথ।

অবশ্য সবাই এই তাওহীদি রাজপথ ধরে চলতে চায়নি, জেনে শুনেও জাহেলিয়াতকেই আপন করে নিয়েছে। অথচ পৃথিবীবক্ষে ইসলামের চেয়ে যে বড় আর কোনো নেয়ামত নেই, মহানবী [সা]-এর চেয়ে যে বড় আর কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, এই চিরন্তন সত্যকে প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে এড়িয়ে চলা যায় কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আর ইঙ্গ-মার্কিন আধুনিক জীবনধারার ক্রীতদাসরূপী হান্টিংটন সাহেবরা যে ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ [সা]কে তাদের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করছে, তার একমাত্র কারণ অসভ্য, অশ্লীল, আদিম বর্বরতার সম্মুখে ইসলাম সততই এক নিরাপস ও দুর্বার প্রতিবাদ। অতএব মিথ্যা ও মোনাফেকি তাড়িত এই আধুনিক বিশ্বের পক্ষে ইসলামকে সহ্য করা



www.pathagar.com

খুবই অসম্ভব। অসম্ভব বটে, তবু পৃথিবী একবার অন্তত ইতিহাসের মুক্ত-বাতায়ন পথে চেয়ে দেখতে পারে যে, পুরো সপ্তম শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী আরো অনেকদিন বিশ্বের এক বিশাল অংশে ইসলামী সভ্যতার কী হৃদয় জুড়ানো সৌরভ ও সুতাবাস বয়ে গিয়েছিল। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জিন্দেগির কী অনন্ত সাফল্য গাথাই না সেদিন মূর্ত হয়ে উঠলো। সেই কাঙ্ক্ষিত সুদিন আবারও ফিরে আসতে পারে, আবারও পৃথিবী সর্বমানবিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার হিল্লোলে আন্দোলিত হতে পারে। শুধু একটিই শর্ত, আল কুরআনের অব্যর্থ নির্দেশনা এবং রাসূল মুহাম্মদ [সা]-এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শকে মনুষ্যজীবনের অবিসংবাদিত অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেই খোশ-নসিব কি পৃথিবীকে আবার কখনো আলোকিত করবে? আল্লাহ্ পাক জানেন, কিন্তু আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, "আমরা পথ দেখিয়েছি, ইচ্ছা করলে শোকরকারী হবে, না করলে অস্বীকারকারী হবে।" [সূরা দাহার : আয়াত ৩]।

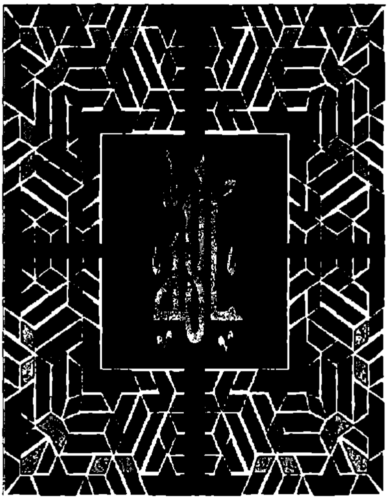



www.pathagar.com

# মানবকল্যাণে মহানবী [সা]

**ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**

বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ছিলেন মানবকল্যাণে নিবেদিত। মানবকল্যাণে তাঁর অবদান অনবদ্য। মানুষকে তিনি এতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন, সকল অবস্থায় মানুষের সুখ-দু:খের ভাগী হতেন, মানুষকে এত আপন মনে করতেন, মানুষের কল্যাণে গোটা নবুওয়তি জীবনে এমন নিরন্তর কর্মরত ছিলেন, ইতিহাসে তার নজির বিরল। মানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল মহানবী [সা]-এর জীবনের মূলমন্ত্র। আল্লাহপাক তাঁকে মানুষের নবী করে মানবকল্যাণের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন। বস্তুত তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, তিনি বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তিনি বিশ্বশান্তির প্রত্যক্ষ প্রতীক, সকল মানুষের জন্য তথা সমগ্র বিশ্বমানবের সর্বকালীন মুক্তি ও সামগ্রিক কল্যাণের মহাসনদ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক। তিনি পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য, আল্লাহর পয়গাম নিয়ে। তিনি তো আরবের বাদশাহ হতে আসেননি। মুশরিক কুরাইশরা তাকে বাদশাহীর টোপ দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তাদের সাফ সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর এক হাতে সুরুজ আর অন্য হাতে চাঁদ এনে দিলেও তিনি কল্যাণের আদর্শ ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ করবেন না।

## মানবকল্যাণের প্রত্যয়গত ধারণা

কল্যাণের ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে ফালাহ [Falah]। আরবি ফালাহ শব্দটি এসেছে আফলাহা, ইউফলিহু থেকে, যার অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জন করা, উন্নতি করা, সুখী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। আল্লামা রাগিব ইস্পাহানির মতে 'ফালাহ' শব্দ পার্থিব জীবনের জন্য তিনটি অর্থ তুলে ধরে। যেমন :

১. বাকা [Survival]
২. ঘ্যানা [Freedom from want]
৩. ইজ্জ [Power and honor]



www.pathagar.com

আর আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য এর অর্থ হচ্ছে চারটি ঃ

১. বাকা ফিল ফানাহ [eternal survival]

২. ঘ্যানা বিল ফকর [eternal prosperity]

৩. ইজ্জ বিল দুউল [everlasting glory]

৪. ইলম বিল জাহেল [knowledge free all ignorance]

কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পরকালের অনন্ত অসীম জীবনে কল্যাণ [falah] লাভ করা। মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ। কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, এ বিশ্বজাহানের সবকিছু একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামে মানবকল্যাণের গঠন উপকরণ শুধু বস্তুবাদী লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বস্তু বাদী লক্ষ্যের সাথে আধ্যাত্মিক উপকরণও সমগুরুত্ব সহকারে সংযুক্ত। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মানুষ কখনো সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ইহকাল ও পরকালের ওপর উভয় প্রয়োজনের একটি সুষম তৃপ্তি লাভ করে। এ কল্যাণ এমন, যা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না, অথচ তা তার দৈহিক আরাম, মানসিক শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করে। এ ফালাহর কথাই কুরআন মজিদে চল্লিশবার আলোচনায় এসেছে। ইসলামে কল্যাণ সর্বাধিক হয়, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির কল্যাণ বিঘ্নিত না করে নিজের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে মহানবী [সা] প্রদর্শিত অবকাঠামোর মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।

## মানবকল্যাণে মহানবী [সা]-এর অবদান

সকল সমাজব্যবস্থার প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ [Human well-being]। মহানবী [সা] এ উদ্দেশ্যের কথা আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন। যদিও কল্যাণের সংজ্ঞা এবং উপাদান সম্পর্কে মহানবী [সা] প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বের মানবরচিত বস্তুবাদী মতবাদসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তবু মানবকল্যাণের জন্য কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য বলে সকল চিন্তাশীলই একমত পোষণ করেন। এ উপাদানগুলো হচ্ছে ঃ–

১. সর্বাধিক [optimum] উৎপাদন নিশ্চিত করা।

২. যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ তথা সকল কর্মক্ষম মানুষের যথোপযুক্ত ব্যবহার ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৩. আয় ও সম্পদের সুষম ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা।

৪. সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা।

৫. সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা।

চিন্তাবিদগণ মনে করেন মানবকল্যাণের জন্য উল্লিখিত অপরিহার্য লক্ষ্যসমূহ হাসিল করতে হলে প্রধানত দু'টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:

১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার;

২. আয় ও সম্পদের সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা।



www.pathagar.com

মহানবী [সা] মদিনায় যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, কালক্রমে তা একটি সুদমুক্ত জাকাতভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাজের সৃজন করেছিল, সেখানে ছিল না শোষণ, বৈষম্য, জুলুম নিপীড়ন, বঞ্চনা ও অকল্যাণ। ইসলামে কল্যাণকামিতা ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিভাজ্য। এ কারণে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে কল্যাণ অর্জনকে মহানবী [সা] সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

আজকের পৃথিবীতে প্রচলিত পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানবকল্যাণকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মানবরচিত এ দুই অর্থনীতিতে বস্তুবাদী উপাদানই মানবকল্যাণের একমাত্র উপকরণ। সুষম বন্টনব্যবস্থার মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা যায় বলে মনে করা হয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকার সমস্যার সমাধান ইত্যাদিসহ কিছু বস্তুবাদী লক্ষ্য অর্জিত হলে মানবকল্যাণ সাধিত হয়েছে বলেই ধরে নেয়া হয়। উল্লেখ্য, এরূপ কল্যাণের সাথে নৈতিকতার কোনো সংযোগ নেই।

পুঁজিবাদী অবাধ বাজার অর্থনীতিতে ক্রেতা বা ভোক্তাগণ সার্বভৌম। এ অর্থনীতিতে বস্তুবাদী কল্যাণ অর্জনের জন্য যে কৌশলটি কাজে লাগানো হয় তা হচ্ছে ভারসাম্য দাম [Equilibrium Price] যা চাহিদা জোগানের সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে দ্রব্যের বেশি উপযোগ, ক্রেতা বা ভোক্তা তার জন্য তত বেশি দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। অন্য দিকে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রত্যাশী উৎপাদক এ দামের প্রতি সাড়া দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ভোক্তারা যে দাম দিতে প্রস্তুত বিক্রেতারা তারচেয়ে বেশি দাম হাঁকেন। শুরু হয় দরকষাকষি। এভাবে যে দামে দ্রব্য বেচাকেনা হয় তা-ই ভারসাম্য দাম। এ ব্যবস্থায় দাম একটি পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ মানদণ্ড হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেক উৎপাদনকারী নিম্নতম ব্যয়ে উন্নতমানের সর্বাধিক পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং বিক্রয় করে। প্রত্যেক উৎপাদনকারী সর্বোচ্চ মুনাফা পায় এবং সামগ্রিকভাবে গোটা অর্থনীতির দক্ষতা ও উৎপাদন সর্বাধিক হয়। আধুনিক অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের ভাষায়, যদি প্রত্যেকেই তার স্বীয় স্বার্থের জন্য কাজ করে তাহলে বাজারশক্তির 'অদৃশ্য হস্ত' [invisible hand] কোন রকম বহিরাগত হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রতিযোগিতার বিধিনিষেধের মাধ্যমে কল্যাণ রক্ষণে এগিয়ে আসে।

অবাধ বাজার অর্থনীতির উপরোক্ত ধারণা বাস্তবে কোন দেশেই সত্যে পরিণত হয়নি, ফলে মানবকল্যাণও আশানুরূপভাবে অর্জিত হয়নি। বাজার অর্থনীতির উদ্যোক্তারা মনে করেছিলেন যে ভোক্তারা সীমিত সম্পদের দাবি শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজন পূরণের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখবে; যার ফলে ভোক্তার পছন্দ ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। কোন ভোক্তা যতক্ষণ কোনো জিনিসের দাম পরিশোধের ক্ষমতা রাখে ততক্ষণ সে তার চাহিদা পূরণ থেকে নিবৃত্ত হয় না। প্রায়শই ভোক্তাগণ তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয়, আরামদায়ক এবং বিলাসজাত দ্রব্য ও সেবার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না বা করে না। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যবস্থা



www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের চাকচিক্যময় প্রচার ও বিজ্ঞাপন ক্রেতার স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দকে অনেকটা মূল্যহীন করে তোলে। সুদি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সীমাহীন ভোগের প্রতিযোগিতাকে আরো বেগবান করে তোলে। দ্রব্যমূল্য ও কর আকারে সুদ প্রদান করে ভোক্তাগণ ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং অবশেষে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিপুল জনগোষ্ঠীর হাতে ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় নিত্যব্যবহার্য পণ্য ক্রয় করে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতাও তাদের থাকে না। বাজারে চাহিদা পড়ে যায়। পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় বন্ধ হয়, উৎপাদনে স্থবিরতা নেমে আসে, এক মহামন্দায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অর্থনীতি।

এছাড়াও পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে নিঃস্ব, সর্বহারা, অক্ষম, আয়হীন এবং অল্প আয়ের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের কোনো প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা [Built in mechanism] নেই। একদিকে সুদি শোষণের মাধ্যমে দরিদ্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলে, অন্যদিকে দরিদ্র অক্ষমদের চাহিদা পূরণের স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় দুস্থ জনগোষ্ঠী বেসরকারি স্বেচ্ছাদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, অনেকে পেটের দায়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা থাকে না, রাষ্ট্রই সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ এ অর্থনীতিতে অনুপস্থিত।

যেহেতু সকল কর্মকাণ্ড-কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয় সেহেতু কারো পছন্দ বা কায়েমি স্বার্থ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অনুপস্থিত। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক মূল্য ব্যবস্থায় যে ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে তা সর্বহারাদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয়। উপরোক্ত অনুমিতিসমূহ সবই ভুল। এ অর্থনীতি ব্যক্তিস্বার্থ বলি দিয়ে সবশ্রেণীর মানুষকে সমাজের জন্য কাজ করতে কার্যকরী উৎসাহ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রের নামে, মানবকল্যাণের নামে সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যা করা হয়েছে তা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একদলীয় রাষ্ট্র যা উপহার দিয়েছে জুলুম, নির্যাতন, শ্রম শোষণ ইত্যাদি। এ ধরনের নির্মম কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে সমাজতন্ত্র নিজ পিতৃভূমিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এ মতাদর্শের মাধ্যমে প্রকৃত মানবকল্যাণ যে অর্জিত হয়নি তা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে।

## মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শে মানবকল্যাণ অর্জনের কৌশলসমূহ

১. ইসলামে সামাজিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণকে স্বীকার করা হয় পরিপূরক বিষয় হিসেবে। এখানে মনে করা হয় যে, ব্যক্তির মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল এবং সমাজের মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল হয়। ব্যক্তির যদি সুখ সমৃদ্ধি আসে তাহলে সমাজের সমৃদ্ধি হয় এবং সমাজ সমৃদ্ধ হলে ব্যক্তিরও সার্বিক মঙ্গল হয়। কিন্তু এটি সম্ভব হয় তখনই যখন ব্যক্তি তার নিজের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। অন্য কথায় ব্যক্তি যেন নিজ প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জন করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের অনিষ্ট না করেন। ইসলামী সমাজে প্রতিজন ব্যক্তি অন্যের মঙ্গলে অংশীদার হয়ে থাকেন এবং এভাবেই ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে থাকে। অন্য কথায় ব্যক্তির কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণ এখানে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।



www.pathagar.com

২. ইসলামী সমাজের সদস্যগণকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং প্রশিক্ষণ দিতে বাস্তবপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে, যাতে পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় এবং মানুষের স্বার্থপরতার [self interest] প্রবণতা প্রশমিত হয়। মহানবী [সা] বেশি জোর দিয়েছেন মানুষের নৈতিক সংশোধন এবং জীবন সম্বন্ধে সঠিক নৈতিক মনোভাবে গ্রহণের ওপর। এর ফলে মানুষের অন্তরে লোভ লালসার যে অশুভ শক্তি আছে তা শুধু দমিতই হয় না বরং প্রশমিত হয়ে মানসিক আনন্দ এবং জাগতিক সাফল্যের সূচনা করে।

৩. মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শে মানুষের অসীম চাহিদার মূলে আঘাত করে তা সসীম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ইসলাম মানুষের ভোগের ওপর হালাল হারামের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। মানুষের জন্য কল্যাণকর পণ্য ও সেবাই আল্লাহপাক হালাল করেছেন আর অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর জিনিস হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন: "খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা ৭, আল আরাফ: আয়াত ৩১]

"এবং কিছুতেই তাবজির [অপব্যয়] করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" [সূরা ১৭, বনি ইসরাইল: আয়াত ২৬-২৭]

স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ ধ্বংস ও অপচয় করা যাবে না। মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে এ আচরণকে কুরআনে ফাসাদ বা বিপর্যয় এবং অনাচার সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। [সূরা ২, আল বাকারা : আয়াত ২০৫] "হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বই তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" [সূরা ৫, আল মায়েদা: আয়াত ৯০]

মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শে মানুষ হারাম জিনিসের অভাব বোধ করে না, হারাম পণ্য ও সেবা ভোগ করবে না। এতে গোটা সম্পদ কেবল কল্যাণকর সম্পদ উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। এতে মানুষের সর্বপ্রকার কল্যাণকর চাহিদা পূরণে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও জোগান বাড়বে এবং দামও কমে আসবে। ফলে মানুষের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে।

৪. ইসলামে জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনের মটিভেশন সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতিই মানুষকে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। দুনিয়া ও আখেরাত দুই জগতেই কল্যাণকর এমন জিনিসেই মহানবী [সা] উদ্বুদ্ধ করেছেন। লটারির টিকেট কিনে দুনিয়াতে লাভ হতে পারে কিন্তু তা আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর। দুনিয়ার হাসানা ও আখিরাতের হাসানা এই দুটোই কাম্য। বৈধ পথে অর্জিত সম্পদে আমানতের শর্ত নির্ধারিত অর্থাৎ শুধু নিজস্বার্থ, নিজ পরিবার পরিজনই নয়, সমাজের অন্য সবার কল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে। [সূরা ২৮, আল কাসাস : আয়াত ৭৭]

৫. রিবা বা সুদ হারাম হওয়া মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শের একটি মৌলিক বিষয়। সুদ হারাম হলে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইসলামী অর্থনীতি সুদকে মূলোৎপাটিত করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এতে সুদের মাধ্যমে সৃষ্ট শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটে, ভোক্তাগণ সুদজনিত ব্যয় থেকে মুক্তি পায়, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। সুদ মূলোৎপাটনের ফলে বণ্টন ক্ষেত্রে



www.pathagar.com

বেঈনসাফি ও জুলুম হতে মুক্তি লাভ ঘটে। এতে ব্যাপক গণমানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

৬. মহানবী [সা] প্রদর্শিত আদর্শে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ রাষ্ট্রই পালন করে। বায়তুলমাল হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বীমাব্যবস্থা। বায়তুলমাল অক্ষম, দুস্থ, বৃদ্ধ, ইয়াতিম ও বিত্তহীনদের মৌলিক অধিকার পূরণের গ্যারান্টি। মহানবী [সা] বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার পর ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি কেউ সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তা তাদের উত্তরাধিকারীর, আর যদি কেউ সহায়হীন, ইয়াতিম ও বিধবা রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারী আমি।'

৭. এক মুষ্টি ভিক্ষা দেয়াকেও মানবকল্যাণ মনে করা হয়ে থাকে। মনুষ্যত্ববোধ আর মানবমর্যাদাকে এতে যে ক্ষুণ্ন করা হয় তা সাধারণত উপলব্ধি করা হয় না। মহানবী [সা] বলেছেন : 'উপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।' নিচের হাত মানে যে মানুষ হাত পেতে গ্রহণ করে, উপরের হাত মানে দাতা, যে হাত তুলে ওপর থাকে অনুগ্রহ বর্ষণ করে। দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা তার সর্ব অবয়বে প্রতিফলিত হয়।

মনুষ্যত্বের অবমাননা যে ক্রিয়াকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাকে কিছুতেই মানবকল্যাণ নামে অভিহিত করা যায় না। মানবকল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। একজন আনসারী সাহাবীর ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য। একদিন এক আনসারী সাহাবী মহানবী [সা]-এর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলেন। নবী [সা] তাকে একখানা কুড়াল কিনে দিয়ে বলেছিলেন, এটি দিয়ে তুমি বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা রোজগার কর। এভাবে তিনি ঐ সাহাবীকে শুধু স্বাবলম্বনের পথ দেখাননি, সে সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মর্যাদাবান হওয়ার, মর্যাদার সাথে জীবন যাপনের উপায়ও। ভিক্ষুকের হাতকে তিনি কর্মীর হাতে পরিণত করেছিলেন। অভ্যাসগত ভিক্ষাবৃত্তি ও অযথা হাত পাতাকে ইসলাম খুবই ঘৃণা করে। এ জন্যই তো কবি বলেছেন : 'নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত কর সবে।' মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক বৃত্তি বিকাশের পথেই বেড়ে উঠতে হবে আর তার যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানবকল্যাণের প্রাথমিক সোপান। সে সোপান রচনাই সমাজ আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৮. মানবকল্যাণে জাকাত ও ওশর এক বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জাকাত-ওশর ইসলামের এমন ম্যাকানিজম যার মাধ্যমে মানবকল্যাণের মূল লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। মহানবী [সা] প্রচারিত আদর্শ ইসলামে সচ্ছল মুসলমানদের জন্য জাকাত আদায় বাধ্যতামূলক মৌলিক ইবাদতগুলোর অন্যতম। গরিব, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত বনি আদমের আর্থিক কল্যাণের জন্য তথা তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ জাকাত আদায় ও বিলিবন্টন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। এ ছাড়া কাফফারা, ফিদিয়া,



www.pathagar.com

সাদাকাতুল ফিতর, মানাত, নাফাকাত, ওয়াকফ, ওয়াসিয়াত, সাদাকাতে নাফেলা, হিবা, জারাইর ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন ও মানবকল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৯. মহানবী [সা]-এর প্রচারিত আদর্শে ফি সাবিলিল্লাহর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে খরচ মানে গনেশকে দুধ খাওয়ানো নয়, এ খরচ মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হয়। তার মাধ্যমে বিত্তবানদের সম্পদের মোহমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামের সম্পদ খরচের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

১০. মহানবী [সা] মনোপলি, কার্টেল, অলিসপোলিকে নিষিদ্ধ করেছেন। মজুদদারি, মুনাফাখোরি, কালোবাজারি, চোরাচালানি ইসলামে নিষিদ্ধ আর এসবই মানুষের কল্যাণের জন্য। এসব নিষিদ্ধ থাকায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাতে মানুষ কর্মপ্রেরণা পায়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, মহানবী [সা] ভিক্ষুকের ঝুলিতে তন্দুল কণা বর্ষণ করে অথবা লঙ্গরখানা খুলে কিংবা গুড়-চিঁড়া, ছোলা, পানি বিতরণ করে মানবকল্যাণের কল্পনাও করেননি। তাঁর প্রচারিত আদর্শে মানুষের কল্যাণ শুধু প্রাচুর্যে নয়, অন্তরের সমৃদ্ধিতে, মানুষের চিত্তের মুক্তিতে। জনগণের মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করে, আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করে, বেঈনসাফি থেকে জনগণকে রক্ষা করে মানবকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালন আজ সময়ের দাবি।

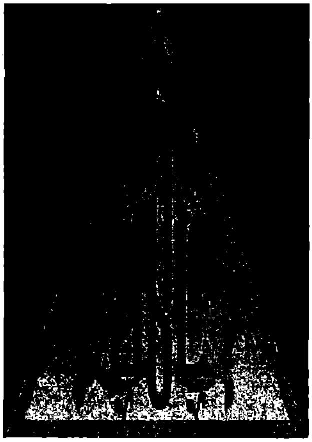



www.pathagar.com

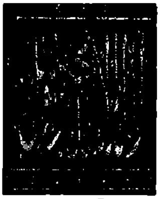

# হুদায়বিয়া সন্ধির প্রেক্ষিত ও মক্কা বিজয়

ড. আবু নোমান

**ভূমিকা**

মহানবী [সা]-কে তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়তী জীবনে অসংখ্য বড় বড় সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়েছে। মহানবী [সা] প্রতিটি স্তরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মক্কী জীবনের তের বছর নানারকম ভয়-ভীতি, হতাশা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে। এই সময়ের প্রথম দিকে চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী হযরত খাদিজা [রা] এর আন্তরিকতাপূর্ণ মধুর সান্তনায় মাঝে মাঝে আশ্রয় খুঁজে পেলেও পরবর্তীতে তাঁদের মৃত্যুর পর আর কোন আশ্রয় ছিল না। এই দূর্বিসহ সময়ে কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন যখন চরমে ওঠে, তখন তিনি মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশনায় মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেন। মহানবী [সা] এর জীবনে হিযরত এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জীবনের এক কষ্টকর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মহানবী [সা] কে চলে যেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে মাত্র আট বছরের মধ্যে সেই মক্কা বিজয় মহানবী [সা] কে এক মহান বিপ্লবী চরিত্রে উন্নীত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবী [সা] এর মক্কা বিজয় নি:সন্দেহে এক অবিস্মরনীয় ঘটনা। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমেই মূলত ইসলাম গোটা আরব তথা সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম হয়েছে। হিযরত থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত আট বছরের যে সমস্ত ঘটনা মক্কা বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে, তার মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও সন্ধি রচনার প্রেক্ষাপট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা যায়। সন্ধি ঘটনার মত মহানবী [সা] এর প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে ইসলাম যেভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল, ইতোপূর্বে আর কোন ঘটনার মাধ্যমে এতটা সম্ভব হয়নি। পবিত্র কুরআনে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা মহাবিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আবু বকর [রা] একে উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছিলাম, সেইরূপ আর কখনই হইনি।" সুতরাং একথা অকপটেই বলা যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ও সন্ধি ঘটনার প্রেক্ষিতই মক্কা বিজয়ের সূচনা করেছে।



www.pathagar.com

**হুদায়বিয়া সন্ধির প্রেক্ষাপট**

নবুয়তের ত্রয়োদশতম বৎসরে মহানবী [সা] মাতৃভূমি মক্কা থেকে হিযরত করে মদিনায় গমন করেন। মাতৃভূমি ছেড়ে যাবার যন্ত্রণা তাঁকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছিল। এসময় তিনি বার বার মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। এতে মাতৃভূমি মক্কার প্রতি তাঁর আবেগঘন ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃভূমি মক্কায় ফিরে আসার এক দূর্বার আকাংখা মহানবী [সা] এর মনে জাগরুক ছিল বলে মনে হয়। ফলে মদিনার নতুন পরিবেশে মহানবী [সা] বসবাস ও ইসলাম প্রচারে অবতীর্ণ হলেও মক্কার প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আকর্ষণ কোন সময়ই কমেনি। তাছাড়া, মক্কার কুরাইশরা অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে মহানবীকে মক্কায় হিজরতে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, ইসলাম যেন আর প্রসারিত হতে না পারে, মুহম্মদের ক্ষমতার পরিব্যপ্তি যেন আর বৃদ্ধি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তারা যথাসম্ভব সর্বোত প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ, ৩য় হিজরীতে ওহুদের যুদ্ধ, ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ সহ বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু ঝামেলায় তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। মূলত এই সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ যুদ্ধ-বিগ্রহই হুদায়বিয়ার পটভূমি রচনা করেছে, এবং পরিশেষে মক্কা বিজয় সূচীত হয়েছে।

**মদিনা সনদ**

মহানবী [সা] হিযরত করে মদিনা পৌঁছেই রাষ্ট্রনায়কোচিত যে কাজটি সর্বপ্রথম করেছিলেন তা হচ্ছে, মদিনা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বসবাসকারী সকল গোত্র ও নাগরিকদের নিয়ে একটি সনদ রচনা করা। একে মদিনা সনদ বলা হয়। মদিনায় তিন শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। এরা হলো-মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্তলিক। মদিনার মুসলমানগণ প্রধানত দুটি গোত্রের ছিল, আউস ও খাযরাজ। এরাও বিভিন্ন দলে উপদলে ছিল বিভক্ত। ইহুদীরা প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত ছিল, বনু নযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা। এদের গোত্র, দল এবং উপদলগুলির মধ্যে সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। মদিনার পৌত্তলিকদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও সুযোগ পাওয়ামাত্র মহানবী [সা] এর বিরুদ্ধাচরণ করতে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। সুতরাং মদিনার সকল, গোত্র, দল, উপদলকে কোন একটি ব্যানারে একত্রিত করে চুক্তিবদ্ধ হবার মত প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত মহানবী [সা] গ্রহণ করলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও সংহতির লক্ষ্যে মদিনা সনদ রচনা করেন। মদিনা সনদের শর্তগুলি ছিল মহানবী [সা] এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এই সনদের মাধ্যমেই মহানবী [সা] মূলত মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃত হলেন। গোটা মদিনাবাসী মহানবী [সা] এর নেতৃত্বে একটি জাতি হিসেবে বরিত হলো। মদিনার কল্যাণ ও উন্নয়নে সকল সম্প্রদায়ের আত্মনিয়োগ, এবং মদিনার ক্ষতি বা অন্য গোত্র কর্তৃক মদিনা আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের একযোগে কাজ করার মাধ্যমে সকল গোত্রকে একটি সুদৃঢ় ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কে তিনি জড়িয়েছিলেন। মূলত এই ঐক্যতা ইসলামকে একটি প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মে ও মহানবী [সা]কে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে সকলের মাঝে উপস্থাপিত



www.pathagar.com

করে দিয়েছিল। ইসলামের ভিত্তি রচনার মূল হিসেবে এই মদিনা সনদ নি:সন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা যায়। একে ঐতিহাসিক বিজয়ও বলা যায়। এই বিজয়ের ধারাবাহিকতায় বদর, ওহুদ ও খন্দকের মত যুদ্ধও সম্পৃক্ত হয়েছে। মদিনা সনদের ফলে প্রাপ্ত সুবিধায় মুসলমানরা মক্কার সেই কুরাইশদের যারা মাত্র এক বছর পূর্বে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, এবং পরাজিত করেছে। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহানবী [সা]কে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে সত্য, কিন্তু কোন যুদ্ধেই মুসলমানরা প্রথম আক্রমণকারী ছিল না।

**বদর যুদ্ধ**

মদিনার কোন ব্যক্তি মক্কায় হজ্বে গেলে মক্কার কুরাইশরা প্রায়ই বাধা প্রদান করতো। মদিনার মুসলমানরা মদিনা সীমান্তে উট, দুম্বা চরানোর জন্য নিয়ে গেলে কুরাইশরা আক্রমণ করে সেগুলো নিয়ে যেতো। এসমস্ত আক্রমণের প্রতিজবাব দেবার মত মুসলমানদের শক্তি-সাহস তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মহানবী [সা] জুহায়না, এবং বনু জামরার মত বেশকিছু সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরেই আগ্রহী ছিলেন। পক্ষান্তরে, কুরাইশরা কোন ধরনের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত না নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকলো। কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মহানবী [সা] মুসলমানদের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকবার প্রেরণ করেন। আবওয়া, বুওয়াত, সাফওয়ান, যুল উশায়রা, আব্দুল্লাহ বিন জাহসের নেতৃত্বাধীন অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন জাহসের নেতৃত্বাধীন নাখলা অভিযানে কুরাইশ নেতা আমর বিন হাজরামী নিহত হলে মক্কার কুরাইশরা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এর ফলেই ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের চৌদ্দ জন শাহাদাত বরণ করেন। পক্ষান্তরে, কুরাইশদের সত্তরজন নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দীত্ব বরণ করে। বদর যুদ্ধের ফলে কুরাইশরা মুসলমানদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়। এ যুদ্ধের পর হতে মুসলমানদের প্রতি তাদের ভয় বেড়ে যায়, এবং নতুনভাবে চিন্তা করতে থাকে।

বদর যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফলে মুসলমানদের অবস্থান দ্রুতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোত্র মুসলমানদের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে, যা কুরাইশদের জন্য ছিল অসহনীয়। কুরাইশরা বদরে মুসলমানদের শক্তির পরিচয় পেয়ে হতভম্ব হয়েই মুসলমানদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে মক্কার সকল গোত্র-সম্প্রদায়কে একত্রিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু বদরে কুরাইশদের বিপুল পরিমান শক্তিক্ষয় এবং নিবেদিত কুরাইশ নেতাদের মৃত্যুর ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে



www.pathagar.com

যথেষ্ট শক্তি নিয়ে দাঁড়ানোর মত সাহস তাদের ছিলনা। দীর্ঘ এক বছরে তারা মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা করে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ওহুদের যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়।

**ওহুদ যুদ্ধ**

বদর যুদ্ধের অপমানজনক পরাজয়ের নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা লাঘবের উদ্দেশ্যে ৩য় হিজরীতে মক্কার কুরাইশগণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। বদরের পরাজয়ের ফলে তারা ইতোমধ্যেই অনেকটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। মদিনা উপকণ্ঠ হয়ে সিরিয়া-মিসর বাণিজ্য তাদের বন্ধ হয়ে পড়েছে। তদুপরি মক্কার কুরাইশ মহিলারা তাদের পুরুষদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সার্বক্ষণিক উত্যক্ত করে চলেছে। এমতাবস্থায় মদিনার বেশ কয়েকটি ইহুদী সম্প্রদায় মক্কার কুরাইশদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে মদিনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। ফলে তিন হাজার দক্ষ বাছাই সৈন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি নিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। অপরপক্ষে মুসলমানগণ মাত্র সাতশত সৈন্য এবং নিম্নমানের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থা মুসলমানদের পক্ষে থাকলেও রাসূল [সা] এর নির্দেশ অমান্য করে ওহুদ গিরিপথের পাহারাধারী সাহাবাদের গণিমতের মাল সংগ্রহের চেষ্টার ফলে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, এর সুযোগ নিয়ে কুরাইশগণ আক্রমণ চালালে মুসলমানদের বিজয় নিমেষেই পরাজয়ে পরিণত হয়। মুহূর্তের মধ্যে মুসলমানদের সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করে। ওহুদ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের যে শিক্ষা হয়েছিল, তা ভবিষ্যতের প্রতিটি পদক্ষেপে তারা কাজে লাগিয়েছিল। কুরাইশরা ওহুদে বিজয় লাভ করলেও তারা তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেনি। ফলে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা তা কাজে না লাগিয়ে ওহুদ প্রান্তর ছেড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। বিষয়টি পরবর্তী বিশ্লেষকদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

এইভাবে ধীরে ধীরে মুসলমানদের অবস্থান শক্তিশালী হয়ে ওঠে। W. Montgomery Watt লিখেছেন, "মুহম্মদের জন্য যুদ্ধের নির্ভেজাল সামরিক ফলাফল কেবারে অসন্তোষজনক ছিল না। মুসলমান যোদ্ধাগণ মক্কার কুরাইশ বাহিনীর প্রায় সমকক্ষ ছিল। শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর কারণেই মুসলমানদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর মুসলমানদের পক্ষে তাদের দারিদ্র্যতার কারণে অশ্বারোহী সেনাদল গঠন করা সম্ভবপর ছিল না। এতসব প্রতিকূলতা সত্বেও মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহম্মদ তাঁর অবস্থানকে সুসংহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সে মুহূর্তে এর প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক।" আতাহার হোসেন তাঁর Prophet Muhammad and his Mission, বইতে লিখেন, "মক্কার কুরাইশরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের একক ক্ষমতাবলে এই ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করা যাবে না।" যতই আক্রোশ ও ক্ষোভ নিয়ে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে অগ্রবর্তী হোক না কেন, এটা তাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে



www.pathagar.com

মুসলমানদের সাথে তাদের সমঝোতার সাথেই চলতে হবে। আর এই উদ্দেশ্যেই মক্কার অনেক কুরাইশ নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছিল।

**খন্দকের যুদ্ধ**

যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের মাধ্যমে মুসলমানদের শায়েস্তা করার পথ খুঁজতে থাকে কুরাইশরা। ইতোমধ্যে ইহুদীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে রাসূল [সা]কে হত্যার ষড়যন্ত্রও তারা করে। দ্বিতীয় বদর অভিযানে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়, যাতুর-রিকা ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়। দুমাতুল জান্দালে মুসলমানদের অভিযানে তাদের ষড়যন্ত্র বুমেরাং হয়ে যায়। এইভাবে তারা চরম হতাশার মধ্যে নিপতিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা অতর্কিতভাবে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে মদিনার ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী ও মুনাফিকদের যোগসাজসে তারা পরিকল্পনা মত এগুতে থাকে। কিন্তু মহানবী [সা] এর কাছে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যায়। রাসূল [সা] তাদের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। পরামর্শ সভায় ইরানী সাহাবী সালমান ফারসী পরিখা খননের পরামর্শ দেন। রাসূল [সা] সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন। ৫ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত উক্ত যুদ্ধকে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়।

খন্দকের যুদ্ধই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সশস্ত্র বড় যুদ্ধাভিযান বলা যায়। সকল দিকে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে তারা যে চক্রান্তমূলক জাল বিস্তার করেছিল, তা সফল হয়নি। প্রায় তিন হাজার মুসলমান শিশু, নারী, ও পুরুষের বিপরীতে কুরাইশরা তাদের দক্ষ দশ হাজার সেনাবাহিনীর সমাহার নিয়েও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। প্রায় এক মাস মুসলমানদের অবরোধের পর তারা পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়।

মূলত শান্তি স্থাপনই ছিল মহানবী [সা] এর আদর্শ। তবুও যদি যুদ্ধ করতেই হয়, তবে শান্তি স্থাপনের বৃহত্তর স্বার্থেই করতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "তোমরা দুশমনের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যে পর্যন্ত অশান্তি দূরীভূত না হয়।" পবিত্র কুরআনে শান্তি স্থাপনের পথ নির্দেশ করে আল্লাহপাক আরো এরশাদ করেছেন, "আর যখন কাফিরগণ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নিকট শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করে তখন তোমরাও তাতে সম্মতি জানাও, এবং এই সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা কর। কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেন, জানেন। কিন্তু যদি তারা চুক্তির প্রস্তাব করে তোমাদেরকে ধোকা দিতে চায়, তবে একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি যদি সহায় থাকেন তবে কেহই তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক মহানবী [সা] সকল সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে আগ্রহী ছিলেন। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত না হলে



www.pathagar.com

তিনি কখনো যুদ্ধের অনুমতি দেননি। যুদ্ধের পূর্বে শান্তিচুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখেছেন। এরূপ এক পরিস্থিতিতেই মূলত হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**হুদায়বিয়ার সন্ধি**

দীর্ঘদিন মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে এসে মহানবী [সা] এর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কাবা শরীফ জিয়ারত করবার মহান আল্লাহ তায়ালার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেয়ে মহানবী [সা] ৬ষ্ঠ হিজরীতে জিলকদ মাসে পবিত্র উমরাহ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে মহানবী [সা] তাঁর চৌদ্দশত সাহাবীসহ শান্তিপূর্ণভাবে উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা তখনো শেষ হয়ে যায়নি। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। খুযায়া গোত্রের সর্দার বুদাইলের মাধ্যমে কুরাইশদের এই মনোভাবের কথা মহানবী [সা] জানতে পারলেন। মহানবী [সা] বুদাইলের মাধ্যমে কুরাইশদের এই মর্মে সংবাদ দিলেন যে, মুসলমানরা কোন যুদ্ধের জন্য নয়, বরং শান্তিপূর্ণভাবে কাবা শরীফে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের বাধা দেবার জন্য কুরাইশরা ছিল সংকল্পবদ্ধ। মহানবী [সা] হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রাবরতি করে তাঁর পাঠানো সংবাদের উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কুরাইশদের মধ্যে কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তি মহানবী [সা] এর শান্তিপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাইল। তারা জানতো যে, মুহম্মদ [সা]কে যদি উমরাহ পালন করতে দেয়া না হয়। তাহলে এর ফলে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। তাছাড়া মহানবী [সা] এর সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মক্কার কুরাইশরা সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক পূণ: চালু করতে পারবে। কারণ মদিনার উপর দিয়ে যাওয়া এই বাণিজ্য পথটি মুসলমানদের দখলে রয়েছে। অতএব, কুরাইশরা তাদের মুখপাত্র হিসেবে উরওয়া ইবনে মাসউদকে মহানবী [সা] এর নিকট এই সন্ধি চুক্তির শর্ত নির্ধারণের জন্য প্রেরণ করলেন। উরওয়া মহানবী [সা] এর নিকট আসলো কিন্তু উভয় পক্ষের আলোচনা কালে মহানবী [সা] এর অনুসারীদের সম্পর্কে তার অপ্রীতিকর ও শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের কারণে চুক্তি সম্পন্ন সফল হননি। তবে উরওয়া মহানবী [সা] এর উপর সাহাবীদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভালবাসা ও আস্থা লক্ষ্য করে এবং মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদের তা অবহিত করে। মহানবী [স] দ্বিতীয়বার কুরাইশদের নিকট খিরাস ইবনে উমাইয়া নামক একজন দূতকে প্রেরণ করলেন, কিন্তু কুরাইশরা তার সাথে দূর্ব্যবহার করে এবং তার উটের পায়ের রগ কেটে দেয়। কুরাইশরা মহানবী [সা] ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুবই শত্রুতামূলক আচরণ করে। তারা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য একটি ক্ষুদ্র দলকেও পাঠায়। কুরাইশদের এসমস্ত লোক আক্রমণ করতে এসে নিজেরাই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। কিন্তু মহানবী [সা] তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন এবং মক্কার পবিত্র কাবা ঘরের আওতার মধ্যে রক্তপাত করতে নিষেধ করেন। অতপর মহানবী [সা] হযরত ওসমান [রা]কে শান্তির জন্য



www.pathagar.com

কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত ওসমান [রা] মক্কায় পৌঁছলে কুরাইশরা তাঁকে বন্দী করে। মুসলিম শিবিরে এরূপ গুজব রটে যে কুরাইশরা হযরত ওসমান [রা]কে হত্যা করেছে। মহানবী [সা] এই খবরে খুবই মর্মাহত হলেন। পবিত্র কাবা শরীফের এলাকার মধ্যে পবিত্র মাসে কোন আরব গোত্র প্রধানকে হত্যা করা ইসলাম পূর্ব আমলেও আরবদের জন্য জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হতো।

মহানবী [সা] তাঁর সাহাবীদের ডেকে নতুন করে শপথ নেয়ার জন্য বললেন যে তাদের ধর্ম ও ঈমানের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ করবে। একটি গাছের নিচে এই শপথ নেয়া হয়। ইতিহাসে এই শপথকে 'বাইয়াতুর রিদওয়ান' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।"

সকল সাহাবীর শপথ গ্রহণ শেষ হলে রাসূল [সা] তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর দিয়ে হযরত ওসমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে নিজে শপথ নিলেন। পরে অবশ্য হযরত ওসমান [রা] নিরাপদে মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন।

কুরাইশরা বুঝতে পারলো যে, এই অপ্রতিদ্বন্দ্বি ও বিস্ময়করভাবে একান্ত অনুগত ভক্ত সমন্বয়ে গঠিত এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সফলকাম হতে পারবে না। তাদের অবিস্মরণীয় অতীত ও শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি তখনো তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। তাই তারা সুহাইল ইবনে আমরকে মুসলমানদের নিকট সন্ধি করার জন্য দূত করে পাঠালো। তার সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ একটি যুদ্ধ বিরতিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ইতিহাসে এটিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

**হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত সমূহ**

হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:-

* এ বছর পবিত্র কাবায় উমরা পালন না করেই মুসলমানগণ মদিনায় ফিরে যাবে।
* মুসলমানরা পরের বছর উমরা করতে পারবে। কিন্তু তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না।
* অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই তারা পরবর্তী বছর পবিত্র নগরীতে আসবে। এ সময় কেবলমাত্র কোষবদ্ধ তরবারী সঙ্গে আনা যাবে।
* মক্কায় বসবাসরত কোন মুসলমানদের তারা সাথে করে মদিনায় নিয়ে যেতে পারবে না, আবার কোন মুসলমান যদি মক্কায় যেতে চায় তাকেও তারা বাধা দিতে পারবে না।
* যদি কোন মক্কাবাসী মদিনায় চলে যায় তবে তাদেরকে হস্তান্তর করতে হবে, আর যদি কোন মুসলমান মক্কায় আসে তবে মক্কাবাসীরা তাকে হস্তান্তর করবে না।



www.pathagar.com

* আরবের অন্যান্য গোত্র স্বাধীনভাবে যে কোন পক্ষের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।
* এই চুক্তির মেয়াদ হবে দশ বছর।

সাধারণভাবে মুসলমানগণ শর্তাবলীতে খুশি হতে পারেনি। চুক্তির শর্তগুলি ছিল বড় বেশী একতরফা ও অবমাননাকর। সন্ধিচুক্তির শর্তাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনাকালে কুরাইশদের একগুঁয়ে আচরণ মুসলমানদেরকে ভেতরে ভেতরে ক্রোধান্বিত করে তোলে, কিন্তু মহানবী [সা] এর মনস্তুষ্টির জন্য তারা শান্ত থাকে।

## হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতিক্রিয়া

হুদায়বিয়ার সন্দির শর্তসমূহ মুসলমানদের জন্য আপাত দৃষ্টিতে ছিল খুবই অবমাননাকর। সন্ধি চুক্তিপত্রটি লেখা চলছে, তখনও উভয় পক্ষ চুক্তিপত্রে কোন স্বাক্ষর দেয়নি এমন সময় কুরাইশদের পক্ষে মহানবীর [সা] সাথে সন্ধির শর্ত নির্ধারণকারী সুহাইল ইবন আমরের পুত্র আবূ জানদাল সভাস্থলে মুসলমানদের দলে যোগদান করতে আসে। সে ইতোপূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তার প্রতি যে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে তা সে মহানবী [সা]কে দেখায়। এই দূর্দশা দেখে মহানবী [সা] ও তাঁর সাহাবীরা খুবই ব্যথিত হলেন, আবু জান্দালের শত অনুনয়ে মহানবী [সা] এর প্রাণ বিগলিত হলেও শর্ত ভঙ্গকারী কোন পদক্ষেপ নেননি। তিনি আবু জানদালকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন, এবং নিজে চুক্তির শর্ত পালনের জন্য দৃঢ় থাকলেন। হযরত ওমর, হযরত আলী [রা] সহ অনেক সাহাবী বিষয়টিতে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং সন্ধির শর্তাবলীকে এক চরম অবমাননা হিসেবেই দেখেছিলেন।

## ফাতহুম মুবিন

রাসূল [সা] এর রিসালাত ও বিশাল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা ছিল মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফিরগণ কর্তৃক মদিনায় প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং মহানবী [সা]-এর নেতৃত্বের স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত। এতকাল যারা ছিল প্রাণের শত্রু, আজ তারাই সন্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতে দশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ না করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর ঘর কাবা ঘর যিয়ারত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চুক্তির ফলেই মহানবী [সা] ইসলামের আহবান দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পান। এই সন্ধির পরেই খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস ও উসমান বি তালহাসহ বড় বড় যোদ্ধা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই মহান চুক্তির ধারাগুলো আপাত দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অসম্মানজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। অল্প সময়ের মধ্যে মদিনার বাইরের বিভিন্ন গোত্রের বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সন্ধির একটি শর্ত অনুযায়ী মক্কা হতে প্রত্যাগত নবদীক্ষিত মুসলমানদের মহানবী [সা] মক্কায় পাঠিয়ে দিতেন, আবু জানদাল যার জ্বলন্ত



www.pathagar.com

প্রমাণ। পরবর্তীতে এইরকম নবদীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তাঁরা সন্ধিশর্ত বজায় রেখে মদিনা না গিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী 'ইস' নামক এক জঙ্গলে বসবাস করতে শুরু করেন। সিরিয়া হতে প্রত্যাগত মক্কার ব্যবসায়ীদের সেই পথ দিয়ে আসতে হতো, ফলে তারা এই সমস্ত নবদীক্ষিত মুসলমানদের হুমকিস্বরূপ মনে করে নিজেরাই শর্তটি সংশোধনের অনুরোধ জানায়। ফলে এই সমস্ত মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানরা মদিনায় মহানবী [সা] এর সাথে মিলিত হবার সুযোগ পান। এইভাবে দেখা গেল, শর্ত যেমনই হোক না কেন, এর সুফলগুলি ছিল মুসলমানদের পক্ষে।

হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলেই মুসলিম মিল্লাত আরব বিশ্বে একটি শক্তিধর জাতির সম্মান লাভ করে। তাই রাসূল [সা] অত্যন্ত সাচ্ছন্দে মক্কার কাফির সর্দারদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমরের আরোপিত শর্তগুলি মেনে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল করীমে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে তাই 'ফাতহুম মুবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই মহান সন্ধির ধারাবাহিকতায় ইসলামের উত্তরোত্তর প্রসার এবং সর্বোপরি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে, যা বিশ্বজয়েরও সূচনা করে।

**হুদায়বিয়া সন্ধি ভঙ্গ ও মক্কা বিজয়ের সূত্রপাত**

হুদায়বিয়ার সন্ধি দুই বছর স্থায়ী হয়। এই দুই বছরে ইসলাম অনেকটাই শক্তিশালী হয়। সন্ধি কার্যকর হওয়ার পর খুযায়া গোত্র মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের শত্রু বনু বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুসলমানদের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় কুরাইশদের অন্তর্জ্বালা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি তাদের মধ্যে জন্ম নিতে থাকে এক প্রচন্ড ক্রোধের। খুযায়া গোত্র মহানবীর [সা] সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় কুরাইশরা তাদের মিত্র বনু বকরকে খুযায়া গোত্র আক্রমণের জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। এই গুপ্ত চক্রান্তের ফলে বনু খুযায়াবাসী যখন 'ওয়াতির' নামক জলাশয়ের নিকট এক রাত্রে নিদ্রামগ্ন ছিল, তখন অতর্কিতভাবে বনু বকর তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বনু খুযায়ার অনেক লোককে হত্যা ও তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। কুরাইশরা এই আক্রমণে তাদের প্রকাশ্যে সাহায্য করে। বনু খুযায়া গোত্র এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে কুরাইশদের নিকট অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তারা মহানবী [সা] এর নিকট তাদেরকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মহানবী [সা] সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কুরাইশদের তিনটি শর্ত দিয়ে এর যে কোন একটি বেছে নেয়ার জন্য বার্তা প্রেরণ করেন ঃ

১. খুযায়া গোত্রের যে সব লোককে হত্যা করা হয়েছে, কুরাইশদের তার রক্তপণ প্রদান করতে হবে, অথবা
২. বনূ বকরের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, অথবা
৩. কুরাইশদেরকে হুদাইবিয়া সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।



www.pathagar.com

কুরাইশ পক্ষ প্রথম দুটি শর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে কুরত ইবন উমারের মাধ্যমে মহানবীর [সা] নিকট সংবাদ পাঠায় এবং এই সংবাদে তারা জানিয়ে দেয় যে, তারা তৃতীয় শর্তটি গ্রহণ করেছে। কুরাইশদের পক্ষে এটা ছিল একটি অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি বিলুপ্তির অনিবার্য ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরে পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান চুক্তিটি নবায়নের উদ্দেশ্যে নিজেই মদিনায় মহানবী [সা] এর সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। কিন্তু তার প্রস্তাবের পাশাপাশি মুসলমানদের দাবীর প্রতি তিনি কর্ণপাত করেননি। এটি ছিল নিতান্তই অযৌক্তিক। ফলে মহানবী [সা] তার চুক্তি নবায়নের প্রস্তাবে সম্মত হননি।

**মক্কা বিজয়**

মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যের খবর সম্পূর্ণ গোপন রেখে মহানবী [সা] ৮ম হিজরীর ১০ই রমজান দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য মদিনা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে 'মারুয-যাহরান' নামক স্থানে তিনি শিবির সন্নিবেশ করলেন। এই বিশাল বাহিনী দেখে কুরাইশরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। প্রত্যেক তাবুতে আগুন জ্বালানোর জন্য মহানবী [সা] নির্দেশ দিলেন। রাত্রে তা দেখে কুরাইশরা মুসলিম বাহিনীর প্রকৃত শক্তি থেকে অনেক বেশী বলে ধারণা করলো। এসময় আবু সুফিয়ান ছদ্মবেশে শিবিরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আসলে ইসলামের এই ঘোরতর শত্রু মুসলমানদের কাছে ধরা পড়ে যায়। তাকে মহানবী [সা] এর কাছে নিয়ে আসা হলে করুণার মূর্ত প্রতীক মহানবী [সা] তাকে ক্ষমা করে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, যারা আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা নিরাপদ থাকবে। আবু সুফিয়ান মহানবী [সা] এর মহানুভবতায় এবং ইসলামের মহান উদার নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌছে মুসলমানদের আগমনের খবর ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা যে নির্বুদ্ধিতা হবে, তা প্রচার করে দিলেন।
পরদিন মহানবী [সা] শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কোনরূপ রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে সকলকে নির্দেশ দিলেন। কাবা ঘরে প্রবেশ করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সমস্ত প্রতিমাগুলিকে সরিয়ে কাবাঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করলেন। অতপর এক ভাষণে সমস্ত মক্কাবাসীর প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করলেন। মহানবী [সা] এইভাবে তাঁর শত্রুদের প্রতি এক দৃষ্টান্তমূলক ক্ষমা প্রদর্শনের সাক্ষর রাখলেন। সুদীর্ঘ তের বছর ধরে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ এই মক্কায় কুরাইশদের হাতে নিদারুন নির্যাতন ভোগ করেছেন। তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মুসলমানদের বাধ্য হয়ে মদিনায় হিযরত করতে হয়। হিন্দার মত, আবু সুফিয়ানের মত, ইসলামের ঘোরতর শত্রুকেও ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। কোন বিজয়ী তাঁর শত্রু বিজিতদের এভাবে ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করতে পারে, ইতিহাসে তেমন নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না।
ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন যে, "যুদ্ধ বিজয়ের সকল ঐতিহাসিক বিবরণীতে মহানবী [সা] এর বিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশের মত দৃশ্য আর দেখা যায় না।" বিশ্ব ইতিহাস মহানবী [সা] এর মত ব্যক্তিত্ব এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি করতে



www.pathagar.com

পারেনি, যাঁর ছিল ক্ষমা করার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বস্তুত মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের একটি অনন্য বিজয় এবং মহানবী [সা]-এর পবিত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অটল বিশ্বাসের বিজয়।

**উপসংহার**

হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের জন্য একটি সুমহান বিজয়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার পরিচায়ক মহানবী [সা] এর এ হুদায়বিয়া সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমেই মূলত মক্কা বিজয়ের পথ পরিস্কার হয়ে যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আসসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সময়েই ইসলামের সুমহান ছায়াতলে সন্নিবেশিত হতে শুরু করে। দেখা যায়, নবুয়তের প্রথম বছর থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত [৬১০-৬২৯খ্রিস্টাব্দ] উনিশ বছর সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা যেখানে চৌদ্দশত ছিল, সেখানে সন্ধির দু'বছর পর মহানবী [সা] দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা বিজয় করেছিলেন। এথেকেই হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঐতিহাসিক যুহুরীর ভাষায়, "There was no man of sense of judgment amongst the idolators who was not led thereby to join Islam." মূলত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরাইশদের অংশগ্রহণের মধ্যেই বিজয়ের বীজ লুক্কায়িত ছিল। এ সন্ধির মত পরিস্থিতি তৈরী একদিনে হয়নি। মহানবী [সা]কে অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে কুরাইশরা এক পর্যায়ে তাঁকে মদিনায় হিজরতে বাধ্য করেছিল। হিজরতের পরেও মহানবী [সা] ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বদর, ওহুদ, খন্দকের মত যুদ্ধ মহানবী [সা] ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়েই কুরাইশরা সংঘটিত করেছিল। আর এ উদ্দেশ্যে ইহুদী-খৃষ্টানদের সহযোগিতা পেয়েও মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারেনি। এক সময় তাদের সাথেই হুদায়বিয়া সন্ধিতে বসতে হয়েছে। আর সন্ধির সুযোগে মহানবী [সা] দেশে-বিদেশে ইসলামের আহবান পৌঁছিয়ে ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হন। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই সন্ধির সুফল মুসলমানদের অনুকূলে এত ব্যাপক শক্তি ও সাফল্য বয়ে এনেছিল যে, কুরাইশগণ বিচলিত না হয়ে পারেনি, এবং সন্ধি ভঙ্গ করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। এ সুযোগে মহানবী [সা] তাঁর দশ হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা জয় করে নেন, এবং এ থেকেই শুরু হয় বিশ্ব জয়ের অধ্যায়। আর একেই মহান আল্লাহ পাক 'ফাতহুম মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী**


১. ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, [আকরাম ফারুক অনুদিত], বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৮
২. আল্লামা শিবলী নোমানী, সিরাতুন নবী [সা], [আল্লামা সোলায়মান নদভী ও মওলানা মুহিউদ্দিন খান অনুদিত], প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৫
৩. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮০




www.pathagar.com

৪. আ,খ,মু, ইয়াকুব আলী [ড.এ কে এম ইয়কুব আলী] মহানবী ও ইসলাম, রেযা-উর-রহীম, মতিহার, রাজশাহী, ১৯৭৪
৫. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা [সা], সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮
৬. ইবনে ইসহাক, [শহীদ আখন্দ অনুদিত], সীরাতে রসুলুল্লাহ [সা], [তৃতীয় খন্ড], ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২
৭. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, [খাদিজা আখতার রেজায়ী অনুদিত, পরিবেশনা-আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়], খাদিজা আখতার রেজায়ী, লন্ডন, চতুর্থ প্রকাশ, ২০০০
৮. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী [প্রা] লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৫
৯. ডঃ মজিদ আলী খান, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ [সা], [আবু মুহম্মদ অনুদিত] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫
১০.মুহম্মদ আবু তাহের [সম্পাদিত], রাসূলুল্লাহ [সা]-এর হুদায়বিয়ার সন্ধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭

www.pathagar.com

# আমাদের রাসূল [সা]

## ড. মাহফুজ পারভেজ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় যখন নি:সঙ্গ অবস্থায় রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, সে সময় তাঁর কোটের পকেট থেকে তাঁর নিত্য সময়ের সঙ্গী যে বইটি পাওয়া যায়, সেটি ছিল আবদুল্লাহ সোহরাওয়াদী লিখিত 'দ্য সেয়িংস অব প্রফেট মুহাম্মদ [সা]'। বাংলায় যার শিরোনাম 'মহানবীর [সা] বাণী'। বইটির একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূল [সা] বলেছেন: 'তুমি নিজের জন্য যেটা ভালো মনে করবে, অন্যের জন্যও তা ভাববে। আর যেটা নিজের জন্য মন্দ মনে করবে, অন্যের জন্যও তাই মনে করবে।' সহীহ হাদিস গ্রন্থ বুখারি ও মুসলিমেও এর উল্লেখ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর আবদুন নূর 'আয-যিকরু ওয়াল ফালাহ' গ্রন্থে তাঁর শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন: 'এক মার্কিন তরুণী দীর্ঘ দু'বছর মেলামেশার পর, তার বাংলাদেশী পুরুষ-বন্ধুকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। বন্ধুটি বলে যে, সে রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। তাই তাকে বিয়ে করতে হলে মেয়েটিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হতে হবে। মার্কিন তরুণীটি ইসলাম ধর্ম কী, তা বুঝতে চাইলো। ছেলেটি তাকে আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত পবিত্র কুরআন শরিফের একটি কপি দিয়ে বললো যে, ওটি পড়লে সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে। দু'মাস কুরআন অধ্যয়নের পর মার্কিন তরুণীটি এসে জানালো, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। ইসলামের সৌন্দর্য ও সমন্বিত নীতিমালা আমাকে আকর্ষণ করেছে। এ ব্যাপারে আমার মা-বাবারও আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাকে আর বিয়ে করতে পারবো না। কারণ তোমার আচার-আচরণ লক্ষ্য করছি সম্পূর্ণ কুরআন পরিপন্থী।' [পৃ. ৩৭]

রুশ দেশীয় টলস্টয় এবং মার্কিন তরুণী যা বুঝতে ও অনুধাবণ করতে পেরেছে, মুসলমানগণ সেটা কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন? অথচ পবিত্র কুরআনের সুরা ২ [আল বাকারা], আয়াত ১৮৯; সূরা ৩ [আলে ইমরান], আয়াত ১৪৪; সূরা ২৩ [আল মোমেনুন], আয়াত ১-১১; সূরা ২৪ [আন নূর], আয়াত ৬২; সূরা ২৬ [আশ শোয়ারা],



www.pathagar.com

আয়াত ৯০-এ মানুষের শ্রেণী বিভাগ এবং তাড়না ও আচরণের মিথস্ক্রিয়ায় মানবিক বিকাশের ধারাক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে মানুষের জীবন বিকাশের পর্যায়গুলো হলো: আন নাস বা মানুষের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাসী মুমিন। তার উপরের স্তরে রয়েছে মুসলেমুন বা সচেতনভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী। তার ওপরের স্তরে রয়েছে আল্লাহর সকল হুকুম-আহকাম সতর্কভাবে পালনকারী মুত্তাকীন। এবং সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে সৎকর্মপরায়ন মোহসেনীন।

মানবজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার অভিলাষে তিলে তিলে অগ্রসর হতে হয়। গড়ে তুলতে হয় কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবন-যাপন প্রণালী। আমরা প্রত্যেহ ফজরের নামাজ সমাপনান্তে দিনের কর্মকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। পেশাগত জীবনে আমরা কেউ চাকরিজীবী, কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষার্থী। নিজ নিজ পেশাগত জীবনে সকলেই আমরা পূর্ণ সফলতা প্রত্যাশা করি। 'কিভাবে জীবনে সফলা লাভ করা যায়'–এটা জানতে হলে মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রথম নির্দেশনার দিকে লক্ষ্য করতে হয়। আর সেটা 'পড়!'। অর্থাৎ পাঠ ও অধ্যয়নের নির্দেশ। অতএব নিত্য দিনের যথোপযুক্ত কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার শুরুতে আমাদেরকে পড়তে হবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কিতাব 'আল কুরআন', যেখানে রয়েছে মানবজাতির দিশা– ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহুবিধ সমস্যার সমাধান এবং সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা। আল কুরআনে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যে কাজই করি না কেন, প্রতিটি কাজ যেন ইহসান বা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। এবং একই সঙ্গে আমাদেরকে 'সায়ী' বা উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে বলা হয়েছে। নিদের্শ দেওয়া হয়েছে :

"ফলাফলের জন্য বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে।"

[সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ১১-১২]

এ প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে সফলতার 'রোল মডেল' বা 'আদর্শ' হচ্ছেন পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 'উসওয়াতুন হাসানা' বা অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ মহানবী [সা]-এর উজ্জ্বল জীবনী। কিশোর বয়সে তিনি ছিলেন সমাজহিতৈষী, সত্যবাদী, চরিত্রবান, সংঘাত নিরসনে উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানকারী ও বিশ্ব আমানতদার 'আল-আমিন'। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী ও স্নেহময়-দায়িত্ববান পিতা। সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন সদাচারী ব্যক্তিত্ব, উপকারী প্রতিবেশী, সৎ ও সফল ব্যবসায়ী, দানবীর, আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিক, কৌশলী সমর নেতা, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, ত্যাগ-ক্ষমা-মহত্ত্বে অতুলনীয় আদর্শ, দুর্বল, সংখ্যালঘু ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম সংগ্রামী। অতএব আমাদের রাসূলের [সা] জীবন ও সুন্নাহ হচ্ছে জীবনের সফলতার একমাত্র পরীক্ষিত পাথেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নিদের্শনা হচ্ছে :

"আনুগত্য কর আল্লাহর এবং অনুসরণ কর আল্লাহর রাসূলকে।'

[সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩২]



www.pathagar.com

জীবনের সফলতা, এমন কি পরকালীন অনন্ত জীবনের সাফল্য ও মুক্তির জন্য আল্লাহর আনুগত্যের পথে যেতে হবে। আর সে সাফল্যের পথ রয়েছে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের মধ্যে। অতএব প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের জন্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে যেমন একটি প্রভুর সঙ্গে দাসের সম্পর্ক গড়তে হয়; তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে উম্মতের সম্পর্ক গড়তে হয়। এ পর্যায়ে আমাদের রাসূল [সা] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কি বলা হয়েছে, সেটা দেখা দরকার। কারণ কুরআন-নির্দেশিত পথেই রচিত হবে রাসূলের সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের বুনিয়াদ। পবিত্র কুরআনে-রাসূল [সা] সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে আমরা ১৫টি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি।

১. ***মুহাম্মদ [সা] আল্লাহর প্রেরিত রাসূল :*** *সূরা আল বাকারা ১১৯, আন নেসা ৭৯, আর রা'দ ৩০, বনী ইসরাঈল ১০৫, আল আম্বিয়া ১০৭, আল আহযাব ৪৫, সাবা ২৮, ইয়াসীন ৩।*
২. ***নবীদের মানবরূপী মাবুদ মনে করা কুফরী :*** *সূরা আল মায়েদা ৭২-৭৪।*
৩. ***নিজেদের দিকে নয় বরং আল্লাহর দাসত্বের দিকেই নবীদের আহ্বান :*** *সূরা আলে ইমরান ৭৯।*
৪. ***রাসূল [সা] সকল নবীদের মধ্যে উত্তম :*** *সূরা আল আহযাব ৪০, সাবা ৩৮।*
৫. ***রাসূলের [সা] বিশেষ গুণাবলী :*** *সূরা আত তাওবা ১২৮, আল আম্বিয়া ১০৭, আল আহযাব ৪৫-৪৬, সাবা ২৮।*
৬. ***আল্লাহর রাসূলের দায়িত্ব :*** *সূরা আলে ইমরান ২০, আল মায়েদা ৬৭, ৯২ এবং ৯৯, আর রা'দ ৪০, আশ শুরা ৮৪।*
৭. ***রাসূল [সা] হচ্ছেন নামাযীদের ইমাম :*** *সূরা আন নেসা ১০২, আত তাওবা ১০৩।*
৮. ***রাসূল [সা] হচ্ছেন আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক :*** *সূরা আন নেসা ৬৫ এবং ১০৫।*
৯. ***রণাঙ্গনের সেনাপতি আল্লাহর রাসূল [সা] :*** *সূরা আলে ইমরান ১২১, আন নেসা ৮৪, আল আনফাল ৫৭ এবং ৬৫।*
১০. ***পরামর্শ সভা বা শুরা কাউন্সিলের প্রধান মহানবী [সা] :*** *সূরা আলে ইমরান ১৫৯।*
১১. ***রাসূল [সা] হচ্ছেন সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা :*** *সূরা আলে ইমরান ১৫৯, আত তাওবা ১২৭, আল কালাম ৪।*
১২. ***রাসূল [সা] ছিলেন শত্রুদেরও কল্যাণকামী :*** *সূরা আল কাহফ ৬।*
১৩. ***সকল নবীই রাসূল [সা] -এর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী :*** *সূরা আন নাহল ৮৪ এবং ৮৯।*
১৪. ***উম্মতে মুহাম্মদী অন্য সব উম্মতের সাক্ষী :*** *সূরা আল বাকারা ১৪৩।*
১৫. ***নবীদের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছায়ই তাঁরা মোজেযা দেখাতে পারেন :*** *সূরা আল আনআম ১০৯, আর রা'দ ৩৮।*



www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলে রেসালাত এবং রাসূল [সা] অনুসরণের একটি সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সূরা আল ক্বামার মক্কায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এই সূরায় একটি বিশেষ আয়াত 'চার বার' উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন: "অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?"

পবিত্র কুরআন শুরু হয়েছে 'পড়' বলে; 'শিক্ষা দেওয়ার জন্য সহজ' করে; এবং 'আছ কি কেউ' বলে সন্ধান করা হচ্ছে এর শিক্ষার্থীদের। রাসূল [সা] সারাটা জীবনই এই মহান কুরআনের শিক্ষা প্রচার আর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দিয়ে গেছেন দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের দিশা। এ কারণেই রাসূল [সা] -এর নূরানী জীবন হয়ে ওঠেছিল 'জীবন্ত কুরআন' স্বরূপ।

পবিত্র কুরআনের পথে চলে রাসূল [সা] -এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রকৃত দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকৃত জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রজ্ঞার যোগ্যতায় পরিপূর্ণ করে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করাই আজকের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য।

www.pathagar.com

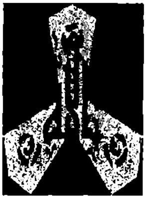

## আলোর আলো ॥ কাজী নজরুল ইসলাম

বিশ্ব তখনো ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন। তখনো বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে। তখনো গগণ-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার মালা।

আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ময়
একাকী আছিল–ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।
অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা
ছিল না বাগান, ছিল বনমালী-সহসা জাগিল সাধ
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।

অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যাজি কে বুঝিবে তাঁর লীলা
বাহিরিয়া এলো সৃষ্টি-প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুল-খেলার মানুষ সৃষ্টি-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর সৃষ্টির ফুলবনে।
আদিম মানব 'আদমে' সৃজিয়া এক মুঠো মাটি দিয়া
বলিলেন, যাও কর খেলা ঐ ধরার অঙনে গিয়া।

সৃজিলা মানব আত্মা তাহার দানিল মানব দেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে "প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধুলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!"
আদমের মাঝে বারে বারে যায় বারে বারে ফিরে আসে।
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, "ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।



www.pathagar.com

আমা হতে ছিল প্রিয়তম যারা আমার আলোর আলো।
মোহাম্মদ সে, দিনু তাহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো।"
মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহ-মাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এক রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি' এ কোন্ জ্যোতি পাথার।
বন্দনা করি সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
"অপরূপ জ্যোতি প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!
কেবা এ পুরুষ কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে?"

কহিলেন খোদা, "এই সে জ্যোতির পুণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময় সকল কলুষ-হরা
এই সে আলোর দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি'
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্বরী।
আমার হাবিব-বন্ধু এ প্রিয়, মানব-ত্রাণের লাগি'
ইহারে দিলাম তোমাতে—হইতে মানব-দু:খ ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল-প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।"

সিজদা করিয়া খোদার আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
"ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোন ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ
ধরার সকল ভয়েরে ইহারি পুণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়
মোর সাথে হল ধন্যা পৃথিবী।"—মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, "সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লাম।"

www.pathagar.com

## বিশ্বনবী ॥ গোলাম মোস্তফা

যুগান্তরে অন্তরালে দাঁড়াইয়া আজি এই কবি,
তোমার সালাম করে, হে মহান আরবের নবী!
ছিল যেথা মূর্তিপূজা, এল সেথা পবিত্র তৌহিদ
দেবতা-মন্দির হ'ল লা-শরীক্ আল্লার মসজিদ।
অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা ছিল যেথা নিরন্তর
সেথায় বহালে তুমি আলোকের পুলক-নির্ঝর।
নারী যেথা ছিল দাসী, তুমি তারে করে দিলে রাণী,
বসাইলে একাসনে পুরুষের পাশাপাশি আনি।
আসিল নতুন যুগ, কেটে গেল গভীর নিরাশা
মিটে গেল নিখিলের অন্তরের গোপন পিয়াসা।
থেমে গেল ব্যথিতের হাহাকার করুণ ক্রন্দন
বন্দী মন মুক্তি পেল, কেটে গেল সকল বন্ধন।
মূক সে মুখর হল, কণ্ঠ পেল অপরূপ ভাষা
দেহে এল নব বল, প্রাণে এল নব সাধ-আশা
মানুষ দাঁড়ালো ফের ভালোবেসে মানুষের পাশে
হিংসা নাই, ভেদ নাই, ভাই-ভাই এক ঠাঁই হাসে।
নগণ্য দুর্ব্বল যারা এতদিন ছিল ধরণীতে
তারা আজি বাহিরিল দিগ্বিজয়ে অকুণ্ঠিত চিতে।
কত দেশ, কত জাতি, কত রাজা, স্বর্ণসিংহাসন
লুটাল তাদের পায়ে, কেঁপে গেল নিখিল ভুবন।
মুষ্টিমেয় বীরদল চালাইল বিশ্ব-অভিযান
দুর্জ্জয়-দুর্ব্বার গতি-কার সাধ্য করে বাধাদান?
রাষ্ট্রে, শিল্পে, জ্ঞানে, গুণে, আবিষ্কারে ললিত কলায়
আসন লভিল তারা পুরোভাগে জগৎ-সভায়।
এইরূপে দিকে দিকে খুলে গেল কল্যাণের দ্বার
শ্বাপদ-সঙ্কুল ধরা স্বর্ণসম হইল আবার।



www.pathagar.com

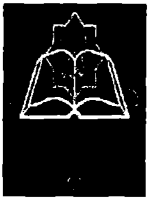

## মুক্তপক্ষ হে আলো ॥ ফররুখ আহমদ

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙালে কি, হে আলোর পাখী মহানীলিমায় ভ্রাম্যমান
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হতে ঝরবে এবার দিনের গান?
এবার কি সুর ঘন অশ্রুর কারাতট থেকে প্রশান্তির?
এবার সে কোন আলোর স্বপ্নে তাকাবে ক্ষুব্ধ প্রলয় নীর?
এ বোবা বধির আকাশ এবার ভুলবে কি তার নীরবতাকে
সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে?
ঐ আসে, আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হয়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে
থির-বিদ্যুৎ-আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।
হে অচেনা পাখী কোন আকাশের গভীরতা হতে এসেছ উঠি?
তোমার পক্ষ-সঞ্চারে ভাষা-ভাবের কুসুম উঠিছে ফুটি;
তোমার জরিন ফিতায় নিখিল মানস করো জরিপ
কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা-মুখরিত তোমার পাখার সব সাগরের অশ্রুজল,
তোমার ছায়াকে চুম্বন করে তরুণ মনের লাল কমল,
আলো বিহঙ্গ। মুক্ত নীলের সকল রশ্মি ঝরোকা চেন,
তোমার গতির ইঙ্গিতে তাই নিখিল স্বপ্ন ফুটছে যেন।
অন্ধরাতের তুমি নও নও, তুমি নও মৃত স্থবিরতার
সব আকাশের দুয়ার খুলেছো, খুলেছো সকল মনের দ্বার,
তোমার আসার পথ চেয়ে আবেগে সকল আকাশ কাঁপে,



www.pathagar.com

মুক্ত পক্ষ, হে আলো! ধন্য ধরণী তোমার আবির্ভাবে।
কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুসুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।

হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন
ঘুম ভেঙে যায় আল ফারুকের হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার আগমন শিখা পায় যে প্রাণ।

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হত না লুট
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।
তাই সে যখন এল এ ধরায় সে নবী যখন আবির্ভূত
দেখে এ বিশ্ব বিস্মিত চিতে সে দূতের তনু মহিমা পূত
নিখিল ব্যাপ্ত তার অন্তরে পর্বত হতে পথের ধূলি,
এ-হাতে বজ্রনির্ঘোষ যবে ও-হাত এনেছে গোলাব তুলি,
ক্লিন্ন তিমিরে যাত্রীরা যবে দেখে সম্মুখে শ্বাপদ ভূমি
এমন সময় হে জ্যোতির্ময় নূরানী চেরাগ আনলে তুমি।
'কে আমি' জানালে তুমিই প্রথম হে মেষ পালক উম্মী নবী!
দীপ্ত সূর্য আলো আরশিতে ধরিয়াছে কাল তোমারি ছবি।
সে এল, সে এল রাজার মত সে এ ধূলিতে তবু দীনের মত
পুষ্পকোমল তার অন্তর হল বিক্ষত কাঁটায় ক্ষত,
তবু সে জাগালো মেশকের বাস, জাগালো মরুতে গুলে আনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হয়ে ফোটে ক্ষুব্ধ নার।
দেখেছি তোমার মানবতা চলে সাথে জনগণ বিপুল দেহ
ক্লোদাক্ত পথে ফোটায়ে মুকুল সাজালো তাদের ধরণী মেহ,
যে মরুতে জানি ফুল ফোটেনাকো যেখানে ঊষর পৃথ্বীতল
সেখানেও তুমি জাগালে শস্য আনলে অঝোর ধারা বাদল।



www.pathagar.com

# মহানবীর [সা] আদর্শ জীবন

**অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান**

মহান স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী ও সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। বিশ্ব-চরাচরে তিনি সবকিছু এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। সৃষ্টি করার পর সৃষ্টি-জগতের সবকিছু সঠিকভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের জন্য তিনি এক স্বয়ংক্রিয় নিয়ম বা বিধান দিয়েছেন, যার অন্যথা হবার কোন উপায় নেই। সে কারণে সৃষ্টি-জগতে কোথাও কোন অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় দেখা যায় না। এ নিয়ম বা বিধানকে প্রাকৃতিক নিয়ম বা 'ল অব নেচার' বলা যায়। সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এ নিয়ম মেনে চলে। এর ব্যত্যয় ঘটাবার কোন শক্তি কারও নেই। একমাত্র স্রষ্টাই ইচ্ছা করলে ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন, অন্য কেউ নয়। তবে সে ব্যত্যয় যখন ঘটবে তখন মহাবিপর্যয় বা কিয়ামত ঘটবে। স্রষ্টার ইচ্ছায় সে মহামুহূর্তের আগমনও একসময় ঘটবে।

সৃষ্টি-জগতের জন্য মহান স্রষ্টা যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যবস্থা করেছেন, মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যও তেমনি তিনি এক নির্ভুল ও শাশ্বত জীবন-বিধান প্রদান করেছেন। স্রষ্টা-প্রদত্ত এ বিধানের নাম ইসলাম। এ বিধান অনুসরণ করে মানবজাতি দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। অন্যথায় দুনিয়ায় যেমন অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, আখিরাতেও তেমনি ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। ইসলাম স্রষ্টা-প্রদত্ত একমাত্র জীবন-বিধান। আমাদের যিনি স্রষ্টা, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে জান্নাত-জাহান্নাম প্রদানের অধিকারীও তিনিই। অতএব, তাঁর প্রদত্ত জীবন-বিধান পালনেই কেবল মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তি প্রত্যাশা করা যায়। ধর্মের নামে মানব-রচিত অথবা স্রষ্টা-প্রদত্ত বিধানের বিকৃত রূপ অনুসরণের মাধ্যমে কখনও স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং তাঁর বিধান অস্বীকার করে ভ্রান্ত মত ও পথ অনুসরণ করায় তাঁর অসন্তুষ্টি অর্জন করাই স্বাভাবিক। তাই বিভিন্ন মত-পথ-দর্শন ও ধর্মের নামে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর বিষয় পরিহার করে সঠিক ও শাশ্বত মানবধর্ম বা স্রষ্টা-প্রদত্ত বিধান অনুসরণ করে জীবনে চরম সার্থকতা অর্জনে সকলকে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।



www.pathagar.com

মহান স্রষ্টা আদি মানব আদমকে [আ] সৃষ্টির পর তাঁর উপর যে নির্দেশনা বা অহী নাযিল করেন, প্রকৃতপক্ষে সেটাই ছিল মানবজাতির জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা। এটাই ইসলাম বা স্রষ্টা-প্রদত্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়ম অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে জীবনে সাফল্য অনিবার্য, অন্যথায় জীবনে অশান্তি-বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। ইসলাম অর্থ শান্তি। এর অন্য আরেকটি অর্থ আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপরে নি:সংশয় ঈমান এনে তাঁর আদেশ-নির্দেশ [বিধান] মেনে চললেই জীবনে শান্তি আসে। অন্যথায় অশান্তির আগুনে জীবন ও সমাজ দগ্ধীভূত হয়। তাই মানবসৃষ্টির সাথে সাথে মহান স্রষ্টা মানবজাতির জন্য এক শাশ্বত বিধান প্রদান করেছেন। সৃষ্টি-জগতের জন্য যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম রয়েছে, মানবজাতির জন্যও তেমনি মহান স্রষ্টা ইসলামকে প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে নাযিল করেছেন। এজন্য প্রথম মানুষ প্রথম নবীও বটে। তাঁর মাধ্যমেই তিনি তাঁর বিধান পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

যুগে যুগে মানবজাতি স্রষ্টার বিধান বিস্মৃত হয়ে বিপথে পরিচালিত হওয়ায় মহান স্রষ্টা মানবজাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে বিভিন্ন জাতি ও কওমের মধ্যে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী বা রাসূল স্রষ্টার নির্দেশে মানুষের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত সঠিক জীবন-বিধান প্রচার করেছেন। 'রাসূল' অর্থ প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহতা'য়ালা যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় নবী বা রাসূল। নবী-রাসূলগণ দুনিয়ায় আল্লাহর বার্তা-বাহক, সমাজে দ্বীন প্রচার করাই ছিল তাঁদের কাজ। 'দ্বীন' অর্থ জীবন-ব্যবস্থা। আল্লাহর বান্দার জন্য আল্লাহর দ্বীন হলো সর্বোত্তম জীবন-ব্যবস্থা। কিন্তু মানুষ অনেক সময় শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীনের কথা ভুলে যায় এবং মানুষের তৈরি বিধি-বিধান অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ নতুন কোন নবী বা রাসূল পাঠান। এভাবে যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় এসেছেন এবং তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব যুগে ও সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এভাবে বিভ্রান্ত মানবজাতিকে মহান স্রষ্টা সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী সকল নবী বা রাসূল নির্দিষ্ট কোন দেশ, জাতি বা কওমের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আখিরী নবী হযরত মুহাম্মদকে [সা] দেশ-কাল নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণাঙ্গ ও চির শাশ্বত রূপ দান করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলামের এ সম্পূর্ণাঙ্গ আদর্শ একমাত্র অনুসরণীয় বিধান।

হযরত মুহাম্মদ [সা]। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল [সা]। তাঁর পর দুনিয়ায় আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। কিন্তু মহানবীর উপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলের জীবনাদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে পথ দেখাবে। অতএব, মহামূল্য এ দু'টি জিনিস মজবুত রূপে ধারণ করলে উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জন বা



www.pathagar.com

সাফল্য অনিবার্য। অন্যথায় মানবজাতি বিভ্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ বা জীবনাদর্শ সঠিক রূপে মেনে চলা।

মহানবীর [সা] সমগ্র জীবন ও তাঁর জীবনাদর্শ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে। তাঁর জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয় বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত আছে। এছাড়া, আল-কুরআন পাঠেও আমরা মহানবীর জবনাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারি। কারণ মহানবী [সা] আল-কুরআনের শিক্ষা নিজের জীবনে পরিপূর্ণ রূপে ধারণ করে তা নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। মূলত আল-কুরআন হলো মানুষের জন্য প্রদত্ত আল্লাহর বিধান। আর এ বিধান কীভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে, মহানবীর [স] জীবনাদর্শে তাঁর সঠিক বিবরণ রয়েছে।

মহানবী [সা] দুনিয়ার সেরা মানুষ। তাঁর চরিত্র ছিল সর্বোত্তম মানবিক গুণাবলীতে বিভূষিত। তিনি মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন :

"তুমি অবশ্যই সর্বোত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" [সূরা কলম, আয়াত-৪]।

"হে নবী ! আমরা আপনাকে সাক্ষ্য ও সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং একটি উজ্জ্বল আলোক-শিখা রূপে প্রেরণ করেছি।" [সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬]।

"আল্লাহ্ তা'য়ালাই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এ সত্য দ্বীনকে [জীবন-বিধান] সকল দ্বীনের [মতবাদের] উপর চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করতে পারেন।" [সূরা-ফাতাহ্, আয়াত-২৮]।

আল-কুরআনে মহানবী [সা] সম্পর্কে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে তা থেকে মাত্র কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা হলো। এ থেকে মহানবী [স] কেমন মানুষ ছিলেন এবং মানবজাতির নিকট তিনি কেন প্রেরিত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যায়। তিনি রক্ত-মাংশের মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানবিক সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। মানবিক সর্বোচ্চ গুণাবলীতে বিভূষিত এ মহান ব্যক্তি সৃষ্টি-জগতের সেরা মানুষ ও সমুজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে চির দেদীপ্যমান।

৫৭০ ঈসায়ীতে আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে মহানবীর [সা] জন্ম। তখন সে দেশের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। মানুষ তখন মূর্তিপূজা করতো, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, ব্যভিচার-মদ্যপান, সুদ-জুয়া ও নানারূপ অন্যায়-অনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিল। মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকতো। সমাজে সর্বত্র অশান্তি-বিশৃঙ্খলা, অবিচার-অনিয়ম, যুলুম-নির্যাতন বিরাজমান ছিল। গরীব-দু:খী, এতিম-বিধবা, দুর্বল ও অসহায় লোকদের কোন নিরাপত্তা ছিলো না। এজন্য ঐ যুগকে বলা হতো 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' বা 'অন্ধকার যুগ'। অশান্তি ও অমানবিকতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সে দেশ।



www.pathagar.com

এ অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেও মহানবী [সা] সমস্ত অন্যায়-অশোভন কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর চরিত্রের অনন্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দেখে সকলে মুগ্ধ হয়। এজন্য তাঁকে সকলে 'আল-আমিন' [বিশ্বস্ত] ও 'আস্-সাদিক' [সত্যবাদী] ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ডাকতো। তাঁর কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্মে সকলে মুগ্ধ ছিল। এজন্য ছোট-বড় সকলেই তাঁকে সমীহ করতো, ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। তিনি ছিলেন পরোপকারী, সজ্জন ব্যক্তি। সকলে তাঁর সাহচর্য পেতে উৎসুক থাকত। তিনি ছিলেন সমাজের সকল মানুষ বিশেষত গরীব-দু:খী-অসহায়-মজলুম ও বিপদগ্রস্ত মানুষের একান্ত আশ্রয়স্থল। শুধু মানুষ নয়, সৃষ্টিকুলের প্রতিও তিনি ছিলেন পরম সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্র। এজন্য মহান রাব্বুল আলামীন স্বয়ং মহানবীকে [সা] 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' [সমগ্র সৃষ্টির জগতের প্রতি করুণাশীল] বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সমাজের অধ:পতন ও মানুষের দুর্দশা দেখে মহানবী [সা] ব্যথিত হন। শৈশব থেকেই তিনি এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনের উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর মত কতিপয় কিশোর-যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো–সমাজের দুর্বল, নিরীহ, দরিদ্র, বিধবা ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করা, অন্যায়-দুষ্কর্ম প্রতিরোধ করা এবং মানুষে মানুষে ও সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। নবুওত লাভের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি এভাবে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন এবং এর মাধ্যমে সমাজের অনেক অন্যায়, অনিয়ম, অনাচার ও দুষ্কর্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।

মহানবীর [সা] সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও তাঁর চরিত্র-মাধুর্য দেখে মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ [রা] তাঁকে তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। অল্প দিনেই মহানবীর [সা] সৎ, দক্ষ ও যোগ্য পরিচালনায় খাদীজার [রা] ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি ঘটে। এরপর খাদীজা [রা] মহানবীর [সা] সততা ও নানা গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন। উভয়ের অভিভাবকদের সম্মতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। তখন খাদীজা [রা] ছিলেন চল্লিশ বছরের বিধবা এবং মহানবীর [সা] বয়স ছিলো পঁচিশ বছর। বিয়ের পর খাদীজা [রা] তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ মহানবীর [সা] হাতে তুলে দেন। কিন্তু তিনি পূর্বের ন্যায় অনাড়ম্বর সাধারণ জীবন-যাপন করেন এবং সমস্ত ধন-সম্পদ গরীব-দু:খী-অসহায় মানুষের সাহায্যে ব্যয় করেন। দুনিয়ার অর্থ-প্রাচুর্য, ধন-সম্পদ ও বিলাস-বৈভবের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। মানবজাতির মুক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। এ মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য তাই তিনি দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান-মগ্ন থাকেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেন।

নবুওয়ত লাভের পর তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীন প্রচার শুরু করেন। নবুওয়তী জিন্দেগীর তেইশ বছর তিনি দ্বীন প্রচারের কাজে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর



www.pathagar.com

নবুওয়তী জিন্দেগী কত কঠিন ও সংঘাতপূর্ণ ছিলো, সে সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবগত। মক্কায় দ্বীন প্রচারের সময় তাঁর ও তাঁর সহচরদের উপর নানারূপ জুলুম-অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হয়। অবশেষে সেখানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ায় আল্লাহর হুকুমে তিনি হিযরত করে মদিনায় চলে যান। মদিনায় যাওয়ার পর সেখানকার মুসলিম-ইহুদি ও মুশরিকগণ সকলেই তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নেয়। তিনি মদিনার সকল অধিবাসীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সকলের সম্মতিতে ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ' [Charter of Madina] ঘোষণা করেন। এ সনদের ভিত্তিতেই সেখানে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যার নেতা নির্বাচিত হন স্বয়ং মহানবী [স]। সে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়। মহানবী [সা] ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। দুনিয়ায় সেটাই প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য একটি আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। মহানবী [সা] সেখান থেকে সারা দুনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। ফলে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম এক বিজয়ী আদর্শ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানবী [সা] একজন মানুষ এবং আল্লাহর রাসূল [সা]। মানুষ হিসাবে তিনি সেরা, রাসূল [সা] হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন আদর্শ নেতা ও মানবজাতির মহান শিক্ষক। তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং সে দ্বীনের আলোকে নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্র ইত্যাদি সবকিছু পরিচালনা করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালক, সমর-নায়ক, সমাজপতি, বিচারক, নীতি-নির্ধারক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আদর্শ ব্যক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু, অভিভাবক, প্রতিবেশী ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ছিলেন সকলের আদর্শ। তাঁর মহান চরিত্র ছিলো সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সকলের নিকট প্রশংসনীয়। এ সম্পর্কে তাঁর নিকটজনদের কয়েকটি অভিমত ও ধারণা নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো।

মহানবীর [সা] স্ত্রী মহিয়সী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ [রা] মহানবীকে [সা] বলতেন, "হে আল্লাহর রাসূল [সা], আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে আপনি কখনো বঞ্চিত হবেন না, কারণ আপনি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে থাকেন, দরিদ্র-অসহায় মানুষকে আপনি সাহায্য করেন, অতিথি-মেহমানদের আপনি উদারভাবে আপ্যায়িত করেন এবং আপনি সর্বদা ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন ও মজলুমের সহায়তা করেন।"

মহানবীর [সা] চাচা আবু তালিবের পুত্র হযরত আলী [রা] শৈশব কাল থেকে মহনবীর [সা] নিকট প্রতিপালিত হন। মহানবী [সা] সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "তিনি ছিলেন অতিশয় উদার, মহানুভব ও দয়ার্দ্রচিত্ত। সর্বাবস্থায় তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ালু স্বভাবই প্রতিভাত হতো, কঠোরতা তিনি পরিহার করে চলতেন। তাঁর মুখ দিয়ে কখনো খারাপ ও অশ্রাব্য বাক্য নির্গত হতো না। তিনি কখনো অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতেন না। যদি এমন কোন অনুরোধ তাঁর নিকট পেশ করা হতো, যা গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে তিনি যেমন তা অনুমোদন করতেন না, আবার সরাসরি তা নাকচও করে দিতেন না, যাঁরা



www.pathagar.com

তাঁকে জানতেন, তাঁরা সহজেই এর অর্থ অনুধাবন করতে পারতেন। তিনি এটা এ জন্য করতেন যেন অন্যের অনুভূতিতে এতটুকু আঘাত না লাগে অথচ অনুমোদনযোগ্য নয় এমন কাজ থেকেও সে নিবৃত্ত হয়।...তিনি ছিলেন অতিশয় পরোপকারী মহানুভব ব্যক্তি, কঠোরভাবে সত্যবাদী ও দয়ার্দ্রচিত্ত। তাঁর সাহচর্যে আসার সৌভাগ্য যাঁরা অর্জন করেছেন তাঁরাই হয়েছেন মুগ্ধ ও আনন্দিত। যে কেউ তাঁকে দেখেছে, প্রথম দর্শনেই তাঁর সৌম্য কান্তি তাঁকে আকর্ষণ করেছে এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তিনি তাঁকে মহব্বত করতে শুরু করেছেন।"

উম্মুল মুমেনিন হযরত খাদীজার [রা] পূর্ব স্বামীর ঔরষজাত পুত্র হিন্দ [রা] মহানবী [সা] সম্পর্কে বলেন, "তিনি ছিলেন অতিশয় মহানুভব ব্যক্তি। তিনি কখনো কারো মনে আঘাত দিতেন না অথবা এমন কোন কথা কখনো বলতেন না যাতে কারো আত্মমর্যাদায় এতটুকু আঘাত লাগতে পারে। কেউ তাঁর প্রতি সামান্যতম অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেও তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারেই তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না বা প্রতিশোধ নিতেন না। তবে ন্যায় ও হকের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন, যে কোন মূল্যে তা প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।"

হযরত যায়েদ বিন হারিসা [রা] আজীবন মহানবীর [সা] খাদেম ছিলেন। যায়েদ ছিলেন কালব গোত্রের হারিসা বিন শুরাহবিল [অথবা শারাহ্‌বিল]-এর পুত্র। আট বছর বয়সে তিনি তাঁর মা সু'দা বিনতে সালাবাহর সাথে নানার বাড়ি বেড়াতে গেলে সেখানে বনী কায়ন বিন জাসর গোত্রের লোকজন অন্যান্যদের সাথে যায়েদকেও অপহরণ করে নিয়ে তায়েফের নিকটবর্তী ওকাজ মেলায় তাঁকে বিক্রি করে দেয়। হাকিম বিন হিশাম মেলা থেকে যায়েদকে কিনে তার ফুফী খাদীজাকে [রা] উপহার স্বরূপ প্রদান করে। মহানবীর [সা] সাথে হযরত খাদীজার বিয়ের পর যায়েদকে তিনি খাদিম হিসাবে মহানবীর খেদমতে পেশ করেন। তখন যায়েদের বয়স মাত্র পনের বছর।

এদিকে যায়েদের বাপ-চাচা হারানো সন্তানকে খুঁজতে খুঁজতে মক্কা শরীফে এসে জানতে পারেন যে, যায়েদ মহানবীর নিকট আছেন। যায়েদের বাপ-চাচা মহানবীর [সা] নিকট এসে যায়েদকে ফেরত নেবার আবেদন জানান। তারা মহানবীকে [সা] প্রস্তাব দেন যে, তিনি যে পরিমাণ ফিদিয়া [মুক্তিপণ] চান তা তারা দিতে প্রস্তুত। ফিদিয়ার বিনিময়ে তারা যায়েদকে ফিরে পেতে চান। মহানবী [সা] এ কথা শুনে বলেন, ঠিক আছে আমি যায়েদকে তোমাদের সামনে হাযির করছি এবং সবকিছু তাঁর মর্জির উপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের সাথে যেতে চায়, তাহলে কোনরূপ ফিদিয়া লাগবে না, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে। আর যদি সে আমার নিকট থাকতে চায় তাহলে আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কেউ আমার নিকট থাকতে চাইলে জবরদস্তি তাকে বের করে দেব। এরপর মহানবী [সা] যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন–"তুমি এ দু'ব্যক্তিকে চেন?" যায়েদ বললেন, "হাঁ, ইনি আমার পিতা আর উনি আমার চাচা।" মহানবী [সা] বললেন, "তুমি আমাকেও চেন, এদেরকেও চেন। এখন তুমি পূর্ণ স্বাধীন। তুমি ইচ্ছা করলে



www.pathagar.com

তোমার বাপ-চাচার সাথে তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে পার অথবা আমার নিকটও থাকতে পার।" যায়েদ বললেন, "আমি আপনাকে ছাড়া কারো কাছে যেতে চাই না।" একথা শুনে যায়েদের বাপ-চাচা উভয়েই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি স্বাধীনতা ছেড়ে গোলামীকে বরণ করে নিতে চাচ্ছ?" তখন যায়েদ তাঁর পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আব্বাজান ! আমি এ মহান ব্যক্তির অনন্য গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত, তাঁর সান্নিধ্যের বিনিময়ে দুনিয়ার অন্য কারো সান্নিধ্য আমার নিকট অভিপ্রেত নয়।" এ কথা শুনে যায়েদের বাপ-চাচা উভয়ে অভিভূত হলেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না। মহানবীও [সা] তৎক্ষণাৎ যায়েদকে [রা] আযাদ করে দিলেন এবং তাকে নিয়ে কা'বা শরীফে সকলের সামনে ঘোষণা দিলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক, আজ থেকে যায়েদ আমার পুত্র, সে আমার ওয়ারিশ হবে এবং আমি তাঁর ওয়ারিশ হবো"।

মহানবী [সা] মদিনায় হিযরত করার পর হযরত আনাস বিন মালিককে [রা] তার খাদিম হিসাবে গ্রহণ করেন। হযরত আনাস [রা] তখন ছিলেন একজন কিশোর বালক। তিনি মহানবীর [সা] ইন্তিকাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর তাঁর খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সব সময় মহানবীর খিদমত করার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। এ দীর্ঘ দশ বছরকাল একজন কিশোর বালকের প্রতি মহানবীর আচার-আচরণ কত সুন্দর ও অনন্যসাধারণ ছিল, তা হযরত আনাসের বিবরণ থেকে জানা যায়। আনাস [রা] বলেন, আল্লাহর কসম, আমি যতটা তাঁর খেদমত করেছি, তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি আমার খেদমত করেছেন এবং দীর্ঘ দশ বছরে তিনি আমার কোন কথা বা আচরণে কখনও এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। তিনি সর্বদাই ছিলেন আমার প্রতি অতিশয় সদয়।

উপরে মহানবীর [সা] ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের মন্তব্য ও ধারণা পেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছেন। নাঙা তলোয়ার হাতে তাঁকে খুন করতে এসেও তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তলোয়ার ফেলে দিয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছেন। প্রতিবেশী বুড়ি যে তাঁর পথে প্রতিদিন কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, অসুস্থ অবস্থায় মহানবী [সা] তার সেবা-যত্ন করতে গেলে সে অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম কবুল করে মহানবীর [সা] নিকট তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আরবের যে বুড়ি মহানবীর প্রচারিত দ্বীন প্রত্যাখান করে মহানবীকে [সা] গালমন্দ করতে করতে ভারী বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, মহানবী [সা] বোঝা বহনে তার কষ্ট দেখে এগিয়ে এলেন এবং সেটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিলেন। পথে মহানবীকে তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও অভিশাপ দিতে থাকে, কারণ তাঁর জন্যই আজ তাকে নিজ গৃহ পরিত্যাগ করে অজানা-অচেনা দূর স্থানে চলে যেতে হচ্ছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর বুড়ি যখন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, তিনি



www.pathagar.com

সেই ব্যক্তি, যার জন্য সে মক্কা ছেড়ে চলে এসেছে। তখন সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো এবং অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে জোরে চিৎকার করে উঠলো–"এই যদি সেই মুহাম্মদ হয়, তাহলে আমাকে মুহাম্মদের দেশে নিয়ে চলো।" অত:পর মহানবী [সা] পুনরায় সে বুড়ির ভারী বোঝা নিজ কাঁধে বহন করে তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিলেন।

এই হলো মহানবীর [সা] পরিচয়। তাঁর মহত্ত্ব, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে হযরত ওমরের মত কঠিন দিলের মানুষও মুসলমান হয়ে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণের অধিকারী হয়েছেন। শত বাধা-বিপত্তি ও বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে অত্যল্প কালের মধ্যে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দুনিয়ার সকল অন্ধকার ও ভ্রান্ত মতবাদের উপর আল্লাহর দ্বীনকে চূড়ান্ত রূপে বিজয়ী করার জন্য যে দু'টি জিনিস সহায়ক ছিলো- তার একটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং অন্যটি কুরআনের দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদের [সা] জীবনাদর্শ।

আল-কুরআন ও মহানবীর [সা] সে আদর্শ এখনো বিদ্যমান- মানবজাতি তা গ্রহণ করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে পারে। এ পথেই মানুষের মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণ নিহিত।

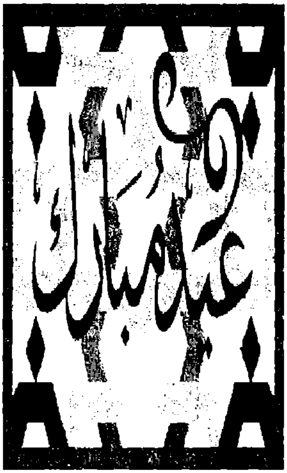



www.pathagar.com

# মহানবীর [সা] কালজয়ী জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ

## ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের প্রিয় রাসূল, সর্বশেষ নবী এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আগমন ঘটছেলি এবং এ মাসে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হন। মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সঙ্গে আনন্দের, আবেগের ও বেদনার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রিয় রাসূল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন, 'আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি [সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৭]। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে আমাদের শেষ নবী [সা] চিরজাগরুক থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। দয়ায়, ক্ষমায়, দানে, কর্মে, উদারতায়, মহত্ত্বে, জ্ঞানে, ধর্মে সাইয়িদুল মুরসালিন, প্রিয় নবী [সা] সর্বকালের মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

নবুওয়তির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর মিশনের লক্ষ্য ছিল জুলুমের অবসান ঘটিয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা। যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন সার্থকভাবে। তাঁর উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা ছিল মানব জীবনের সর্বত্রের সবদিক দিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ [সা] সমাজে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাতি-ধর্ম, বর্ণ-শ্রেণী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য সবার ক্ষেত্রের বিচার সমান, এখানে বিন্দুমাত্র হেরফের করার অবকাশ ছিল না। দয়া বা পক্ষপাতিত্ব আল্লাহ বিধান কার্যকর-করণে কোনোরূপ



www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। হযরত আয়েশা [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি [হাফিয আবু শায়খ ইস্ফাহানি, আখলাকুন্ নবী [সা], পৃ. ১৯]।

রাসূলুলাহ [সা] মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেন তা মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এটা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর অনন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ। তিনি ঘোষণা করেন, 'আল্লাহর পথে তোমরা দু'জন দু'জনে ভাই ভাই হয়ে যাও।' সে সময় মুসলমানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, এ ভ্রাতৃত্বের বিধান ছিল তার চমৎকার সমাধান। সামাজিকতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূলুল্লাহ [সা] মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাদিয়া-উপঢৌকন কবুল করতেন এবং বিনিময়ে তাদেরও উপহার-উপঢৌকন দিতেন। রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। মুসলমানদের বৈরী শক্তি পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি কবুল করেন। আয়েলার শাসক রাসূলুল্লাহ [সা]-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর প্রদান করেন [জামে তিরমিযি, ৪খ,পৃ. ১৮৩; সহিহ্ বুখারি, ৪খ, পৃ.৩৬৩]।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন এবং সোহাগভরা ব্যবহার দিয়ে তাদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন। সফর থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত তিনি সওয়ারির অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং পথে-ঘাটে খেলাধুলারত শিশুদের সঙ্গে দেখা হলে মুচকি হেসে সালাম দিতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর চাইতে শিশুদের প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শনকারী আমি আর কাউকেও দেখিনি। রাসূলুল্লাহ [সা] ছোটদের 'ইয়া বুনাইয়া' অর্থাৎ 'হে আমার প্রিয় পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না আর বেয়াজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারও কাছ থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় না; দয়াবানদের আল্লাহ দয়া করেন, তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে আকাশবাসী [আল্লাহ তায়ালা] তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'

হযরত মুহাম্মদ [সা] ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রদর্শনপূর্বক দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমাজে পরিবেশ গড়ে তোলেন; মানুষের মন-মেজাজকে তৈরি করেন; বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদতরূপে চিহ্নিত করেন। দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে মানবিক আচরণের মাধ্যমে তিনি তাদের মনুষ্য পর্যায়ে উন্নীত করেন; পরিবারের সদস্যরূপে বিবেচনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের পথে কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনে।



www.pathagar.com

আজ মুসলমানদের একটি অংশ এখন মহানবী [সা]-এর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত। তারা কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিতে লিপ্ত; ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বিস্তার লাভ করছে সন্ত্রাস ও অশান্তির দাবানল। মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, মমতা, ভালোবাসা ও প্রীতির ধারা হচ্ছে ক্ষীণতর। নির্বিচারে একে অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত হয়েছে মানুষ। অনিয়ম ও নৈরাজ্যই যেন পরিণত হয়েছে নিয়মে। দুর্নীতি পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারণে। মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। প্রিয়নবী [সা] মানুষের দু: খ-কষ্ট বুক পেতে নিয়েছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের মূলোৎপাটন করেছেন তিনি। ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার ধর্ম। এটাই প্রিয়নবী [সা]-এর জীবনাদর্শ। আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও ভয়াবহ নিপীড়ন। তাঁর কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনিদের্শনাই অনাচার, নিপীড়ন, হানাহানি ও নৈরাজ্যের দু:সহ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তিদান করতে পারে। মহানবী [সা]-এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রুখে দেয়ার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর যুবক-তরুণদের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দান করুন।

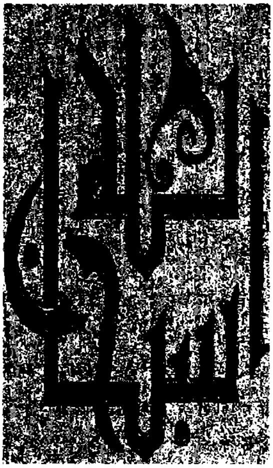



www.pathagar.com

# ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ

## হাফেজা আসমা খাতুন

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য স্রষ্টাপ্রদত্ত একমাত্র নির্ভুল জীবনব্যবস্থা। স্রষ্টাপ্রদত্ত এ নির্ভুল জীবনব্যবস্থা সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র সার্বিক কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম ছাড়া দুনিয়ায় যত ধর্ম, মত, পথ, ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মানুষের মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদ। মানুষের মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদ, কোনকালেই মানবজাতির কোন কল্যাণ দিতে পারেনি, এখনো পারছে না, আর কোনো কালে পারবেও না।

বরং মানবরচিত এসব মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদ চিরকাল মানুষকে শোষণ করেছে, নির্যাতন করেছে ও অত্যাচার করেছে। একমাত্র স্রষ্টাপ্রদত্ত ইসলাম তার ব্যতিক্রম।

স্রষ্টাপ্রদত্ত, সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ আল কুরআনের বিধান ইসলামই একমাত্র মানবজীবনের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল জীবনবিধান। ইসলামের মুখাপেক্ষী আজ সারা বিশ্বের মানুষ। ইসলামের নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামের সহনশীল, সহমর্মিতার সমাজব্যবস্থা এবং ইসলামের ন্যায়, ইনসাফ ও সুবিচারপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া বিশ্ব মানবতার মুক্তির আর কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবীতে আল্লাহর আলো, বাতাস, পানি যেমন সকল মানুষের জন্য সমান কল্যাণকর, তেমনি মানুষের একমাত্র স্রষ্টা, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল প্রেরিত একমাত্র নির্ভুল জীবনব্যবস্থা, ইসলাম তেমনি সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে আল্লাহপ্রদত্ত ন্যায় ও ইসনাফপূর্ণ জীবনবিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বিশ্বজুড়ে সবলের অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণে নির্যাতিত দুর্বলের হাহাকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। এখন স্রষ্টা প্রেরিত জীবনব্যবস্থা ইসলামের বাস্তব প্রতিষ্ঠাই এ ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে।

আল্লাহপ্রেরিত জীবনব্যবস্থা দ্বীন ইসলামের বাস্তব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তমানে বিশ্বের সোয়া শ' কোটি মুসলমানের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

অতীতের প্রত্যেক নবীর ওপর দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেইসব বিধিবিধান নির্বাচন করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং হে মুহাম্মদ, যা আমি এখন তোমার কাছে অহির মাধ্যমে পৌঁছাচ্ছি



www.pathagar.com

এবং যার আদেশ আমি দিয়েছিলাম ইবরাহিম [আ], মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামকে এই তাগিদ সহকারে যে, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং এ ব্যাপারে পরস্পর কোন মতপার্থক্য করো না। হে মুহাম্মদ! এ কথাটিই এসব মুশরিকদের কাছে সবচেয়ে অসহ্য, অপছন্দনীয়। যার দিকে তুমি তাদেরকে আহবান জানাচ্ছ।" [সূরা আস শূরা : ১৩]

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, "তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে তা মেনে চল। তাকে ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না। [সূরা আল-আরাফ : ৩]

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে বিধান আসে, তা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য করা যাবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, হে নবী [দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর] এ কথাটিই মুশরিকদের কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বলে আল্লাহতায়ালা নবী করিম [সা] সতর্ক করেছেন।

আল্লাহপ্রেরিত জীবনব্যবস্থা ইসলাম ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতেই আল্লাহর রাসূল [সা] এবং তার সাহাবীদের জীবনে ২৯টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল [সা]কে ১৯টি যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

মানবরচিত শোষণ, নির্যাতন, নিষ্পেষণের আইন পরিবর্তন করে এবং সমাজ থেকে পবিত্র কুরআনের নিষিদ্ধ সমস্ত হারাম কাজ উৎখাত করে আল্লাহপ্রেরিত ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচারের দ্বীন ইসলামের বিধিবিধান পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, প্রতিষ্ঠিত করতেই আল্লাহর রাসূল [সা] ও সাহাবীদের এ সংগ্রাম করতে হয়েছে।

মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] এর ওপর আল্লাহ রাববুল আলামিনের পক্ষ থেকে যে, দ্বীন বা জীবনবিধান নাজিল হয়েছে তা মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে কোন মানুষই ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার, কল্যাণ, শান্তি বা জীবনের নিরাপত্তা বা ন্যায্য অধিকার কোনো কালেই পাবে না। এ জন্যই আল্লাহ পাকের কড়া নির্দেশ "দ্বীনকে কায়েম কর, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কর।"

আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিটি মানুষের জান, মাল, ইজ্জত ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব ছিল নবী রাসূলগণের ওপর। বর্তমানে এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সর্বশেষ নবীর উম্মত বিশ্বের সোয়া শ' কোটি মুসলমানের ওপর।

মুসলমান নারীরাও নবীর উম্মত। নবীর উম্মত হিসেবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মুসলমান নারী পুরুষের সকলের ওপর সমান দায়িত্ব।

আল্লাহতায়ালা তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মাঝে কর্ম বণ্টন করে দিয়েছেন। নারীর সন্তান গর্ভে ধারণের কষ্ট, সন্তান প্রসবের কষ্ট, সন্তানের স্তন্য দান, সন্তানের প্রতিপালন এসব নারীর একক দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরাপদ গৃহকেই নারীর উপযোগী প্রকৃত কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন। সর্বজ্ঞ আল্লাহতায়ালা পুরুষকে দিয়েছেন বাইরের কঠিন, কঠোর পরিবেশের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ। একজন পুরুষ রাত ১২টার পরও বাইরের কাজে একাকী চলাফেরায় তার নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটবে



www.pathagar.com

না। কিন্তু নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। স্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামিন তাই পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ: এরশাদ হচ্ছে, তোমরা মোমেন [নারীরা] মর্যাদা সহকারে গৃহে অবস্থান কর। জাহেলি যুগের মেয়েদের মতো সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িও না। নামাজ কায়েম কর, জাকাত প্রতিষ্ঠিত কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ তো চান তোমাদের পরিবার থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পাক পরিচ্ছন্ন করে দিতে।" [সূরা আহজাব-৩৩ আয়াত]। নারীর কোমলতা, নমনীয়তা, স্নেহপ্রবণতা, নারীর সন্তান গর্ভে ধারণের কষ্ট, সন্তান প্রসবের জীবন মরণ কষ্ট, সন্তানের স্তন্যদান, সন্তানের যত্ন, প্রতিপালন, সন্তানের শিক্ষাদান, সন্ত ানের সঙ্গদান, গৃহের বহুমুখী দায়িত্ব পালন, গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবারের সদস্যদের সুষ্ঠু সুষম আহারের ব্যবস্থা করা, মেহমানদারি ইত্যাদি বহুমুখী দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সর্বজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা তার বিধান ইসলামে পুরুষকে বাধ্য করেছেন স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, ভাইবোনের ভরণ পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, বিয়ে শাদি, বাসস্থান সব কিছুর সুব্যবস্থা করার। এ দায়িত্ব একান্ত ভাবেই পুরুষের।

ইসলামের এই কর্মবন্টন ব্যবস্থা যেমন যৌক্তিক, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি পরিবারের সকল সদস্যের জন্যও কল্যাণকর প্রমাণিত। স্রষ্টাপ্রদত্ত এ নির্ভুল কর্মবন্টনব্যবস্থা মুসলমানগণ মেনে চলেন বলেই মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের পারিবারিক দায়িত্ব আল্লাহতায়ালা মানবতার কল্যাণের স্বার্থে নারী-পুরুষের মাঝে বন্টন করে দিলেও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহতায়ালা নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর বর্তিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, "মুমিন নারী, মোমেন পুরুষ তারা পরস্পরের সাথী, বন্ধু। তারা মানুষকে অর্থাৎ [নারীরা নারীদেরকে, পুরুষরা পুরুষদেরকে] সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের [সা] অনুসরণ করে চলে।" যেসব মোমেন নারী পুরুষগণ এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, শিগগিরই এদের ওপর আল্লাহতায়ালা রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী। যেসব মোমেন নারী পুরুষগণ এ দায়িত্বগুলো পালন করবে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। যে জান্নাতের নিচ দিয়ে সদা ঝর্ণাধারা প্রবহমান। যে চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র আলয় বা বাসস্থান। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। [সূরা আত তওবা : ৭১-৭২]

পৃথিবীর ৫০-৭০ বছরের জীবনে বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স প্রচুর অর্জন করাটাকে আল্লাহতায়ালা মানবজীবনের সফলতা বলে অভিহিত করেননি। কারণ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য এসব বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স কোন কাজে আসে না। দুনিয়াতেই থেকে যায়। ব্যক্তি খালি হাতে চলে যায়। বরং মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনে চিরকাল বসবাসের, চিরসুখের জান্নাত লাভকেই আল্লাহতায়ালা মানবজীবনের সফলতা বলেছেন।



www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা আরও বলেছেন, তোমরা প্রতিযোগিতা করে সেইদিকে দৌড়াও দ্রুতগতিতে যেদিকে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী সমান বিস্তৃত জান্নাত, যা মুত্তাকিনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে [সূরা আলে ইমরান : ১৩৩]।

মুত্তাকিন কারা? যারা জীবন পথে চলতে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহপাকের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করেছে, পৃথিবীতে কোন অশান্তি, বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, মানুষকে কষ্ট দেয়নি, কোন মানুষকে অধিকারবঞ্চিত করেনি, মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায় করেছে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছে, কোনদিন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি, নারীর প্রতি সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করেছে, নারীকে স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে, মা হিসেবে ইসলাম যে মর্যাদা দিয়েছে, তা আদায় করেছে, হারাম পথে কোন উপার্জন করেনি, পরের জমি, পরের সম্পদ আল্লাহর ভয়ে আত্মসাৎ করেনি বা দখল করেনি, যে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আদেশ মতো সৎভাবে জীবনযাপন করেছে, তাদেরকেই পবিত্র কুরআনে 'মুত্তাকিন' [খোদাভীরু] নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর এদের জন্যেই আল্লাহতায়ালা চিরস্থায়ী জীবনে চিরসুখের জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা আরও বলেছেন, যে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন থেকে বেঁচে গেল এবং চিরস্থায়ী সুখের জান্নাত পেয়ে গেল, সে বড় বাঁচা বেঁচে গেলো এবং বড় পাওয়া পেয়ে গেলো।

সৎ কর্মশীল নারী-পুরুষ, তারা যদি ঈমানদার হয়, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। [সূরা আন নিসা : ১২৪]

যে কেউ জুলুম করার পর তওবা করবে এবং কল্যাণকর কাজ করবে, আল্লাহতায়ালা তার প্রতি ক্ষমাশীল। [সূরা আল মায়েদা : ৩৯]

আল্লাহপাকের দৃষ্টিতে মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনে দাউ দাউ করে জ্বলা কঠিন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাঁচা। আর চিরস্থায়ী জীবনে চিরসুখের জান্নাত পাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

যারা দুনিয়ার স্বল্পকালীন জীবনের সুখের জন্য সারাটা জীবন ব্যস্ততায় কাটায়, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের আদেশ মতো জীবন যাপনের চিন্তা বা চেষ্টাও করে না, মুসলমান নারী-পুরুষের ওপরে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা কি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে দায়িত্ব পালনের চিন্তাও করে না, চেষ্টাও করে না, তাদের কি দশা হবে, মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনে?

একজন মুসলমান নারী-পুরুষ দুনিয়ার জীবনে শান্তি, কল্যাণ এবং পরকালীন জীবনে যদি শান্তি ও মুক্তি পেতে চায়, তাহলে একজন মুসলমান নারী-পুরুষকে প্রতিদিন আল্লাহপ্রেরিত নির্ভুল জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞানের আধার পবিত্র কুরআন পড়তে হবে, কুরআনের অর্থ যার যার ভাষায় জানতে হবে এবং আল্লাহ রাববুল আলামিনের আদেশ মানতে হবে এবং রাসূলের [সা] হাদিস জানতে হবে এবং মানতে হবে। তাহলেই একজন মোমেন মুসলমান নারী-পুরুষ দুনিয়াতে এবং মৃত্যুর পর আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে ও চিরস্থায়ী সুখের জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে।



www.pathagar.com

আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া, আল্লাহপ্রেরিত আল কুরআনের নির্ভুল জীবনব্যবস্থা বা আদ্বীন প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মোমেন মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর আল্লাহতায়ালা ফরজ করেছেন। আল্লাহর রাসূল [সা] যেভাবে আল্লাহর দ্বীনকে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর আদর্শ, শিক্ষা, অনুসরণ করে ঠিক সেভাবেই আল্লাহর দ্বীনকে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারো মনগড়া পন্থায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সে পন্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যও হবে না। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আদেশের আনুগত্য কর, রাসূল [সা] এর আনুগত্য কর এবং তোমাদের উলিল আমর যারা আল্লাহর এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে তোমাদের নেতৃত্ব দেন, তাদের আনুগত্য কর।" [সূরা আন নিসা : ৫৯]

এখন নারীরা আল্লাহপ্রদত্ত ফরজ নির্দেশ অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে? কিভাবে অংশগ্রহণ করবে? আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে যেসব বিধান মোমেন নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর বর্তিয়েছেন তা হচ্ছে, নামাজ কায়েম করতে হবে, জাকাত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের বাধা দানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১ নম্বর দায়িত্ব নামাজ কায়েম করতে হবে। এ জন্য একজন মোমেন নারী প্রথমেই কুরআন সুন্নাহর নির্ভুল জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট হবেন। পরিবারের সদস্যদের কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানদানে আন্তরিক হবেন। একজন মোমেন নারী নিজে ৫ ওয়াক্ত নামাজ সময় মতো নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করবেন। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে নামাজের গুরুত্ব কুরআন হাদিস থেকে তাদের সামনে তুলে ধরবেন। এজন্য পারিবারিক বৈঠক অত্যন্ত উপযোগী। স্বামী সন্তানদের নিয়ে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে সাপ্তাহিক পারিবারিক বৈঠকের মাধ্যমে নিয়মিত কুরআন, হাদিস আলোচনার মাধ্যমে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে নামাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। নামাজ যে আল্লাহপাকের ফরজ আদেশ, নামাজ যে কোনভাবেই মাফ নেই, যে ছোটবেলা অর্থাৎ যুবক বয়স থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হবে, আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে সেই স্থান পাবে, যেদিন কোন ছায়া থাকবে না কুরআন ও হাদিসের এসব বাণী পারিবারিক বৈঠকে আলোচনা করে এবং প্রতি ওয়াক্তে মা মেয়েদের সাথে নিয়ে নামাজ পড়ার অভ্যাস করলে এবং বাবা প্রতি ওয়াক্তে ছেলেকে মসজিদে সাথে করে নিয়ে নামাজে গেলে মসজিদের প্রতি সন্তানের মহব্বত বাড়ে এবং সে সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হবেই। এভাবেই বাবা-মা সচেতন হলেই পরিবারে নামাজ কায়েম হবে। আল্লাহর দ্বীন মহল্লার লোকদের বা প্রতিবেশী লোকদের নামাজী বানাতে হলে বা নামাজ কায়েম করতে হলে, জাকাত প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজে বাধা দানের দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রতি মহল্লায় ১টা করে কুরআন তাফসীর বৈঠক চালু করা জরুরি। যারা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান রাখেন, তাদেরকেই এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। কুরআন সুন্নায় শিক্ষিত নারীরা নারীদের মাঝে এ দায়িত্ব পালন করবেন। তবেই নারীসমাজের মাঝে দ্বীন



www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ। যিনি কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান রাখেন তিনি নিজের বাসায়ই এ কাজ শুরু করতে পারেন।

কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের অভাবে অনেক মা তাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারছেন না। ফলে সমাজের তরুণেরা, যুবকেরা উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে, ড্রাগ এডিকটেড হচ্ছে। অ্যাডভারটাইজমেন্টের নগ্ন নারী চিত্র, সহপাঠী উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের নগ্ন পোশাক পরিচ্ছদ যুবসমাজকে ক্রমেই ধ্বংসের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। কুরআন সুন্নাহয় শিক্ষিত মেয়েরা মায়েরা তাদের সমবয়সী বোনদের কাছে কুরআন সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়েদের, মায়েদের অর্থসহ কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআন-সুন্নাহ অর্থসহ পড়ায় অভ্যস্ত করে দিতে হবে। প্রত্যেক কুরআন সুন্নাহ শিক্ষিত বোনরা পরিচিত, আত্মীয় মা-বোনদের, বান্ধবীদের হাতে কুরআন অর্থসহ তুলে দিতে হবে। জোগাড় করে কিনে দিতে হবে। তাদেরকে কুরআন সহীহ পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কুরআন তাফসির বৈঠকে সহীহ কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে এবং সহীহ নামাজশিক্ষা নিয়মিত চালু করা হলে নারীসমাজের মাধ্যমেই সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক কুরআন সুন্নাহ শিক্ষিত বোনেরা ৩-৫ জনকে টার্গেট নিয়ে অর্থসহ কুরআন পড়ায় অভ্যস্ত করা হলে কতজনকে অভ্যস্ত করলেন টার্গেট নিয়ে কাজ করলে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

সমাজের অর্ধেক নারী। নারী সমাজই হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর, আর পরিবার হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা। একটি পরিবারের মা এবং বোনেরা যদি কুরআন সুন্নাহর নির্ভুল জ্ঞানে সুশিক্ষিত হন, তাহলেই সে পরিবারের প্রতিটি সদস্য কুরআন সুন্নাহর ফলোয়ার হতে পারে এবং এসব পরিবারের সন্তানদেরই কুরআন সুন্নাহর ফলোয়ার হওয়া সহজ।

সন্তানকে ভালো সঙ্গ দিতে হবে। সে একা থাকবে না। মা বোনেরা যদি তাদের সন্তান, তাদের ভাইদের ভালো সঙ্গ জোগাড় করে দিতে না পারেন, সে তার সঙ্গী জোগাড় করে নেবেই। তখন তার সে সঙ্গী খারাপও হতে পারে। ভালও হতে পারে। তাই সন্তানকে ভাল সঙ্গী জোগাড় করে দিতে হবে। ইসলামী ছাত্রসংগঠনে আপনার সন্তানকে যুক্ত করে দিতে পারলে আপনার সন্তান ভাল সঙ্গ পাবে।

ইসলামী ছাত্রসংগঠনের ইসলামী চরিত্রের ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গ লাভে আপনার সন্তানও ইসলামী চরিত্রের হয়ে গড়ে উঠবে। ইসলামী ছাত্রসংগঠনের নামাজী ছেলেদের সাথে থেকে আপনার ছেলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হয়ে গড়ে উঠবে। আপনার ছেলেকে নামাজী বানানোর জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব যদি আপনি উপলব্ধি করেন, আপনার দায়িত্ব আপনার সন্তানদের, আপনার ভাইদের, বোনদের ইসলামী সংগঠনে যুক্ত করে দেয়া। ছেলেদের, ভাইদের ইসলামী ছাত্রসংগঠনে, বোনদের, মেয়েদের ইসলামী ছাত্রীসংগঠনে যুক্ত করে দেয়া। বোনদের দায়িত্ব ভাইদের এবং নিকট আত্মীয় ছেলেদের ইসলামী ছাত্রসংগঠনে যুক্ত করে দেয়া এবং বোনদের দায়িত্ব নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী, পরিচিত



www.pathagar.com

মেয়েদের ইসলামী সংগঠনের গুরুত্ব তাদের পরিবারকে বুঝিয়ে ছাত্রীসংগঠনে যুক্ত করে দেয়া।

ইসলামী নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দিয়ে মাদরাসা শিক্ষা সঙ্কোচন করে, ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরে, ভারতীয় উলঙ্গ নাচনেওয়ালীদের বাংলাদেশে প্রতি মাসে আমদানি করে, লাক্স-চ্যানেল আই-এর উলঙ্গ নারী প্রদর্শনী করে অ্যাডভারটাইজ-মেন্টে উলঙ্গ নারী চিত্রের প্রদর্শনী করে, প্রতি মাসে ভারত থেকে দেদার মাদকদ্রব্য আমদানী করে দেশের যুব চরিত্র ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, যাতে মুসলমান তরুণেরা যুবকেরা দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালনে অকেজো অথর্ব হয়ে যায়। এসব সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত থেকে আপনার সন্তানকে একা ঘরে পাহারা দিয়ে কোনদিন রক্ষা করতে পারবেন না। আপনার সন্তানকে ভাল সঙ্গ দিতেই হবে। ভাল সঙ্গীর প্রভাবে আপনার সন্তান দেশের এসব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে চলতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। আমাকে বিদেশে একজন প্রশ্ন করেছিল, আপনার সবগুলো সন্তান এক রকম হলো কিভাবে? আমার জবাব ছিল, আমার সব ছেলেমেয়েদের ইসলামী সংগঠনে যুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যার ফলে ইসলামী ভাল সঙ্গের প্রভাবে ভাল হয়ে গড়ে উঠেছে।

পবিত্র কুরআনের আইন কায়েম হলে জাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বিলিবণ্টন হবে। তাতে কোটি কোটি টাকা ধনীদের কাছ থেকে ইসলামী সরকার জাকাত আদায় করে গরিবের মাঝে বিলিবণ্টন করবে। তাতে দেশে কর্মক্ষম মানুষ আর বেকার থাকবে না। একটা মেয়েও অসহায় থাকবে না।

ব্যক্তিগত দাওয়াতী কাজই প্রধান কাজ। অবশ্য ইসলামী বইও কর্মীর কাজ করে। সব সময় বই সঙ্গে রাখবেন, যেখানে যাবেন একটা বই পৌঁছাবেন। বাসায় মেহমান আসলেও তাকে প্রাথমিক দাওয়াতী বইগুলো একটা পড়তে দেবেন। বিদায়ের সময় প্রাথমিক বইগুলো প্রেজেন্ট করতে পারেন। আর কিনে নিতেও বলতে পারেন। যেখানেই বেড়াতে যান কমপক্ষে ১ সেট বই সাথে রাখবেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও মাথায় সব সময় চিন্তা রাখবেন, কাকে সাথে নিয়ে বৈঠকে যাওয়া যায়। দাওয়াতী কাজে সব সময় আত্মীয়, পরিচিত এবং প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ কাজে নিজে সকলের সঙ্গে মিশুক প্রকৃতির হবেন, হাসিখুশি হবেন, দরদি মন হবেন। প্রতিবেশীর অসুখে বিসুখে, বিপদে আপদে আপনি সকলের আগে হাজির হবেন। তাহলেই প্রতিবেশীরা আপনার দ্বীনের কাজে সঙ্গী হবেন।

স্বামী, সন্তানের সঙ্গে হাসিখুশি মিষ্টভাষী হতে হবে। দরদি মন হতে হবে। তাহলে স্বামী সন্তানদের দ্বীনের কাজে আপনার সহযোগী পাবেন এবং দ্বীনের কাজে তারাও দ্বীনের পথে সানন্দে অগ্রসর হবেন।

সংগঠনের বোনেরা জানেন, বাতিলের অন্যায়, জুলুম, শোষণের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ পাকের প্রেরিত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে ঘরে বাইরে সর্বত্র এই ধারার সম্মুখীন হওয়া, এটাই স্বাভাবিক। নবী করিম [সা] যিনি ছিলেন কাফেরদের কাছে আলআমিন, সবচেয়ে বিশ্বস্ত, যিনি তাঁর দাসদের সাথে কোনদিন খারাপ আচরণ করেননি, তিনিই যখন তাঁর সমাজের



www.pathagar.com

মানুষগুলোকে খারাপ কাজ বর্জন করে, মূর্তি পূজা বর্জন করে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান জানালেন তখন তারাই হলো তাঁর চরম দুশমন। এমন দরদি মানুষ, যিনি মানুষের কল্যাণের চিন্তায়, মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিবি খাদিজার অগাধ সম্পদ ব্যয় করে নি:স্ব হয়ে তায়েফে যখন তায়েফের সর্দারদের কাছে দাওয়াতী কাজে যান, তখন তার একটা বাহন পর্যন্ত ছিল না। এ দরদি মানুষটা তায়েফে দাওয়াতী কাজে গিয়ে কিভাবে রক্তাক্ত তারপরও তায়েফবাসীর জন্য বদ দোয়া করলেন না যে, এদের মাঝেও ভালো লোক জন্মাতে পারে, যারা হয়তো আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করবে। কত দরদি মন, সুবহানাল্লাহ।

এরপর কাফেরদের অত্যাচারে একে একে সব মুসলমানগণ সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-পরিজন সব ছেড়ে মদিনায় হিযরত করতে বাধ্য হলেন। তারপরও কাফেররা মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি। মদিনায় মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য পর পর তিনবার কাফেররা মদিনা আক্রমণ করে। নবী করিম [সা] তার সাথীগণ সাহসী ভূমিকা পালন করে, নবী করিমের বিচক্ষণ নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবেলা করে বিজয়ী হন।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে সমগ্র আরবের কাফের শক্তির মোকাবেলা নবী করিম [সা] এবং সাথীদের করতে হয়েছে। তারপরও তিনি তখনকার দুই বৃহৎ শক্তি পারস্য রোম সম্রাটদের কাছে দূত পাঠিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। এই দুই বৃহৎ শক্তির মোকাবেলা করতে হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবী করিম [সা] এবং তার সাহাবীগণ মিথ্যা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন, রাসূলে করিম [সা] কপালে তীরবিদ্ধ হন, তীরের আঘাতে তার দাঁত খসে যায়, তখন একজন মহিলা সাহাবী এমন ক্ষীপ্রগতিতে তলোয়ার চালিয়ে নবী করিম [সা]কে রক্ষা করেছিলেন যে, পরবর্তীতে নবী করিম [সা] বলতেন, ওহুদের দিনে আমি যেদিকে চেয়েছি সেদিকে তাকে দেখেছি। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এমন জীবন-মরণ সংগ্রাম করে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নবী করিম [সা] এবং তাঁর সাহাবীগণ এবং মহিলা সাহাবীগণ। মক্কায় শেবে আবু তালিব পাহাড়ে কাফের মোশরেকরা নবী করিম [সা] এবং তার সাহাবীগণকে একঘরে করে রেখেছিল সমস্ত পরিবার পরিজনসহ। ক্ষুধার্ত শিশুদের চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যেত। সাহাবীগণ না খেয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের পায়খানা হতো ছাগলের বিষ্ঠার মতো, কেউ কাফেরদের চোখ এড়িয়ে গোপনে উটের দুধ দিয়ে আসত। উটের রাখালরা এ কাজ করত। এত কষ্ট করেছেন নবী করিম [সা] এবং তাঁর সাহাবীগণ। এক মাস নয়, দুই মাস নয়, ছয় মাস নয়, পুরো ৩টি বছর এ কষ্ট করেছেন। তবু তারা কাফেরদের সাথে আপস করেননি বা এ কথা বলেননি বা ভাবেননি যে, আমরা এভাবে কতদিন কষ্ট করব। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ত্যাগ করে নিজেদের জীবন বাঁচাই। না, তা তারা করেননি। কারণ তারা জানতেন, আল্লাহর জমিনে



www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই যে দাস প্রথা, কন্যাসন্তান হত্যা, মারামারি, হানাহানি গোত্রে গোত্রে, কোনকালেই তা বন্ধ হবে না। নারীদের সম্মান, মর্যাদা, অধিকার, কোনকালেই প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই তারা কষ্ট করেই দ্বীনের পথে অটল রইলেন। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। তিন বছর পর সমাজের কিছু সৎ প্রবণ যুবকদের সাহায্যে তারা বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পান।

আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া আমাদেরও কোন মুক্তি নেই। বর্তমানে জাহেলি সমাজের চেয়ে আরও ভয়াবহ অবস্থা। প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে নির্বিচারে পেশাদার খুনিদের হাতে, পরের বাড়ি, পরের জমি দখল করে নিচ্ছে সরকারি দলের লোকেরা সরকারের ছত্রছায়ায়, প্রতিদিন নারী নির্যাতন হচ্ছে যৌতুকের জন্য, কিশোরী, যুবতী, স্কুল ছাত্রীরা পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হয়ে জীবন দিচ্ছে। শিশুরা পর্যন্ত হত্যার শিকার হচ্ছে জায়গা জমির বিরোধ নিয়ে। এ ভয়াবহ অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, যতদিন বাংলাদেশে আল্লাহর দ্বীন, কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠি করা না যাবে, ততদিন দেশ ও জাতির ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। দেশের ঘরে ঘরে নারীসমাজের কাছে এ বার্তা পৌছে দিতে হবে। সাপ্তাহিক কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা বৈঠকে মহল্লার নারীদের কাছে এ বার্তা পৌছে দিতে হবে। সাধারণ সভা সমাবেশ করেও নারীদের মাঝে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব যথাযথভাবে পৌছে দিতে হবে। ইসলামী সচেতন শিক্ষিত নারীদের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিত্তবান ইসলামী সচেতন বোনেরা সমাজের দুস্থ বস্তিবাসী নারীদের সমস্যা দূরীকরণে তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে, তাদের বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ে-শাদিতে সাহায্য সহযোগিতা করে, তাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা কালেমা, নামাজ, রোজা, দোয়া-দরূদ, হারাম-হালাল মুখে মুখে শিক্ষা দিয়ে তাদের সহযোগিতা করা হলে তাদের নৈতিক সমর্থন অবশ্যই পাওয়া যেতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও রাসূল [সা] সুন্নাহর বাণী যদি মহল্লায় মহল্লায়, মসজিদে মসজিদে, বিভিন্ন অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল কলেজে, জেলখানায়, হাসপাতালে, বিভিন্ন সংগঠন সংস্থায়, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সপ্তাহে একদিন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হতো তাহলেই দেশের সব সিন্ডিকেটের দল, মজুতদারি, কালোবাজারির দল, খুনি, ধর্ষণকারী, নারী নির্যাতনকারী, সব ধীরে ধীরে আল্লাহর ভয়ে, আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে ভালো মানুষ হয়ে যেতো।

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, নারীরা নারীদের মাঝে এ দায়িত্ব পালন করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যথার্থ অবদান রাখতে পারেন। আল্লাহপ্রেরিত আল কুরআনের জ্ঞান এবং রাসূল [সা] সুন্নাহ ছাড়া কখনো এবং কিছুতেই দু:খী পৃথিবীর দু:খ নিরাময় সম্ভব নয়- একথা কেবল বিশ্বাস নয়, সেই বিশ্বাসের আলোকে নিজের সমস্ত চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করে আসুন শান্তিময় একটি সমাজ নিমার্ণে আমরা সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট হই।



www.pathagar.com

# ঈদে মীলাদুন্নাবী [সা] উদযাপন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

**প্রফেসর ডক্টর আ ছ ম তরীকুল ইসলাম**

## ভূমিকা

ঈদে মীলাদুন্নাবী' আধুনিক যুগে আমাদের সমাজে একটি পরিচিত পরিভাষা। আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনের অনুষ্ঠানাদি ঈদে মীলাদুন্নাবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সারা বিশ্বের বহু মুসলিম অত্যন্ত ঘটা করে এ দিনকে উদযাপন করে থাকেন। বের হয় জশনে জুলুস, অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, তথ্য মাধ্যমে উপস্থাপন হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন অংশ এবং বের হয় তার জীবনের উপর বিশেষ সংখ্যা। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামের সবকিছুই সুনিয়ন্ত্রিত। মানুষের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে এর রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং তার জন্মদিনে তাকে নিয়ে অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা অবশ্যই মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে বক্ষমান প্রবন্ধের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে- 'ঈদে মীলাদুন্নাবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ"।

## ঈদে মীলাদুন্নাবী'র শাব্দিক বিশ্লেষণ

পরিভাষাটি তিনটি আরবি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তবে শব্দ বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আরবি ভাষার নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি। আরবি ভাষার সম্বন্ধপদ বিন্যাসের নিয়মনীতি অনুযায়ি পরিভাষাটি হওয়া উচিত ছিল 'ঈদু মীলাদুন্নাবী'। 'ঈদ শব্দটির [দ] বর্ণটি একার সহকারে ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত উর্দূ ও ফারসি ভাষার প্রভাব বলে প্রমাণিত হয়। 'ঈদ' শব্দটির অর্থ ফিরে আসা, বার বার আবর্তিত হওয়া, অভ্যাসে পরিণত হওয়া প্রভৃতি। যে কোন দিন বা সময় খুশীর কারণে হোক বা দু:খের



www.pathagar.com

কারণে হোক স্মরণযোগ্য হয়ে মানুষের মাঝে বার বার ফিরে আসে তাকেই 'ঈদ' বলে। প্রতি বছর 'ঈদ আমাদের মাঝে খুশীর সওগাত নিয়ে ফিরে আসে সে জন্য 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আদহাকে 'ঈদ' বলা হয়।[১] এ শব্দটি আমাদের মাঝে খুশীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। সে জন্য সচারচার 'ঈদ' মানে খুশী বলা হয়ে থাকে। 'মিলাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, জন্মগ্রহণের সময়। 'নাবী' বা নবী শব্দের অর্থ সংবাদদাতা, যিনি মহান আল্লাহর পরিচিতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকেন তাকে 'নবী' বলা হয়। এখানে নাবী বলতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নাবী' এর অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের সময় বা কালের খুশী। খুশীর বহি:প্রকাশ ঘটিয়ে তার জন্মদিনকে উদযাপন করা হয় বলে একে ঈদে মীলাদুন্নাবী' বলা হয়। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহনের খুশী উদযাপন। তার জন্মক্ষণ উদযাপন বা তার জন্ম উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করাই ঈদে মীলাদুন্নবী হিসেবে মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের কোন কোন স্থানে রবিউল আউআল মাসের ১২ তারিখে এই 'ঈদে মীলাদুন্নবী'' বা নবীর জন্মের উৎসব পালন হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মিলাদুন্নাবীর মূল অর্থ জন্মবৃত্তান্ত হলেও এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ জীবন চরিত বুঝানো হয়ে থাকে। সে জন্য আমাদের দেশে মীলাদুন্নাবীর নামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৃত্তান্তই আলোচনা হয় না বরং তার সার্বিক জীবনচরিতই আলোচিত হয় বরং ইসলামের সার্বিক বিষয়াদিও সেখানের আলোচনায় স্থান পায়। সুতরাং মীলাদুন্নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

## ঈদে মীলাদুন্নবী'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধিকাংশ গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলোতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ইবন হাজর আল'আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত্যু: ৮৫২হি] লিখেছেন: "মাওলিদ পালন মূলত: বিদ'আত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন শতাব্দীর সালফি ছালিহীনের কোন একজনও এ কাজ করেন নি।"[২] সালফি ছালিহীন অর্থাৎ সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম' তাবি'ঈ ও তাবি'ঈ-তাবি'ঈন রাহিমাহুল্লাহ। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আসসাখাবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত্যু: ৯০২হি] লিখেছেন: "ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফি ছালিহীনের কোন একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। পরবর্তীতে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের



www.pathagar.com

মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন।"[৩]

মিশরের বিখ্যাত মুফতি আশশায়িখ মুহাম্মদ ইবন বাখিত আলমুতি'ঈ তার 'আহসানুল কালাম ফী মা য়াতা'আল্লাকু বিসসুন্নাতি ওয়াল বিদ'আতি মিনাল আহকাম' গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায়, আশশায়িখ আলি মাহফুয তার 'আলইবাদ' ফী মুদাররিল ইবতিদা" গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায়, ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, ও তহা আহমাদ শারাফ তাদের 'আলমুয়িযয লি দীনিল্লাহ' গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায়, স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ঈদে মীলাদুন্নবী'র প্রচলন শুরু হয় ফাতিমী শাসন আমলে অর্থাৎ ইসলামের তিন উত্তম যুগের অনেক অনেক পরে।

হিজরী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সনদভিত্তিক প্রায় অর্ধশতাধিক হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত হয়। যে সব গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজকর্ম, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, অনুমোদন, মৌন সম্মতি ও আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু হাদীস সংকলিত রয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছে সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম, তাবি'ঈ ও তাবি'ঈ-তাবি'ঈন রাহিমাহুল্লাহর মতামত ও কর্ম। সে সকল গ্রন্থে ছহীহতো দূরের কথা একটি দুর্বল হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পরে কোন সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তার জন্মদিন উদযাপন, তার জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা বা তার জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নি িগাহাবাহ র্দষ্ট কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বৎসরের কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান করেছেন বলে দেখা যায় না।

গাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের জীবনের চেয়েও ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন তাদের প্রাণের স্পন্দন। তাদের সব কিছুই আবর্তিত হত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে। তিনিই ছিলেন তাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের কাজকর্ম, চালচলন, কথাবার্তা, আচার অনুষ্ঠান সবকিছুতে ছিলো তারই অনুকরণের ছাপ। তারা তার জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনাকে মূল্যায়ন করেছেন। তার সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আলোকিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা কখনো তার জন্মদিন উদযাপন করেননি। তার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার জন্য জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেননি। তার জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে কোন জশনে জুলুসও বের করেননি। তাদের পরে তাবি'ঈ ও তাবি'ঈ-তাবি'ঈন রাহিমাহুল্লাহর অবস্থাও ছিল একই রকম।

জন্মদিন পালন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তবে সে সময়ে এর সাথে মুসলিমদের ন্যূন্যতম কোন সম্পর্ক ছিলো না। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী



www.pathagar.com

থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারসিয়ান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অমুসলিদের থেকে আমদানিকৃত অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে এই ঈদে মীলাদুন্নবী হচ্ছে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানা যায়, দুই ঈদের বাইরে কোন দিবসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সামাজিক ভাবে উদযাপন শুরু হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। শী'আরা ছিল এর প্রথম প্রবক্তা। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে বাগদাদের আববাসীয় খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শি'আহ শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ই মুহাররাম তারিখে আশুরা হিসেবে শোক দিবস ও জিলহজ্জ মাসের ৪ঠা তারিখ 'গাদীর খুম'কে[৪] উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে তদানিন্তন সরকারের পৃষ্টপোষকতায় এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালন করা শুরু হয়। তখনকার শী'আহগণ ছিলেন খুবই শক্তিশালী। ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহ বিশ্বাসের প্রতিনিধি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ তখন ছিলেন খুবই অসহায়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম দিকে এই দু'টি দিন উদযাপনে বাধা দিতে পারেন নি। এরই ধারাবহিকতায় শি'আদেরই ছত্রছায়ায় ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনও শুরু হয়। যা সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রেও শী'আগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এক পর্যায়ে উবায়িদ বংশের রাফিদী ইসমা'ঈলী শী'আগণ ফাতিমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতিমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ৫৬৭ হিজরীতে গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে মিশরের ফাতিমী শী'আ রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। শী'আদের এ দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শী'আ শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইসলামের দু'ই 'ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন উদযাপন করতেন। জন্মদিন উদযাপনেরই ধারাবাহিকতায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে ঈদে মীলাদুন্নবী'র উদযাপন শুরু হয়। মিশরের ফাতিমী খালীফাহ আলমুয়িজ্জু লিদীনিল্লাহ সর্বপ্রথম বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে ঈদে মীলাদুন্নবীসহ অন্যান্য জন্মদিন উদযাপন শুরু করেন।[৫] তার শাসনামলে মিশরে শী'আ শাসকদের মধ্যে যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব। অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তারা প্রথমত পাঁচ জনের জন্মদিন পালন করতেন। যা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলী,



www.pathagar.com

তার স্ত্রী ফাতিমা, তাদের দুই পুত্র হাসান এবং হুসায়িন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জন্মদিন। পরবর্তীতে এ জন্মদিন পালনের গণ্ডি আরো প্রশস্ত হয়। তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিনও পালন করা শুরু করেন। এমন কি এক পর্যায়ে তারা মিশরের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত "মীলাদ" নামে 'ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিনও উদযাপন শুরু করেন। যা উদযাপন হত আনন্দ প্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে। যার বর্তমান রূপই হচ্ছে, খ্রিষ্টানদের সব চেয়ে প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন বা ক্রিসমাস।[৬]

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ৫৫০ সাল থেকে ৬০০ সালের মধ্যেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের কিছু ধার্মিক মানুষ প্রতি বৎসর রবি'উল আউআল মাসের প্রথমাংশে জৌলুসপূর্ণ খানাপিনার মজলিস ও আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী" উদযাপন করতে শুরু করেন।[৭] তবে যিনি ঈদে মীলাদুন্নাবীর প্রবর্তক হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি ঈদে মীলাদুন্নাবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের [?] দাবিদার তিনি হচ্ছেন, ইরাক অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক কূকুবুরী নামে খ্যাত মুযাফ্ফরুদ্দীন আবু সা'ঈদ কূকুবুরী ইবন আলী ইবন বাকতাকীন ইবন মুহাম্মদ আলতুরকমানী [মৃত্যু: ৬৩০হি]। তারই আন্তরিক প্রচেষ্টায় শী'আহ কর্তৃক উদ্ভাবিত এই উৎসব সুন্নী জগতে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। এজন্য তিনি এর প্রথম প্রবর্তক না হলেও বিভিন্ন সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ তার কেই ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন; কারণ তিনিই প্রথম এই উৎসবকে রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতে শুরু করেন এবং সাধারণের মধ্যে এই উৎসবকে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত করেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেছিলেন।[৮] ৬০৪ হিজরীতে ইবনে দিহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন কূকুবূরী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদযাপন উপলক্ষে বিশাল উৎসব করেছেন। তখন তিনি তাকে উৎসর্গ করার জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হলেন "মীলাদুন্নবী"র উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান, ইবনে দিহিয়া আল-কালবী [৬৩৩হি]। এর শিরোনাম ছিল, 'আততানাবীর ফী মাওলিদিল বাশীরি ওয়াননাযীর'। তার এ গ্রন্থ পরবর্তীতে "মীলাদ" কেন্দ্রীক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। মীলাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের জন্য কুকুবুরী তাকে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করেন।[৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্য মহামানবের জীবনচরিত যেহেতু 'মীলাদুন্নাবী' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত অর্থেও ব্যবহৃত হয় সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ বা জীবনচরিত চর্চা করা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পেতে হলে তার জীবনচরিত ও অন্যান্য অতিমানবের



www.pathagar.com

জীবন চরিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ হওয়া খুবই জরুরী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্য মহামানবের জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনচরিতের মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন পার্থক্য। তার জীবনচরিতের ধরণ, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা অন্য যে কোন মানুষের জীবনচরিত থেকে একেবারেই ভিন্ন। মুসলিমের জন্য যে কোন ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে তার অনুকরণ ঐ ইবাদাত কবুলের জন্য অনিবার্য শর্ত। তিনি যে 'ইবাদাত যেভাবে আদায় করেছেন, সেভাবে না করে তার চেয়ে অতিরঞ্জন বা বিয়োজন করে তা আদায় করলে কোনক্রমেও তা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। যে জন্য এক রাকা'আত সালাত আদায়ে দু' সিজদাহর পরিবর্তে এক সিজদাহ অথবা তিন সিজদাহ দিলে সে সালাত বাতিল বলে গণ্য হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি রাক'আতে দু'টি করে সিজদাহ করতেন। তেমনটিই করা আমাদের জন্যও অপরিহার্য। আর তিনিই তো বলেছেন:
"তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবেই সালাত আদায় কর।"[১০] এ দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, 'ইবাদাত কবুলের ক্ষেত্রে তার অনুকরণ অনিবার্য শর্ত। তিনি কিভাবে কোন ইবাদাত করতেন তা জানার জন্য তার জীবনী জানা অপরিহার্য, পক্ষান্তরে ইবাদাত কবুলের জন্য অন্য কোন মানুষের অনুকরণ অত্যাবশ্যক না হওয়ায় অন্য কারো জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। এটাই হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্য মহামানবের জীবনচরিতের মধ্যে মূল পার্থক্য।

মহান আল্লাহর আনুগত্য একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আর মহান আল্লাহর আনুগত্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :
"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।"[১১] সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য করতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে হয় আর তার আনুগত্য করতে হলে কোন কোন কাজের আনুগত্য কি কি ভাবে করবে সে জন্য তার কর্মকাণ্ড, তার কর্মতৎপরতা ও তার কর্মময় জীবনবৃত্তান্ত জানা ছাড়া এ আনুগত্য সম্ভবই নয়। যেহেতু অন্য কোন মানুষের আনুগত্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য নয় সেহেতু তাদের জীবনবৃত্তান্ত না জানাটা কোন সমস্যা না, পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য, সেহেতু তার জীবনবৃত্তান্ত জানা অপরিহার্য।

পরকালে নাজাতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী জানাও অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে।"[১২] অর্থাৎ যারা



www.pathagar.com

পরকালে সফলতা লাভের আশা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আদর্শকে নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। কাউকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হলে তার কর্মকাণ্ড, তার কর্মতৎপরতা, তার কর্মময় জীবনবৃত্তান্ত জানা ছাড়া সম্ভব হয় না, সেই প্রেক্ষাপটে পরকালে নাজাতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী জানার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং তার জীবনী সম্পর্কে জানা আর অন্য কোন মহৎ ব্যক্তির জীবনী সম্পর্কে জানা কোনভাবেও এক নয়। সুতরাং খ্রীষ্টানগণ বছরের একদিনে অর্থাৎ ক্রিসমাস দিনে তাদের নাবী ঈসা আলায়হিস সালামের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে মাতামাতির মাধ্যমে তার জন্মদিন উদযাপন করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব পালন করে ও তার প্রতি ভালবাসার বহি:প্রকাশ করে ফেলেছেন মর্মে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু একজন মুসলিমের সে সুযোগ নেই। তিনি বছরের একদিনে তার নাবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আলোচনা করে বা একটি মাত্র দিনে তার জন্মদিন উদযাপন করে তার হক আদায় করে শেষ করেছেন, বা তার প্রতি ভালাবাসার বহি:প্রকাশ ঘটিয়ে ফেলেছেন বলতে পারেন না। বরং বছরের সকল সময় তাকে চর্চা করা ও তাকে নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়াই হচ্ছে, তার ঈমানের অনিবার্য দাবী। তার আমল কবুল হওয়ার ও আখিরাতে নাজাতের জন্য অপরিহার্য শর্ত। এ জন্য মুসলিম মণীষীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধুমাত্র জন্মদিনে বা দু' একদিনে তাকে চর্চা করে তাকে খাটো করেননি।

হিন্দু ধর্মমতে ৩২২৮ খৃস্টপূর্বে ১৮ অথবা ২১ জুলাই তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল বিধায় হিন্দু শাস্ত্রমতে তার এ জন্মদিনটিকে তারা জন্মাষ্টামী নামে তারই জন্মোৎসব পালন করে থাকেন। এছাড়াও মুসলিম সমাজে ঈদে মীলাদুন্নাবী' উদযাপন শুরু হওয়ার পূর্ব হতেই খ্রীষ্টানদের মাঝে মিলাদে মাসিহী বা ক্রিসমাস ডে নামে তাদের নাবীর জন্মদিন উদযাপন হতো। ক্রিসমাস উৎসবের মূল ভিত্তি হচ্ছে, যিশুর জন্ম কাহিনী।[১৩] এই দুই ধর্মে তাদের ভগবান ও ঈশ্বরের জন্মদিন পালন মূলত আমাদের সমাজে ঈদে মীলাদুন্নাবী' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উদযাপনের মূল ভিত্তি। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নাবী' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উদযাপন যে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা মুসলিম হিসেবে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করতে ব্যর্থ হয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা মুসলিম পরিচয়ের অযোগ্য। ইসলামের গণ্ডি থেকে তারা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা বিজাতীয় দলের সদস্য হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে :



www.pathagar.com

"ইবন 'উমার রাদি আল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে অন্য কাউকে অনুসরণ করে সে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়।"[১৪]
আরো বর্ণিত হয়েছে :

"'আমর ইবন শু'আয়িব রাদি আল্লাহু আনহু তার পিতা, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে আমার ব্যতিত অন্য কাউকে অনুকরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা য়াহুদী ও নাছারাদের অনুকরণ করো না, কেননা য়াহুদীরা হাতের আঙ্গুল দ্বারা এবং নাছারারা হাতের তালু দ্বারা সালাম দেয়।"[১৫] বলা হয়ে থাকে, যে যাদের অনুকরণ করে তাদের সাথেই তার হাশর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর অনুকরণ থেকে যথারীতি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বর্ণিত হয়েছে :

"আবূ হুরায়য়া রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "য়াহুদী ও নাছারাগণ সাদা দাড়ি রঙিন করে না, সে জন্য তাদের বিরোধিতা করে তোমরা তা রঙিন কর।"[১৫] সুতরাং বিজাতীয়দের অনুকরণ করে ঈদে মীলাদুন্নাবী' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উদযাপন কোনভাবেও ইসলাম সমর্থন করে না। বরং পূর্বের আলোচনার আলোকে যারা ঈদে মীলাদুন্নাবী' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উদযাপন করেন তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যান কি না তাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিজাতীয়দের দীন বা ধর্মীয় সম্পর্কিত বিষয়কে অনুকরণ করা হারাম ও এটি যে কাবীরাহ গুণাহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ তাদের দেবতা ও নবীর জন্মদিনকে ঈদ হিসেবে পালন করে থাকে, এটি তাদের নিছক ধর্মীয় ... সুতরাং এ বিষয়কে অনুকরণ করা কবীরাহ গুণাহ।[১৬]

শয়তান কোন নবী বা ওলীর প্রতি তার অনুসারীগণের অতিমাত্রায় ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে বিপথগামী করে থাকে। পৃথিবীতে মূর্তিপূজার শুরুর ইতিহাসটিও এমনই। নূহ আলায়হিস সালামের গোত্রের কিছু লোককে তাদের সমাজের বিগত সজ্জনদের প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ধীরে ধীরে তাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর একত্ববাদ বিধ্বংসী মূর্তিপূজার ক্ষেত্র তৈরী করে। যার ধারাবাহিকতায় সমগ্র পৃথিবীতে রমরমা রূপ নিয়েছে মূর্তি সংস্কৃতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অতিমাত্রায় ভালবাসার টোপ দিয়ে যে ঈদে মিলাদুন্নাবী ঘটা করে উদযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে তা মূলত নবীদের প্রতি অতিরঞ্জিত ভালবাসারই ছদ্মাবরণে। পূর্ববর্তী ইতিহাস থেকে জানা গেছে যে, সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম, তাবি'ঈ ও তাবি'ঈ-তাবি'ঈন রাহিমাহুল্লাহ এমনকি আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন



www.pathagar.com

করেননি। বরং ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রচলন হয়েছে অনেক অনেক পরে। তাহলে কি ইসলামের এই সব বিদগ্ধজনদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার ঘাটতি ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার বহি:প্রকাশ উম্মাতের পূর্ববর্তী মণীষীগণ যেভাবে করতে পারলেন না তাদের চেয়ে আমরা তার ভালবাসার ক্ষেত্রে অগ্রগামী বলেই কি এই ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি একজন সাহাবাহর ভালবাসা আর আমাদের ভালবাসা কি কোনভাবেই তুলনা করা যেতে পারে? আমরা তো তাদের পায়ের ধুলার সমানও নই। উহুদের রণাঙ্গনে তালহা ইবন উবায়দিল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহু নামের যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে শত্রুদের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য সত্তরটিরও বেশী আঘাত নিজের শরীরে ধারণ করেছিলেন, কোন মুখে আমরা দাবী করি তার চেয়ে আমাদের রাসূল প্রেম অনেক বেশী? তারপরেও তিনি এমন কি তার মত লক্ষ লক্ষ সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহুম কেউতো এই ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনকে রাসূল প্রেম বহি:প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন না; তাহলে তাদের রাসূল প্রেম কি প্রশ্নবিদ্ধ ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা যাকে আরবীতে হুব্বুর রাসূল বলা হয়, এটি মুসলিমদের ঈমান আকীদার অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

"আনাস ইবন মালিক রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার ছেলে, তার পিতা ও সকল মানুষ থেকে প্রিয় হবো।"[১৭] ঈমান আকীদার অপরিহার্য অঙ্গ এই রাসূল প্রেমের বহি:প্রকাশ কিভাবে ঘটাতে হবে তা ইসলামের আলোকেই হওয়া অপরিহার্য। মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা তার আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কাউকে বিরোধীতা করে, তার আনুগত্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তাকে ভালবাসা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উদযাপনই যদি তার প্রতি ভালবাসার বহি:প্রকাশ হত তাহলে তাকে জীবনের চেয়ে যারা বেশী ভালবাসতেন সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম তার জন্মদিন পালনের মাধ্যমে তাদের ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও এর পক্ষে তার পথ নির্দেশনা দিয়ে যেতেন। ইসলামে কোন কিছু ভাল বলে বিবেচিত হবে আর সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন বক্তব্য থাকবে না এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে খাটো করে দেখারই নামান্তর। যদি মিলাদুন্নাবী ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে পালিত হয়, তাহলে অবশ্য তা ইবাদাতের অর্ন্তভূক্ত। আর ইবাদাত তো তাওকিফী অর্থাৎ শারী'আত কর্তৃক



www.pathagar.com

অনুমোদিত হতে হবে, যেহেতু এ ব্যাপারে শারী'আতের অনুমোদন নেই, তাহলে তা নিশ্চয় ইবাদাত নয়। আর যা ইবাদাত নয়, তা করলে ছাওয়াবের আশা করাও অবান্তর। একজন মুসলিম এসব বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকবেন এটাই তো স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"আলী ইবন হুসায়িন তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের জন্য উত্তম ইসলামই হচ্ছে, বেহুদা কোন কিছু বর্জন করা।"[১৮]

## ঈদে মিলাদুন্নাবী বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত

ঈদে মীলাদুন্নবী'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় এ বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যে, ঈদে মীলাদুন্নাবী' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এবং তার গাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহু এটি কোন দিন উদযাপনও করেননি। আর এ ধরনের কোন দীনী বিষয় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন দিন করেননি এবং অনুমোদনও দেননি এবং তার গাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম, তাবি'ঈ ও তাবি তাবি'ঈন রাহিমাহুল্লাহ যা কোন দিনও করেননি তাকেই বিদ'আত বলে। অর্থাৎ যে বিধান মহান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেননি সে বিধানকে উত্তম মনে করাকে বিদ'আত বলা হয়। ইবন তায়মিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

"দীনের মধ্যে 'বিদ'আত' হচ্ছে, যার বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেননি; যা করা অত্যাবশ্যক, অথবা যা করা উত্তম এমন কোন নির্দেশ নেই।"[১৯]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, গাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম ও তাবি'ঈন রাহিমাহুল্লাহের যুগে ছিল না শারী'আত সংশ্লিষ্ট এমন কোন বিষয় নতুন ভাবে শারী'আতে সংযোজন ও বিয়োজনেরই নামই হচ্ছে 'বিদ'আত'। তবে শারী'আত সংশ্লিষ্ট নয়, এমন কোন বিষয় নতুনভাবে উদ্ভাবনকে ইসলামের দৃষ্টিতে 'বিদ'আত' বলা হয় না। বিদ'আত ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ।

## হাদীসে বিদ'আত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

"গুদায়িফ ইবনিল হারিছিল ছুমালী রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন সম্প্রদায় বিদ'আতের প্রচলন করলে তার মাধ্যমে তার মতই একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং সুন্নাতকে আকড়ে ধরা বিদ'আদ উদ্ভাবনের চেয়ে উত্তম।"[২০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :



www.pathagar.com

"কোন সম্প্রদায় তার নাবীর পরবর্তীতে কোন বিদ'আতের প্রচলন করলে তার মাধ্যমে তার মতই একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।"[২১] বর্ণিত হয়েছে :

"আনাস ইবন মালিক রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিদ'আত ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন বিদ'আতকারীর 'আমল কবুল করতে অস্বীকার করেন।"[২২] আরো বর্ণিত হয়েছে :

"আনাস ইবন মালিক রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিদ'আত ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিদ'আতকারীর তাওবার মাঝে পর্দা দিয়ে রাখেন।" [২৩] হাদীসে উল্লেখ হয়েছে

"আব্দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের সবার আগে হাউজ কাউছারে উপস্থিত হবো, তোমাদের কিছু লোককে আমার নিকট আনা হবে, এরপর আমার থেকে তাদেরকে সরিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রাব্ব, এরাতো আমার সাথী। বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পর এরা দীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব করেছিল।"[২৪]

সুতরাং ইসলামে 'বিদ'আত' একটি নিন্দিত বিষয়। এর সাথে ইসলামের আপোষ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ কত সুন্দরইনা বলেছেন:

"যারা ইসলামে বিদ'আত উদ্ভাবন করার পর, তাকে ভাল কাজ বলে মনে করে, তারা মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রিসালাত আত্মসাতকারী ধারণা করেই এ কাজটি করে থাকে। কেননা মহান আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দান করলাম", সে দিন যেটি দীন ছিল না, আজও সেটি দীন নয়"।[২৫] সুতরাং বিদ'আত লালন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রিসালাতের আত্মসাতকারী মনে করারই নামান্তর, যা কোন মুমিন কক্ষনো করতে পারে না। বিদ'আত যে অতি নিন্দিত ও জঘন্য বিষয়, সে প্রসংগে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে :

"'আয়িশাহ রাদি আল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের কোন বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা বর্জনীয়।" অর্থাৎ ইসলামের বাহিরের কিছু নতুন উদ্ভাবনকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই অগ্রহণীয় বিষয় বলে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।[২৬] এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে:

"যে এমন কোন কিছু আমল করবে, যা আমাদের স্বীকৃত বিষয় নয় তা অগ্রহণীয়।"[২৭] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শারী'আতের মধ্যে নয়, এমন কোন কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর যা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তার কি কোন মূল্য আছে? মূলত ঈদে মীলাদুন্নাবী' উদযাপন হচ্ছে, এমনই একটি



www.pathagar.com

বিদ'আত। সুতরাং এ ধরণের বিদ'আতী কাজ করা একজন মুমিনের জন্য কক্ষনো শোভনীয় নয়। বরং এটি বর্জন করা অপরিহার্য।

## ঈদ সংস্কৃতির সাথে ঈদে মীলাদুন্নবী'র সাংঘর্ষিকতা

ইসলামের অন্যতম সংস্কৃতি 'ঈদ সংস্কৃতি'। 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আদহা' ইসলামের দু'টি বিশেষ উৎসব। বিশেষ বিশেষ দীনী কার্যক্রমের মাধ্যমে এ দু'টি দিন উদযাপিত হয়। এ দু'টি দিনের করণীয় সম্পর্কে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এ দু'টি দিনের করণীয় বিষয়াদি ইবাদাত বলেই গণ্য। আর ইবাদাতের ধরণ প্রকৃতি তো ইসলামী শারী'আহ কর্তৃকই নির্ধারিত। সংযোজন ও বিয়োজনের সেখানে কোন সুযোগ নেই। এখানে ঈদুল ফিতর ১লা শাওয়াল তারিখ ব্যতীত উদযাপন, এ দিনের ছালাতুল ঈদ জোহরের পরে আদায়, এ ছালাত দু রাকা'আতের পরিবর্তে চার রাকা'আত সম্পাদন প্রভৃতি ইসলামে বৈধ নয়। কেননা এটি ইসলামী শারী'আতের নিয়ম নীতির উপর নতুন সংযোজন, যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই বছরের দু'টি দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"আনাস রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মাদীনাতে আগমন করেন তখন মাদীনাবাসীর জন্য দু'টি দিন নির্ধারিত ছিল, তারা সে দু'টি দিনে খেলাধূলা করত। তিনি বললেন, এ দুটি দিন কী? তারা বললেন, আমরা জাহিলী যুগে এ দু'টি দিনে খেলাধূলা করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দু'টি দিনকে এর চেয়ে উত্তম দু'টি দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহাতে পরিবর্তন করেছেন।"[২৮] সুতরাং ইসলামের ঈদের সংখ্যা নির্ধারিত। শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত দু'টি ঈদের অতিরিক্ত অন্য আরো এক বা একাধিক ঈদের প্রচলন করার অধিকার কোন মুসলিমের নেই। আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে ঈদে মীলাদুন্নাবী', কাল পীর সাহেবের জন্মদিনে ঈদে মিলাদুশ শায়িখ, পরশু দেশের স্বাধীনতার সেনাপতির জন্মদিনে ঈদে মিলাদুল কায়িদ প্রভৃতির প্রচলন করতে করতে ঈদের তালিকা তো দীর্ঘ হতেই থাকবে, যা মূলত ইসলামে তো বটেই এমনকি বাস্তবতার আলোকে কোনভাবেও গ্রহণীয় হতে পারে না। ঈদ একটি ইসলামী পরিভাষা যা ইসলামই প্রচলন করেছে। এ পরিভাষা অন্য কোথাও ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখানো উচিত নয়। যারা মূলত ঈদে মীলাদুন্নবী'র প্রচলন করেছেন এবং আজও এ পরিভাষা ব্যবহার করে যাচ্ছেন তারা ইসলামী শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত দু'টি ঈদের সাথে তৃতীয় অন্য একটি ঈদের সংযোজন করে নিজেরাই শারী'আতে নতুন ঈদের প্রচলন করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক অপরাধ।

ঈদ শব্দটিকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত বুঝানোর জন্য 'মীলাদুন্নবী' পরিভাষার চেয়ে 'সীরাতুন্নাবী' পরিভাষাটি এ অর্থে কিছুটা



www.pathagar.com

ভালো যে, এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন বা জন্মক্ষণের ঘটনাপঞ্জির সীমাবদ্ধতাকে সম্প্রসারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামগ্রিক কর্মকান্ডকে বুঝানো যায়। তবে 'সীরাতুন্নাবী' নাম দিয়েও কোন বিশেষ দিনকে বা সময়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করে উদযাপন করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

## ঈদে মীলাদুন্নবী'র পক্ষের দলীলাদি ও তার পর্যালোচনা

ঈদে মীলাদুন্নবী'র পক্ষের লোকেরা যে দলীলাদি উপস্থাপন করেন তা নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন। নিম্নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলীল পর্যালোচনাসহ তুলে ধরা হলো।

দলীল: মহান আল্লাহর বাণী:

"বল, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত। সুতরাং এ নিয়েই তারা আনন্দিত হোক। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম।"[২৯] তাদের মতে এ আয়াতে রাহমাত বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। অতএব আল্লাহ যেহেতু তার কারণে আনন্দ প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন সেহেতু তার জন্মদিনে ঈদে মীলাদুন্নবী'র উৎসব করে আনন্দ প্রকাশ করা অপরিহার্য।

পর্যালোচনা: কোন আয়াতের কোন তাফসীরটি গ্রহণযোগ্য, তা বিবেচনার জন্য ইসলামের প্রথম যুগের বিদগ্ধ মুফাসসিরগণ কী তাফসীর করেছেন তা উপলব্ধি করা একান্ত জরুরী। এগুলোকে উপেক্ষা করে পরবর্তী যুগের দু'একজনের সে সব আয়াতের মনগড়া তাফসীর যা সালফি ছালিহীনের নিকট অগ্রহণযোগ্য তা কক্ষনো সত্যান্বেষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে 'রাহমাত' বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা এর পূর্ববর্তী আয়াতকে পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায়। সেখানে মহান আল্লাহ বলেন :

"হে মানুষ, তোমাদের রাব্বের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে মাও'ইযাহ [উপদেশ] এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার আরোগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।"[৩০] এ দু'টি আয়াতকে একত্রে অধ্যয়ন করলে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, এখানে যে রাহমাতকে পাওয়ার জন্য আনন্দ করার আহ্বান এসেছে, তা দ্বারা মাও'ইযাহ অর্থাৎ আলকুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মানবজাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আলকুরআনের মত বিশুদ্ধ হিদাআত গ্রন্থ প্রাপ্তি বড় আকারের রহমত বিশেষ। উপরোক্ত আয়াতে এ কুরআন নামক রাহমাত প্রাপ্তির জন্য খুশী প্রকাশের আহ্বান এসেছে। 'রাহমাত' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়নি। প্রসিদ্ধ মুফাসসির আততাবারী,[৩১] ইবন কাছীর,[৩২] আলকুরতুবী[৩৩] এবং আশশাওকানী[৩৪] রাহিমাহুমুল্লাহ কেউই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাহমাত বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুঝাননি, সকলেই আলকুরআন ও আলকুরআন নির্দেশিত পথ



www.pathagar.com

ইসলামকেই বুঝিয়েছেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন করাকে বৈধ প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই।

**দলীল: মহান আল্লাহর বাণী:**

"নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু'আ করেন[৩৫]। হে মু'মিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[৩৬] তাদের ভাষায় মহান আল্লাহ ও তার ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত পাঠান, আর মু'মিনদেরকে তার উপর সালাত ও দুরূদ প্রেরণের জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনের মধ্য দিয়ে তার উপর বেশী বেশী দরূদ প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে জন্য ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন দোষণীয় তো নয়ই বরং তা উত্তম কাজ বলে গণ্য।

পর্যালোচনা: বিশুদ্ধ হাদীসে যে কোন সময়ই বেশী বেশী দরূদ পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে তার জন্মদিনেই সেটাকে বেশী বেশী পাঠ করার কোন বৈধতা নেই। কোন আমল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষণের জন্য নির্ধারণ না করে দিলে তা নির্ধারণ করে নেয়া বিদ'আতেরই অন্তর্ভূক্ত। উপরন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে, তার সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈ, ইমামগণ রাহিমাহুমুল্লাহ কেউ এমনটি না করায় নিজেরা মনগড়াভাবে মিলাদুন্নাবী উদযাপনের মাধ্যমে জন্মদিনে বেশী দরূদ পাঠের ব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারেই ভিত্তিহীন।

দলীল: ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক নবী আলায়হিমুস সালামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ স্থানকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন মাকামে ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে মুছাল্লা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩৭] তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট তার জন্মদিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন তেমন দোষের নয়।

পর্যালোচনা: যেহেতু মাকামে ইবরাহীমকে বিশেষ মর্যাদা দানের পক্ষে আয়াত রয়েছে সেহেতু তার মর্যাদা প্রশ্নাতীত, আর ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনের পক্ষে কোন আয়াত বা বিশুদ্ধ হাদীস নেই সেহেতু এ দিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদযাপন বৈধ নয়। যদি এ দিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদযাপন করতেই হত, তাহলে এ বিষয়ে আলকুরআনে না হলেও বিশুদ্ধ হাদীসে দিকনির্দেশনা দেয়া থাকতো। এক সময় মু'আবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু কা'আবাহর চারটি কোণ স্পর্শ করাকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করলেন। ইবন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে এমনটি কক্ষণো করেননি বললে তিনি লজ্জিত হয়ে আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুমার বক্তব্যকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দিলেন।[৩৮] এ দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কোন কিছুকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া ঠিক নয়। সুতরাং মাকামে ইবরাহীমকে বিশেষ মর্যাদা দানের উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নাবী হিসেবে উদযাপন করাকে বৈধ বলার কোন সুযোগ নেই।



www.pathagar.com

**দলীল: বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:**
"আবূ কাতাদাহ রাদি আল্লাহ আনহু সূত্রে বর্ণিত, ...রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সোমবারে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি এ দিন জন্মগ্রহণ করেছিলাম, এ দিন আমার উপর রিসালাত অবতীর্ণ করা হয়েছিল অথবা আমার উপর আলকুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল।" [৩৯] তাদের ভাষায় এ হাদীস অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার জন্মদিনে শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিয়াম পালন করতেন। সুতরাং তার জন্মদিনে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন এ হাদীসদ্বারা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়।
পর্যালোচনা: যদি তাইই হয়, তাহলে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মত সিয়াম পালনের মাধ্যমেই শুধু এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, ঘটা করে খুশী প্রকাশের মাধ্যমে জশনে জুলুস বের করে একে ঈদে মিলাদুন্নাবী নামে অন্য আরেকটি 'ঈদ হিসেবে পালন করার যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া তিনি রাবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখের একটি সোমবারেই তো শুধু সিয়াম পালন করেননি বরং বছরের প্রতিটি সোমবারে সিয়াম পালন করতেন বলে এ হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। এদ্বারা কী বুঝা যায় না যে তিনি এটাকে জন্মদিন হিসেবে পালন করেননি? কারণ বছরে তো জন্মদিন একদিনই হয়। এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে হলে, প্রতি সোমবারই তো তার জন্মদিন উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন করা উচিত বলে গণ্য হবে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনকে বৈধ প্রমাণের কোন সুযোগ নেই।
৫. দলীল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুসা আলায়সি সালাম ও বানূ ইসরাঈলের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় আশুরার দিনে সিয়াম পালন করেছেন। যেহেতু তিনি বিশেষ দিনে বিশেষ কারণে সিয়াম পালনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেছেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন করা অবশ্যই বৈধ।
পর্যালোচনা: আসলে তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন, কেননা মুসা আলায়সি সালাম ও বানূ ইসরাঈলের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আশুরার দিনে সিয়াম পালনের বৈধতা তো বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। যদি মিলাদুন্নাবী উদযাপন করার বিষয়টিরও বৈধতা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতো তাহলে তো কথাই থাক তো না। আশুরার সিয়াম যেমন আশুরার দিন ব্যতীত অন্য দিনে বৈধ নয় তেমনি আশুরার উপর ভিত্তি করে অন্য একটা দিনে অন্য কারণ দেখিয়ে তা বৈধতা দেয়ার কোন যুক্তি নেই।
৬. দলীল: আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সংবাদ পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়েছিল। সংবাদ দাতা দাসী ছুয়ায়বাহকে সেই মুহূর্তে সে মুক্ত করে দেয়। সে জন্য কাফির হওয়ার পরেও প্রতি সপ্তাহের ঐ দিনে তার শাস্তি লঘু করা হয় বলে স্বপ্নের মাধ্যমে জানা গেছে। একজন কাফির যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সংবাদ পেয়ে খুশী হওয়ায় তার শাস্তি মৃত্যুর পরে লঘু হয়, তাহলে তারই জন্মদিনকে খুশীর মাধ্যমে উদযাপন অবশ্যই উত্তম কাজ বলেই গণ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।
পর্যালোচনা: ঘটনাটির মূল উৎস হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্ন শারী'আতের দলীল হতে পারে না। এটি উরওয়াহ রাদি আল্লাহু আনহুর বক্তব্য বলে প্রমাণিত। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু



www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য নয়। সে জন্য এটি অকাট্য দলীল হওয়ার অযোগ্য। তাছাড়াও আলকুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যার স্পষ্ট বক্তব্যই হচ্ছে যে, কাফির যত ভালো কাজই করুক না কেন তা নিষ্ফল হয়ে থাকে।[৪০] সুতরাং এ বর্ণনাটি আলকুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এটি গ্রহণ যোগ্য নয়।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, উল্লিখিত দলীলাদি যেভাবে উপস্থাপিত হলো তাতে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, এ সব দলীলগুলো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে, তার সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈ, ইমামগণ রাহিমাহুমুল্লাহ কেউ এভাবে বুঝতে ব্যর্থ ছিলেন। অন্যথায় তারা এগুলোর আলোকে কেন তার জন্মদিন উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন করলেন না? তা হলে প্রতিয়মান হয় যে, নিশ্চয় তারা বিষয়টাকে অন্যভাবে বুঝেছিলেন, সুতরাং তাদের থেকে ভিন্নভাবে বিষয়টাকে আমাদের বুঝে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনকে বৈধতা দেয়ার অর্থই হচ্ছে, আমরা দীনকে তাদের চেয়ে বেশী বুঝি। নাউযুবিল্লাহ।

## ইসলামের বিদগ্ধ মণীষীদের মতামত

### ইবন তায়মিয়াহ

তিনি ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপন সম্পর্কে বলেন:

"কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও এবং উদযাপনের সুযোগ থাকার পরেও এটি ইসলামের প্রথম যুগের কেউ উদযাপন করেন নি। যদি এর মধ্যে কোন কল্যাণ থাকতো তাহলে অবশ্যই তারা তা করতেন। কেননা তারা ছিলেন সব চেয়ে রাসূল প্রেমিক...।"[৪১]

### ইবন বায

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, খুলাফাউর রাশিদুন ও সাহাবাহ রাদি আল্লাহু আনহুম তাবি'ঈ রাহিমাহুমুল্লাহর কেউ উত্তম যুগের হওয়া, সুন্নাতকে ভালভাবে জানা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ ভালবাসা এবং শারী'আতকে শক্তভাবে অনুসরণকারী হওয়ার পরেও ঈদে মীলাদুন্নাবী' উদযাপন করেননি।"[৪২]

### মুহাম্মদ ইবন আব্দুস সালামুশ শুকায়রী

"বিশেষ মওসুমকে মিলাদের জন্য গ্রহণ করা এবং তা উদযাপন করা ঘৃণিত ও ভ্রান্তিপূর্ণ বিদ'আত যা শারী'আত ও আকল কোনটিও গ্রহণ করে না। যদি তন্মধ্যে কোন কল্যাণ থাকতো তাথেকে আবূ বাকর, উমার, উসমান, আলী, সমগ্র সাহাবাহ, রাদি আল্লাহু আনহুম তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈ, ইমামগণ রাহিমাহুমুল্লাহ ও তাদের অনুসারীগণ গাফিল থাকতেন না।"[৪৩]

### আলফাকিহী

"এ মিলাদের কোন ভিত্তি আলকুরআন বা সুন্নাতে নেই এবং যে সকল ইমাম দীনের অনুকরণীয় আদর্শ,পূর্ববর্তীদের পদাঙ্কের শক্ত অনুসারী তাদের থেকে এটির স্বীকৃতিও নেই। বরং এটি বিদ'আত।" [৪৪]



www.pathagar.com

## উপসংহার

সাহাবীগণ রাদি আল্লাহু আনহুম ও তাবি'ঈ রাহিমাহুমুল্লাহর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রবল ভালবাসা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কখনো তাদের ভালবাসা এভাবে উৎসব বা উদযাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি, কাজেই পরবর্তী যুগের মুসলিমদের জন্যও তা শারী'আত সম্মত নয়। পরবর্তী যুগের মুসলিমদের উচিত ঈদে মীলাদুন্নাবী' উদযাপনের মত শারী'আহ বিরোধী কাজ থেকে বিরত থেকে প্রথম যুগের মুসলিমদের ন্যায় দীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সার্বক্ষণিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ, তার সীরাত আলোচনা, তার উপর সালাম প্রেরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটানো। মহান আল্লাহ, আমাদের সবাইকে সত্যের উপর টিকে থাকার তাওফীক দান করুন।

## তথ্যসূত্র ও টিকাসমূহ


১. ইবন মনজুর, লিসানুল আরব, বায়রূত,তাবি. ৩খ. ৪৬৮পৃ.।

২. আছছালিহী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ বায়রূত, ১৯৯৩, ১খ. ৩৬৬পৃ.

৩. প্রাগুক্ত ১খ. ৩৬২ পৃ.

৪. মাক্কাহ হতে মাদীনার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুম নামক স্থানে একটি পুকুর [গাদীর] পাড়ে একদিন বা কিছু সময় আবস্থান করেন। এক পর্যায়ে তিনি সেখানে একটি খুতবাহ দেন যেখানে আহলি বায়িত সম্পর্কে কিছু কথা ছিল। এটি শী'আদের পক্ষে হওয়ায় তারা এ দিনটাকে উৎসবের দিন হিসেবে উদযাপন করে থাকে।

৫. আলশাহরাস্তানী, আলমলাল ওয়ান নিহাল, বায়রূত, ১৯৮০, ১খ. ১৯১-১৯৮ পৃ. আন নাদওয়া তুল আলামিয়্যাহ লিল শাবাবিল ইসলামিয়্যাহ, আলমাউসূয়া আলমুয়াসসারা, রিয়াদ, ১৯৮৮, ৪৫-৫২ পৃ. আযযাহাবী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন 'উসমান, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' বায়রূত, ১৯৮৯, ১৫খ. ১৪১-১৫৯ পৃ.

৬. আলমাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আলমাওয়ায়িজ ওয়াল ইদতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার, কায়রো, ৪৯০-৪৯৫ পৃ.

৭. আছছালিহী, ১খ. ৩৬৩ ও ৩৬৫পৃ.

৮. প্রাগুক্ত, ১খ. ৩৬২ পৃ.

৯. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়য়াতুল আ'য়্যান, ইরান, ১খ.২১২ পৃ., ইবন কাছীর, আল বদায়া ওয়ান নিহায়াহ, বায়রূত, ১৩৯৬, ৯খ. ২৬পৃ., আযযাহবী, ২২খ. ৩৩৬ পৃ.

১০. ইবন হিব্বান, আছছাহীহ, তাবি. ৪খ. ৫৪২ পৃ.

১১. সূরাহ আননিসা: ৮০

১২. সূরাহ আলআহযাব: ২১

১৩. বাইবেল, লুক: ১:২৬-২:৪০

১৪. আবু দাউদ, বায়রূত, ৪খ. ৭৮ পৃ., হাদীস নং ৪০৩৩

১৫. আততিরমিযী, আলজামি", বায়রূত, ৪খ., ৩৫৩ পৃ. হাদীস নং ২৬৯৫, ২৯১১, ২৯৯৫

১৬. আলবুখারী, আছছাহীহ, কায়রো, ১৪০৭ হি., ৪খ.২০৭ পৃ., হাদীস নং ৩৪৬২

১৭. আল মানজিদ, মুহাম্মদ ছালিহ, ফাতওয়াল ইসলাম, ১খ. ৩১২৪ পৃ.

১৮. আলবুখারী, ১খ. ২০ পৃ. মুসলিম, আসসাহীহ, বায়রূত, তাবি., ১খ. ৪৯পৃ.

১৯. তিরমিযী, আসসুনান, বায়রূত, তাবি. ৪খ. ৫৫৮ পৃ.

২০. ইবন তায়মিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, দারুল ওয়াফা, ১৪২৬ হি, ৪খ. ১০৭ পৃ.

২১. আহমাদ, মুসনাদ, কায়রো, তাবি. ৪খ., ১০৫ পৃ.

২২. আততবারানী, আলমু'জামুল কাবীর, আলমাওছিল, ১৪০৪ হি., ১৮ খ., ৯৯ পৃ.




www.pathagar.com

২৩. ইবন মাজাহ, সুনান, বায়রূত, তাবি.১খ. ১৯ পৃ
২৪. আলবায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, বায়রূত, ১৪১০ হিঃ, ৫খ., ৪৪৯ পৃ.
২৫. আলবুখারী, ৫খ., ২৪০৪ পৃ.
২৬. আশশাতিবী, আবূ ইসহাক, কিতাবুল ই'তিছাম, তাবি., ১খ., ৪৯ পৃ
২৭. মুসলিম, ৩খ. ১৩৪৩ পৃ
২৮. প্রাগুক্ত, ৫খ. ১৩২ পৃ.
২৯. আবূ দাউদ, ১খ.৪৪১ পৃ. আহমাদ, মুসনাদ, কায়রো, তাবি., ৩খ., ১০৩ পৃ.
৩০. সূরাহ য়ূনুসঃ ৫৮
৩১. সূরাহ য়ূনুসঃ ৫৭
৩২. জামি'উল বায়ান, ১৪১০ হি. ১৫খ. ১০৫ পৃ.
৩৩. তাফসীরুল কুরআনুল আযীম, ১৪২০ হি. ৪খ. ২৭৪ পৃ.
৩৪. আলজামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১৩৮৪ হি. কায়রো, ৮খ. ৩৫৩ পৃ.
৩৫. ফুতহুল কাদীর, তাবি. ৩খ. ৩৮৯ পৃ.
৩৬. আলবুখারী আবুল 'আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আল্লাহর সালাত' বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে নাবীর প্রশংসা এবং ফিরিশতাদের সালাত হলো দু'আ। আর আততিরমিযী সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে আল্লাহর ছালাত বলতে রহমত এবং ফেরেশতাদের ছালাত বলতে ইস্তিগফার বুঝানো হয়েছে [ইবন কাছীর, ৭খ. ৪৫৭ পৃ]।
৩৭. সূরাহ আল আহযাবঃ ৫৬
৩৮. দেখুন সূরাহ আলবাকারাহঃ ১২৫
৩৯. দেখুন আহমাদ, ১খ. ২১৭ পৃ.
৪০. মুসলিম, ৩খ. ১৬৭ পৃ. আবূ দাঊদ, ২খ. ২৯৭ পৃ.
৪১. যেমন দেখুন সূরাহ আলফুরকানঃ ২৩ ও সূরাহ আননূরঃ ৩৯
৪২. ইকতিদাউস সিরাতুল মুসতাকীম, ২খ. ৬১৯ .
৪৩. হুকমুল ইহতিফালি বিল মাওলাদিন নাবী ওয়া গায়রাহু, ৩ পৃ.
৪৪. আসসুনান ওয়াল মুবতাদিয়াতুল মুতা'আল্লিকাতু বিল আযকারি ওয়াছ ছালাওয়াত ১৩৮-১৩৯পৃ.
৪৫. আলমাওরিদ ফী 'আমালিল মাওলিদ ২০-২১



www.pathagar.com

# সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষের ওপর বিশ্বাস

## শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

### বিশ্বাস বিমূর্ত এবং অবিচ্ছেদ্য

জীবনের প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত হলেও মৃত্যুর মত সত্যও জীবনের এক অনিবার্য নিয়তি। জীবন যদি আনন্দ আর খুশির উপলক্ষ হয় তবে মৃত্যু, দু:খ আর কান্নার উপলক্ষ। আমরা ভালো না বাসলেও, না চাইলেও মৃত্যু বা নানা বিপদ-আপদ আমাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে আসে। আর জীবনের প্রতি সহজাত ভালোবাসার কারণে সে বিপদ থেকে নিস্কৃতি পেতে চাই। মৃত্যুকে এড়াতে চাই। জীবনকে ঘিরে মানুষের এই শাশ্বত ভালোবাসা আর নিস্কৃতির আকাংখা থেকেই জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অদৃশ্য উৎস হতেই জীবনের ওপর বিপদ আপতিত হয় [ ৬৪: আয়াত ১১] এবং মৃত্যু এসে পড়ে। একে রোধ করার, নিবারণ করার, এড়িয়ে চলার কোনো উপায় মানুষের থাকে না। কোনো প্রাণীরও থাকে না। ["প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে" [০৩ : আয়াত ১৮৫] আর থাকে না বলেই মানুষের জীবনে বিশ্বাস এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান, মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য বিমূর্ত অংশ। বিশ্বাসবিহীন কোনো মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। বিশ্বাস কখনই মূর্ত নয়। বিশ্বাস সত্য নির্ভর কিনা সে প্রশ্ন হয়তো তোলা যায়। কিন্তু বিশ্বাস মূর্ত কি না এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

### নাস্তিকতা ও আস্তিকতা

মানব জীবনে এই বিশ্বাসের ধরণ হয় প্রধানত দু'প্রকার :

এক. নাস্তিকতা।

দুই. আস্তিকতা।

যারা নাস্তিক বলে নিজেদের পরিচয় দেন তারাও একটি বিশ্বাসের কথাই বলেন। কারণ আমাদের চারপাশের বন-বনানী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরসহ গোটা নিসর্গ, রাত-দিন, চাঁদ-সূর্য এসবের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই–এর কোনো প্রমাণ তাদের কাছে নেই। এসব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে এমন বিশ্বাসের কথাই তারা বলেন। কিন্তু এর কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ তাদের কাছে নেই। নিজে নিজে সৃষ্টি হওয়া সূর্য ও চাঁদের কোনো



www.pathagar.com

বাচ্চা-কাচ্চা কেন নিজে নিজে হয় না। কিংবা সৃষ্টির শুরু থেকে বৎসরে বারো মাস কেন নিজে নিজে কোটি কোটি বছর সময় পরেও বাচ্চা দিয়ে তের মাস হয় না কিংবা একদিনে ২৪ ঘন্টা কেন নিজে নিজে ২৪ ঘন্টা ৩০ সেকেন্ড হয় না কিংবা ২৪ ঘন্টায় একটি দিন ও একটি রাত কেন নিজে নিজে দুইটি রাত ও দুইটি দিন হয় না এর কোনো উত্তর সে সব নাস্তিক মানুষের কাছে নেই। তাই এসব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে এমন বিশ্বাসের যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ভিত্তি তাদের কাছে নেই। ফলে এক যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসকেই নাস্তিকরা বুকে ধারণ করে রাখেন। প্রসংগত জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ-এর একটি গল্প শোনা যাক্। লেখকের ৬৩তম জন্মদিনে প্রকাশিত আত্মপর্যালোচনামূলক বই "রঙপেন্সিল"-এ গল্পটি এরকম: "আমি ওল্ড ফুলস বিষয়ক ক্লাবের আড্ডায় প্রায়ই ঈশ্বর-বিষয়ক একটি গল্প বলি। পাঠকদের গল্পটি জানাচ্ছি। ধরা যাক্, এক কঠিন নাস্তিক মঙ্গল গ্রহে গিয়েছেন। সেখানকার প্রাণহীন প্রস্তরসংকুল ভূমি দেখে তিনি বলতে পারেন-একে কেউ সৃষ্টি করে নি। অনাদিকাল থেকে এটা ছিল। তার এই বক্তব্যে কেউ তেমন বাধা দিবে না। কিন্তু তিনি যদি মঙ্গল গ্রহে হাঁটতে হাঁটতে একটা ডিজিটাল নাইকন ক্যামেরা পেয়ে যান তা হলে তাঁকে বলতেই হবে, এই ক্যামেরা আপনাআপনি হয় নি। এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। মনে করা যাক, ক্যামেরা হাতে তিনি আরও কিছুদূর গেলেন, এমন সময় গর্ত থেকে একটা খরগোস বের হয়ে এল। যে খরগোসের চোখ নাইকন ক্যামেরার চেয়ে হাজার গুণ জটিল। তখন কি তিনি স্বীকার করবেন যে, এই খরগোসের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে? করবেন না ....." এ ধরণের অস্বীকার করার পেছনে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল অহং আর গোয়ার্তুমি ছাড়া। নাইকন ক্যামেরার সৃষ্টিকর্তাকে না দেখেই যে নাস্তিক বিশ্বাস করলো, ক্যামেরার একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, সেই তিনিই আবার খরগোস দেখে তার সৃষ্টিকর্তা আছে তা স্বীকার করতে অপারগ। এখানে তার বক্তব্য হলো 'এসব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে।' কি আত্মপ্রতারণা!! "যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আনো, তারা বলে, 'নির্বোধগণ যেভাবে ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো?' সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু তা তারা জানে না।" [০২ : আয়াত ১৩]

তাই নাস্তিকতা এক ধরণের যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস-এর নাম। যেহেতু অদৃশ্য উৎস হতে উৎসারিত জীবনের উপর আপতিত বিপদ ও মৃত্যুকে নিবারণ করা যায় না; তাই অনেকটা অযৌক্তিকভাবেই এই বিশ্বাস করা যে, মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। সব শেষ। সৃষ্টিকর্তা তথা অদৃশ্য জগত বলে কিছু নেই। পার্থিব জীবনই সবকিছু। এটাই নাস্তিকতারূপ বিশ্বাসের ধরণ। Where there is smoke there is fire under and Where there is a life & death there is a super power behind.-এই সহজ সত্যকে নাস্তিকতায় বিশ্বাসীরা স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যেহেতু মৃত্যুকে নিবারণ করা যায় না, তাই মৃত্যুর পেছনে অনিবার্য শক্তিকে স্বীকার করার যৌক্তিকতাকে সহজ



www.pathagar.com

স্বীকৃতি দেয়ার পরিবর্তে মৃত্যুর পর আর কিছু নেই -এ বিশ্বাসকেই একজন নাস্তিক ধারণ করে। গোয়ার্তুমিই নাস্তিকতায় বিশ্বাসের একমাত্র সহায়ক। কারণ একজন নাস্তিক তার এই অস্বীকার করার পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ দেখাতে অক্ষম। জীবন ও মৃত্যুর পেছনে অদৃশ্য সেই অনিবার্য শক্তিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করাই নাস্তিকতায় বিশ্বাসীদের পরিচয়।

বেঁচে থাকার জন্য বাতাসের অনিবার্যতা, তা অদৃশ্য হলেও নাস্তিকরা তা বিশ্বাস করে। এভাবে আনন্দ ও পরম সুখের অনুভূতি অদৃশ্য হলেও নাস্তিকরা তা অবিশ্বাস করে না। অর্থাৎ জীবনের সুখ আর আনন্দ আহরণের প্রয়োজনে অদৃশ্য যা কিছু আছে সবকিছুতেই নাস্তিকদের রয়েছে পুরোপুরি আস্থা আর বিশ্বাস। কিন্তু বিপদ-আপদ আর মৃত্যুর পেছনে অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। অস্বীকৃতি জানায় জীবনের অস্তি ত্বের নেপথ্যের সেই অনিবার্য শক্তিকে। আর এরই ধারাবাহিকতায় অস্বীকৃতি জানায় মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের যৌক্তিক বিশ্বাসকে। তাই নাস্তিকতা এক ধরণের যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক এবং অন্ধ বিশ্বাসের নাম।

অন্যদিকে আস্তিকতায় বিশ্বাসীরা জীবন-মৃত্যুর পেছনে অনিবার্য শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে যৌক্তিকতার নিরিখে তথা Where there is smoke there is fire under and Where there is a life & death there is a super power behind.-এই শ্বাশত যৌক্তিকতাকে মেনে নিয়ে। শ্বাশত এই যৌক্তিকতায় আস্থাবান মানুষই আস্তিক হিসেবে বিবেচিত হন। আর আস্তিকতায় বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে অদৃশ্য সেই সুপার পাওয়ার-কে উপলব্ধির পার্থক্যের ধরণ অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মাচরণ।

আস্তিকতায় বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে এক বিশাল অংশেরই বিশ্বাস হলো, জীবন-মৃত্যুর পেছনে যে সুপার পাওয়ার রয়েছেন, প্রাকৃতিক সকল কিছুর সৃষ্টি ও লয়ের পেছনেও সেই একই শক্তি রয়েছেন। রোগ-শোক ও তা থেকে আরোগ্য লাভ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি হতে নিরাপত্তার জন্য, ফসলের আশানুরূপ ফলনের জন্য, পুত্র বা কন্যা লাভের জন্য, সকল ধরণের কল্যাণ বা অকল্যাণের নিয়ন্ত্রক এককভাবেই সেই একই শক্তি। সব ভাষা ও মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। পৃথিবীর লয় ও পুনরুত্থান তাঁরই একক ব্যবস্থাপনার অধীন। জাতি সমূহের উত্থান ও পতনও তাঁর নিয়তির অধীন।

জীবন ও মৃত্যুকে যিনি সৃষ্টি করার সামর্থ্য রাখেন, খুব স্বাভাবিক যে তিনি পুনরুজ্জীবন ঘটাতেও সক্ষম হবেন। সক্ষম হবেন নানা রোগ-শোক দিতে এবং আরোগ্য করতে। যিনি গোটা প্রাকৃতিক জগত এবং রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন; তিনি এ সৃষ্টি জগত ধ্বংস করতেও সক্ষম। সক্ষম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিতে; রাত-দিনের হ্রাস-বৃদ্ধি করতে। কিংবা রাত-দিনের ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রলয় ঘটাতে। যিনি জীবন-মৃত্যু দিতে সক্ষম তিনি অপ্রতিরোধ্য। সর্বশক্তিমান। এটাই যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য বা দেবতায় বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয় না। একজন উপাস্যই



www.pathagar.com

যথেষ্ট। কারণ শক্তির প্রকারভেদে উপাস্য বা দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি বস্তুত: মানুষের মানবীয় দুর্বলতাকে সেই সর্বশক্তিমানের উপর বা স্রষ্টার উপর আরোপ করার নামান্তর। এছাড়া মানবীয় বিবেচনাতেও অসংখ্য উপাস্য বা দেবতার উপস্থিতি গোটা সৃষ্টি জগতে ভারসাম্যহীনতার কারণ হবে। তাই বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় এবং যুক্তির বিচারে উপাস্য একজনই; এটাই যুক্তিগ্রাহ্য সত্য।

## বিশ্বাস ও বিভ্রান্তি

সে যাক্ বলছিলাম বিশ্বাসবিহীন কোনো মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কিন্তু সে বিশ্বাস সত্য নির্ভর কিনা সে নিয়েই যত কথা। যেমন ভুত ও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস। এটা শৈশব-কৈশোরের এক শিহরিত বিশ্বাস। জ্ঞান বিকাশের এক পর্যায়ে এই শিহরিত বিশ্বাসের পেছনে যখন আর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন সে বিশ্বাস হৃদয় হতে অপসৃত হয়ে যায়। তেমনি আরো একটি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেয়া যায় "ওলাদেবী" কেন্দ্রিক। "পরেশচন্দ্র মন্ডলের ভাষায়, 'ওলাদেবী অন্যতম লৌকিক দেবতা। দানবের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত ওলাদেবী ওলাউঠা, বিসূচিকা বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি ওলাইচী, ওলাবিবি, বিবিমা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। অতীতে প্রায়শই ওলাউঠা [কলেরা] রোগ মহামারী আকারে দেখা দিত এবং এতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটত। তাই এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পল্লীবাসীরা ওলাদেবীর পূজা করত। ওলাদেবী অসাম্প্রদায়িক দেবতা অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এর পূজা করা হতো। তবে দেবীর মূর্তি ও পূজা পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য ঘটত। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে এর আকৃতি হতো লক্ষী-সরস্বতীর মতো, গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ বর্ণ, হাত দুটি প্রসারিত, কখনও দন্ডায়মান, কখনও বা শিশুসন্তান ক্রোড়ে উপবিষ্টা, পরণে সাধারণত নীল শাড়ি এবং সর্বাঙ্গে নানা প্রকার অলংকার। এর কোনো বাহন নেই। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ওলাদেবীর আকৃতি ও পোষাকের ভিন্নতা ছিল। সেখানে এর মূর্তি অভিজাত ঘরের কোন সুন্দরী কিশোরীর মতো, পরনে পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না এবং গায়ে নানা প্রকার অলংকার। এছাড়া পায়ে থাকে নাগরা জুতা এবং কখনও কখনও মোজাও। এর এক হাতে থাকে আসান-, যা দিয়ে ভক্তের মুশকিল আসান করেন। ওলাদেবীর পূজা এককভাবেও হয় আবার ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনেবিবি ও আসানবিবি এই ছয়জনের সঙ্গে একত্রেও হয়। এদের একত্রে বলা হয় সাতবিবি। কারও কারও মতে এরা ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবীর লৌকিক রূপ। এদের একত্র পূজার প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়, কারণ মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি মৃণ্ময় ফলকে সাতটি নারীমূর্তি পাশাপাশি দন্ডায়মান দেখা যায়। সাতবিবির মধ্যে ওলাদেবীই প্রধান; ভক্তরা তাঁর উদ্দেশেই পূজা দেয়, তবে অন্যরাও সে পূজার ভাগ পায়। ওলাদেবীর পূজা হয় পল্লীর বৃক্ষতলে পর্ণকুটিরে। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে শনি অথবা মঙ্গলবারে পূজা হয় এবং পূজায়



www.pathagar.com

নিরামিষ নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজার পৌরহিত্য যে কোন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের লোকের, এমনকি নারীরও অধিকার আছে। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে একে ওলাবিবি বা বিবিমা নামে হাজোত দেওয়া হয়। হাড়ি বা ডোম-প্রধান অঞ্চলে তারাই পৌরহিত্য করে এবং সেখানে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকে। ওলাদেবীর পূজা তিন রকম। শনিবার ও মঙ্গলবার অনাড়ম্বরে যে পূজা হয় তা বারের পূজা নামে পরিচিতি। কারও মানত উপলক্ষ্যে সামান্য আড়ম্বরের সঙ্গে যেকোনো সময় এর পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া কোথাও কলেরা রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে সে এলাকার লোকজন গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে সমষ্টিগতভাবে এর পূজা দেয়। ওলাদেবীর পূজায় কোনো সাম্পদায়িকতা নেই। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে একই পুরোহিতের হাতে পূজার নৈবেদ্য ও হাজোত প্রদান করে। পুরোহিত নিম্নবর্ণের হিন্দু কিংবা মুসলমান হলেও কেউ তার নিকট থেকে নৈবদ্য গ্রহণে দ্বিধা করে না। ওলাদেবীর নৈবদ্য অতি সাধারণ সন্দেশ, বাতাসা ও পান-সুপারি; কোথাও কোথাও আতপ চাল ও পাটালিও দেওয়া হয়। এ পূজায় বিশেষ কোন মন্ত্র নেই; তবে কোন কোন হিন্দু পুরোহিত পূজার সময় "এসো মা ওলাদেবী, বেহুল রাঢ়ির ঝি" এরূপ আবেদন করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লীতে এক সময় খুব গুরুত্বের সঙ্গে ওলাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজ থেকে এসব আচার এক প্রকার উঠে গেছে বলা যায়।' [পরেশচন্দ্র মণ্ডল, বাংলাপিডিয়া-০১]" অর্থাৎ পরীক্ষিত জ্ঞান ও সত্যের সংস্পর্শে ওলাদেবী ভিত্তিক বিশ্বাস ও চেতনা এবং তার সাথে আরো যারা পূজার ভাগ পেত তাদের সবার পূজার আচার-এর অর্ন্তধান ঘটল।

বিভিন্ন দেবতা ও অপদেবতার ওপর বিশ্বাস মূলত: আস্তিকতার প্রকাশ হলেও রোগ-শোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি হতে নিরাপত্তার জন্য, ফসলের আশানুরূপ ফলনের জন্য, দু:খ দূর করার জন্য ইত্যাদি নানা সমস্যার জন্য নানা দেবতার ধারণা ও বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে আস্তিকতার বিশ্বাসে এক ধরণের অযৌক্তিক বিকৃতি। অদৃশ্য সেই সুপার পাওয়ার-এর পরিচয়টি যে দুর্ভেদ্য আড়ালে ঢাকা তাতে সকল মানুষের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের এই বিভ্রান্তি বা বিকৃতি এক স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ অদৃশ্য সেই সুপার পাওয়ার পরাক্রমশালী শক্তি নিজে কারও কাছে তাঁর পরিচয় উম্মোচন না করলে কোনো মানুষের পক্ষে তাঁর পরিচয় পাওয়া দু:সাধ্য। কেবল কিছু অনুমান ছাড়া। আর এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই পৃথিবীতে আস্তিকতার বিকাশ হওয়ায় তা বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল না। আর তাই তিনি তাঁর মনোনীত মানুষ বা প্রেরিত পুরুষদের [যারা মনোনীত মানুষ হিসেবে সুস্পষ্ট নিদর্শনেরও অধিকারী ছিলেন] দিয়ে মানুষকে আস্তিকতার বিকৃতি বা বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রয়াস পেয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ হলেন 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]'।



www.pathagar.com

## সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ ও সত্য নির্ভর বিশ্বাস

আহার্য, পানীয়, রোগ ও আরোগ্য লাভ, জীবন-মৃত্যু, রাত-দিন, সূর্য ও চাঁদ সবকিছু এক সুপার পাওয়ার-এরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সত্যানুসন্ধীৎসু মানুষগুলো যুক্তিগ্রাহ্য ও সত্যাশ্রয়ী বিশ্বাসকেই ধারণ করে হৃদয়ে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণে বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাসের ধরণ একমুখী নয়, বহুমুখী বা মিশ্র। তেমনি এক মিশ্র বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক। তিনি বলেন, "উপরে আল্লাহর পর আমার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি শেখ মুজিব। আমি জীবনে একটি মাত্র বই লিখেছি। সেটি 'মুজিব ভাই'। আমাকে যখন মুজিব বিদ্বেষী বলা হয় এর চেয়ে জঘন্য গালি আমার কাছে আর হতে পারে না। আমাকে বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, মানসিক ভারসাম্যহীন। মাহবুব-উল আলম হানিফ কিভাবে এ কথা বললেন তা বুঝতে পারছি না।" [বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা-০৩।] বিশ্বাস মাত্রই মানুষের রয়েছে একটি পবিত্র অনুভূতি। চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন ওলাদেবীর পূজার আচার-এর অর্ন্তধান ঘটিয়েছে, তেমনি অবিমিশ্র ও যৌক্তিক জ্ঞানের প্রসার মানুষের অবৈজ্ঞানিক, অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে আলোকিত করে মানুষের জীবনকে সত্যের আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর পর যে তাঁর প্রেরিত পুরুষ ও মনোনীত মানুষ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মর্যাদা, সে কথা প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক জনাব এ বি এম মুসা-র কথায় প্রতিফলিত হয়নি। তিনি যার কথা বলেছেন; অর্থাৎ শেখ মুজিব নিজেও কিন্তু আল্লাহর পর তার মর্যাদার কথা ঘোষণা করেননি। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] শুধু শেখ মুজিব নন, চলমান বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আদর্শ মানুষ ও প্রেরিত রাসূল।

## সকল মানুষের জন্য মনোনীত রাসূল

আল্লাহ বলেন, বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে। এবং তোমার তাঁর অনুসরণ করো যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও। [০৭ : আয়াত ১৫৮]

## সর্বশেষ রাসূল

অদৃশ্য সেই পরাক্রমশালী অনিবার্য শক্তি সুপার পাওয়ার আল্লাহতায়ালা আরো বলেন, মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। [৩৩ : আয়াত ৪০]

## একজন সর্তককারী

পরাক্রমশালী সেই সত্তা সকল মনোনীত রাসূলকেই মানবজাতির জন্য করেছিলেন একেক জন সর্তককারী। আল্লাহ বলেন, "বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং



www.pathagar.com

কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী, যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল। বল, এতো এক মহাসংবাদ, যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।" [৩৮ : আয়াত ৬৫-৬৮]

## রাসূলকে অমান্য করার কুফল

দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য প্রেরিত সেই রাসূলকে যিনি বা যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে পরাক্রমশালী সে অনিবার্য শক্তি সুপার পাওয়ার আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।" [৩৩ : আয়াত ৩৬]

"আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ" যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির'আওনের নিকট, কিন্তু ফির'আওন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।" [৭৩ : আয়াত ১৫-১৬]

## পৃথিবীর কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি

পৃথিবীর কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি; এর পেছনে রয়েছে একজন কুশলী সৃষ্টিকর্তা। আর তাঁর কোনো সৃষ্টিই অনর্থক নয়। নিজে নিজে সৃষ্টি হওয়ার ধারণা একদিকে অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক এবং অন্যদিকে এ ধারণা গোটা সৃষ্টিকে অনর্থক প্রতীয়মান করে। যা মোটেই সত্য নয়। কারণ গোটা সৃষ্টি জগত থেকে মানুষ প্রতিনিয়তই কল্যাণ আহরণ করছে; উপকৃত হচ্ছে।

আল্লাহ বলেন, " আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কাফির, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করবো? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করবো? এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। [৩৮ : আয়াত ২৭-২৯]

আল্লাহ আরো বলেন, "তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন..." [০২ : আয়াত ২৯]

## সত্যাশ্রয়ী বিশ্বাস

০১. পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই মাস বারটি। এ সত্য শাশ্বত। কোনো নাস্তিকের এটা বিশ্বাস করা না করা উভয়ই সমান। মাস তেরটি করা কখনই সম্ভব নয়। কুরআনের এই শাশ্বত সত্য উক্তি মূলত একদিকে কুরআনের সত্যতা অন্যদিকে মনোনীত রাসূলের সত্যতার নিদর্শন এবং পরাক্রমশালী আল্লাহর অপরিমেয় ক্ষমতার বহি:প্রকাশ।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আকাশমলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি।" [সূরা তাওবা; ০৯ : আয়াত ৩৬ ]



www.pathagar.com

০২. রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহরই সৃষ্টি। প্রত্যেকের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথ। কোনো মানুষ কি দাবী করেছে যে সে রাত্রি/দিবস কিংবা সূর্য/চন্দ্র সৃষ্টি করেছে? নাস্তিকদের বিশ্বাস যে রাত্রি ও দিবস এবং চন্দ্র ও সূর্য নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আর মেলে না যে, কেন শত শত কোটি বছর পরও নিজে নিজে আরও একটি সূর্য কিংবা চাঁদ সৃষ্টি হয় না? কিংবা রাত-দিন মিলে ৩০ ঘন্টা হয় না?

আল্লাহ বলেন, "তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই। এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নহে।" [সূরা ফাতির; ৩৫ : আয়াত ১৩]

"তাদের জন্য এক নির্দশন রাত্রি, তা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে তা শুস্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" [সূরা ইয়াসীন; ৩৬ : আয়াত ৩৭-৪০]

০৩. পুনরুজ্জীবন মৃত্যুর মতো এক অনিবার্য সত্য। বৃষ্টির স্পর্শে মৃত জমিনকে যেভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় তেমনিভাবেই ঘটবে মানুষের পুনরুজ্জীবন। অথচ নাস্তিকরা পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করে থাকে। কুরআনে তাদের বক্তব্যটি আল্লাহ এভাবে তুলে ধরলেন, "[কিসের আবার পুনরুত্থান?] দুনিয়ার জীবনই তো হচ্ছে আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা [এখানে] মরবো [এখানেই] বাঁচবো, আমাদের কখনোই আবার পুনরুত্থিত করা হবে না।" [সূরা মু'মিনুন; ২৩ : আয়াত ৩৭]

নাস্তিকদের এ ধরণের বক্তব্যের জবাবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, "আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অত:পর আমি তা নির্জীব ভূখরের দিকে পরিচালিত করি, অত:পর আমি তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।" [সূরা ফাতির; ৩৫ : আয়াত ০৯]

"প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো; আর আমি তোমাদের চেয়ে তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। ..... তবে তোমরা তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!" [সূরা ওয়াকিয়া; ৫৬ : আয়াত ৮৩-৮৭]

"আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নহি"-[সূরা ওয়াকিয়া; ৫৬ : আয়াত ৬০]

মানবজাতির নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কায়মনোবাক্যে সত্যের স্বীকৃতি দিলেন এভাবে, "তিনি আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়; এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই



www.pathagar.com

আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অত:পর পুনর্জীবিত করবেন।" [সূরা শু'আরা; ২৬ : আয়াত ৭৯-৮১]

০৪. মানুষের সৃষ্টি মৃত্তিকা হতে; জোড়া জোড়া । মানুষ সৃষ্টির সকল উপাদান তাঁর তৈরী। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করলেন, তিনি কি পুর্নবার তা সৃষ্টি করতে অক্ষম? তাঁর সম্পর্কে এ ধরণের ভাবনা কি নির্বোধের ভাবনা নয়?

আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে; অত:পর শুক্রবিন্দু হতে, অত:পর তোমাদেরকে করেছেন যুগল। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে সংরক্ষিত ফলকে। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।" [সূরা ফাতির; ৩৫ : আয়াত ১১]

"তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" [সূরা ওয়াকিয়া; ৫৬ : আয়াত ৫৮-৫৯]

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?' বল 'তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সূরা ইয়াসীন; ৩৬ : আয়াত ৭৭-৭৯]

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ ও মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।" [সূরা ইয়াসীন; ৩৬ : আয়াত ৩৬]

০৫. পানির অপর নাম জীবন। মানুষতো নয়ই; কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদও বেচে থাকতে পারবে না পানি ছাড়া। সুপেয় পানি মানুষের প্রতি মহাপরাক্রমশালী সেই সুপার পাওয়ার আল্লাহর এক নিবিড় অনুগ্রহ। মানব জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে, যদি সুপেয় পানিসমুহ লবণাক্ত হয়ে পড়ে। পানির উপর এই নিয়ন্ত্রণ [সুপেয় বা লবণাক্ত করার ক্ষমতা] পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রীয় সুপার পাওয়ারেরই নেই। পৃথিবীর তাবৎ নাস্তিকরা মিলে কি সুপেয় পানিকে লবণাক্ত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন?

আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো? তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আনো, না কি আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" [সূরা ওয়াকিয়া; ৫৬ : আয়াত ৬৮-৭০]

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?" [সূরা মুল্ক; ৬৭ : আয়াত ৩০]

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।" [সূরা ওয়াকিয়া; ৫৬ : আয়াত ৬৩-৬৫]



www.pathagar.com

"সমুদ্র দুটি একরূপ নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতেই তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং আহরণ কর অলংকার যা তোমরা পরিধান কর......। [সূরা ফাতির; ৩৫ : আয়াত ১২]

এসব নিখুঁত সত্যের মুখোমুখি আমরা প্রতিনিয়তই হচ্ছি। এসব সত্য আমাদের জীবনে এতটাই বাস্তব এবং সহজ যে, তা বোধশক্তিসম্পন্ন কোনো মানুষকে চিহ্নিত করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর যিনি এই সহজ সত্যগুলোকে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন; তিনিই যে এসব সত্যের একমাত্র রূপকার তা উপলব্ধি করা কি খুবই কঠিন?

## উপসংহার

সমগ্র বিশ্বের সমাজ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রের সত্যসমূহের রূপকার মহাপরাক্রমশালী সেই অদৃশ্য শক্তি আল্লাহর মনোনীত রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]। তিনিই কি সর্বোচ্চ প্রাধিকারযোগ্য ও মাননীয় নন? তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণই কি অগ্রগণ্য নয়? তাহলে কিভাবে আমরা আল্লাহর মনোনীত সে রাসূলকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি পুজায় নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখি!!! যদিও রাসূল [সা]-এর সম্মান ও মর্যাদা কারও স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয়। যিনি গোটা মানবজাতির মালিক, জগতসমূহের মালিক, আসমান-জমিনের মালিক, তিনিই এ সম্মান তাঁকে দিয়েছেন। কোনো মানুষ দেয়নি। বিষয়টি এমন নয় যে লক্ষ লক্ষ লোকের কোনো উদ্যানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তাঁকে রাসূল হিসেবে ভূষিত করা হয়েছে। আর কারো তা ভালো লাগলো না বলে সে তাঁকে রাসূল হিসেবে অস্বীকার করে বসলো। বিষয়টি উদ্যান বা সমাবেশের বিষয় নয়। মানুষের মালিক আল্লাহর মনোনীত বিষয়। আল্লাহ বলছেন,"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" [সূরা ফাত্হ; ৪৮ ঃ ২৯]

রাসূল [সা]-এর সম্মান, আভিজাত্য, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মর্যাদা- এর সব কিছুই আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত। তিনি তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'প্রশংসিত স্থানে' [১৭ : ৭৯]। পৃথিবীর কেউ এসব কেড়ে নিতে পারবে না। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আল্লাহর রাসূলকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হেয় করার চেষ্টা করবে, তার মর্যাদার স্থলে অন্য কাউকে স্থান দিবে, সে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান মূলত: নিজেকে বা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবে। আর আল্লাহর প্রতিপক্ষদের নিন্দিত হওয়া এবং লাঞ্ছনাই হলো স্বাভাবিক পরিণতি। যারা নবী ও রাসূলদের বলেছিলো, "সে তো এক পাগল [সূরা কালাম : ৫১]", "এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী [সূরা মুমিন : ২৪]" ইতিহাসে তাদের পরিণতি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। "আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।" [সূরা ইউসুফ : আয়াত ২১]



www.pathagar.com

# কালো গেলাফ ও সবুজ গম্বুজের টানে

## মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

[১৯৯৬ সালের ২৫ আগস্ট থেকে তিন সপ্তাহ তায়েফ-আলবাহা-মক্কা-মদিনা-জেদ্দা সফর করি। এরপর তিন দিন রিয়াদে থেকে ফের সফরের প্রস্তুতি নেই।

১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকালে সুমাইচির সাফারা জেলে যাই। গালিব হাসান এই জেলখানার পাঁচ নম্বর সেলের বন্দী। রিয়াদে এক ক্যাসেট দোকানের কর্মী ছিলেন গালিব। কাজের ফাঁকে গল্প-কবিতা লেখেন। নাটকে অভিনয় করেন। সাহিত্য আড্ডায় অংশ নেন। ঢাকার এক দৈনিক পত্রিকার রিয়াদ প্রতিনিধি হয়ে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। কিছুদিন বৈধ কাগজপত্র ছিল না। কাজ করেছেন পুলিশের চোখ এড়িয়ে। এখন দেশে ফেরা দরকার। তাই পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছেন। পুলিশ তাকে জেল থেকে নিয়ে ঢাকার ফ্লাইটে তুলে দেবে।

সাফারা জেলের কয়েদিরা চোর-ডাকাত-খুনি নয়। ওই সব অপরাধীর জন্য মালাজ ও আল-হায়ারে জেলখানা আছে। মালাজ জেলখানা বিচারাধীন কয়েদির জন্য। আর আল হায়ারে রাখা হয় দন্ডিত কয়েদি। এছাড়া প্রতি থানায় আছে কয়েদখানা। আর গালিবদের মতো কাগজপত্রহীন অভিবাসীর জন্য সাফারা জেলখানা।

মদিনা যাওয়ার আগে গালিবকে দেখে যেতে চাই। জেলখানার বাইরে পুলিশের অফিস। এখান থেকে অনুমতি নিয়ে জেল-গরাদের ফাঁক দিয়ে বন্দীর সাথে কথা হয়। সাফারা জেলের কয়েদিরা বেশীর ভাগই পাকিস্তান, ভারত কিংবা বাংলাদেশের। তাদের সাথি-বন্ধুরা দেখা করার জন্য জেলখানার বাইরে নীরবে অপেক্ষা করেন। দুবলা-পাতলা দু'এক জন সিপাই তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁকিয়ে বেড়ায়। 'এরজা'! 'এতলা'! 'বার্‌রা'! আজনবি দর্শনার্থীরা বাতাসের ইশারায় পানির শ্যাওলার মতো ভাসেন।

কিছুক্ষণ এসব দৃশ্য দেখি। দর্শনার্থীর ভিড় বাড়ে। ভিড় দেখে পুলিশের মাথা বিগড়ে যায়। 'মা-ফি জিয়ারা আল-ইয়াওম! খালাস!' আজ দেখা-সাক্ষাত হবে না। ব্যস।

এদের কথার ওপর কথা চলে না। সুমাইচির সাফারা জেলখানা থেকে ধীরা হয়ে বাথা যাই। সাপটকো টারমিনাল থেকে মদিনার টিকেট কিনি।]



www.pathagar.com

## চল্ মদিনার পথে

রাত সাড়ে নয়টায় মদিনার শেষ বাস। বাসে ভিড় কম। পছন্দমতো একটি আসনে বসি। পাশের মিসরী যাত্রী আমাকে 'হালা' বলেন। আমি বলি থ্যাঙ্কিউ!

এক সৌদি তরুণ টিকেট চেক করে। বাস ছাড়ার পর সে কখনো এ-সিটে কখনো ও-সিটে গিয়ে বসে। সাপটকোর বাসে ধূমপান 'মামনূ'। কিন্তু সে সিগারেট ধরায়। যাত্রীদের মুখের ওপর ধূয়া ছাড়ে। এক সময় সে আমার কাছে এসে বলে : 'আমি মিসরী। আমাকে মিসরী 'সাদিকের' পাশে বসতে দাও। তুমি গিয়ে অন্য সিটে বস!'

তরুণটির আচরণে সবাই বিরক্ত। বাসের ফিলিপিনো চালক দু'এক বার চেষ্টা করেছেন তাকে থামাতে। কিন্তু আজনবি চালককে এ সৌদি বালক পাত্তা দেয়নি! আমি তাকে বলি, 'আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ! আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

সে বলে, 'মা-ফি কালাম ইংরেজি! ইংরেজি বুঝি না!'

সামনের আসনের এক যুবক হঠাৎ গর্জে ওঠেন : 'আন্‌তা মা-ফি ইনসান? তুমি ইনসান নও?'

এ বাজখাই ধমকে ছেলেটি সুরসুর করে একেবারে পিছনের খালি আসনে গিয়ে ধপাস। এরপর সারা পথ সে একদম খামুশ।

মাঝরাতে বাস থামে বুরাইদায়। স্বল্প বিরতির সরাইখানা। মেহমানদের সাড়া পেয়ে জেগে ওঠে। বাড়িতে যেন নতুন জামাই এসেছে।

ভোররাতে মেহমান হই আরেক সরাইখানায়। তাকিয়া হেলান দিয়ে চায়ের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে নিজের সাথে কথা বলি। শৈশবের-কৈশোরের-তারুণ্যের স্মৃতিরা ডানা ঝাপটায়। যেন আমি অনন্তকালের এক মুসাফির। সরাইখানার গল্প কাহিনীর মতো কত শত বছরের দীর্ঘ রাতজাগা এক মুসাফিরি জিন্দেগি। নিজেকে অচেনা মনে হয়। এই আমি কি সেই আমি! রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরযাদী।

এক যুবক আমার পাশে এসে বসেন। তিনিই বাসে সৌদি বালককে ধমকেছেন। এই সাহসী পুরুষকে চায়ের দাওয়াত দেই। এক-দু' কথায় আলাপ জমে। মোহাম্মদ ইকবালের বাড়ি পাকিস্তান। তার কফিলের বাড়ি রিয়াদ। কফিলের কাছ থেকে প্রতিবার তিন মাসের ওরাকা নিয়ে তিনি 'ফ্রি-ভিসা'য় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন মদিনায়। এবারও নতুন 'ওরাকা' নিয়ে রিয়াদ থেকে ফিরছেন।

পথের ধারে এক মসজিদে ফজর আদায় করি। পাশে বাসের ফিলিপিনো চালক। নামাজ শেষে তার সাথে কথা বলি। নাম নূর হাশমত। বাড়ি মিন্দানাও। গত চার বছর এ পথে যাতায়াত করেন। তৃপ্তির সাথে বলেন, মুসলমান চালক ছাড়া কেউ মক্কা-মদিনায় ঢুকতে পারে না।



www.pathagar.com

**মদিনায় স্বাগতম**

বারো ঘন্টা সফর শেষে মসজিদে নববীর কাছে মদিনার টারমিনালে বাস নোঙর করে। কলকেবিন থেকে ডাক্তার সাইফুলকে ফোন করি। এরপর পায়ের কাছে ব্যাগ রেখে তার জন্য অপেক্ষায় থাকি।

হঠাৎ কে একজন আমার হাতে ক'টি খেজুর গুঁজে দেন। আমি হকচকিয়ে তাকে দেখি। নবীর মদিনার এক মুসাফিরকে মেহমানদারি করার আনন্দ তার চোখে-মুখে। আমি সংকোচের সাথে ছোট্ট করে বলি, শুকরান! জাযাকুমুল্লাহ। ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনাকে এর বদলা দিন!

পাশে দাঁড়ানো ষোল চাকার ইয়া-বড় ট্রাকে উঠতে উঠতে হাত নেড়ে সালাম দেন তিনি। আমিও হাত নাড়ি। অদৃশ্য হন তিনি। সুদান বা ইরিত্রিয়ার এ অচেনা ট্রাক চালকের দেয়া ক'টি কাঁচাপাকা সোনা-রং খেজুর আমার হাতে। বিসমিল্লাহ বলে একটি খেজুর মুখে দেই। এ মেহমানদারির বিনিময় কি এ দুনিয়ায় কখনো সম্ভব?

ডাক্তার সাইফুলের বাসার পথে মদিনার কাঁচা বাজারে যাই। এটা-সেটা কেনার ফাঁকে দোকানদারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন তিনি। সবার সাথে মিশে বহুদিন মদিনায় আছেন সাইফুল ভাই।

**হাররা গারবিয়া ও হাররা শারকিয়া**

বিকালে আমাকে আবদুল মান্নান ভাইয়ের হাওলা করে ডাক্তার সাইফুল চলে যান হাসপাতালে। আবদুল মান্নান ভাইর সাথে আলাপ জমে। একাধারে হাফিজ, কারী ও মওলানা। গুণী মানুষ তিনি। মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেসানস বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেছেন। তারপর নবীর শহরেই আছেন।

তার সাথে পথে নামি। যেতে যেতে মদিনার গল্প শুনি।

নবীর শহরের দুই অংশ। একটি হাররা গারবিয়া। পশ্চিম মহল্লা। অপরটি হাররা শারকিয়া। পূব মহল্লা। আমরা গারবিয়া থেকে চলছি কোবার পথে। পূব ও পশ্চিম জনপদের বাইরে কোবা আলাদা পল্লী।

রাসূল সা. মদিনায় হিযরত করেন ৬৬২ ঈসায়ী সনে। সেই থেকে হিজরী সন গণনার শুরু।

রাসূল সা.কে মদিনার মুহাজির ও আনসারগণ প্রথম অভ্যর্থনা জানান কোবায়। দিনটি ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর। আট রবিউল আউয়াল। প্রথম হিজরি।

মহানবী সা. কোবায় ক'দিন থাকেন। এখানে তিনি একটি মসজিদ কায়েম করেন। সেই কোবা মসজিদ মুসলমানদের এক গুরুত্বপূর্ণ জিয়ারতগাহ্।

কোবা মসজিদের চার পাশে ঘন সবুজ-সতেজ মায়ামাখা আনন্দিত এক প্রশান্তির পরিবেশ। আমরা মসজিদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে রাসূল সা.-এর হিজরতের কথা স্মরণ করি।



www.pathagar.com

নবুওয়তের প্রথম তেরো বছর মক্কায় কঠিন সময়। এ দীর্ঘ সময়ে মাত্র দু'শ থেকে সোয়া দু'শ লোক রাসূল সা.-এর দাওয়াত কবুল করেন। মুসলিম উম্মার তারা প্রথম দল। তারা অগ্রপথিক। তাদের মাঝে কিছু সম্ভ্রান্ত কুরেশ ছিলেন। একটি অংশ ছিলেন আর্থিক প্রতিপত্তিহীন। তাদের মাঝে কিছু বঞ্চিত লাঞ্ছিত ক্রীতদাস। একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। প্রায় সবাই তরুণ-যুবা।

প্রথম তিন বছর গোপন দাওয়াত পর্ব। সাফা পর্বতের কাছে তরুণ নও মুসলিম আরকামের ঘর। ঘরটিকে নব দীক্ষিতদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বানিয়ে মহানবী সা. নতুন জাতি গঠনের কাজ করেন। আবু বকর-উসমান-আলী রা.সহ প্রথম পর্যায়ের সাহাবিগণ দার-উল-আরকাম নামক এ বিদ্যাপীঠের ছাত্র। আর হযরত উমর [রা] মহানবীকে হত্যা করতে এসে এখানে ইসলাম কবুল করেন।

নবীর দাওয়াতে প্রথম তিন বছরে কিছু লোক তৈরি হয়। এরপর প্রকাশ্য দাওয়াত। এ সময় বেড়ে যায় জুলুম-নির্যাতন, নিন্দা-অপবাদ। আম্মার-সুমাইয়া-বেলাল কিংবা আমের ইবনে ফুহাইরা আর খাব্বাব ইবনে আরতু। এমনি অনেকে জুলুম নির্যাতনের শিকার হন। জুলুম বাড়ার সাথে ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনও বাড়ে। কঠিন বাধা ঠেলে দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

একদল নও মুসলিম মক্কা থেকে হিযরত করেন লোহিত সাগরের ওপারে। সেখানে হাবশা তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। বাইরের দুনিয়ায় দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের জন্য হাবশা তখন চমৎকার জায়গা। সেখানে হিযরতকারীদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান, দলনেতা উসমান ইবনে মাযউন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবাইর ইবনে আওয়াম ও আবু হুযাইফা সহ বেশ ক'জন ছিলেন মক্কার প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান।

সম্রাট নাজ্জাসীর দেয়া পাল তোলা জাহাজ নিয়ে হাবসা থেকে আবু ওয়াক্কাস ছোটেন চীনের পথে। তিনি হযরত আমেনার চাচাতো ভাই। তার সাথে আরো ক'জন সাহাবি। তাদের যাত্রাপথে দক্ষিণ এশিয়ার মালাবার আর চট্টগ্রাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

নবুওয়াতের ছয় বছরের সময় হযরত হামজা ও হযরত ওমর [রা] ইসলাম কবুল করেন। পরের বছর মুসলমানদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করে মুশরিকরা। দশম বছর পর্যন্ত রাসূল সা. ও তার সাথিগণ শিয়াবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ জীবন কাটান।

নবুয়তের দশম বছর রোযার মাসে রাসূল সা. এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদিজা রা. ইনতিকাল করেন। এ দুঃখের বছরই মক্কার বাইরে দাওয়াত পৌছাতে নবীজী তায়েফ সফর করেন। তায়েফবাসী নবীজীকে কষ্ট দেয়। তবে এর পরপরই তায়েফের আয়াদ ইবনে মুয়াজ ইসলাম কবুল করেন। এ বছর মক্কার বাইরের নানা জায়গা থেকে হজে আসা লোকদের কাছে দাওয়াত প্রচার করেন মহানবী [সা]।



www.pathagar.com

এরপর মিরাজের ঘটনা। বড় কাজের জন্য মহা প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতির পর হিযরত।

নবুয়তের এগারোতম বছরে রাসূল সা. বৈঠক করেন মদিনার আওস ও খাজরাজ কবিলার সাত ব্যক্তির সাথে। মিনার কাছে আকাবার এ বৈঠকের পরই নবী সা. মদিনায় পাঠান মুসায়েব ইবনে উমায়েরকে। মুসায়েব মদিনায় ইসলামের দূত। তার চেষ্টায় সেখানে দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। নবুওয়তের বারোতম বছরে হজের সময় আউস ও খাজরাজ কওমের সত্তুর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা মক্কায় এসে আকাবার বৈঠকে বসেন রাসূল সা.-এর সাথে। মহানবীকে মদিনায় অভ্যর্থনা জানানোর প্রাথমিক প্রস্তুতি এভাবে সম্পন্ন হয়।

অন্যদিকে মক্কার মুশরেক নেতারা এ সময় দার-উন-নাদওয়ায় বৈঠক করে মুহাম্মদ সা. কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তখন আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে মহানবী [সা] হিজরতের জন্য তৈরি হন। মক্কার 'আল আমীন' বা বিশ্বস্ততম এই মহামানবের কাছে মক্কার কত লোকের আমানত। রাসূল সা. সে সব গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দিতে হযরত আলীকে মক্কায় রেখে আবু বকরকে সাথে নিয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে রওনা হন এক নতুন ইতিহাসের অভিমুখে।

**তালায়াল বাদরু আলাইনা...**

মক্কার উত্তরে মদিনা। কিন্তু মহানবী চলেন দক্ষিণে। সাওর পর্বতে কাটান তিনদিন। এরপর মক্কার নিম্নভূমি বা তিহামা ও লোহিত সাগরের উপকূল বেয়ে সামনে চলেন মদিনার দিকে।

মুহাজির ও আনসারগণ রাসূল সা. কে অভ্যর্থনা জানাতে ইয়াসরিব থেকে কোবায় জড়ো হন। মদিনার ছেলেমেয়েরা দফ ও খঞ্জনি বাজিয়ে মুহাম্মদ সা.কে স্বাগত জানায়। 'বাদা উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে আসা উজ্জ্বল চাঁদ' দিগন্তে উদিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দে উদ্বেল মদিনার শিশুদল গায় ঃ

'তালাআল বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল ওয়াদা।
ওয়াজাবাশ শুক্‌রু আলাইনা
মা দায়া লিল্লাহি দা।'
দেখ, বাদা উপত্যকার ওপর দিয়ে
উড়ে এসেছে চতুর্দশীর উজ্জ্বল চাঁদ!
আমাদের জন্য তাই ওয়াজিব হয়েছে
আল্লাহর শোকর গুজারি করা।



www.pathagar.com

কোবা মসজিদের ব্যালকনি থেকে সবুজ খেজুর-বীথির ওপর দিয়ে আমরা দূরে দেখি ধবধবে শাদা মসজিদ-ই-জুমা। রাসূল সা. কোবা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে বনু সালেম-এ ওয়াক্ত হয় জুমার নামাজের। রাসূল সা. সাথিদের নিয়ে এখানে নামাজ আদায় করেন। জুমার-এ জামাতে একশ মুসল্লি হাযির ছিলেন। সে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক মসজিদ-ই-বনু সালেম। প্রথম জুমা মসজিদ।

রাসূল সা.কে মদিনার সবাই মেহমানরূপে পেতে চান। স্বাগতিক গোত্রপতিগণ কাতারবন্দী হয়ে অপেক্ষা করেন। রাসূল সা. বলেন ঃ 'উটনীকে চলতে দাও। এ উট কোথায় থামবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত।'

সকলের কৌতুহল ও প্রতীক্ষা শেষে উটনী থামে আইয়ুব আনসারীর বাড়ীর সামনে। রাসূল সা. সে বাড়িতে সাত মাস থাকেন। এ সময়ের মধ্যে মসজিদে নববী ও রাসূল সা.-এর হুজরাখানা নির্মাণ শেষ হয়। সেই থেকে আইয়ুব আনসারী ছিলেন নবীজির ঘনিষ্ট ও উত্তম প্রতিবেশী।

মদিনা নগরীর মাঝখানে মসজিদে নববী। সে মসজিদের সবুজ গম্বুজের নিচে নবীজীর সমাধি মুবারক। মসজিদ-ই-কোবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সামনে দেখি। জুমা মসজিদের মাথার ওপর দিয়ে সবকিছু ছাপিয়ে জ্বলজ্বল করছে মসজিদে নববীর সুউচ্চ মিনার। আর সে মিনারের ফাঁক দিয়ে উত্তর দিগন্তে শহীদের রক্ত জমাট ওহুদের ধুসর কালো বিষণ্ন শৈলশ্রেণী।

রাসূল সা. নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুক অভিযানে যান। তখন মদিনার মুনাফিকরা মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির মতলবে মসজিদে নববীর 'বিকল্প' একটি প্রার্থনার ঘর তৈরি করে। এ ঘরের নাম হয় মসজিদ-ই-জিরার। রাসূল সা. তাবুক থেকে ফিরে বিভেদের এ ঘরটি মাটিতে মিশিয়ে দেন। বনু সালেম-এর জুমা মসজিদের অদূরে 'জিরার'-এর সে জায়গা ইশারায় দেখান আবদুল মান্নান ভাই।

কোবা মসজিদ থেকে এবারে আমরা শহরের বাইরের পথ বেয়ে রওনা হই ওহুদের দিকে। পথে পড়ে আম্বুরিয়া। হারাম শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিমে এখানে এক পুরনো রেল স্টেশনের নিশানা। ওসমানিয় শাসনামলে তুরস্ক থেকে তাবুক ও আল উলা হয়ে মদিনা ছুঁয়ে একদিকে রিয়াদ ও দাম্মাম আর অন্যদিকে জেদ্দা পর্যন্ত এ রেলপথ বিস্তৃত ছিল।

মদিনা থেকে চারশ কি.মি. দূরে আল উলা। তার প্রায় পঁচিশ কি.মি. দূরে মাদায়েন সালেহ। সামুদ জাতির সেই প্রাচীন কেন্দ্রভূমিতে তুর্কি আমলের একটি রেলস্টেশন আজো দর্শনীয় বস্তু। রিয়াদ থেকে আল আহসা পর্যন্ত রেলপথ এখন সীমিতভাবে চালু আছে। আর মক্কা ও মদিনার মাঝে রেল যোগাযোগের বিষয় এখন নতুন করে ভাবা হচ্ছে।

**ওহোদে মিশেছে পথ**

আমরা পথ চলি ওহুদ পর্বতমালার কিনার ঘেঁষে। এ পর্বতমালার শুরু বীরে ওসমান বা আল জুরুফ থেকে। মদিনার গোটা উত্তর দিক জুড়ে মাইলের পর মাইল ওহুদ



www.pathagar.com

পর্বতশ্রেণী। পর্বতমালার দক্ষিণ পাদদেশে প্রাচীন ইয়াসরিব গ্রাম। এখন মদিনাতুন্নবী। নবীর শহর। মুসলিম উম্মাহর রুহানি রাজধানী।

ওহোদ পর্বতমালার এক পাশে জঙ্গে আহজাব বা পরিখার যুদ্ধক্ষেত্র।

বদর ও ওহুদের পর মক্কার দশ হাজার মুশরিক হামলা চালায় মদিনায়। মদিনার তিন দিকে পাহাড়-পর্বত আর খেজুর বাগান। উত্তরে খোলা। উত্তর দিকের সুরক্ষার জন্য হযরত সালমান ফার্সীর পরামর্শে পারস্য কায়দায় তিন কি.মি. দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়। জাতীয় প্রতিরক্ষার এই কঠিন খননকাজে নবীজী নিজে শরীক হন। এখানে খনন চালানোর সময় রাসূল সা. রোম বিজয়ের ইশারা লাভ করেন। সে ঐতিহাসিক পরিখার চিহ্ন এখন প্রায় মুছে গেছে। কিন্তু রাসূল সা. ও তার সাথিদের কঠোর পরিশ্রম আর অনন্য ত্যাগের স্মৃতি চির অম্লান।

খন্দক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন দল অবস্থান নিয়েছিলেন নির্ধারিত জায়গায়। সে সব দলের অবস্থানের স্মৃতিরূপে খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে আজো শোভা পাচ্ছে সাতটি ছোট মসজিদ। আবু বকর, আলী, সালমান ফার্সী। তাদের নামে সাতটি ছোট মসজিদ জঙ্গে আহযাবের স্মৃতি ধারণ করছে। এ এলাকা এখন সাত মসজিদের নামেও পরিচিত।

সবচে উঁচু জায়গায় সালমান ফার্সীর মসজিদ। গভীর আবেগ নিয়ে সে মসজিদে প্রবেশ করি। পারস্য থেকে সত্যের অন্বেষায় যৌবনে ঘর ছাড়েন সালমান। পথেপথে কাটে দিন-মাস-বছর। সত্যের সন্ধানে এক দীর্ঘ রুহানী পরিক্রমা শেষে সালমান ফার্সী নবীজীর কাছে পৌছেন বৃদ্ধ বয়সে। মদিনায় এসে ইথিওপিয়ার হাফসী বেলাল, রোমের সুহায়েব, পারস্যের সালমান আর মক্কার কুরাইশ সাইয়েদগণ এক অভিন্ন জাতিসত্তায় মিশে যান।

পরিখা প্রান্তরের একটি মসজিদ হযরত ফাতিমার নামে। সে মসজিদের পাশে একটি পুরনো গাছে মানত পূরণের আশায় কিছু লোক নানা রংয়ের সূতা বেঁধেছেন। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ সূতা জড়ানো এই গাছ দেখিয়ে আবদুল মান্নান ভাই আফসোস করেন, রাসূল সা. তার সাথিদের নিয়ে পর্বতের কিনারে পাথুরে প্রান্তর খুঁড়ে শ্রমে আর ঘামে পরিখা তৈরি করেন। এ প্রান্তর তো সে কুরবানী আর উম্মাহর প্রতিরক্ষার স্মৃতিচিহ্ন। এমন জায়গায় এসে যারা খুচরা মানত পূরণের আশায় গাছে সূতা জড়ায় তারা রাসূল সা.-এর কষ্টের মূল্য কী বুঝেছে!

আবদুল মান্নান ভাইর চেহারায় কষ্টের অভিব্যক্তি। তিনি বলেন, মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে। মাকড়সা আহরণ করে বিষ। আর ভোমরা ফুল থেকে নিজের জন্য কিছুই নিতে পারে না। গুণগুণই সার!'

সাত মসজিদের এলাকা থেকে মাত্র পাঁচশ গজ দূরে মসজিদ-ই-কিবলাতাইন। কিন্তু সাঁঝ নামার আগেই ওহোদ যুদ্ধের জায়গাটি জিয়ারত করতে চাই। সেই তাগিদে আমরা ওহোদের শহীদগাহে রওনা হই।



www.pathagar.com

মদিনার নগরকেন্দ্র থেকে জঙ্গে ওহোদের প্রান্তরে যাওয়ার দু'টি পথ। একটি 'ত্বরিক সাইয়েদুস শুহাদা'। অন্য পথ 'ত্বরিক সাইয়েদুনা হামজা'। দুই সড়কই হযরত হামজার নামে। ওহোদের প্রান্তরে সত্তুর জন শহীদ সাহাবির কবর। হযরত হামজা [রা] সব শহীদের নেতা।

ঘের দেয়া কাঁকর বিছানো জমিনে শুয়ে আছেন সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামজা [রা]। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মাহর প্রতিটি লড়াই-সংগ্রামে তিনি শরিক থেকেছেন। অমিত সাহস আর প্রবল বিক্রমে লড়াই করে হযরত হামজার উপাধি হয় আসাদউল্লাহ। আল্লাহর সিংহ। বদর যুদ্ধে মুশরিক কুরেশদের ক'জন বড় নেতা সম্মুখ যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হয়। ওহোদ প্রান্তরেও বীরত্ব আর সাহসিকতায় দুশমনের একের পর এক ব্যুহ তছনছ করেন হযরত হামজা [রা] ! মক্কার মুশরিকদের বড় বড় যোদ্ধা ছিন্নভিন্ন খড়কুটার মতো নিশ্চিহ্ন হয় তার হাতে।

ওহোদ প্রান্তরে সম্মুখ রণাঙ্গণে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন হযরত হামজা [রা]। তার ঘাতক মক্কার কৃতদাস ওয়াহশী। সে যুদ্ধ করতে মদিনায় আসেনি। হযরত হামজাকে হত্যার জন্য ওয়াহশীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হামজা-হত্যার বিনিময়ে ওয়াহশী পাবে মুক্ত জীবন। সে আশায় গুপ্তঘাতক ওয়াহশী আড়াল থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে। সে আঘাতে হযরত হামজা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ওয়াহশী পরে ইসলাম কবুল করেন। তার হাতেই হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ইয়ামামার প্রান্তরে নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামা নিহত হয়।

আমরা ওহোদের প্রান্তর ঘুরে দেখি। শহীদগাহের দক্ষিণে রুমাহ পর্বত। এখানে দুই পাহাড়ের মাঝে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ। মদিনার প্রতিরক্ষার এক কৌশলগত জায়গাটি পাহারা দেয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের-এর নেতৃত্বে চল্লিশজন সাহাবিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। রাসূল সা. নির্দেশ ছিল, পাখি ঠুকরে ঠুকরে মুসলিম মুজাহিদদের গোশত খেলেও পাহারার এ জায়গা ছেড়ে কেউ নড়বে না!

যুদ্ধ শুরু হয়। দুশমনরা পিছু হটতে থাকে। মুজাহিদদের প্রাথমিক সাফল্যকে রুমাহ পর্বতের পাহারাদাররা মনে করেন চূড়ান্ত বিজয়। দলনেতা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের-এর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা দুশমনদের পিছু ধাওয়া করেন। এই সুযোগে মুশরিকদের নেতা খালেদ বিন ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে পিছন থেকে মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সেনাদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

যুদ্ধের গতি হঠাৎ পাল্টে যায়। ওহোদের প্রান্তরে আঁধার নামে। রাসূল সা.-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। শিরস্ত্রাণের লোহার কড়ি বিদ্ধ হয় পবিত্র মস্তকে। দাঁত দিয়ে টেনে সে কড়ি বের করতে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ্ রা.-এর দাঁত ভাঙে। ওহোদ নিয়ে আরো কত কথা!



www.pathagar.com

বিষণ্ন গুমোট সে কষ্টের আবহে ডুবে আছে ওহোদের প্রান্তর। ওহোদের শহীদগাহে হযরত হামজার পাশে ঘুমিয়ে আছেন মুসআব ইবনে উমায়ের রা.। মদিনায় রাসূল সা.-এর প্রথম দূত। এখানে শুয়ে আছেন বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.। এই প্রান্তরে ওহোদ যুদ্ধের অন্যান্য শহীদের কবর।

আমরা শহীদানে ওহোদের কবর জিয়ারত করি। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলোকচ্ছটা উহোদ পর্বতমালায় বিম্বিত হয়ে শহীদানের রক্তরঙিন স্মৃতি আরো টাটকা করে তোলে। ওহোদ যুদ্ধ যেন এক্ষুণি সংঘটিত হচ্ছে। আর আমি এক নগণ্য সৈনিকরূপে হিজরি পনেরো শতকের ওহোদের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি।

## নতুন প্রহরের আযান

মসজিদের মিনার থেকে আযানের সুর ভেসে আসে। আল্লাহ মহান! আল্লাহ মহান! মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল! এসো সালাতের পথে। এসো কল্যাণের পথে। আমর বিল মারুফ সংস্থার লোকেরা সে আযানের প্রতিধ্বনি করে হাঁকছেন ঃ সালাহ! সালাহ! ইয়া আল্লাহ! রোহ!

পাশেই মসজিদ। আমরা রুকু ও সেজদাকারীদের কাতারে শামিল হই। এরপর ওহোদ প্রান্তরের কষ্টের স্মৃতি বুকে নিয়ে যাই মসজিদ-ই-কিবলাতাইন-এ। দুই কিবলার মসজিদ। এ মসজিদে দু'টি মিহরাব। একটি মিহরাব বায়তুল মাকদাসের দিকে। অন্যটি কাবামুখি। কাবামুখি মিহরাবের সামনে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে পিছনের দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

বায়তুল মাকদাসমুখি এই মিহরাবের সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে ইমামতি করেন রাসূল সা.। তখন আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হলো ঃ 'কাবার দিকে মুখ ফিরাও।' এক মুহূর্ত দেরী না করে রাসূল সা. ঘুরে দাঁড়ান কাবামুখি হয়ে। সাথিগণ সেভাবে রাসূল সা.-কে অনুসরণ করেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে। ঈসায়ী কাল গণনায় তখন ৬২৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাস।

এ ঘটনা এক দিক থেকে অন্য দিক মুখ ফিরানোর ব্যাপার শুধু নয়। কিবলা পরিবর্তন মানব ইতিহাসের এক নতুন যুগের ইশারা! দুনিয়ার নেতৃত্ব ছিল বনি ইসরাইলের হাতে। কিবলা ছিল বায়তুল মাকদাস। এখন নেতৃত্বের পালা-বদল ঘটেছে। নেতৃত্ব চলে এসেছে এক নবজাগ্রত জাতির হাতে। সেই সাথে নতুন কিবলা নির্ধারিত হয়েছে মক্কার কাবা ঘর। কাবা ঘর যে শীঘ্র মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসবে, সে ইশারাও ছিল এটি।

বায়তুল মাকদাসমুখি মিম্বরের পাশে দেয়ালে উৎকীর্ণ আল কুরআনের প্রত্যাদেশ। 'মক্কার কাবাঘরকে পৃথিবীবাসীর জন্য কিবলারূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।' এছাড়া এ সংক্রান্ত হাদীস। আর সে বড় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বয়ান।আমি দেয়ালের লিখন পাঠ করি। বোঝার চেষ্টা করি এ বড় পরিবর্তনের তাৎপর্য।



www.pathagar.com

ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনের স্মারক কিবলাতাঈন মসজিদ! সে প্রাচীন নিদর্শন দেখে আধুনিক যুগের জাতীয় জাগরণের এক নতুন স্থাপত্য মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে আমরা চলি মসজিদে নববীর পানে।

নবীর মসজিদের দিকে যেতে যেতে আমার ভেতর ডানা ঝাপটায় অন্য রকম আবেগ। শৈশব থেকে কতবার স্বপ্নে দেখেছি সোনার মদিনা। মা-চাচি-ফুপু-খালার কোলে বসে মা-ফাতিমার কাহিনী শুনতে শুনতে হাওয়ায় পাখনা মেলে উড়াল দিয়েছি মদিনায়। সেখানে নবীজীর কোলে খেলা করেন হাসান-হোসেন। আমারও সাধ হয় হাসান-হোসেনের সাথি হয়ে নবীজীর কাছে যাই। সোনাখালির তীরে বসে ঝিলিমিলি ঢেউ গুণতে গুণতে কখনো মিনতি করেছি ঢেউয়ের কাছে। পুবাল হাওয়ায় কাছে। আর ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলা পাখির কাছে। 'আমার সালাম পৌঁছে দিও সোনার মদিনায়!'

আমি এখন সেই স্বপ্নের মদিনায়! হাত বাড়ালেই আমি এখন সবুজ গম্বুজ স্পর্শ করতে পারি!

**ইমাম বুখারীর মসজিদ ও শরীয়তউল্লাহর গল্প**

আবদুল মান্নান ভাই বাব-উল-মজিদ-এর কাছে গাড়ি দাঁড় করেন। এই বিখ্যাত দরোজার অদূরে একটি ছোট সুন্দর মসজিদ। মসজিদ-ই-বুখারী। মসজিদে নববীর পাশে এখানে বসে হাদীস সংকলনের কাজ করতেন ইমাম বুখারী (রহ)। মানবিক সংস্কৃতির উন্নয়নে আর সভ্যতার বিকাশে মানুষের আচরণীয় জীবনধারার উৎকৃষ্ট পাথেয় এই মহামূল্য হাদীস সংকলন।

রাসূল সা.-এর কথা ও কাজ আর তার সমর্থন ও অনুমোদনের বিবরণ সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারি ছুটেছেন এক জনপদ থেকে অন্যখানে। তথ্যের বাছ-বিচারে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহে তার অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি সকল যুগের পন্ডিতদের প্রশংসা পেয়েছে। বিশ্বস্ত প্রতিবেদক ইমাম বুখারি তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য যাচাইয়ে মডেল হয়ে আছেন। তার সম্পর্কে কত আলোচনা ও গবেষণা। তাকে নিয়ে বাংলাদেশের এক বড় সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী কিশোরদের জন্য লিখেছেন একটি চমৎকার বই। বইয়ের নাম 'বিশ্বের প্রথম রিপোর্টার'। সে রিপোর্টারের স্মৃতি বইছে মসজিদে নববী সংলগ্ন এই সুন্দর মসজিদ।

মসজিদে নববীতে এশার নামাজ শেষে আমরা যাই বাব উল মজীদের অদূরে হারাতুন নসরে। সেখানে মদিনার একদল প্রবাসী বাংলাদেশীর সাথে মিলিত হই।

গভীর রাতে আবদুল মান্নান ভাইর বাসায় দেখা হয় মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন বাংলাদেশী ছাত্রের সাথে। তাদের চোখে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন। তারা বলেন মদিনা ও মক্কার সাথে বাংলাদেশের অতীত সম্পর্কের কথা। কথায় কথা বাড়ে। প্রবাসী ছাত্রদের স্বপ্নের পাশে আমি একজন শরীয়তউল্লাহকে দেখতে পাই।



www.pathagar.com

'সতেরোশ সাতান্নোয় সিরাজউদদৌলা শহীদ হন। মুর্শিদাবাদ থেকে পরাধীন বাংলার রাজধানী যায় কলকাতা। সতেরো শ নিরানব্বুই সালে মহিশূরে টীপু সুলতানকে শহীদ করে ওয়েলেসলি কলকাতায় ফিরলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্ট নতুন জমিদাররা পালন করে 'বিজয় উৎসব'। স্বাধীনতার পক্ষের মানুষেরা তখন শোকে ও হতাশায় মুহ্যমান। আলেমগণ ইংরেজ কবলিত হিন্দুস্তানকে ঘোষণা করেন 'দারুল হারব'। যুদ্ধ কবলিত এ এলাকায় স্বাধীনভাবে দ্বীন পালনের সুযোগ নেই। ফরিদপুরের ছেলে শরীয়তউল্লাহ তখন দারুল হারব-এর রাজধানী কলকাতা ছেড়ে তার শিক্ষক মওলানা বাশারাত আলীর সাথে সে বছরই হিযরত করেন মুক্তভূমি মক্কায়।

সে যুগে মক্কা-মদিনা-রিয়াদ-জেদ্দায় এখনকার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তবে শিক্ষার প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। মক্কায় শরীয়তউল্লাহ তাহের সম্বলের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে হজ ও উমরায় আসা মুসলিম দুনিয়ার প্রতিনিধি, নেতা ও মনীষীদের কাছে যাওয়ার সুযোগ পান। কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীর ছায়ায় বসে তিনি পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। বিশ্বের পরিবর্তনকামী মুসলিম সংস্কারক পন্ডিতদের সোহবতে তার ভেতর এক বড় নেতার সামর্থ সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে এরপর তিনি মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে আরো দু'বছর অধ্যয়ন করেন। ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে শরীয়তউল্লাহ রাজধানী কলকাতা না গিয়ে নিজ গ্রাম থেকে কাজ শুরু করেন। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরে তিনি পূর্ব বাংলার সমাজ সংস্কারে কান্ডারির ভূমিকা পালন করেন।

শরীয়তউল্লাহর পর ১৮৪০ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত তেইশ বছর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা ছিলেন তার ছেলে মোহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া। দুদুমিয়াও মক্কা-মদিনার আলো-ছায়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ। তিনিও মক্কায় লেখাপড়া করেন। সে সময় অনেক মুজতাহিদ-মুজাহিদের সাথে তার দেখা হয়। তার মানস গঠনে এই অভিজ্ঞান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার জিহাদ আন্দোলনের নেতা তিতুমীরের সাথেও দেখা হয় দুদুমিয়ার। তিতুমীর দুদুমিয়াকে একটি তসবিহ উপহার দেন। পরে তিতুমীরের মতোই দুদুমিয়া আওয়াজ তোলেন ঃ লাঙ্গল যার জমি তার! সৃষ্টি যার আইন তার!

ইসলামের বন্টনমূলক সুবিচার আর জুলুম শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণে দুদু মিয়ার সংগ্রাম আজো বাংলার ঘরে ঘরে প্রেরণা। আর তিতুমীরের তসবিহ আজো ফরায়েজী পরিবারের সম্পদ।

ইতিহাসের এই অধ্যায়ের প্রতি ইশারা করে আমি বলি, বর্তমান প্রজন্মের অনেক মেধাবি বাংলাদেশী তরুণ মক্কা-মদিনা-রিয়াদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। তারা শরিয়তউল্লাহ ও দুদুমিয়ার মতো বড় স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরলে জাতি তাদের দানে আলোকিত হবে। বিশ্বের এক দশমাংশ মুসলমানের বাসভূমি গাঙেয় বদ্বীপ বাংলাদেশ। এ দেশের বহুলোক এখনো নানা সামাজিক অসুখের শিকার। তাদের নিরাময়ে অ-নে-ক চিকিৎসক প্রয়োজন!



www.pathagar.com

আবদুল মান্নান ভাইর খাওয়ার টেবিলে নানাপ্রকার দেশী ব্যঞ্জন এই গভীর রাতেও আমাদের রসনা তৃপ্ত করে। আর মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে মত বিনিময় করে আমার আত্মার ক্ষুধা মিটে। ঘটনাবহুল একটি দিন ও একটি রাত শেষে ফজরের সালাত আদায় করে শয্যায় যাই ডাক্তার সাইফুল ভাইর বাসায়।

শুক্রবার সকালে মদিনার একদল নেতৃস্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী ছুটির ভোরের ঘুমের আয়েশ ঝেড়ে হারাতুন নসরে মিলিত হন। তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে মসজিদে নববীতে জীবনের প্রথম জুমার জামাতে শরিক হই। আবদুর রহমান হোজাইফীর ইমামতিতে নামাজ শেষে মসজিদে নববীর আলিশান চত্বরের এক কোণায় মিলিত হই মদিনার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে।

মাগরিবের পরে রাসূল সা.-এর কবর মুবারক জিয়ারত করি। হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর ফারুক রা.-এর কবরে সালাম জানাই। রিয়াদুল জান্নাতে কাটাই এশা পর্যন্ত । এশার পর জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের চারপাশে শত শত মানুষের ভীড়। সেখান থেকে যাই চাঁদপুর বোর্ডিং-এ। সেখানে প্রবাসি বাংলাদেশী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-আলেম-ব্যবসায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জমায়েত হন এক চমৎকার মিলনমেলায়।

সমাবেশ যখন শেষ হয় তখন রাতের বয়স বেড়েছে। এত রাতে ঢাকার কোন বাসায় দাওয়াত খেতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এ তো আরবের প্রবাস। তাই গভীর রাতে আমরা যাই বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আবদুল ওয়াহিদের মেয়ের আকীকা অনুষ্ঠানে। প্রবাসে এ ধরনের দাওয়াতের অন্য রকম আকর্ষণ। পুরো বাড়ি সরগরম। প্রবাসী বিভিন্ন পরিবারের ছেলেমেয়ে একসাথে মিলে হৈ হুল্লোড় করছে।

অনেকদিন পর আমি কচি-কাঁচাদের কলরব উপভোগ করি। কিন্তু হঠাৎ তাদের হৈচৈ থামাতে এক করিৎকর্মা যুবক সক্রিয় হয়ে ঘোষণা করেন 'চুপ থাকার প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে সে পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার!' সাথে সাথে কলকণ্ঠ থেমে যায়। শুরু হয় বোবা হবার প্রতিযোগিতা। শিশুরা গাল-ফুলিয়ে বিরস অভিমানি চেহারা নিয়ে বারান্দায় বসে থাকে। উৎসবমুখর বাড়ির সব আনন্দ আমার চোখে ম্লান আর প্রাণহীন মনে হয়। ফুলপরীদের তাড়িয়ে দেয়ায় বাগানে যেন ফুল ফোটা গন্ধ ছোটা বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় গভীর রাতে  মেজবানের কাছে বিদায় আরজ করি।

**মসজিদে নববীর জাদুঘরে**

শনিবার ভোরে মসজিদে নববীতে যাই। ইদরিস বলেন, দোতালায় একটি চমৎকার লাইব্রেরি আছে। সাথে সাথে আমরা ছুটে যাই দোতালায়।...এ তো লাইব্রেরী নয়! মূল্যবান এক জাদুঘর। বিভিন্ন শতাব্দীতে নানা দেশে প্রকাশিত হাদিস-তাফসীর, ফিক্‌হ, সিরাত গ্রন্থ, শব্দকোষ, অভিধান, বিশ্বকোষ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস ও ভূবিদ্যার প্রাচীন বই-কিতাবের চমৎকার সংগ্রহশালা। উপমহাদেশীয় আলেমদের কিছু দুষ্প্রাপ্য বইও আছে এই সংগ্রহে।



www.pathagar.com

তেতলার সংগ্রহশালায় রয়েছে রাসূল সা.-এর সীলমোহর অংকিত কিছু দলিল। রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে লেখা চিঠির অনুলিপি। বাহরাইনের আমীর মজনুন বিন সাওরী, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছে লেখা মহানবীর চিঠি। পারস্য সম্রাটকে নবীজীর লেখা চিঠির ছেঁড়া পাতা।

একটি কক্ষে নাদর মানসুখের লেখা ৫৭৮ হিজরীর তাফসির। মরক্কো থেকে পাওয়া আল কুরআনের ১১৬৭ হিজরীর ক্যালিগ্রাফি। বিভিন্ন শতাব্দীতে দেশে দেশে সংকলিত আল কুরআনের কারুকার্যময় নকল। আবদুল কুদ্দুস কাশ্মীরী ফার্সীতে তরজমা করেছেন তাফসির-ই-কাশ্বাফী। এখানে আছে সে তরজমার মূল পাণ্ডুলিপি।

আরেকটি কক্ষে দেখি ইমাম বুখারীর হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা, সুনান আবু দাউদের প্রাচীন কপি, বখ্ত মাগরিবীর লেখা মুসলিম শরীফের পাণ্ডুলিপি আর আহমদ বিন হাসান দারুনীর কিতাব। আর আছে মসজিদে নববীর একটি প্রাচীন মানচিত্র। আরো কয়েকটি কক্ষে বেশ কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও দলীল সাজানো হচ্ছে প্রদর্শনের জন্য।

ইদরিসকে ধন্যবাদ দেই এ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা সম্পর্কে আমাকে ধারণা দেয়ার জন্য। এখান থেকে অন্যরকম অক্সিজেন নিয়ে বুক ভরা আনন্দে রাসূল সা.-এর কবর মুবারক জিয়ারত করতে যাই।

## ঘুরে দেখি স্বপ্নের ভুবন

উত্তর পাশে হযরত ফাতিমার ঘর। ভেতরে স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে ইদ্রিসের চোখ দিয়ে আমি সেখানে দেখি তুর্কী আমলের কারুকাজ। সে ঘরের দক্ষিণ পাশে হযরত আয়েশার ঘর। এটিই হুজরা শরীফ। সে ঘরে সবুজ কাপড়ের আচ্ছাদন। উপরে তুর্কী আমলের লাল সামিয়ানা। এখানে শুয়ে আছেন প্রিয় নবী সা.। তার পাশে কিছুটা ডানে নবীজীর কাঁধ বরাবর শয্যা পেতেছেন সিদ্দিকে আকবর হযরত আবূ বকর [রা]। সিদ্দিকে আকবরের পাশে একটু ডানে ঘুমিয়ে আছেন ফারূকে আযম হযরত উমর [রা]।

আমরা দরুদ ও সালাম পাঠ করি। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খিয়ারাতাল্লাহি মিন খালকিহি! আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যেদাল মুরসালীন ওয়া ইমামাল মুত্তাকীন। আশহাদু আন্নাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়া আদ্‌দায়াতাল আমানাতা ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা ওয়া জাহাদ্‌তা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহি!...

ডানে সরে সালাম জানাই নবীজীর দুই প্রিয় সাথি হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে!

জিয়ারত শেষে কবর মুবারক থেকে পুবে সরে এসে দু'হাত তুলি মহান আল্লাহর দরবারে। কিছু লোক এখানে রোনাজারি করছেন। তাদের গণ্ডদেশে প্রেমের ও আবেগের নুনের দ্রবণ!

মসজিদে নববীর চল্লিশ নম্বর গেট 'বাবে জিবরীল'। এ পথে মসজিদে নববীতে এসে এক আগন্তুক রাসূল সা.-এর হাটুর সাথে হাটু মিলিয়ে বসেন। নবীজীকে কিছু প্রশ্ন করেন। সেসব জিজ্ঞাসার জবাব শুনে আগন্তুক নিজেই বলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন!'



www.pathagar.com

সফরের ক্লান্তি-চিহ্নহীন এই অপরিচিত আগন্তুক চলে গেলে রাসূল সা. সাথিদের জানান, তিনি জিবরীল আমীন। এই সংলাপের মাধ্যমে তিনি উম্মতকে দিলেন জ্ঞান। এই অভিনব সংলাপ 'হাদীসে জিবরীল' নামে খ্যাত।

রাসূল সা.-এর হুজরা ও কবর মুবারক-এর কয়েক গজ উত্তরে মসজিদের মেঝে থেকে প্রায় দেড় ফুট উঁচু একটি পাটাতন মতো জায়গা। রাসূল সা.-এর সময় সত্তুর জন সম্মানিত সাহাবি এখানে সারাক্ষণ জ্ঞান চর্চা করতেন। আসহাবে সুফ্ফা নামে পরিচিত এই ছাত্রদের শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং মহানবী সা.। পৃথিবীর অনন্য এই শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষ ভাগ্যবান ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আবু যর গিফারি ও আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহুমের মতো ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানের মধু-ভাণ্ডার লুটে নিয়ে সারা দুনিয়ায় তারা ছড়িয়ে দেন কল্যাণ ও উন্নয়নের অমিয় ধারা।

আসহাবে সুফ্ফার এ জায়গাটিতে কেউ নামাজ পড়ছেন। কেউ তেলাওয়াত করছেন। সে প্লাটফরমের এক কোণায় শশ্রুবিরল দু'জন লোককে অন্যদের থেকে সহজে আলাদা করা যায়। ইদ্রিস বলেন, তাদের কবিলা পুরুষানুক্রমে কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীর চাবি সংরক্ষণ করছেন।

মসজিদে নববীর প্রতি ইঞ্চি জমি মহানবী সা. ও তাঁর নেক সাহাবিদের পবিত্র পরশে ধন্য। রাসূল সা. ও তার সাহাবিগণ স্বপ্ন বুনেছেন এ জমির প্রতিটি রেনুতে। সে ধারায় পরবর্তী যুগের কত মনীষী বিচরণ করেছেন এ পবিত্র মসজিদে। এ জমির প্রতিটি ধুলিকণা পৃথিবীর মানুষের মুক্তি আর কল্যাণের বিরামহীন জিকিরের সাথি। রাসূল সা.-এর হুজরা মুবারক থেকে মসজিদের মিহরাব পর্যন্ত পথটুকু রিয়াজুল জান্নাত বা জান্নাতের বাগানরূপে চিহ্নিত। সাহাবিগণ এখানে রাসূল সা.-এর মজলিসে বসেছেন। দুনিয়াকে কুরআনের রঙে রাঙিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা, প্রযুক্তি আর উদ্দীপনা তৈরি করেছেন।

বা'বে জিবরীল থেকে কয়েক গজ দক্ষিণে আইউব আনসারীর বাড়িটি কিছু দিন আগেও ছিল। এখানে রাখা ছিল রাসূল সা.-এর ঢাল-তলওয়ার। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের পর সে বাড়ির চিহ্ন এখন নেই। মসজিদে নববীর পশ্চিমে খানিক দূরে একটি সরকারী ভবনে এখন রাসূল সা.-এর ব্যবহার করা সামগ্রি রাখা আছে।

আইউব আল আনসারী রা. ইসলামের অনেক যুদ্ধে অংশ নেন। আশি বছর বয়সে তিনি ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল অভিযানে শরীক হন। এই অভিযানের সময় অসুস্থ হয়ে তিনি অসিয়ত করেন, যেন তাকে ইস্তাম্বুল নগরীর প্রাচীরের পাদদেশে কবর দেয়া হয়। ভবিষ্যতের মুসলিম অভিযাত্রী দল যেন তার কবরের উপর দিয়ে গিয়ে কনস্টান্টিনোপলে ইসলামের বিজয় নিশান উড়াতে পারেন।

সেই থেকে বহু বছর পর বিস্ময়কর বীরত্ব আর অনন্য সামরিক নৈপুণ্যে সুলতান মুহাম্মদ জয় করেন কনস্টান্টিনোপল। তার খেতাব হয় ফতেহ সুলতান। ফতেহ সুলতান প্রিয় নবীর ঘনিষ্ট সাহাবি হযরত আইয়ুব আল আনসারীর কবরের পাশে নির্মাণ করেন এক



www.pathagar.com

বিরাট মসজিদ। গোটা এলাকার নাম হয় আইউব সুলতান। তুরস্কে ইসলামের সবচে প্রাচীন দর্শনীয় স্থান আইয়ুব সুলতান। সেখানে প্রতিদিন এখন বহু মানুষের ভীড়। আমরা সেই ত্যাগী পুরুষের কথা মসজিদে নববীর চত্বরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করি।

আইয়ুব আল আনসারীর বাড়ির দক্ষিণে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে মসজিদে জিন্নুরাইন। 'দুই নূরের অধিকারি' হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান রা.-এর মসজিদ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মসজিদ-ই-গামামা। অনাবৃষ্টির সময় রাসূল সা. এখানে বৃষ্টির জন্য নামাজ আদায় করেন। এ জায়গায় পরে ঈদের নামাজও আদায় করেন তিনি। মসজিদে গামামার উত্তরে মসজিদ-ই-আবূ বকর। দক্ষিণে মসজিদ-ই-ওমর ফারুক। মসজিদ-ই-আবু বকর থেকে আরেকটু উত্তরে মসজিদ-ই-আলী। রাসূল সা.-এর কবর মুবারক থেকে পুব দিকে প্রায় একশ গজ দূরে জান্নাতুল বাকী।

ইদ্রিসের সাথি হয়ে আমি ঘুরে ঘুরে দেখি আমার স্বপ্নের ভুবনের এদিক-ওদিক। এক সময় দেখি ক্র্যাচে ভর দিয়ে রাসূল সা.-এর কবর মুবারকের দিকে আসছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী লে. জেনারেল নূরউদ্দিন খান। তার সাথে জেদ্দার কনসাল জেনারেল মহসিন আলী খান। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছি সাবেক এই সেনাবাহিনী প্রধান সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তাঁকে সুস্থ অবস্থায় নবীর মসজিদে দেখে ভালো লাগে। কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করি।

যোহরের নামাজ শেষে হারাতুন নসরে যাই। সেখান থেকে যাই ওহোদের পাদদেশে শামসুদ্দিন মানিকদের ভিলায়। মানিক কৃষি ও পল্ট্রি খামারের ব্যবস্থাপক। কোম্পানির প্রায় দু'শ কর্মচারী এক ভিলায় থাকেন। আমি তাদের সাথে দুপুরের খাওয়ার দস্তরখানে মিলিত হই।

বিকালে যাই মদিনা থেকে ত্রিশ কি.মি. দূরে মায়মানি কোম্পানির ক্যাম্পে। ক্যাম্পের মসজিদে সিরামিক ফ্যাক্টরির বাংলাদেশী শ্রমিকদের সাথে মিলিত হই। বাংলাদেশের পলিমাটির ছেলেদের পোড়া ইটের মতো রুক্ষ ও কঠিন চেহারা দেখে কষ্ট লাগে। বৈঠক শেষে রাতের দস্তরখানে তারা সকলকে আম-দুধে আপ্যায়িত করেন।

**জান্নাতুল বাকী ঃ এ কোন্ আর্কষণ!**

বাইশ সেপ্টেম্বর রবিবার মসজিদে নববীর মিনার থেকে তাহাজ্জুদের আযান শুনে জেগে উঠি। ফজরের জামাত শেষে যাই জান্নাতুল বাকীতে। এ সময় এ গোরস্তানের প্রধান দরোজা খুলে দেয়া হয়। দরোজার কাছে একটি সাইন বোর্ডে বাংলায় লেখা ঃ 'কবরে প্রার্থনা করা বা কোন কিছু পাওয়ার আশায় কবর স্পর্শ করা কিংবা কবরে অর্থকড়ি রাখা ইসলামবিরোধি কাজ।' উর্দু ও ফার্সিসহ ক'টি ভাষায় একই বিজ্ঞপ্তি। ইদ্রিস বলেন, কিছু লোক জান্নাতুল বাকীর মাটিকে 'খাকে শেফা' বা রোগমুক্তির মাটি মনে করে তাবিজে ব্যবহার করেন!



www.pathagar.com

জান্নাতুল বাকীর প্রধান দরোজার কাছে একটি ভবনে মৃত ব্যক্তিদের গোসলের ব্যবস্থা। ইদ্রিস জানান, মদিনায় কেউ ইন্তেকাল করলে সরকারী ব্যবস্থাপনায় লাশ এনে এখানে গোসল শেষে কাফন পরিয়ে মসজিদে নববীতে জানাযার পর জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

জান্নাতুল বাকীতে প্রায় দশ হাজার সাহাবীর কবর। এখানে শুয়ে আছেন হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান, ওসমান বিন মাযউন, আবদুর রহমান বিন আউফ, হাসান বিন আলী, আব্বাস, আলী ইবনে হুসাইন, আকিল বিন আবু তালিব, আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আবদুল মুতালেব, আবদুল্লাহ বিন জাফর আল তাইয়ার, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, ইমাম মালেক বিন আনাস, আবদুল্লাহ ইবন ওমর, ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ সা., আবু সাইয়ীদ আল খুদরী, সাদ বিন মুয়াজ, মোহাম্মদ বিন বাকের, জাফর সাদেক বিন মুহাম্মদ বাকের সাদেক, রাসূল সা.-এর দুধ মা হালিমা, ফুফু সাফিয়া বিনতে আবদুল মোতালিব, কন্যা ফাতিমা, উম্মে কুলসুম, রোকাইয়া ও জয়নাব, স্ত্রী উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা, ছাওদা, হাফসা, উম্মে সালামা, ওয়াসফিয়া, যোয়াইরিয়া, উম্মে হাবীবা, জয়নাব বিনতে খোজিমা, জয়নাব বিনতে জাহাশ রাযিআল্লাহু আনহুম।

জান্নাতুল বাকীর প্রবেশ দরোজার কাছে ঘের দেয়া একটুখানি জায়গা। অনেকের মতে, এখানে রাসূল সা.-এর ক'জন আহলে বাইতের কবর। একটি কবরের পাশে চকচকে একটি কালো পাথর। এখানে হযরত ফাতিমার কবর বলে ধারণা করা হয়। দশ হাজার সাহাবি ছাড়াও অগণিত তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী শুয়ে আছেন এই কবরগাহে। এছাড়া গত দেড় হাজার বছরে নানা যুগের কত মনীষী, মুজাদ্দিদ-ইমাম-মুজতাহিদ, আলিম-মুবাল্লিগ, শহীদ-গাজী, আনসার-মুহাজির-মুসাফির শুয়ে আছেন এখানে। মদিনার সহস্র বছরের বাসিন্দাদের এখানে সমাহিত করা হয়েছে।

জান্নাতুল বাকীর প্রায় মাঝখানে শুয়ে আছেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান জিন্নুরাইন রা.। ইসলামের তৃতীয় খলিফার কবরের চারপাশে দশখানা সাধারণ পাথরের টুকরা। কবরের ওপর কংকর মাটির ওপর আরেকটি ছোট পাথর। হযরত ওসমান রা.-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একজন ইশারায় দেখান, দূরে হযরত হালিমার কবর। হযরত হালিমা আস সাদিয়া রা.। এক সৌভাগ্যবতী দুধ মা। যাঁর সম্মানে গায়ের চাদর মাটিতে বিছিয়ে দেন রাসূল সা.!

জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে চলি। আবেগের উত্তাপে বিগলিত হৃদয়-মন। পুব দিকে মসজিদে নববীর এক কোণ থেকে নয়া যমানার দাওয়াত নিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। আর জান্নাতুল বাকীর সামনে আফ্রিকী মেয়েরা 'এক রিয়াল-পাঞ্জ রিয়াল–কবুতর কবুতর-খাসারা নেহি হ্যায়' বলে চিৎকার করে। লাখ লাখ কবুতরের বাকুম বাকুম শব্দে গোরস্তানের নিথর পরিবেশ এখন মুখরিত।



www.pathagar.com

দুপুরে মসিউল্লাহ ভাইর বাসায় দাওয়াত। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে ফিরার পথে আবদুল মান্নান ভাই ঘুরিয়ে দেখান সকিফায়ে বনি সাঈদায় একটি খেজুর বাগান। রাসূল সা.-এর ওফাতের পর আবু বকর রা.-এর হাতে উমর ফারূক রা. এখানেই আনুগত্যের শপথ নেন।

মসজিদে নববী থেকে প্রায় ত্রিশ কিমি দূরে খোদারী ক্যাম্প। আছরের পর ইঞ্জিনিয়ার সিরাজসহ সেই ক্যাম্পে যাই। ক্যাম্প সুপার আবদুশ শাকুর আর ক্যাম্প মসজিদের ইমাম মওলানা আবদুর রবের ব্যবস্থাপনায় কয়েকশ লোক মসজিদে জমায়েত হন। তাদের সাথে কথা বলি ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে। অনুষ্ঠান শেষে প্রবাসী শ্রমিক ভাইরা সকলের জন্য দস্তরখান পাতেন। এ যেন পুরান দিনের বিয়ে-বাড়ির খানা! তারা আমাকে আরো দু'এক বেলা মেহমানদারি না করে ছাড়তেই রাজি নন। তবু এক সময় ফিরে চলি। ফেরার সময় লক্ষ্য করি প্রায় ত্রিশ কি.মি. দূর থেকে মসজিদে নববীর মিনার খুবই স্পষ্টভাবে আমাদের পথ দেখাচ্ছে। আমরা এ মিনারের টানে দ্রুত ছুটে চলি।

**ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু!**

তেইশ সেপ্টেম্বর সোমবার তাহাজ্জুদের আযান শুনে মসজিদে নববীতে যাই। সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত রিয়াদুল জান্নাতে কাটাই। চারদিকে বোবা চোখে দেখি। আর আমার ভেতর গভীর আলোড়ন। এক সময় এখানে ছিল খেজুর গাছের খুঁটি। মাথার ওপর খেজুর পাতার ছাউনি। মেঝেতে বালুরাশির ওপর খেজুর পাতার চাটাই। একজন নেতাকে ঘিরে খেজুরের খুঁটির ওপর ভর করে ইসলামের ইমারত আজ কত শক্তিশালী। প্রতিটি খুটির সাথে মিশে আছে নেতৃত্ব, আনুগত্য, আন্তরিকতা আর কোরবানীর পরাকাষ্ঠা। মানব উন্নয়ন আর মানব মুক্তির এক অনন্য আন্দোলনের মডেল চোখের সামনে বিম্বিত হয়। আমরা সে শক্তি ও মর্যাদার উত্তরাধিকারী। কিন্তু...

রাসূল সা.-এর মেহরাবের সামনে একটু জায়গা করে নেই। প্রিয় রাসূল সা. এখানে দাঁড়িয়ে নামাজে ইমামতি করেছেন। এখান থেকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। এখানে বসে বিচার-ফয়সালা করেছেন। বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা করেছেন। যুদ্ধযাত্রী মুজাহিদদের নির্দেশনা দিয়েছেন। বিদেশী দূতদের সাক্ষাতকার দিয়েছেন! এই মিহরাব আর মিম্বরকে কেন্দ্র করে দুনিয়াটা কত দ্রুত বদলে গেল! বঞ্চিত ফিরে পেল অধিকার। মজলুম শক্তি পেলো মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার।

এখানে আল্লাহর কাছে সেজদানত হয়েছেন কত সাহাবি, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী; আল্লাহর অসংখ্য প্রিয় বান্দাহ! সেই মিহরাবের সামনে মহান রবের কাছে সেজদানত হই। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো! আর তোমার সন্তুষ্টি লাভকারী বান্দাদের কাতারে আমাকেও শামিল করো!

মসজিদে নববীতে আছর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করি। রাসূল সা.-এর সমাধির পাশে রিয়াদুল জান্নাতে বসে কুরআন তেলাওয়াতে সময় কাটাই। রসূল সা. এর সমাধি মুবারক জিয়ারত করি। এশার পর মদিনার নানা মহল্লা আজো থেকে আজো বহু লোক সমবেত হন চাঁদপুর বোর্ডিং-এ।



www.pathagar.com

## তোমার শিয়রের পাশে

মঙ্গলবার ভোরে মসজিদে নববীতে যাই। রুকু সেজদা করি রিয়াদুল জান্নাতে। আমার বাঁ পাশে রাসূল সা. এর কবর মুবারক। আমি তাঁর শিয়রের পাশে। সেখানে বসে নবীজীর ওপর নাযিল হওয়া মহাগ্রন্থের তেলাওয়াত করি। ভয় মিশানো শান্তি আর স্বস্তির আনন্দিত আবেগ আমাকে ঘিরে রাখে!

মসজিদে নববীতে জোহর ও আছর আদায় করে মাগরিবের আগে জায়গা নেই আসহাবে সুফফার পাটাতনে। সেখানে ফর্সা উজ্জ্বল চেহারার এক প্রবীণ আরব আসন পাতেন আমার পাশে। তার আগমনে চারপাশে কিছুটা চাঞ্চল্য। তিনি খেজুর ও কাহওয়া আর জমজমের পানি দিয়ে ইফতার করেন। পকেট থেকে শুকনো আজওয়া খেজুর বের করে আমার হাতে তুলে দিতে দিতে মুচকি হেসে আদরমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'আনতা পাকিস্তানী? আপনি পাকিস্তানী?'

জবাবে বলি, 'আনা বাংলাদেশী। আমি বাংলাদেশী।'

তিনি মিষ্টি হাসেন। একটি খেজুরপাত্রে তার সাথে আহারের দাওয়াত দেন। আমি তার সাথে এক বরতনে খাই।

পিছন থেকে এক বাংলাদেশী আমাকে আলতো ধাক্কা দিয়ে বলেনঃ 'একটু সরে তাজিমের সাথে বসেন। তিনি সাইয়েদ!'

আমি এ কথার অর্থ বুঝি না। সরে বসবো কেন? পেছনের লোকটি বলেন, 'তিনি আউলাদে রাসূল। রাসূল সা.-এর বংশধর। তাঁর নাম সাইয়েদ মুহাম্মদ।' আমি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসি!

মাগরিবের নামাজ শেষে কিছু লোক সাইয়েদ মুহাম্মদের সাথে মুসাফাহা করেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচশ রিয়ালের নোট গুঁজে দেন। কিছু লোক মুসাফাহার সময় ছোট চিরকুট দেখায়। তিনি তাদেরকেও পাঁচশ রিয়ালের নোট দেন।

আমি এর তাৎপর্য বুঝি না। বাংলাদেশে তো অনেক 'বুযুর্গ' দেখেছি। মাহফিল-মজলিস-খানকায় সাধারণ মানুষ তাদের সাথে হাত মিলিয়ে হাদিয়া গুঁজে দেয়। সেখানে সাধারণ মানুষ দাতা আর বুযুর্গ সাহেব গ্রহীতা। এখানে তার উল্টোটা দেখি।

এককালে আমাদের দেশেও দ্বীনের দাওয়াতে যিনি যত অগ্রসর ছিলেন তার বাড়িতে দুঃখি মানুষের জন্য সতরঞ্জি তত বেশী প্রশস্ত ছিল। দ্বীন প্রচারক আলেমদের খানকাহগুলি ছিল অভুক্তদের লঙ্গরখানা, রোগিদের জন্য হাসপাতাল আর সর্বসাধারণের জন্য অবারিত শিক্ষাকেন্দ্র।...আমরা কবে ফিরে পাব হারানো সে সোনালী অতীত! রাসূল সা.-এর রওজার পাশে আসহাবে সুফ্ফার পাটাতনে বসে একজন আউলাদে রাসূলের দানের হাতের দিকে তাকিয়ে আমি এসব কথা ভাবি।

আজ রাতে বাইরে কোন কাজ নেই। এশার পর মসজিদে নববীর দরজা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত রিয়াদুল জান্নাতে হুজর পাকের কবর মুবারকের পাশে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা কাটাই।



www.pathagar.com

পঁচিশ সেপ্টেম্বর সকালে মসজিদে নববীতে ভীড় কিছুটা হালকা হলে রাসূল সা. এর কবর মুবারক জিয়ারত করি। ফের রিয়াদুল জান্নাতে বসি। জোহরের পরে জিয়ারতের জন্য রাসূল সা.-এর সমাধি পাকের সামনে আবার দাঁড়াই। ভীষণ কান্না পায় আমার! গত সাত দিন মসজিদে নববীতে রাসূল সা.-এর সমাধির পাশে কাটিয়েছি। আল্লাহকে শুকরিয়া। কত বড় সৌভাগ্য তিনি আমায় দিয়েছেন! আবার কবে এভাবে সবুজ গম্বুজের নীচে এসে দাঁড়াতে পারবো? বসতে পারবো রাসূল সা.-এর শিয়রের পাশে! তার মিম্বরের সামনে! রিয়াদুল জান্নাতে!

**মক্কার পথে**

নবীর শহর থেকে বিকালে মক্কার পথে রওনা হই। আমার সাথি মোহাম্মদ ইদ্রিস।

মদিনার নগরকেন্দ্র থেকে কুড়ি কিমি দূরে জুল হুলাইফা মীকাতের মসজিদ। ধারণা ছিল, এখানেই হযরত আলীর কূয়া। ইদ্রিস বলেন, বীর-ই-আলী এখান থেকে অল্প দূরে আরেকটি মসজিদের পাশে। হযরত ওসমানের খেলাফতের সময় সে কূয়ায় রাসূল সা.-এর নবুওতের সীলমোহর হারিয়ে যায়।

বাসের যাত্রিরা এখন এহরামের চাদরে ঢাকা। কেউ তালবিয়া পাঠ করছেন। কেউ কুরআন শরীফ থেকে একমনে তেলাওয়াত করছেন। আমিও তালবিয়া পাঠ করি। থেমে থেমে ইদ্রিসকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করি।

পথের ধারে কুচকুচে কালো লাভায় ঢাকা উঁচু-নিচু পাহাড় সারি। কিছু কিছু সমতল ভূমি। মরুভূমির এখানে-ওখানে নানা ধরনের কাঁটা জাতের গাছ। এখানে গাছ কাটা অপরাধ। বদুরা আধমরা বা শুকিয়ে যাওয়া গাছে কাপড় বেঁধে বা অন্য কোন চিহ্ন দিয়ে রাখেন। গাছ মরে গেলে কেটে বিক্রি করেন। ইদ্রিস বলেন, মরুভূমিতে এটা অলিখিত আইন। বদুরা এই আইন মান্য করেন।

আছরের বিরতির সময় সরাইখানায় চা-নাশতার ফাঁকে ক'জন বাংলাদেশীর সাথে কথা হয়। তারা আজনবী যাত্রীদের কাছে আংটি, আতর, তসবিহ বিক্রি করেন। শহরে আইনের কড়াকড়ি। বৈধ কাগজপত্রহীন ফেরিওয়ালারা তাই মরুভূমির সরাইতে আশ্রয় নিয়েছেন। হজ ও রোযার সময় এসব সরাই জমজমাট থাকে। ফেরিওয়ালাদের বেচাকেনাও তখন ভালো হয়।

মদিনার দিক থেকে মক্কার ভূমি ক্রমশ উঁচু। মক্কা থেকে তায়েফ, আল বাহা, মাহাইল ও কুংফুদার দিকে পার্বত্যভূমি ক্রমে আরো উঁচু হয়ে দক্ষিণে আবহা ও নাজরান ছুঁয়েছে। আবহায় সুদা পর্বত প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু।

মরু পর্বতের পথে পথে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সাঁতার কেটে আমরা মক্কা শরীফে প্রবেশ করি। আল্লাহর ঘরের সুউচ্চ মিনার চোখে 'পড়তেই অন্য রকম আবেগে ভিতর-বাহির শিহরিত হয়। হারাম শরীফে এশার ইকামত হচ্ছে। ছুটে গিয়ে বাইরের চতৃরে রুকুকারীদের সারিতে দাঁড়িয়ে যাই।



www.pathagar.com

মেসফালার এক হোটেলে রাত নয়টায় প্রবাসীদের সমাবেশ। এরপর রাত দুপুরে আমি আর ইদ্রিস কাবা শরীফে তাওয়াফকারীদের মিছিলে যোগ দেই। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমের সামনে দু'রাকাত নামাজ আদায় করি। জমজমের পানি পান করে সাফা মারওয়ায় দৌড়াই।

উমরা যখন শেষ হয় বায়তুল্লাহর চত্বরে তখন হাজার হাজার মানুষ তাহাজ্জুদ আদায় করছেন। আমরা মাকামে ইবরাহিমের সামনে রুকু-সেজদা করি। এরপর শায়খ ইবরাহিম শুরাইমের পেছনে ফজরের জামাতে কাতার বাঁধি।

ফযরের পর হারাম চত্বরে জানে আলম সাহেব জড়িয়ে ধরেন। তিনি রিয়াদ থেকে এসেছেন উমরা করতে। তার তাওয়াফ শেষ। সাঈ বাকী। আমি ও ইদ্রিস সাফা পাহাড়ের মাথায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করি। সাফা-মারওয়ায় হাজেরা নামের এক মায়ের পায়ের দাগ অনুসরণে অসংখ্য মানুষের আবহমান আবর্তনের দৃশ্য দেখি।

ঢাকা হোটেলে নাশতা সেরে শুরু হয় দিনের কাজ। আমার চারপাশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভীড়। কাজের ফাঁকে হারাম শরীফে জোহর-আছর-মাগরিব আদায় করি। সন্ধ্যার পর মক্কার উপকণ্ঠে দাল্লা ক্যাম্পে যাই। প্রায় পাঁচ হাজার বাংলাদেশীসহ নানা দেশের হাজার হাজার লোকের বসতি দাল্লা ক্যাম্প। আগে এটি ছিল মাওয়ারিদ কোম্পানির ক্যাম্প। এশার পর ক্যাম্পের বিশাল মসজিদে কয়েক হাজার বাংলাদেশীর সমাবেশে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে কথা বলি। শত শত লোক হিসাব খোলার জন্য ভীড় করেন।

ক্যাম্প থেকে মেসফালায় ফিরি আবুল হাশিমের সাথে। প্রায় দুই যুগ মক্কা শরীফে আছেন তিনি। এক সময় ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার বাণিজ্য বিভাগে ছিলেন। বহুদিন পর তার সাথে পরিচয় ঝালাই হয়।

**হারাম চত্বরে খুসুফ-এর নামাজ**

২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তাহাজ্জুদের আযানের সাথে সাথে ফাহাদ গেট দিয়ে কাবার মাতাফে প্রবেশ করি। রুকনে ইয়ামেনী বরাবর দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের সাথে সালাত আদায় করি। এরপর কাবা শরীফ তাওয়াফ করি। নানা মহাদেশের বিচিত্র বর্ণের লাখো মুসল্লির সাথে ফজরের জামাতে শায়খ ইবরাহিম শুরাইমের পিছনে দাঁড়াই।

ফজরের জামাত শেষে মক্কার মিনার থেকে হঠাৎ মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে 'খুসুফ...খুসুফ' ঘোষণা শুনে ঘুরে দাঁড়াই। অভিজ্ঞজনেরা ফিসফিস করেন।...চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। এখন খুসুফের নামাজ পড়া হবে!

ছোটবেলা আমাদের প্রতিবেশী সমাজের লোকেরা বলতেন রাহুগ্রাস! বিরাট এক রাক্ষস গিলে খায় চন্দ্র বা সূর্যকে! তারপর বড় কষ্টে রাহুমুক্তি ঘটে। আমরা পিতল-কাঁসার থালায় পানি নিয়ে রাক্ষসের চাঁদ-সুরুজ গিলে খাওয়ার দৃশ্য দেখেছি। তারপর রাহুমুক্তি। আরো পরে জেনেছি অন্য খবর। আজ নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে কাবার খোলা চত্বরে



www.pathagar.com

ভোরের ঠান্ডা বাতাসে মাতাফে দাঁড়াই। গাজ্জা মার্কেটের ব্যবসায়ী সা'দুল হক ফারুক বলেন, আপনি আজ এক বিরল সুযোগ পেয়ে গেলেন!

দুনিয়ার নানা জনপদের মানুষ নিয়ে কাবার চত্বরে শুরু হয় খুসুফের নামাজ। শেখ ইবরাহিম শুরাইম প্রাণ আকুল করা মধুমাখা কণ্ঠে আল কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। কুরআনের আয়াতের মরমে ঢুকিয়ে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে কখনো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মক্কা শরীফের প্রধান বিচারপতি কাবার ইমাম শায়খ শুরাইম। তেলাওয়াত দীর্ঘ হয়। এ তেলাওয়াতে বুঝি কখনো যতি পড়বে না!

প্রথম রাকাতের পর ইমামের সাথে আমরা নিজেদেরকে ঝুঁকিয়ে দেই মাটির দিকে। দীর্ঘ রুকু। লাখো মানুষ হাঁটুতে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে আছেন আল্লাহর কাছে। শর্তহীন আত্মসমর্পন। দীর্ঘ রুকু শেষে সেজদায় না গিয়ে ফের কিয়াম আর দীর্ঘ তেলাওয়াত। আবার দীর্ঘ রুকু। রুকু থেকে উঠে এবারে আমরা সেজদায় নত হই। লাখো মানুষের সাথে মাটিতে নাক ও কপাল লেপ্টে রাখি। যেন অনন্তকাল কাবার চত্বরে আল্লাহর কাছে সেজদায় নত হয়েই থাকবো। দীর্ঘ সেজদা থেকে উঠে এক সময় আবার কিয়াম ও দীর্ঘ তেলাওয়াত। এরপর দীর্ঘ রুকু। রুকুর পর সেজদায় না গিয়ে ফের সুরা ফাতিহাসহ তেলাওয়াত। দীর্ঘ রুকু-সেজদা। এভাবে চারবার রুকু এবং দুইবারে চার সেজদার মাধ্যমে দু'রাকাত নামাজ সূর্যোদয়ের পরও দীর্ঘ সময় জারি থাকে। বায়তুল্লাহর সর্বত্র রুকু ও সেজদাকারীদের চোখে মুখে অন্য রকম আবেগ! এ যেন হাশরের মাঠ!

শুক্রবার ছুটির দিন। মিসফালার আস্তানায় আমার মেজবানগণ মেহমানদের ভীড় সামলান। হিসাব খোলার ফাঁকে আমি বাংলাদেশের এই ভ্রাম্যমান দূতদের সাথে একটানা কথা বলি। জুমার নামাজের পর প্রচন্ড ভীড়। এই ভাইরা আমাকে দুপুরের খাওয়ার সময়টাও ছাড় দিতে রাজি নন।

দাল্লা ক্যাম্প ও কাকিয়া ছাড়িয়ে দুরে পাহাড়বেষ্টিত সুন্দর প্রকৃতির কোলে বিকালে মিলিত হন কয়েক শ বাংলাদেশী। পিকনিকের নানা আয়োজনের মাঝে সেখানেই ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। এরপর হেরার আলো শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবাসে একখন্ড ছোট বাংলাদেশ যেন। উৎসব মুখর পরিবেশে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেই রাত বারোটায়।

২৮ সেপ্টেম্বর জোহরের সালাত শেষে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য কাবার চত্বরে দাঁড়াই। মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নিচ্ছি। বায়তুল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে যাব! এ যেন নাড়ি ছেঁড়ার কষ্ট। হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করি। এ সময় কাবার চারপাশ কিছুটা হালকা। তাওয়াফের মাঝে কয়েকবার হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার সুযোগ পাই। মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে কাবার গায়ে নিজেকে লেপ্টে রেখে আল্লাহর সাথে কথা বলা! তার কাছে রোনাজারি! তারপরও সব কথা বলা হয় না। অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে কাবা শরীফের চত্বর থেকে বিদায় নিতে পা চলে না। অনেকের মতো আমিও অশ্রুর বন্যায় ডুবে যাই।



www.pathagar.com

রিয়াদের বাস ছাড়বে সাড়ে পাঁচটায়। শরিকা মক্কা থেকে যানজট ঠেলে তানঈম বাসস্ট্যান্ডে পৌছি। নাকের ডগা বেয়ে তখন রিয়াদের বাস ছেড়ে যায়। জীবনের এই স্টেশনে সাড়ে তিন ঘন্টা কাটাতে হবে! বাস টার্মিনালের সারি সারি খালি চেয়ারের এখানে ওখানে দু'একজন ঝিমুচ্ছেন।

এক গেলাশ গরম চা হাতে নিয়ে আসন পাতি এক কোণায়। ব্যাগ থেকে বই-ম্যাগাজিন-কাগজপত্র সামনে বিছিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবি। এখন আমার কী করা প্রয়োজন? মিতি আমাকে প্রায় এক মাস আগে চিঠি লিখেছে। তারপর ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেছে সময়। চিঠির জবাব দেয়ার মওকা হয়নি। চিঠি সাথে নিয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়েছি। এখন এই অবসরে গত কয়েক সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত সফর বিবরণী লিখতে বসে যাই। মিতির কাছে চব্বিশ পাতার একটি চিঠি লেখা শেষ করে আরেক গ্লাস চায়ের জন্য হাত বাড়াই।

রাত সাড়ে আটটায় বাস ছাড়ে। জানালার পর্দা সরাতেই হেরা পর্বতের ফাঁকে ঝলমলিয়ে ওঠে অপরূপ এক সোনার থালা। কাল ছিল পূর্ণিমা। মক্কার পাহাড়-পর্বতের ওপর দিয়ে আজো আসমানে ঝুলে আছে মধুমিঠা আলোর ফোয়ারা। বাসের গতির সাথে তাল মিলিয়ে মক্কার চাঁদ আমার সাথে কথা কইতে কইতে ছোটে নিঃসঙ্গ সফরের সাথি হয়ে।

মরু জোছনার রহস্যের ভেতর সাঁতার কাটতে কাটতে মন ছুটে যায় বাংলার সবুজ-শ্যামল গাঁয়। চাঁদ আর জোছনা নিয়ে সেখানে কত গান আর কবিতা। এমন তরল জোছনায় গল্প বলার আসর বসে নানি-দাদির দাওয়ায়। বাড়ির উঠানে পুঁথি পাঠ কিংবা বায়ান্ন ছাপ্পার গল্প শুনতে শুনতে কেটে যায় কত উজাগর রাত। এমন জোছনা প্লাবিত রাতে গ্রামের মাঠে কাবাডি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুটের স্মৃতি। এমন রাতে কতবার নাও ভাসিয়েছি সোনাখালি গাঙে। সে গ্রাম কি এখনো আছে?

তায়েফে যাত্রা বিরতির সময় টারমিনাল কাউন্টারে আমাদের ড্রাইভার বাংলায় কথা বলছেন। এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলি, আমিও বাংলাদেশী। বাস চালক মুন্সী ওয়ায়দুল হক। তার সাথি তায়েফের সাপটকো ওয়ার্কশপের কারিগর জসিম। তারা অন্ত র খুলে পরিচিত হন আমার সাথে।

এরপর মুন্সী ওবায়দুল হক আমাকে তার পাশের সিটে বসিয়ে ফিলিপিনো সহচালককে বলেন, তুমি ঘুমাও গিয়ে! আমি সাদিক পেয়েছি। তার সাথে গল্প করি!

ওবায়দুল হক থাকেন মক্কার তানঈমে। সাপটকো টারমিনালের কাছে। সাপটকোর লোকেরা তাকে মুন্সী নামে চিনে। বাড়ি গোপালগঞ্জ। পিতা ঢাকার ডেমরা থানার দারোগা। মুন্সী বলেন, 'আমার আব্বা একজন সৎ মানুষ। সংসারের জন্য কিছুই করতে পারেননি। আমি প্রথমে আর্মিতে যাই। তারপর সৌদিতে চাকরী নিয়ে আসি। এখন দূরপাল্লার গাড়ি চালাই। জর্দান তুরস্ক মিসর কুয়েত বাহরাইনের পথে বাস নিয়ে ছুটি। যেন পঙ্খীরাজে উড়ে বেড়াই।'



www.pathagar.com

দুপুর রাতে এক সরাইখানার সামনে বাস থামিয়ে মুন্সী ঘোষণা করেন, 'ইসতারাহা ওয়াহিদ-সা! এক ঘন্টার বিরতি।' মুন্সী আর তার ফিলিপিনো সহযোগি আমাকে নিয়ে সরাইখানার অন্তঃপুরিতে প্রবেশ করেন। সেখানে বাস চালকদের জন্য খাস্ মেহমানদারির ব্যবস্থা। রেস্তোরাঁর দুই বাংলাদেশী ছেলের সাথে কথা হয়। বিদায়ের সময় তাদের এক জন অনুরোধ জানায়, 'আবার এ পথে আসার সময় একটি বাংলা পত্রিকা আনবেন।'

ড্রাইভিং সিটে এখন ফিলিপিনো। মুন্সী আমার জন্য চারটি পাশাপাশি সিট একসাথ করে চমৎকার বিছানা পেতে দেন। মাথার নিচে বালিশ।

ফজরের পর মুন্সী ফের ড্রাইভিং সিটে বসেন। তার পাশে বসে বিস্তীর্ণ মরু মাঠ আর উঁচুনীচু পাহাড়ের মাঝে সুবহে সাদিকের অবাক করা দৃশ্য দেখি। এক সময় মরুপ্রান্তরে শিহরণ তুলে জেগে ওঠে আলোর গোলক। আমরা ক্রমশ রিয়াদের কাছাকাছি হই।

মুন্সি দেশে ফিরে পরিবহন ব্যবসা করবেন। নাম দেবেন মুন্সী পরিবহন। তার এক ভাই গোপালগঞ্জে পরিবহন মালিকদের নেতা। তাকে সবাই সমীহ করে। মুন্সী মনে করেন সড়কপথে তার সমস্যা হবে না!

www.pathagar.com

# যাত্রা তোমার শুভ হোক

**মূল : তাজরীদুল বুখারী**

**তরজমা : মনসূরুল হক খান**

পৃথিবীতে থাকবে পথচারীর মত–
শুধু গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হবে,
কখনো থামবে না,
কেননা তুমি অতিথি,
এখানে তোমার স্থায়ী নিবাস নেই।

যখন সন্ধ্যা হবে
প্রত্যুষের জন্য অপেক্ষা করো না।
যখন সকাল হবে
সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না।

জীবনকে ইচ্ছা করো,
মৃত্যুকে ইচ্ছা করো না।
বিপদকে মনে করবে প্রস্তরের মত
যেন তুমি পাহাড়ের সানুদেশে–
এবং ভাবছ যে, প্রস্তরখণ্ডগুলো
প্রলয়ংকরভাবে ভেঙ্গে পড়বে তোমার উপর।

তখন তুমি বলবে–
"হে আমার প্রভু
আমি তোমার শরণ নিচ্ছি
পাপের অধিকার থেকে,



www.pathagar.com

বঞ্চনার অন্ধকার থেকে,
বিশৃঙ্খল কোলাহল থেকে,
দূর্ভাগ্য থেকে,
তকদীরের বিপাক থেকে,
শত্রুর উল্লাস থেকে।"

তোমার পথযাত্রা কখনও যেন না থামে,
তোমার যাত্রাপথে বনানী-গুলশান
শান্তিময় হোক।

বারাকাতের প্রকাশরূপে কখনো বর্ষা নামবে-
কখনো শীত, কখনো গ্রীষ্ম,
তুমি তখন পৃথিবীর দিকে
মিত্রের দৃষ্টি দিয়ে দেখবে।

অকস্মাৎ উদ্ভাসিত চেতনায় আবিষ্কার করবে,
পৃথিবীর সকল কিছু তোমার
অন্তরঙ্গ হয়েছে-
তারা তোমার
যেমনি তুমি তাদের।
তোমার যাত্রা শুভ হোক, শুভ হোক, শুভ হোক।

www.pathagar.com

# ইসলামে মহিলাদের অধিকার

## ইকবাল কবীর মোহন

**প্রাক ইসলামী যুগে স্ত্রী জাতি**

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো আরব বিশ্বের কতিপয় মুসলিম দেশে সম্প্রতি মহিলারা আয়োজন করছে সমাবেশ ও সেমিনার। এসব সমাবেশ ও সেমিনারে মহিলাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা চলছে। এসব সমাবেশ ও সভা-সেমিনারে যে সব কথাবার্তা ও পর্যালোচনা হচ্ছে তাতে আপাতদৃষ্টিতে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, ইসলামে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে কোনো স্বীকৃতি নেই। আর এ জন্যই হয়তো এসব অধিকার আদায়ে তাদেরকে পথে নামতে হচ্ছে, অথবা সভা-সেমিনার করতে হচ্ছে। মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে অবদান ও স্বীকৃতি তা তখনই অনুধাবন করা যাবে যদি আমরা ইসলাম-পূর্ব সময়ে মহিলাদের অবস্থার দিকে খানিকটা তাকাই। তখন নারী জাতির অবস্থা ছিল খুব নাজুক। সেই সময় পুরুষরা ছিল মহিলাদের প্রভু আর মহিলাদের অবস্থা ছিল দাসির তুল্য। মনে করা হতো যে, পুরুষের সেবা ও তাদের জৈবিকচাহিদা পূরণের জন্যই মহিলাদের পৃথিবীতে আগমন। তখন মহিলারা পণ্য ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। তাদেরকে বিক্রি করা যেত কিংবা চাহিবামাত্র কেনা যেত। কখনও কখনও মূল্যের বিনিময়ে অথবা বিনামূল্যে মহিলাদের উপহার হিসাবে ব্যবহার করা হতো। মহিলাদের একটা অশুভ সৃষ্টি বলেও গণ্য করা হতো। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতার আগুনে স্ত্রীকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো। আধুনিক যুগেও হিন্দুদের মধ্যে এ নিয়ম প্রচলিত আছে। এমন অনেক মানুষও তখন ছিল যারা স্ত্রী লোকদের না হাসতে বাধ্য করত। তারা মনে করত মহিলাদের মুখ থেকে যে কথাই বের হয় তা ছিল অশুভ। এমনও করা হতো যে, পুরুষরা মহিলাদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাদের মুখে তালা লাগাত। এই তালা খাবার সময় ও পান করার সময়েই শুধু খোলা হতো। ইহুদি সম্প্রদায়ের মহিলাদের সাথে বিয়ে ছিল একটা ব্যবসার মতো। বিয়ের পর মনে করা হতো মহিলাকে পুরুষের কাছে যেন বিক্রি করা হয়েছে। তাই পুরুষরা হয়ে যেত স্ত্রী লোকদের প্রভু। বিয়ের পূর্বে মহিলাদের যা কিছু সম্পদ থাকত বিয়ের পর তা তার স্বামীর সম্পদ বলে গণ্য হতো। মহিলারা মা-বাবার কাছ থেকে যা পেত তাও স্বামীর হাতে তুলে দিতে হতো। মহিলারা ঘরের সকল কাজকর্ম করতে বাধ্য হতো। তাকে গম ছাতু করা, রুটি বানানো, কাপড়-চোপড় ধোয়া,



www.pathagar.com

রান্না করা থেকে শুধু করে কাপড় বুনা পর্যন্ত সব কাজই করতে হতো। স্বামীর কাছ থেকে কোনো কিছু পাবার অধিকার স্ত্রীদের তখন ছিল না। অথচ স্ত্রীর সব কিছুই স্বামী অথবা তার উত্তারাধিকারের অধীনে চলে যেত। বৌদ্ধদের বেলায় সেটা ছিল আরো বেশি জঘন্য। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ তার ধর্মীয় জীবনে মহিলাদের গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। তিনি তার অনুসারীদের মহিলাদের দিকে তাকাতেও নিষেধ করেছিলেন। রোমান সভ্যতার মধ্যে মহিলারা বিবেচিত হতো দাসী হিসেবে। পুরুষরা সব সময় মহিলাদের অনেক অধিকার অস্বীকার করত। রোমে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মহিলাদের আত্মা বলতে কিছু নেই। অনুরূপভাবে গ্রীসে মহিলাদের ভাবা হতো অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টি হিসেবে। তাদের নিয়ে ব্যবসা করা হতো। প্রাচীন বিশ্বাস মতে, মহিলারা মৃত্যু, বিষ, সাপের চেয়ে খারাপ বলে বিবেচিত হতো। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী লোকরাও মৃত্যুর মুখে পতিত হতো এবং পুরুষের চিতায় স্ত্রীকে নিক্ষেপ করে মারা হতো। আরবে ইসলামের আগমনের পূর্বে মহিলাদের অবস্থাও ভিন্নতর কিছু ছিল না। একজন আরববাসী এ কথা বলতে দ্বিধা করত যে, তার স্ত্রী কোনো কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। তখন নবজাতক কন্যাকে জীবিত কবর দিতে হতো। যদি তাকে বেঁচে থাকতে দেয়া হতো তখন সে সন্তানকে বড়ই করুণ ও দুর্বিষহ জীবনযাপনের মুখোমুখি হতে হতো। পবিত্র কালামে পাকে এ প্রসঙ্গে আল্লাহতাআলা বলেছেন, 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনের মধ্যে ক্রোধ চেপে রাখে। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হলো তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, সেভাবে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দেবে, না কি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত।'-[সূরা নাহল, আয়ত : ৫৮ ও ৫৯]

মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকরা মহিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সৃষ্টি বলে মনে করত। ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চের লোকদের একটি সম্মেলন হয় যার বিষয় ছিল মহিলাদের মনুষ্য শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত করা যায় কি যায় না সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। সে সম্মেলনে পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহিলারা মনুষ্য জাতির অর্ন্তভুক্ত, তবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষদের সেবার জন্য। মহিলাদেরকে সামান্য কিছু অর্থনৈতিক লেনদেনের সুযোগ দেয়া হলেও তাদের জন্য কোনো ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ ছিল না। তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করারও ক্ষমতা ছিল না। তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না। ১৯৩৮ সালে আইন করে এই বিতর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া পর্যন্ত মহিলারা ছিল খুবই অবহেলিত। ইংল্যাণ্ডে কিং হেনরি অষ্টম মহিলাদেরকে পবিত্রগ্রন্থ পাঠ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মহিলাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কোনো বিষয় ছিল না। রোমান, গ্রীক, জার্মান, ইন্ডিয়া এবং চীনের পরিবারগুলোতে পুরুষরা ছিল প্রধান। মহিলাদের ব্যবহার করা হতো দাসের মতো। বিয়ের বিষয়টি ছিল বিক্রয় চুক্তি। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীকে কিনে নিতো এবং ইচ্ছে হলেই তাকে অন্যত্র বিক্রয় করতে পারত।



www.pathagar.com

## ইসলামে মহিলাদের অধিকার

ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মানবজাতির ইতিহাসে একটি ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। এতে মহিলাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসল। পবিত্র কুরআনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবহারিক সম্পর্কের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। আল-কুরআন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমন্বিত নির্দেশনা জারি করে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজের জন্য সাবধানতার কথা বলা হয়। তাদের উভয়ের জন্যই পুরস্কার ও শাস্তির বিধান সমভাবে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে তিনি কোনো বক্রতা রাখেননি, বরং একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তা তাঁর কঠোর আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে এবং সুসংবাদ প্রদান করে মুমিনদেরকে যারা নেক কাজ করে যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।'-[সূরা কাহফ: ১-৩]। এই আয়াতে আল্লাহতাআলা এটাই বলেছেন যে, আল্লাহর নেয়ামত তাদের জন্যই যারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভালো কাজ করবে। আল্লাহ্ আরো বলেন, 'তারপর তাদের রব তাদের প্রার্থনা কবুল করে বললেন, আমি বিনষ্ট করি না তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর কর্ম তা সে হোক পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা একে অপরের অংশ।'-[সূরা আলে ইমরান : ১৯৫]। আরো বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।'-[সূরা নিসা : ১২৪]

ওপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহতাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন, আল্লাহ নারী কিংবা পুরুষ কারোর সৎকর্মই বৃথা যেতে দেবেন না। তাদের কর্মানুযায়ী তাদের পুরস্কার অবশ্যই পাবে। সৎকর্মকারীদের নেয়ামত দানের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। তারা তাদের নেয়ামত পূর্ণভাবে এবং সমানভাবেই পাবে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত হয় এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তার হেফাযত করে আল্লাহর হেফাযত অনুসারে।'- [সূরা নিসা, আয়াত: ৩৪]। এই আয়তে আল্লাহ ভালো মহিলাদের প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআন বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলাদের প্রশংসা করেছে এবং তাদেরকে একে অপরের জন্য সঙ্গী হবার কথা বলেছে। আল্লাহ্ তাদের একত্র থাকতে বলেছেন এবং ভালো কাজের সহযোগী হতে তাগিদ দিয়েছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের উচিত আল্লাহকে মেনে চলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা। তার বিপরীতে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। পরিশেষে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, 'মুমিন নর ও মুমিন নারী তারা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আনুগত্য করে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের। এদেরই ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, হেকমতওয়ালা।'-[সূরা তওবা, আয়াত :৭১]। আল্লাহপাক আরো ওয়াদা করেছেন বিশ্বাসী পুরুষদের মতো বিশ্বাসী মহিলারা বেহেশতের নেয়ামত ভোগ করবে। তারা



www.pathagar.com

উভয়েই সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং আল্লাহর করুণা লাভে ধন্য হবে। এটা দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবনের জন্য বিরাট পাওনা।' কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিন নর ও মুমিন নারীকে জান্নাতের, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ইহাই মহাসাফল্য।'-[সূরা তওবা, আয়াত :৭২]। আল-কুরআনে আল্লাহ আরো বলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে তখন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাদের রবের আদেশে তারা সেথায় অনন্তকাল থাকবে এবং সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম।'-[সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ২৩]। সূরা রাদ-এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে আসেবে, বলবে, তোমাদের প্রতি অনাবিল শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে, আর তোমাদের এ পরিণাম কত উত্তম।' সূরা নাহলের ১৬ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে নেক কাজ করবে এবং সে মুমিন, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি অবশ্যই তাকে দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করব।'

কোনো কোনো বিশ্বাসী মহিলা মনে করতে পারেন যে, কুরআন তাদের গুরুত্ব দেয়নি। কেননা, কুরআনে তাদের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। তাদের একজন হচ্ছেন নবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর স্ত্রী উম্মে সালমা। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর নবী, আমি পবিত্র কুরআনে মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে তো শুনিনি। তারপরই কুরআনের সেই আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়েছে, তারপর তাদের তাদের প্রার্থনা কবুল করে বললেন–[সূরা আলে ইমরান : ১৯৫]। একজন মহিলা হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমরা দেখি সবকিছুই পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য কিছুই নেই, বরং কুরআনেও তাদের কথা উল্লেখ নেই। তারপরই হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর ওপর নাযিল হয় নিম্নোক্ত আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী–এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।'-[সূরা আহযাব, আয়াত :৩৫]

ওপরে কুরআনের আয়াতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য একই নেয়ামতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসী মহিলাদের জন্য জান্নাতের যেমন নিশ্চিয়তা দেয়া হয়েছে, তেমনি অবিশ্বাসী মহিলাদের ব্যাপারে জান্নাতে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, 'সেদিন আপনি দেখতে পাবেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে যে, তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডানে। তাদেরকে বলা হবে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমন জান্নাতের যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তোমরা অনন্তকাল থাকবে। এটাই



www.pathagar.com

মহাসাফল্য।'-[সূরা হাদীদ, আয়াত : ১২]। মহানবী মুহাম্মদ [সা]-এর সাথে যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেছেন, সেই সব ঈমানদার মহিলাদের আল্লাহ বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহতাআলা পবিত্র কুরআনে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'ওহে, যারা ঈমান এনেছ, যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিযরত করে আসে তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নিবে। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররাও এদের জন্য হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। আর তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যদি তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো তাদের প্রাপ্য মহর প্রদান করে। আর তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চেয়ে নেবে। আর তারাও চেয়ে নেবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ অতি প্রজ্ঞাময়। আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়। তারপর তোমরা সুযোগ পাও, তা হলে যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে যে অর্থ তারা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে। যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।'-[সূরা, মুমতাহানা : ১০-১১]

ওপরে উল্লেখিত দুটি আয়াতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১. মহিলারা মহানবী [সা]-এর সাথে যোগ দিতে মদিনায় হিযরত করেছিল শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার নবীর প্রতি গভীর বিশ্বাসের কারণে, অন্য কোনো তাড়নায় নয়।
২. ঈমানদার ও হিযরতকারী মহিলারা তাদের অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট ফেরত যাবে না।
৩. আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে ভালো করে জানেন।
৪. মহিলারা অবশ্যই তাদের অবিশ্বাসী স্বামীদের নিকট ফেরত যাবে না। তাদের মধ্যকার বিবাহ চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা নেই এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, একজন মুসলিম নারী অমুসলিম স্বামীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে, মুসলিম স্বামী অমুসলিম স্ত্রীকে গ্রহণ করাও জায়েজ নেই।
৫. বিয়ের সময় অমুসলিম স্বামীরা যা ব্যয় করেছে তার ক্ষতিপূরণ মহিলারা প্রদান করবে।
৬. অমুসলিম স্বামীকে ত্যাগ করার একটা নির্দিষ্ট সময় পর মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি ঘোষিত।
৭. হিযরতকারী মহিলাদেরকে কিছু অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান করবে সেই মুসলিম স্বামীরা।
৮. অমুসলিম স্ত্রীদের মুক্ত করে দেয়া এবং যতক্ষণ না তারা মুসলিম হবে তাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক বহাল না রাখা।
৯. অমুসলিম স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার সময় সেই অর্থসম্পদ ফেরত পাবে যা সে ইতোমধ্যে তার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করেছে। অনুরূপভাবে একজন মুসলিম স্বামী ও তার স্ত্রীর জন্য যা ব্যয় করেছে তা ফেরত পাবে, কেননা স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাসের সাথে একমত নয়।



www.pathagar.com

১০. মুসলিম স্বামীরা তাদের অমুসলিম স্ত্রীদের কাছ থেকে সেই অর্থ ফেরত পাবার অধিকার রাখে যা তারা বিয়ের সময় স্ত্রীর জন্য ব্যয় করেছে।

১১. সুবিচারের মনোভাব বজায় রাখা এবং যার যার প্রাপ্য ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর কথা মনে প্রোথিত রাখা।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহতাআলা মহিলাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তা বিশদ বর্ণনা করেছেন। মহিলাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত করা। দ্বিতীয়ত: তাদের উচিত বড় বড় গুনাহের কাজ যেমন চুরি, ডাকাতি, শিশুদের হত্যা, মিথ্যা বলা, অবৈধ সন্তানধারণ এবং তাদের সন্তানদের স্বামীর নামে ডাকা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। তৃতীয়ত: আল্লাহ ও তাঁর নবীর আদেশ মেনে চলা। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর নবীর আদেশ ন্যায়পূর্ণ এবং অশুভ ও অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে নির্দেশিত। মহিলারা যদি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নীতি নিয়মের মধ্যে জীবন যাপন করে তাহলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে নবী, মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না। তারা চুরি করবে না। তারা ব্যভিচার করবে না। তারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। তারা জেনেশুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না। তখন আপনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। অতিশয় দয়ালু।'-[সূরা মুমতাহানা, আয়াত : ১২]। আল্লাহতাআলা মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি কাউকে উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, আল্লাহ একে না করার আদেশ দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে : 'ওহে, যারা ঈমান এনেছ। তোমাদের কোনো পুরুষ যেন কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, তারা উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারীও যেন অন্য কোনো নারীকে উপহাস না করে। কেননা, তারা উপহাসকারিণীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যকে খোঁটা দিও না এবং একে অন্যাকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর ফাসিক নাম যুক্ত হওয়া অতি গর্হিত। আর যারা এরূপ কার্যাবলী থেকে নিবৃত্ত না হয় তারাই প্রকৃত অনাচারী।'-[সূরা হুজরাত, আয়াত : ১১]।

স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহতাআলা পুরুষ ও নারীদের প্রতি সমান নিয়ম নির্দেশ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন কিছু করতে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমাদের কাউকে কারো ওপর। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ। আর প্রার্থনা করো আল্লাহ কাছে তার অনুগ্রহ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।'-[সূরা নিসা, আয়াত : ৩২]। মুসলিম নারীরা তাদের পিতামাতা বা আত্নীয়দের কাছ থেকে তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্য পাবার অধিকার রাখে। নারী ও পুরুষ উভয়েই নিহত আত্নীয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বলা হয়েছে: 'আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি সে সম্পত্তির যা ছেড়ে যায় পিতামাতা ও নিকট আত্নীয়রা। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছো



www.pathagar.com

তাদের দিয়ে দাও তাদের প্রাপ্য অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।'-[সূরা নিসা, আয়াত : ৩৩]

## উপসংহার

নারী অধিকারের বিষয়ে যারা বেশি সোচ্চার তারা মনে রাখবেন যে, ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা আর কোনো মতবাদ, নীতি ও ধর্ম দেয়নি। আর নারীদের সমানাধিকারের নামে যারা সারা বিশ্বে হই-চই ও তোলপাড় সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তাদের নিজেদের স্ত্রী ও পরিবারের দিকে এবং সেই সমাজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন আসলে সেখানে নারীরা সমান অধিকার পাচ্ছে কিনা। আসলে তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার মোটেও পাচ্ছে না, বরং তারা হচ্ছে শোষিত ও অত্যাচারিত। পশ্চিমা বিশ্বে নারীরা স্রেফ ভোগের সামগ্রী ও পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে দেখা যায়, পুরুষের নিপীড়নের কারণে সেখানে প্রতিনিয়ত তালাক ও ছাড়াছাড়ির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। বিপরীতপক্ষে, মুসলিম বিশ্ব ও পরিবারে তার সংখ্যা খুবই কম। এ কারণে, পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের যে ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটছে তার অধিকাংশই নারী। ইসলাম নারীর যে অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে, সেই সৌন্দর্য অবলোকন করেই নারীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আর ইসলামের এই গতিকে থামিয়ে দেবার জন্য একটি গোষ্ঠী অন্যায়ভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামে নারীর অধিকারের বিষয়ে অপপ্রচারে নেমেছে। যদিও এসব অপপ্রচার এখন আর ধোপে টিকছে না। ইসলামী আদর্শ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পড়াশোনার সুযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে ইসলামে নারী অধিকারের বিষয়গুলো সবার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। নারীদের প্রতি আমাদের অনুরোধ হচ্ছে, আসুন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করি এবং অন্যদের মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় কান না দিয়ে ইসলামের শোভা ও সৌন্দর্যে অবগাহন করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করি। আমিন।



www.pathagar.com

# মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বিচারব্যবস্থা

**জাফর আহমদ**

একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার যতগুলো দিক ও বিভাগ প্রয়োজন সেই সব দিক ও বিভাগ দিয়েই মানব সম্প্রদায়ের জন্য দ্বীন ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদ [সা] ছিলেন সেই সব বিভাগের একজন দক্ষ মহামানব। একজন পূর্ণাঙ্গ মহামানব হিসেবে তিনি ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক, সাথে সাথে তিনি ন্যায়পরায়ণ প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। দক্ষতার সাথে তিনি যেমন প্রশাসন পরিচালনা করেছেন, তেমনি তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। তিনি তার জীবদ্দশায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অনেক বিচার ফয়সালা করেছেন। পক্ষপাতিত্ব, প্রভাবিত, আবেগতাড়িত হয়ে কোন বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন এমন একটি ছোট্ট ঘটনাও তার বিচারপতি জীবনের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। তিনি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে কোনদিন নিজের আহাল, আত্মীয়-পরিজন ও জলিল-কদর কোন সাহাবীর পক্ষও অবলম্বন করেননি। তিনি বলতেন, 'যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে, তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিবো।' এ জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠতর মহামানবের সাথে সাথে একজন শ্রেষ্ঠ প্রধান বিচারপতিও বটে। তাঁর এ ন্যায়বিচারের কারণেই হাজরা থেকে সানআ মাউত পর্যন্ত সুন্দরী তনয়া, মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিতা, একাকিনী দিনে রাতে পথ চলছে, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করবে তো দূরের কথা তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করতো না। তাঁর জীবদ্দশায় কয়টি বিচার তার আদালতে এসেছে জানা না থাকলেও অবশ্যই তা নগণ্যই হবে। কারণ সমাজ ও সভ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে অপরাধপ্রবণতা একেবারেই কমে গিয়েছিল। মানুষ অপরাধ করলে বিবেকের অবিরত কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে নিজের মামলা নিজেই দায়ের করতো। প্রসিদ্ধ সেই মহিলার ঘটনা আমরা জানি যে জেনা করে রাসূলের [সা] বিচারালয়ে নিজের কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করলেন। প্রধান বিচারপতি রাসূল [সা] প্রথমত সন্তান প্রসব, দ্বিতীয়ত আড়াই বছর দুগ্ধ পান করাবার নির্দেশ দিলেন। মহিলা কেঁদে কেঁদে এই ভয়ে চলে গেলেন যে, এ সময়ের মধ্যে যদি আমি বিনাবিচারে মৃত্যুবরণ করি তবে আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় কী জবাব দিবো। এই ছিল একজন শ্রেষ্ঠ প্রধান বিচারপতির ন্যায়বিচারের সামাজিক প্রভাব।



www.pathagar.com

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দারুণভাবে উপেক্ষিত। বিশেষ করে যখন যেই সরকার ক্ষমতায় থাকেন, তাদের মন মর্জি ও হুকুম তামিল করতে গিয়ে ন্যায়বিচার আদালতের কঠিন দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজেকে রক্তাক্ত করে। ন্যায়বিচারের করুণ আর্তনাদ ও গগনবিদারি কান্না আমাদের বর্তমান বিচারপতিদের হৃদয়কে ক্ষণিকের জন্য আহত করে না। কত নিরপরাধ নিরীহ বনিআদম চার দেয়ালের ভেতর থেকে পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানবতা বা মানবিক মূল্যবোধ তো আজ গোবেচারা বয়সের ভারে ন্যুব্জ, পাইক-পেয়াদাদের মতো বড় বড় লেজার বুক নিয়ে এ অফিস থেকে ও অফিসে, কে তার কথা শোনে। মানবতার রক্ষক বিচারপতিরাই আজ মানবতাকে দূর কোন মহাসাগরের কালা পানির দেশে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। আদালতকে বলা হয় মানুষের বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের বিশেষ স্থান। আশাহত মানুষ এ দ্বার থেকে ও দ্বারা শেষাবধি ভারসাম্যপূর্ণ দাঁড়িপাল্লার এ অফিসটির দ্বারস্থ হয়। কিন্তু এখানে দেখা যায়, মানবতার সাথে কী পরিমাণ অসদাচরণ করা হয়? পৃথিবীর দেশে দেশে প্রধান বিচারপতিদের সৌজন্যে রাসূল [সা] এর বিচারালয়ের ন্যায়-ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার কিছু ইতিহাস আলোচনা করতে চাই। সম্মানিত বিচারপতিগণ যদি আহকামুল হাকিমের তথা সমস্ত বিচারপতিদের বিচারপতি আল্লাহ রাববুল আলামিনের কথা ভেবে রাসূলুল্লাহ [সা] এর বিচারব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ ও নিরপেক্ষতাকে স্থান দিতে পারেন তবে নিজেরা যেমন প্রশান্তি লাভ করবেন, সাথে সাথে উপকৃত হবে বিশ্বমানবতা। হাশরের দিনের কথা একটু স্মরণ করুন, যখন পরোয়ারদিগার ক্ষমতার সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে বিচারপতির আসনে আসীন হবেন তখন দুনিয়ার বিচারপতিদের কী অবস্থা হবে? যারা রাসূল [সা] অনুসৃত পন্থায় বিচার-ফয়সালা করেছেন তাদের জন্য কোন চিন্তা থাকবে না। রাসূল [সা] এর অনুসৃত নীতি ও বিচার ফয়সালাই কেবল মানবসমাজে ইনসাফ ও আদল পুন:প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সূরা রহমানে তাকিদ করা হয়েছে: "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না।" [আয়াত ৮-৯] যেহেতু আমরা এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বসবাস করছি যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গণ্ডির মধ্যে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি আমরা বে-ইনসাফী করি এবং হকদারদের যে হক আমাদের জিম্মায় দেয়া হয়েছে, তা যদি হরণ করি তাহলে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহা বিশ্ব প্রকৃতি জুলুম তো দূরের কথা দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিস কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।



www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা মিযান [দাঁড়িপাল্লা] কায়েম করেছেন অর্থ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করেছেন। এ মিযানে কমবেশ করো না মানে অবিচার ও বে-ইনসাফী করো না। গোটা বিশ্ব দাড়িপাল্লার মতো ভারসাম্যপূর্ণ। এর মধ্যে সামান্য এদিক সেদিক হলে পৃথিবীতে প্রাণের কোন অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং সামান্য ক্ষমতা পেয়ে যে ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, আল্লাহর সামান্য আলো-বাতাস, অক্সিজেন, শ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য সময়ের জন্য ক্ষমতাধারীর ক্ষেত্রে স্তব্ধ করে দেয়া হয়, তবে চিন্তা করুন কী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন। দাঁড়িপাল্লায় ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করবেন না। মনে রাখবেন, ক্ষমতায় যারা আছে তাদের প্রাণ আর শাসিতের প্রাণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আপনি যদি ন্যায়ের পথে থেকে বিচার-ফয়সালা করেন তবে পৃথিবীর কেউ আপনাকে কিছুই করতে পারবে না। কারণ হায়াত-মওতের ফয়সালা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়। আপনার মান-সম্মান, ইজ্জত-অপমান, রিজিকের মালিক মহান রব।

## প্রভাবশালী ও দুর্বলের বিচার ফয়সালা

বুখারী-মুসলিমে আছে একবার মাখজুমী গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। নবী করীম [সা] তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিল সম্ভ্রান্ত গোত্রের। তারা বলাবলি করতে লাগলো, উসামা ইবনু যায়িদ ছাড়া আর কে আছে, যাকে আল্লাহর রাসূল [সা] অত্যধিক ভালোবাসতেন। তারা উসামা [রা]কে সুপারিশের জন্য রাসূল [সা] এর কাছে পাঠালেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে রাসূল [সা] এর সাথে কথা বললেন, তখন নবী করীম [সা] বললেন, "হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার সুপারিশ করতে এসেছো?" তখন উসামা ইবনু যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে। অত:পর নবী আকরাম [সা] মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পেশের পর বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। ঐ সবার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।'

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম [সা] এর নিকট এক ক্রীতদাসকে হাজির করা হলো, যে চুরি করেছিল। তাকে চারবার নবী করীম [সা] এর কাছে আনা হলে চারবারই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। পঞ্চমবার তাকে হাজির করা হলে তখন রাসূল [সা] হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। পরে ষষ্ঠবার হাজির করা হলে তার একটি পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সপ্তম বার তার অপর হাত কাটার আদেশ দিলেন।



www.pathagar.com

অষ্টমবার তার দ্বিতীয় পা কেটে দেন। রাসূলের [সা] আদালতের উল্লেখিত দু'টি বিচার এখানে উল্লেখ করার অর্থ হলো, তাঁর বিচারব্যবস্থায় সমাজের প্রভাবশালী বা দুর্বল কোনটিই প্রভাব ফেলতে পারতো না। যা ন্যায়সঙ্গত, যা সঠিক তাই সেখানে বাস্তবায়িত হতো।

**বাকপটুতার দ্বারা রায় নিজের পক্ষে নেয়া মানে আগুনের টুকরা নেয়া**

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী [সা] বলেছেন, 'আমি তো একজন মানুষ। দু'জন ঝগড়াকারী এসে আমার কাছে অভিযোগ করলে, যে অপেক্ষাকৃত বেশি বাকপটু আমি তার দিকে রায় দিতে পারি এই মনে করে যে, সে সত্য বলেছে, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। এরূপ করলে এবং তার পক্ষে রায় দিলে, সে যেন আগুনের টুকরো নিয়ে গেল।' বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'যাকে আমি [ভুল বুঝে] মুসলমানের সম্পদের মালিক বানিয়ে দেবো, তা আগুনের টুকরা মাত্র। ইচ্ছে করলে সে নিতে পারে অথবা ত্যাগ করতে পারে।

**উভয়ের বক্তব্য শুনে বিচার করা ও রায় দেয়া**

আবু দাউদে হযরত আলী [রা] হতে বর্ণিত- তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ [সা] ইয়েমেনে [দায়িত্ব দিয়ে] পাঠাচ্ছেন অথচ আমার বয়স তখন কম, বিচার ফয়সালা করার মতো কোন জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার অন্তরকে হিদায়াত দেবেন এবং তোমার জবান দৃঢ় রাখবেন। যখন বাদি-বিবাদি তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন একজনের বক্তব্য শুনেই রায় দেবে না বরং দু'জনের বক্তব্য শুনবে। এতে ফায়সালার দিগন্ত তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।' হযরত আলী [রা] বলেন, এরপর আমি সেখানে বিচার ফয়সালা করতে গেলাম কিন্তু কোনো বিচারের রায় দিতে গিয়ে আমি কখনো সন্দেহে পড়িনি।

আসুন মানবতার মহান বন্ধু, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] এর ন্যায় তাকওয়ার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করি। আহকামুল হাকিমিনের সামনে হাজির হওয়ার আগে এমন কোন বিচার ফয়সালা না করি যাতে মহান প্রভুর সামনে অপমানিত হতে হয় এবং কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ আমাদের শাসক ও বিচারপতিদের সুমতি দিন।



www.pathagar.com

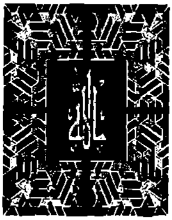

# মহানবী [সা]-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য

নাসির হেলাল

'আপনি অবশ্যই মহান বরিত্রে অধিষ্ঠিত।' [৬৮:৫]

রাসূলুল্লাহ [সা] সম্বন্ধে মহান রাব্বুল আলামীনের উক্ত লক্ষ্য ও মূল্যায়ন তাঁর অনুপম চরিত্রের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সনদ। হযরত আদম [আ] থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে ও ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে নি:সন্দেহে রাসূলুল্লাহ [সা] তাদের সবার মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এ জন্যই মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।' [৩৩:২১]

হাফিয আবূ শায়খ ইস্‌ফাহানী রচিত 'আখলাকুন্ নবী [সা]' গ্রন্থে আখলাক বা চরিত্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'অভিধান প্রণেতাগণ লিখেছেন, 'আখলাক' [ আরবী] শব্দটি খুলক [ আরবী]-এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ও শিষ্টতা। আল্লামা ইবনুল আছীর জাযারী [রা] বলেন, মানুষের বাহ্য আকার-আকৃতির ক্ষেত্রে যেমন 'খালক' শব্দ ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনি তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও গুণাবলীর জন্য 'খুলুক'–শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলি যেমন ভাল হয়, তেমনি মন্দও।'

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে চরিত্র অর্থ লিখেছে-১. প্রকৃতি; স্বভাব। ২. আচরণ; চলাচল। ৩. রীতিনীতি; ব্যবহার বিধি; কায়দা-কানুন। ৪. সদগুণ; উন্নত আদর্শ; সুনীতি; সদাচার। ৫. প্রকৃতি বা আদর্শের জোর; দৃঢ়তা; বলিষ্ঠতা ইত্যাদি।

আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব চরিত্র শব্দটির অর্থ লিখতে গিয়ে অভিধানে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মহানবী [সা]-এর চরিত্রে তার সবগুলোরই সমাবেশ রয়েছে। আমরা জানি তিনি ছিলেন নবী রাসূলদের সর্দার। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যুগে যুগে যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেয়ার জন্য কাজ করেছেন তাঁদের নেতা। আর এজন্য আল্লাহ তাঁকে স্বাক্ষীরূপে ও সুসংবাদাতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

'হে নবী। আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সকর্তকারীরূপে, আল্লাহর অনুমতি ক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।' [৩৩:৪৫-৪৬]



www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র কত মহান ছিল তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিম্নোক্ত ঘোষণা থেকে বুঝা যায়, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।' [৪:৮০]

এমনকি আল্লাহকে ভালবাসতে হলে, আল্লাহকে পেতে হলে, রাসূলুল্লাহ [সা]কে ভাল বেসে তাঁকে অনুসরণ করেই তা করতে হবে। অন্য কোন পথে নয়। ইরশাদ হচ্ছে-'হে নবী। আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।' [৩:৩১]

আমরা জানি যারা চরিত্রবান, যারা মহান তারা সাধারণত, উদার ও কোমল হৃদয়ের মানুষ হয়ে থাকেন, দরদী মানুষ হয়ে থাকেন। মানুষের দু:খ কষ্টে তাঁরা এগিয়ে আসেন, সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমরা মহানবী [সা]-এর চরিত্রে উদারতা, কোমলতা ও দরদী হৃদয়ের মহাপ্রস্রবণ দেখতে পাই। আল্লাহ নিজেও রাসূল [সা]-এর এ মহান চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছো; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।' [৩:১৫৯]

আসলে মুহাম্মদ [সা]-এর চরিত্র ছিল মহত্তম চরিত্র। সারা বিশ্বের সব যুগের মানুষের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে রহমতের দরিয়া হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। নি:সন্দেহে রাসূলুল্লাহ [সা]-কে আল্লাহ বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য রহমত ছিলেন সে কথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'আপনাকে কেবল সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' [২১:১০৭]

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র এতটাই মহান ছিল যে, যে কোন মানুষের দু:খে তিনি দু:খিত হতেন, কষ্টে কষ্ট পেতেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তাঁর পেরেশানির অন্ত ছিল না। ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এমন একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।' [৯:১২৮]

শুধু তাঁর অনুসারীগণই নয়, অন্যরাও তাঁর সত্যবাদিতায়, তাঁর আচরণে মুগ্ধ ছিল। আরবের সেই জাহেলী যুগে, ইসলাম প্রচারের সময়ে-কাফেরগণ ইসলামের দাওয়াত কবুল না করলেও, দাওয়াতী কাজের বিরোধীতা করলেও তাকে কখনো চরিত্রহীন বলেনি, মিথ্যাবাদী বলেনি এবং তারা তাকে আল আমিন, আস্ সাদিক উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং সে নামেই তাঁকে সম্বোধন করত। ইরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্য আমি জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালংঘনকারিগণ আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।' [৬:৩৩]

রাসূলুল্লাহ [সা]-কে মহান রাব্বুল আলামীন উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য এ ধরার ধূলায় পাঠিয়েছেন তা নিজেই বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য' [আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮]। অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, 'আল্লাহ পাক আমাকে শ্রেষ্ঠতম আখলাকের এবং উত্তম কার্যাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন।' [আল-মাওয়াহিবুল লা দুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৭]।



www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা] আরও বলেন, 'আমার প্রতিপালক আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার আচার ব্যবহারকে অতি উত্তম করে দিয়েছেন।' [মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা], পৃ: ৩৯৪]

মুহাম্মদ [সা] নিজে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যেমন সত্য তেমনি তিনি তাঁর অনুসারীদেরকেও সেইভাবে তৈরি করেছিলেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মদী অর্থাৎ মুমীনগণ সেই চরিত্রের অধিকারী হোক তা মনে প্রাণে কামনা করতেন। তিনি বলেন, 'মুমিনদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান।' [তিরমিযী, আবু দাউদ] রাসূলুল্লাহ [সা] আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রে সবার সেরা।' [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে সেই ব্যক্তির মর্যাদায় পৌঁছে যায়, যে দিনভর রোযা রাখে, রাতভর সালাতে রত থাকে।' [আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ]।

রাসূল [সা] আরও বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর প্রিয়তম বান্দা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে অধিক ভাল।' [তাবরানী]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আখিরাতে আমার মজলিসসমূহে আমার সবচেয়ে কাছাকাছি হবে সেই ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।' [আখলাকুন নবী [সা], পৃ: ১৬]

কোন মানুষের চরিত্র কেমন তা সব থেকে ভাল বলতে পারেন তার কাছের অর্থাৎ পরিবারস্থ লোকজন। আরও ভাল বলতে পারেন তার স্ত্রী। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ [সা] নিজেই বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিজনের কাছে উত্তম।' [সীরাত বিশ্বকোষ, পৃ: ২৯]

অন্য এক হাদীসে আছে, 'তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।' [তিরমিযী, আস-সুনান]।

এবার আসুন তাঁর পরিবারের সদস্যগণ তাঁর সম্পর্কে কি বলেন তা একটু খতিয়ে দেখি। হযরত আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] থেকে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আর কোন লোক ছিলেন না।'

আয়েশা [রা] আরও বলেন, 'তাঁহার সাহাবা ও পরিবারবর্গের মধ্য হইতে কেন যখন তাহাকে ডাকিতেন তখন তিনি জবাবে বলিতেন, লাব্বায়ক-আমি হাজির। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁহার সম্পর্কে নাযিল করিয়াছেন, 'নি:সন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।' [সীরাত বিশ্বকোষ, ১০ম খন্ড পৃ:]

যেদিন ওহী নাযিল হয় স্ব-মূর্তিতে জিবরাইল [আ]কে দেখে ও ওহী নাযিলের ভারে রাসূলুল্লাহ [সা] হেরা গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এসেছিলেন। তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং বাড়ি ফিরে হযরত খাদিজাতুল কুবরা [রা]কে ডেনে বলেছিলেন, আমার জীবন সম্বন্ধে আশংকা হচ্ছেম তুমি আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। ঐ সময় বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ [সা]কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অভাবীর অভাব মোচন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।' [ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩]।



www.pathagar.com

আল-কুরআন ছিল রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র। হাদীসে আছে, 'জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র [রহ] বলেন, আমি হযরত আয়েশা [রা]-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।'

অন্য হাদীসে আছে–হযরত ইয়াযীদ ইবন বাবানূস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা [রা]-এর কাছে হাজির হয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র ছিল আল কুরআন। তারপর তিনি বলেন, তোমরা কি সূরা মু'মিনূন পড় না? আমরা বললাম হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বললেন, পড়। তখন আমি পড়লাম, 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ; যারা নিজেদের সালাতের মধ্যে বিনয় নম্র, যারা অসাড় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে; যারা যাকাত দানে সক্রিয়; যারা আপন যৌনাংগকে সংযত রাখে।' [সূরা মুমিনূন]

এরপর হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর চরিত্র এরূপই ছিল।' [আখলাকুন-নবী, পৃ: ২]

হযরত আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা [রা]কে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তিনি ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত কোনভাবেই কখনও অশ্লীল কথা বলতেন না, হাট-বাজারে শোরগোল ও চিৎকার করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দ্বারা করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন।' [আত-তিরমিযী, আস-সুনান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২]।

অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তিনি ছিলেন সর্বাধিক সৎ, ভদ্র ও হাসিখুশি মানুষ।' [আখলাকুন-নবী, পৃ:১৩]

উম্মেহাতুল মুমেনিন হযরত সাফিয়া [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ [সা.] অপেক্ষা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।' [ইউসুফ কান্ধলবী, হায়াতুস সাহাবা, ৩ খণ্ড]

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে পরিবার-পরিজনের পরেই সাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে আপনজন। মূলত: তিনি সর্বদা সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। অনেক সাহাবীই রাসূল [সা]কে একান্ত কাছ থেকে দেখেছেন। দীর্ঘকাল তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতেও মুহাম্মদ [সা]-এর চরিত্র ছিল সর্বোত্তম চরিত্র। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ [সা] নিজেই বলেছেন, 'সাথী হিসেবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে উত্তম যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম।' [সীরাত বিশ্বকোষ, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩১]

হযরত আনাস [রা] শিশুকাল থেকে দীর্ঘ দশ বছর রাসূল [সা]-এর সেবক হিসেবে কাছ করেছিলেন; ফলে তিনি তাঁর চলা-ফেরা, ওঠা-বসা খুব ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করেন। তিনি বলেন, 'দশ বছর পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাহচর্যে ছিলাম এবং সব রকমের আতরের আমি ঘ্রাণ নিয়েছি। কিন্তু তাঁর মুখের ঘ্রাণ থেকে উত্তম কোনো ঘ্রাণ আমি শুকিনি। সাহাবাদের মধ্যে কারো সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তখন তিনি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং যে পর্যন্ত তিনি তাঁর থেকে পৃথক না হতেন, নিজে তাঁর থেকে পৃথক হতেন না। আর যখন কোনো সাহাবী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তাঁর হাত মুবারক তাঁর হাতে নিতেন তখন যে পর্যন্ত ঐ সাহাবী যখন তার সাথে মিলিত হয়ে তাঁর কানে কানে কোনো কথা বলতে চাইতেন, তখন তিনি তাঁর কান তার দিকে পেতে দিতেন এবং সেই পর্যন্ত তাঁর কান সরিয়ে আনতেন না, যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজে না সরিয়ে নিতেন।'



www.pathagar.com

অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বহু বছর খিদমত করেছি। [এই দীর্ঘ সময়ে] তিনি আমাকে কখনো গালি দেননি, মারপিট করেননি, ধমক দেননি, চোখ-রাঙাননি। আর এমন কোনো বিষয়ে তিনি আমাকে তিরস্কারও করেননি, যা তিনি আমাকে করতে আদেশ করেছেন অথচ আমি তা করতে আলস্য করেছি। তাঁর গৃহের কেউ যদি এ ব্যাপার আমাকে ভৎর্সনা করতো, তবে তিনি বলতেন, আরে রাখো তো!

রাসূলুল্লাহ [সা.] ছিলেন মিষ্টভাষী একজন মানুষ। তিনি সর্বাবস্থাতেই মার্জিত ও রুচিসম্মত ভাষা ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে হযরত ইবন উমর [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী [সা] না অশ্লীল ভাষী ছিলেন, নির্লজ্জের মত ভাষা প্রয়োগ করতেন। বরং তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোত্তম।'

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ [সা.] অপেক্ষা অধিক দানশীল ও দাতা, অধিক সাহাসী, বড় বীর, অধিক ধৈর্যশীল ও পরিতুষ্ট কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি।'

সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী [রা] ছিলেন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর একান্তই নিকটতম। আপন চাচাত ভাই হওয়ার কারণে তিনি রাসূল [সা]-এর ঘরেই লালিত পালিত হয়েছেন। পরবর্তীতে হযরত ফাতিমা [রা]-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। সেই হযরত আলী [রা]-এর দৃষ্টিতে রাসূলূল্লাহ [সা] কেমন ছিলেন তা তুলে ধরেছেন, গাফারার আযাদকৃত গোলাম হযরত উমর ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, হযরত আলী [রা]-এর বংশধর ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়ার আমাকে বলেছেন, হযরত আলী ইবন আবূ তালিব [রা] যখনই রাসূলূল্লাহ [সা]-এর গুণাবলী বর্ণনা করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ [সা] সবচেয়ে দানশীল ও উদারহস্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিক সুসম্পর্ক রক্ষাকারী। তাই যে কেউ তাঁর সাথে মেলামেশা করতো এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হতো, সেই তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতো।'

আলী [রা] রাসূলুল্লাহ [সা] সম্পর্কে আরও বলেন, 'মহানবী [সা] হাস্যমুখ, নম্র স্বভাব ও দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। তিনি উগ্র প্রকৃতির ও সংকীর্ণ চিত্ত ছিলেন না। কোন মন্দ কথা। অশ্লীল বাক্য তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে বাহির হইত না। কাহারও দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। যাহা তাঁহার পসন্দ হইত না, মুখ ফিরাইয়া নিতেন। তিনি নিজেকে তিনটি আচরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছিলেন, ঝগড়া-কলহ, অহংকার ও বাজে কথা। অন্যদের সম্পর্কেও তিনি তিনটি বিষয় সর্বদা পরিহার করিয়া চলিতেন–কাহারও কুৎসা রচনা করা, অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা এবং গোপনে ছিদ্রান্বেষণ করা। তিনি এমন কথা বলিতেন যাহা জনগণের পরিণামের জন্য কল্যাণকর। যেই কথা শুনিয়া সকলে হাসিত, তিনিও উহাতে হাসিতেন। যেই বিষয়ে সকলে আশ্চর্যবোধ করিত, তিনিও উহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেন। আগন্তুক ও অপরিচিত ব্যক্তির কর্কশ বাক্য ও অসঙ্গত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যাবলম্বন করিতেন। কেহ কাহারো প্রশংসা করিলে তিনি উহা পসন্দ করিতেন না। কিন্তু কেহ তাঁহার উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রশংসা করিলে তিনি নীরব থাকিতেন। তিনি কাহারও কথার মাঝখানে বাধা দিতেন না। [সীরাত বিশ্বকোষ, ১০ খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৩]।

মহানবী [সা] তাঁর উম্মতের সকল বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি চাইতেন অহেতুক কেউ যেন কষ্ট না পায়। মুয়াজ ইবন জাবাল [রা]কে যখন ইয়েমেনের গভর্ণর



www.pathagar.com

করে পাঠান তখন তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু নসিহত করেন। হযরত মুয়ায [রা] নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] আমাকে ইয়ামেনে [গভর্ণর নিযুক্ত করে] পাঠালেন এবং বললেন, হে মুয়ায! শীতের মৌসুমে তুমি ফজরের সালাত শুরু ওয়াক্তে পড়বে। আর সালাতে কিরাআত এতটুকু দীর্ঘ করবে যতটুকু লোকজনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়। অতিশয় দীর্ঘ কিরাআতের কারণে মানুষের মনে যেন বিরক্তি না আসে। আর গরমের মৌসুমে তুমি ফজরের সালাত শেষ ওয়াক্তে পড়াবে। কেননা [গরমকালে] রাত ছোট হয়ে থাকে-মানুষের ঘুম শেষ হয় না। কাজেই তাদেরকে এতটুকু সুযোগ দেবে যাতে তারাও সালাতে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।' [আখলাকুন নবী, ১৬২ নং হাদীস, পৃ. ১২৭]

অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়-হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [সা.] এর একটি চাটাই ছিল। সেটি তিনি দিনের বেলায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বিছিয়ে নিতেন আর রাতের বেলায় সেটি মসজিদে বিছিয়ে সালাত পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকজন রাতের সালাতে নবী [সা]-এর পেছনে অংশগ্রহণ শুরু করলো। সে কারণে একদিন তিনি রাতের নফল সালাত পড়া ব্যতিরেকেই গৃহে চলে গেলেন। অথচ তখন লোকজনের একটি বিরাট দল তাঁর পেছনে রাতের নফল সালাতে শরীক হতে শুরু করেছিলো। নবী [সা] বললেন, হে মানুষ সকল! তোমরা অতটুকু পরিমাণে আমল কর যা করতে তোমরা সক্ষম। কেননা আল্লাহ পাক কখনো ক্লান্ত হন না তবে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। নি:সন্দেহে সেই সব আমল হলো অতি উত্তম যা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, যদিও না সে আমল সামান্য পরিমাণের হয়। তারপর তিনি বললেন, আমাকে এখানে সালাত পড়তে কেবল এ আশংকাটিই বারণ করেছে যে, এ ব্যাপারে আবার আমার উপর এমন কোন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়ে যায় যা পালনে তোমরা সক্ষম হবে না।' [আখলাকুন নবী, ১৬৬ নং হাদীস পৃ. ১৩৫-১৩৬]

পরবর্তীকালে বিশ্বের নানা ধর্মের প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক, ঐতিহাসিক, লেখক, দার্শনিকগণ মুহাম্মদ [সা] চরিত্র বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে নানা মন্তব্য করেছেন। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বর্তমান ভারতের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ গান্ধী বলেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সে যুগের জীবনধারায় ইসলাম যেস্থান লাভ করেছিল, তা তরবারির বলে নয়। তা ছিল নবী [সা]-এর কঠোর সরলতা, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, ওয়াদা পালনে একান্ত যত্নশীলতা, তাঁর বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, তাঁর সাহসিকতা, তাঁর নির্ভীকতা, আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তাঁর নিয়োজিত প্রচার কার্যের প্রতি বিশেষ আত্মপ্রত্যয়। তরবারির সাহায্য নয়, এ সকল গুণেই সব দিক থেকে তাঁদের সাফল্য দান করেছিলেন, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' [মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী]।

আলফ্রেড ডিলা মারটিন রাসূলুল্লাহ সা. সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'দার্শনিক বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, সেনানায়ক, আইন প্রণেতা, ভাবের বিজয়কর্তা, যুক্তিসঙ্গত ধর্মমতের প্রবর্তক ও প্রতিমাবিহীন ধর্মপদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ [সা]-এর দিকে তাকিয়ে দেখ। মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে, সে সবগুলো দিয়ে তুলনা করলে তাঁর চাইতে মহত্তর কোন লোক ইতিহাসে পাবে কি?'



www.pathagar.com

এ.জি. লিওনার্দ বলেছেন, 'মুহাম্মদ [সা] এমন একজন মানুষ, যিনি কেবল মহৎই নন, বরং সত্যের শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতমও। তিনি কেবল নবী বা ধর্ম প্রবর্তক হিসেবেই মহৎ নন, দেশপ্রেমিক হিসাবেও তিনি মহান। তিনি দুনিয়ায় ও আখিরাতের পথ নিদেশক-পার্থিব ও অধ্যাত্ম সরণি-নির্মাতা। তিনি গড়ে তুলেছেন একটি মহান জাতি এবং একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য। তিনি সত্যের উৎস। তিনি নিজে সত্য, তার নিজের কাছে, তাঁর অনুসারীদের কাছে। তাঁর পরিচিত-অপরিচিতদের কাছে এবং সর্বোপরি তাঁর রবের কাছে।'

জন ডেভনপোর্ট বলেন, 'এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সমস্ত আইন প্রণয়নকারী এবং বিজয়ীদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যার জীবনী মুহাম্মদ [সা]-এর জীবন চরিত থেকে অধিক বিস্তৃত ও সত্য।'

স্টেনলি লেইনপুল বলেন, 'মুহাম্মদ [সা]-এর অকৃত্রিম সৌজন্য, অতুলনীয় বদান্যতা, নির্ভীক সাহসিকতা এসব গুণের কথা আলোচনা করলে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার উদ্রেক হয়। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন। যে ধর্ম প্রেরণা বিশ্বের কল্যাণ সাধন করে, যে ধর্মচেতনা জীবন্ত মানুষকে বিকার থেকে রক্ষা করে, তাঁর ধর্মপ্রাণতা ছিল সেরূপ মানবতামুখী মহৎ ভাবাপন্ন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য যে চেতনাবোধের প্রয়োজন তাঁর কর্মচেতনা ছিল তাই। তাঁর মহৎ চেতনা ও মহৎ প্রেরণা মহৎ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ছিল। তিনি এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার বার্তাবহ রাসূল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপন জীবনব্রত ক্ষণিকের জন্যও ভুলেননি।'

বসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন, 'মুহাম্মদ [সা] একাধারে সিজারের মতো শাসনতন্ত্রের শীর্ষভাগে এবং পোপের ন্যায় ধর্মরাজ্যের উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য এই যে, তিনি একাধারে একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য ও একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। মানবেতিহাসে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই।'

ঐতিহাসিক গীবনের মতে, 'হযরত মুহাম্মদ [সা] ঐহিক ক্ষমতার উচ্চতর আসন লাভ করেও তাঁর দুশমনকেও ক্ষমা করেছেন। যে স্ত্রী লোক তাঁর চাচার কলজে বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল, তাকেও তিনি ক্ষমা করেছেন। তাঁর জন্মভূমির যে সব অধিবাসী তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের অকথ্য উৎপীড়ন করেছিল, তিনি তাদের সকলকেই ক্ষমা করেছেন। পদানত শত্রুকে ক্ষমা করে তিনি ক্ষমা ও উদারতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বের দীর্ঘদিনের সভ্যতার ইতিহাসে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কাউন্ট লিও টলস্টয় রাসূলুল্লাহ [সা] সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি মুহাম্মদ [সা]-এর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর আবির্ভাবের আগে পৃথিবী ছিল ভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছাদিত। তিনি সেই আঁধারে উজ্জ্বল আলোরূপে জ্বলে উঠলেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, মুহাম্মদ [সা]-এর ধর্মপ্রচার ও প্রদর্শন ছিল যথার্থ।'

জর্জ বার্নার্ড'শ আরও এগিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'যদি মুহাম্মদ [সা]-এর মতো কোন লোক বর্তমান বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এর সমস্যার এমনভাবে সমাধান করতেন যাতে জগতে বহুল আকাঙ্খিত চিরস্থায়ী শান্তি ও সুখ আনতে সমর্থ হতেন। আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি, আর আমার মতো একজন বিজ্ঞ লোকের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হবে না যে, সমগ্র ইউরোপে আগামী একশ বছরের মধ্যে সংস্কারকৃত ইসলাম অথবা তার নিয়মাবলী গ্রহণ করবে।'



www.pathagar.com

অন্যদিকে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, 'মুহাম্মদ [সা] ছিলেন একরূপ রাজা। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের তার চারপাশে সমবেত করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অনুসারী মুসলিমরা পৃথিবীর অর্ধেক জয় করে। তারা মাত্র পনের বছরে এত অধিক মানুষকে মিথ্যা দেবদেবী থেকে ফিরিয়ে আনে, এত অধিক দেব মূর্তি ধ্বংস করে, এত অধিক পৌত্তলিক মন্দির ধ্বংস করে, যা পনের'শ বছরেও মূসা [আ] ও ঈসা [আ]-এর অনুসারীরা করতে পারেনি। মুহাম্মদ [সা] ছিলেন একজন মহাপুরুষ। বস্তুত তাঁকে ঈশ্বরই বলা যেতে পারত, যদি না তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন, তার প্রস্তুতি ঘটনা না ঘটতো। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময়ে আরবরা বহু বছর ধরে ঘরোয়া যুদ্ধে জর্জরিত হয়েছিল। এ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে অন্যান্য জাতিরা যা কিছু বড় দেখিয়েছে, আরবরা মুহাম্মদ [সা]-এর একনায়কত্বে সে সমস্ত সংকট দেখে মুক্ত হয়ে তা-ই দেখিয়েছিল, যাতে তাঁদের দেহ ও আত্মা সমভাবে পুনরায় নবীনত্ব লাভ করেছিল।'

আর মাইকেল এইচ, হার্ট তো তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'দি হানড্রেড' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ [সা]কে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে এক নম্বরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের সর্বাধিক অভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিবেচনায় মুহাম্মদই [সা] সর্বোত্তম।'

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন চরিত দেখি তাহলে দেখতে পাবো তিনি অসংখ্য জানের দুশমনকে হাতের মুঠোয় পেয়েও নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছেন, মাফ করে দিয়েছেন। তাঁর দয়া, উদারতার কথা সর্বজন বিদিত। তাঁর চরিত্র মাধুর্য এতটাই উন্নত ছিল যে, অসংখ্য মানুষ তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মুহূর্তে পাল্টে গেছেন এবং ইসলাম কবুল করেছেন। এ রকম হাজারো ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমরা এ লেখায় নিজেদের কথা বেশি না বলে–তাঁর সম্বন্ধে মহান রাব্বুল আলামীন কি বলছেন, স্বয়ং তিনি নিজের সম্বন্ধে কি বলছেন, তাঁর পরিবারের সম্মানিত সদস্য সদস্যাগণ কি বলেছেন, তাঁর প্রিয়ভাজন সাহাবীগণ কি বলেছেন, সর্বশেষে বিশ্বের অমুসলিম মণীষীগণ কি বলেছেন, তার সামান্য অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমরা মুসলমানরা শতভাগ বিশ্বাস করি রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আশরাফুল মখলুকাত। আর এ মানুষের মধ্যে নবী-রাসূলগণ ছিলেন সন্দেহাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং আল্লাহর মনোনীত পুরুষ। এই নবী-রাসূলগণের সর্দার ছিলেন আমাদের মহানবী [সা]। সাথে সাথে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী।

**গ্রন্থপঞ্জী:**

১. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-প্রধান সম্পাদক ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, বাংলাদেশ একাডেমী ঢাকা, নবম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি-২০০৮।

২। সীরাত বিশ্বকোষ, দশম খণ্ড, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৫।

৩। অনুপম আদর্শ, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯২।

৪। আখলাকুন নবী [সা], হাফিয আবূ শায়েখ ইসপাহানী [রা], ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ষষ্ঠ সংস্করণ, মে ২০০৯।



www.pathagar.com

# শ্রমিকের বন্ধু বিশ্বনবী [সা]

**শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া**

আঁধার রাতের বুক চিরে কালো জুলমাতের পর্দা উঁচিয়ে বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের দিশারী হিসেবে ধুলি-ধূসরিত পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ [সা]। বিশ্ব নবী হচ্ছেন ইসলামের প্রধান ও পবিত্রতম মুখপাত্র। আর সংক্ষেপে ইসলাম হলো- কুরআন ও সুন্নাহর সমাহার। বিশ্ব নবীর পবিত্র জীবনে ও কর্মে আল-কুরআনের দর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আল-কুরআনের মূর্ত প্রতীক তিনি।

ইসলাম মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় ও বলিষ্ঠ রক্ষা কবচ। ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল পেশা, শ্রেণী, ধর্মসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক ও অমৌলিক সব রকম অধিকার নিশ্চিত করেছে। এখানেই ইসলামের স্বাতন্ত্র এবং এটিই তার অনুপম ও অনবদ্য বৈশিষ্ট্য।

আমরা এ ক্ষুদ্র পরিসরে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কথা বলবো।

ইসলাম শ্রমিকের অধিকার প্রশ্নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। আল্লাহ পাক বলেন, 'তুমি যাকেই মজুর হিসেবে নিযুক্ত করবে, তন্মধ্যে শক্তিমান ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আমি তোমার ওপর কোনরূপ কঠোরতা করতে চাই না, কোন কঠিন ও দু:সাধ্য কাজ তোমার ওপর চাপাতেও চাই না, আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সজ্জন ও সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে'। [সূরা আল কাসাস : আয়াত- ২৬, ২৭]।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] নিজেও ছিলেন একজন শ্রমিক। তিনি কর্মীর হাতকে শ্রদ্ধা করেছেন। ভালোবেসেছেন দুনিয়ার মেহনতী মানুষকে। কবির ভাষায়, 'নবীর শিক্ষা, করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে'। মহানবী [সা] তাঁর জীবনের একটি অংশ পশুচারণ ও পালন করে অতিবাহিত করেছেন। তিনি ছিলেন মেষের রাখাল। নবী [সা] বলেছেন, "নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সকল নবী ও রাসূল বেশ কিছুকাল পশুচারণ ও পালন করেছেন।" তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- 'আপনিও কি পশুচারণ করেছেন?' তিনি তখন বললেন, "হ্যাঁ, আমিও বেশ কিছুদিন কারারীত উপত্যকায় মক্কাবাসীদের পশু চড়িয়েছি" [সীরাতে ইবনে হিসাম, ১ম খন্ড, পৃ.-১৬৬]।



www.pathagar.com

### ক. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ ও পরিশোধ

শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ ও যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে নবী করিম [সা] সতর্ক ও সাবধান থাকার জন্য কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এ নিয়ে কোন মনোমালিন্য বা অসন্তোষ তৈরী না হয়। এক্ষেত্রে তিনি ইনসাফপূর্ণ নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। একজন শ্রমিক যাতে যথাসময়ে ন্যায্য মজুরী অনায়াসে পেতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রতিটি মালিকের প্রধান কর্তব্য। কেননা, শ্রমিক তাঁর কাজ শেষে সঠিক সময়ে সঠিক মজুরী না পেলে তাঁর ভেতরে কষ্ট, হাহাকার ও হতাশা জন্ম নেয়। শ্রমিক তখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাঁর কর্মস্পৃহা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ যোগাতে গিয়ে তিনি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

রাসূল [সা] বলেছেন, 'মজুরি নির্ধারণ ব্যতীত কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা অনুচিত'। [সহীহ আল বুখারী];

'তুমি যখন কোন মজুর নিয়োগ করবে তখন তাকে তার মজুরী কত হবে অবশ্যই জানিয়ে দেবে'। [নাছায়ী];

'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি পরিশোধ করে দাও'। [ইবনে মাজাহ];

'কর্মরত অবস্থায়ই মজুরীর পরিমাণ সম্পর্কে শ্রমিককে জানিয়ে দাও।' [মীজান আল-হিকমাহ্, হাদীস নং-১৮ এবং কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৯১২৬];

'কিয়ামাতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে, এর মধ্যে একজন সে, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি'। [সহীহ আল বুখারী];

'মজুর-শ্রমিক-ভৃত্যদিগকে যথারীতি খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে'। [মোয়াত্তা-ই-ইমাম মালেক, মুসলিম];

রাসূল [সা] আরও বলেছেন : 'যে ব্যক্তি শ্রমিককে মজুরী প্রদানে জুলুম করে আল্লাহ তাঁর ইবাদত কবুল করবেন না এবং তাকে বেহেশতের সুঘ্রাণ পেতে দেবেন না, যে সুগন্ধ পাঁচশ বছরের দূর থেকেও পাওয়া যাবে' [আমালি আস্-সাদুক্ব, পৃ: ৫১৩, হাদীস নং-৭০৭]।

### খ. শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি [Over Time Bill] প্রদান

অনেক সময় মালিক শ্রমিককে দিয়ে নির্ধারিত কর্মঘন্টার পরেও অতিরিক্ত কাজ করান। বাস্তবতার আলোকে অনেক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অনিবার্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের জন্য অধিক পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। রাসূল [সা] বলেন, 'তোমরা যদি তাদের ওপর অধিক কাজ করার দায়িত্ব চাপাও, তবে সেই হিসেবে 'বাড়তি মজুরী' দিয়ে তাদেরকে সাহায্য কর'।

### গ. শ্রমিককে ব্যবসার লভ্যাংশ [Workers Profit Participation] প্রদান

শ্রমিকগণ দিন-মান খেটে, পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করেন। তাঁর হাড়ভাঙ্গা শ্রম নিয়ে মালিক ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং লাভবান হন। সুতরাং মালিকের লভ্যাংশে শ্রমিকেরও হিস্যা থাকা প্রয়োজন। এটিই ইনসাফের নীতি।



www.pathagar.com

রাসূল [সা] বলেন, 'মজুর ও শ্রমিককে তার শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য থেকেও অংশ প্রদান কর। কারণ, আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না'। [মুসনাদে আহমদ]

**ঘ. শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ [Compensation] প্রদান**

কাজ করার সময় শ্রমিককে যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়। তিনি শ্রম, ঘাম বিনিয়োগ করেন। তাঁর পুরো দেহ, মন ও মনন নিবিষ্টভাবে মালিকের কাজে নিবেদিত হয়। মাথার বুদ্ধি, চোখের দৃষ্টি, কানের শ্রবণ শক্তি, বাহুর বল, পায়ের পদচারণা ইত্যাদি সামষ্টিকভাবে কাজ করে চলে। ফলে কর্মরত অবস্থায় দেহের যে কোন অংশ যে কোন সময় জখম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সুতরাং, যদি শারীরিক কোন জখম হয় সেক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার থাকে মালিকের পক্ষ থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ লাভের। রাসূল [সা] বলেছেন, 'ক্ষতি যথাসাধ্য প্রতিরোধ ও পূরণ হতে হবে'। [আহকামুল আমল ওয়াহু কুকুল আম্মাল পৃ: ২৬]।

**ঙ. শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ, ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন**

শ্রমিকের প্রতি মালিকের সার্বিক আচরণ হওয়া উচিত সহানুভূতিসুলভ ও হৃদ্যতাপূর্ণ। মালিক হবেন প্রকৃত অর্থেই শ্রমিক বান্ধব। কাজ করতে গিয়ে মানুষ ভুল করেন। শ্রমিকরাও ভুল করতে পারেন। এ ভুলগুলো যথাসম্ভব ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। প্রতিটি ভুল মমতার চাদর দিয়ে শুধরে দেয়া উচিত। ভুল ইচ্ছেকৃত আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও হতে পারে। প্রতিটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের মার্জনা হওয়া প্রয়োজন। রাসূল [সা] বলেছেন, 'মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ'। তিনি আরও বলেছেন, 'তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য তৈরী করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সাথে বসাও, সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দু-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খেতে দেবে। কারণ, সে আগুনের তাপ, ধোঁয়া ও খাদ্য প্রস্তুতের যাতনা সহ্য করেছে'। [তিরমিযী]।

'তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ পাক যে ভাইকে অন্য ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খাওয়াবে যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরতে দিতে হবে যা সে নিজে পরিধান করে'। [সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম]।

"শ্রমিকের ওপর জুলুম করা কবীরাহ্ গুনাহ।" [মীজান আল হিকমাহ্, হাদীস নং ১৭, বিহারুল আনওয়ার, খন্ড- ১০৩, পৃ: ১৭০, হাদীস নং ২৭]

**চ. শ্রমিকের ওপর সাধ্যাতিরিক্ত কাজ প্রদান না করা**

সাধ্যের বাইরে কোন কাজ শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দেয়া অনুচিত। এতে শ্রমিকের দেহ মন ভেঙে যায়। শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। জীবনী শক্তির দ্রুত হ্রাস ঘটে। সর্বোপরি কাজের মানও কমতে থাকে। সুতরাং সাধ্যের বাইরে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো অন্যায় ও অমানবিক। রাসূল [সা] বলেছেন, 'শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সেই কাজে তাকে সাহায্য কর'। [সহীহ আল বুখারী, মুসলিম]।

'শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না যা তাকে সেটির দু:সাধ্যতার কারণে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে'। [সহীহ আল বুখারী]।



www.pathagar.com

### ছ. গৃহকর্মী, ভৃত্য, দাস-দাসী, অধীনস্ত প্রসঙ্গ

মহানবী [সা] গৃহকর্মী, ভৃত্য, দাস-দাসী ইত্যাদি অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন। এমন আচরণ করতে বলেছেন যাতে তাঁরা প্রাণবন্ত থাকেন এবং প্রণোদিত হন। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন, 'তোমাদের গোলাম, তোমাদের ভৃত্য, তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে; নিজেরা যা পরবে, তা-ই তাদের পরতে দিবে।'

### একটি ঘটনা

যায়েদ এক যুবকের নাম। শৈশবে আরব বেদুইন ডাকাতদল তাঁকে একটি কাফেলা থেকে অপহরণ করে উকায মেলায় ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। হাকীম ইবনে হিযাম তাঁকে আপন ফুফু খাদীজার জন্য কিনে নেন। বিয়ের পর হযরত খাদীজা ক্রীতদাসটিকে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর কাছে অর্পণ করেন।

মহানবী [সা]-এর মনের পবিত্রতা, স্বচ্ছতা এবং তাঁর উত্তম চরিত্রের কারণে ছেলেটি তাঁর প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি যায়েদের পিতা যখন ছেলের খোঁজে মক্কায় আসেন এবং মহানবী [সা]-এর কাছে তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আবেদন জানান, যাতে করে তাঁকে মায়ের কাছে ও পরিবারের মাঝে নিয়ে যেতে পারেন, তখন তিনি পিতার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান। বরং মহানবীর কাছে থাকাকে নিজের জন্মভূমি এবং আত্মীয়-স্বজনের মাঝে থাকার ওপর অগ্রাধিকার দেন। রাসূল [সা] তাঁর নিকটে থাকা বা নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি যায়েদের ওপর ছেড়ে দেন। এটি ছিল উভয় পক্ষের আত্মিক আকর্ষণ ও মমতার নিদর্শন। যায়েদ যেমন মহানবী [সা]-এর চারিত্রিক মাধুর্যের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন, মহানবীও তেমনি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসা এতটা প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁকে তিনি আপন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সাহাবাগণ তাঁকে 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ' বলতেন। মহানবী [সা] ব্যাপারটি আনুষ্ঠানিক হবার জন্য একদিন যায়েদের হাত ধরে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন : "এ হচ্ছে আমার সন্তান।" এ আত্মিক টান ও মমত্ববোধ ততদিন বলবৎ ছিল যতদিন না মুতার যুদ্ধে যায়েদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ইন্তিকালে মহানবী ঔরসজাত সন্তান হারাণোর মতোই শোকাহত হন। [উসদুল গাবাহ্, ইস্তিআব ও আল ইসাবাহ্ গ্রন্থের 'যায়েদ' অধ্যায়।]

### শ্রমিকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

মালিকের পাশাপাশি শ্রমিকেরও বিস্তর দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিক মালিকের প্রতি বিবেকের দায়ে দায়বদ্ধ ও বিশ্বস্ত থাকবেন। এটিকে তিনি হালাল রুজি আহরণকল্পে ইবাদততুল্য জ্ঞান করবেন। শ্রমিক নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে হাজির হবেন। নির্মল চরিত্র নিয়ে নিরলসভাবে মন দিয়ে কাজ করবেন। কাজের যাতে ক্ষতি না হয় অথবা মালিকের সম্পদের যাতে কোনরূপ ক্ষতি না ঘটে সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এ ব্যাপারে রাসূল [সা] বলেছেন 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কর্মচারী তার মনিবের মালের জন্য দায়িত্বশীল এবং সেজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে'। [সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম]।



www.pathagar.com

'গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক। সে তার অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না।' [সহীহ আল বুখারী]

শ্রমিক মালিকের অথবা মালিকের নিয়োজিত প্রতিনিধির বৈধ নির্দেশনা হুবহু প্রতিপালন করবেন। তিনি কোন ধরনের অসদাচরণে লিপ্ত হবেন না। অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবেন না। শ্রমিকগণ কাজ করবেন নিষ্ঠার সাথে, একাগ্রচিত্তে, নির্ভুলভাবে। রাসূল [সা] বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে, এটিই আল্লাহতায়ালা ভালবাসেন'। [বায়হাকী]

শ্রমিকগণ অহেতুক সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকের বিরুদ্ধাচারণ করবেন না। মালিকের কাছে অন্যায়-অন্যায্য দাবীনামা পেশ করবেন না। এমনভাবে কাজ করবেন না যাতে কর্মমান, কর্মপরিবেশ অথবা উৎপাদিত পণ্যের মান ক্রমশ নীচে নেমে যায়। কারণ এতে মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। মালিক অনেক আকাঙ্খা নিয়ে কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। শ্রমিককে মনে রাখতে হবে যে, কর্মমান ভাল হলেই ব্যবসায়ে প্রসার ঘটবে, মালিকের মুখে হাসি ফুটবে এবং তখন মালিকও শ্রমিকের মজুরীসহ সুবিধা বৃদ্ধির স্বাভাবিক সুযোগ পাবেন।

**শেষ কথা**

একটি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ও নাগরিকগণের মধ্যকার সংহতির ওপর। একটি সংসারের উন্নতি নির্ভর করে দম্পতির মধ্যকার প্রেমময় সম্পর্কের ওপর। এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, দপ্তর-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতেও উন্নতি-সমৃদ্ধি নিহিত আছে মালিক-শ্রমিক কর্তা-কর্মী, মনিব-ভৃত্য, ইত্যাদির মধ্যকার সু-সম্পর্কের মাঝে। মালিক হবেন মানবিক। তিনি শাসক হবেন না, হবেন দায়িত্বশীল। তিনি অধীনস্থদের প্রতি ইনসাফ করবেন। বৈষম্য, দ্বিমুখী নীতি ও কপটতা পরিহার করবেন। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈহিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। নারী শ্রমিকগণের সহজাত সীমাবদ্ধতাগুলোকে বিবেচনা করবেন। সীমা লঙ্ঘন করবেন না। অন্যদিকে শ্রমিকও মালিকের স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। মালিক যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সেইভাবে কাজ করা তাঁর জন্য জরুরী কর্তব্য। এভাবে ক্রমান্বয়ে দ্বিপাক্ষিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব।

মোদ্দা কথা হলো, উভয় পক্ষকেই নিজেদেরকে 'অভিভাবক' তথা জিম্মাদার ভাবতে হবে। বিশেষত সবার ভেতরে এ চিন্তা সতত ক্রিয়াশীল থাকা দরকার যে, সব মালিকের উর্দ্ধেও রয়েছেন বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র এক মহান মালিক- যিনি 'আহকামুল হাকিমীন'। সবাইকে একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং সু-কঠিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুপম, স্বচ্ছ, উদার, মানবিক, ন্যায়ানুগ ও খোদাভীরু হওয়ার মাধ্যমেই কেবল একটি প্রকৃত মহিমময় ও মুখরিত কর্মপরিবেশ রচিত হতে পারে। ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি উম্মাহর উন্নতিও এর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর এটিই বিশ্ব নবী [সা]-এর শাশ্বত শিক্ষা।



www.pathagar.com

# খাতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]

**তমসুর হোসেন**

নিশিথ নিদ্রার নিবিড় স্বপ্নের মত সহজ সুন্দর ধ্যানময় একটি নাম মুহাম্মদ [সা]। জগতের সেই বরকতময় নান্দনিক স্বপ্নগর্ভা নাম, উষার সূর্যের মত পরিপ্লব যার আলোকপ্রভা, কামিনীর সুগন্ধের মত ঘুমাচ্ছন্ন প্রকৃতির মর্মমূলে যিনি স্রষ্টাপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে যান সেই মরমী রাসূলের পরিচয় প্রদান করেছেন করুণাময় আল্লাহ তার নামের ভেতরের তরঙ্গিত সুষমার দ্বারা। কুরআন বলে:

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে থাকবে সিজদার চিহ্ন, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। [সুরা ফাতহ : ২৯]

সমগ্র কুরআনে আল্লাহপাক যেখানে মুহাম্মদ নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে তিনি তার গুণাবলী এবং রেসালাতের সুউচ্চ সম্মানের দ্বারা তাকে সম্মোধন করেছেন। ইয়া আইয়্যুহাল মুযযাম্মিলু, ইয়া আইয়্যুহান্নাবীয়্যু শীর্ষক বিশেষণ দ্বারা তাকে ডেকেছেন। কুরআনে শুধুমাত্র চার জায়গায় তাকে মুহাম্মদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী [রা] যখন তার নাম 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ করেন তখন কাফিররা তা মুছে ফেলে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখার জন্য চাপ দিতে থাকে। আল্লাহপাক রাসূলকে তাই মেনে নেবার জন্য নির্দেশ দেন। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে তার নামের সাথে রাসূলুল্লাহ সংযুক্ত করে তাকে চিরজাগরুক এবং মহিমান্বিত করেন।

সমস্ত নবী-রাসূল যার রেসালত প্রকাশে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যিনি কিতাবপ্রাপ্তদের কাছে দিবসের রোদের মত স্পষ্ট এবং সুবিদিত, যিনি আদম সৃষ্টির বহু আগে নবী বলে প্রকাশিত, যিনি প্রথম মুসলিম এবং সর্বশেষ নবী, যিনি ইসলামের প্রদীপ্ত রাসূল, যিনি সকল নবীর উম্মতের চেয়েও নিকটতম, যিনি মুমিনের আত্মার সুরভি এবং তার বিবিগণ



www.pathagar.com

তাদের জন্মদাত্রী সমতুল্য, যিনি মহান রবের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি বিশেষ অনুকম্পা, যিনি সৃষ্টির সেরা এবং মানবজাতির সর্দার, যার অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য। যার রিসালাত বিশ্বজনীন এবং যিনি উম্মতের নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দু, যিনি নিষ্পাপ এবং নৈশযোগে উর্ধ্বলোকে গমনকারী, সমস্ত গুপ্ত-ভান্ডারের চাবি ছিল যার আয়ত্তে। যার জামানা সমস্ত জামানার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল নবীর ইমাম, যিনি চন্দ্র দ্বিখন্ডকারী, যিনি সম্মুখ এবং পশ্চাত যুগপৎ প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, যার স্বপ্ন ছিল প্রকৃত বাস্তবের সম্যক দর্শন, যার পতাকাতলে সব নবী হবেন সমবেত, যিনি সর্বপ্রথম সুরক্ষিত জান্নাতের কড়া নাড়বেন। যিনি হবেন আল-ওয়াসীলাহ্ এবং আল ফাদিলাহ্ প্রাপ্ত, তার কুরসী থাকবে মহান আল্লাহপাকের আরশের ডানপাশে। যাকে মাকামে মাহমুদ ও চিত্ত প্রশান্তকারী আল কাওসার দান করা হয়েছে, আল্লাহপাক তাকে বহুমুখী শাফায়াতের ক্ষমতা দান করেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম আপন উম্মতসহ পুলসিরাত পার হবেন। সর্বজ্ঞ আল্লাহপাক যে নবীকে হাবীব হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাকে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে রাসূল বলে প্রকাশ করাই যথার্থ মনে করেছেন। তাকে তিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ বাক্যের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

নবী কারীম [সা]-এর বাহ্যিক গঠন ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং লাবণ্যময়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাবলীল এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন। সাধারণত সুশ্রী এবং কোমল তনুর কোন মানুষ এতটা কর্মঠ এবং আলস্যহীন হয় না। আবু ইউনুস [রা] হযরত আবু হুরায়রাকে [রা] বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 'আমি নবী [সা] অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুশ্রী কোন মানুষ দেখিনি। [তার সৌন্দর্য এবং রূপ এমন ছিল] যেন কোন সূর্য তার ললাটের উপর দিয়ে বিচরণ করছে। অনুরূপ আমি নবী [সা] অপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিতে পথ চলতে কাউকে দেখিনি। [তার পথ চলাকালে মনে হত] যেন ভূমিকে তার জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। [শামায়েলে তিরমিযী]

রাসূল [সা]-এর চেহারা মোবারক এমন নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক ছিল যে শুভ্র বস্ত্রখন্ডের উপর কালিঝুলির দাগের মত তার মেজাজের আবেগ। উৎকণ্ঠা চেহারায় ভেসে উঠত। হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'রাসূল [সা] পর্দানসীন কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীলা ছিলেন। তিনি যখন কোনকিছু অপছন্দ করতেন তা তার চেহারা মোবারক দেখেই বোঝা যেত। হযরত আনাস ইবনে মালিক [রা] বলেন, 'নবী [সা] কুমারী অপেক্ষাও লজ্জাশীলা ছিলেন।'

আল্লাহপাক রাসূলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটি ন্যায়দর্শী সমাজ নির্মাণের জন্য। তিনি তার জীবনের একটি মুহূর্তও অকাজে নষ্ট করেননি। অন্যায়ের আধিক্যে দিশাহীন হয়ে পাপাসক্ত পৃথিবীকে প্রচলিত নিয়মে পরিশুদ্ধ করার কাজে করেননি আত্মনিয়োগ। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমা ও মার্জনার নীতিতে বিশ্বব্যবস্থা বদলে দেবার মহান আন্দোলনে নিয়োজিত হন। রাসূল [সা] এরশাদ করেন, তাওরাতে আছে : আল্লাহপাক বলেন, '[হে আমার প্রিয়নবী] যারা কিতাব প্রাপ্ত নয় সেই মুর্খদেরকে উৎসাহিত করুন। কারণ আপনি আমার বান্দাহ ও রাসূল। আমি আপনাকে মুত্তাওয়াক্কিল উপাধিতে ভূষিত করেছি। আপনি রূঢ় ও কর্কশভাষী নন, বাজারে বসে গালগল্প করেন না, আপনি অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং তা ক্ষমা ও মার্জনা করেন। আর আপনাকে মহান আল্লাহ এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেবেন না যতক্ষণ না দুর্বলদের মিল্লাত এইভাবে গঠিত



www.pathagar.com

না হয় যে তারা তখন বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে এবং কুফরীর চাদরে ঢাকা অন্তরসমূহ আবরণমুক্ত হবে।'

নবী কারিম [সা]-এর আবির্ভাবের ইংগিত আহলে কিতাবের পন্ডিতরা সম্যক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। জাহেলী জামানার নিকষ অন্ধকারে আলোকোজ্জ্বল সে নবীর প্রত্যাশা ছিল মুক্তিকামী অন্তরের একান্ত বাসনা। স্বনামধন্য সাহাবী সালমান আল ফারসীকে তার প্রিয় শিক্ষক উমুরিয়াহ মুহাম্মদ [সা] সম্পর্কে যে অন্তিম উপদেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করার মত। তিনি বলেছেন , প্রিয় বৎস! আল্লাহর কসম! আমি যে সত্য দ্বীনের উপর আছি সে মোতাবেক আমি এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান জানি না, যার কাছে আমি তোমাকে পাঠাতে পারি। কিন্তু ইবরাহিমী দ্বীনের উপর প্রেরিত একজন নবীর আগমন অত্যাসন্ন, আমি সেই নবীকে সন্ধানের জন্য তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি। তিনি আরব ভূমিতে আবির্ভূত হবেন, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি হিযরত করবেন যেখানে থাকবে খেজুরের বাগান। তার কিছু প্রকাশ্য পরিচয় থাকবে যা সর্বজনবিদিত হবে; তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, বর্জন করবেন সাদকা। তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে অংকিত থাকবে নবুওয়তের মোহর। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তুমি সেই দেশে চলে যাবে।' [মুসনাদে আহমাদ]

রাসূল [সা]-এর রিসালাত আল্লাহপ্রেরিত নবী-রাসূলগণের পরম্পরাগত ধারাক্রমের চূড়ান্ত বিকাশ। সত্যদ্বীন প্রকাশের কার্যক্রমে প্রত্যেক নবীরই ছিল বিশেষ ভূমিকা। সকল নবীরই মিশন ছিল বাতিল উৎখাত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহপাক তার শেষ নবীর মাধ্যমে তার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূল [সা] এরশাদ করেন : আমার এবং পূর্বেকার নবীগণের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, এক লোক একটি ইমারত নির্মাণ করল, সে ইমারতটি উত্তমভাবে তৈরী করার পর এটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করল। কিন্তু এক জায়গায় একটি ইট খালি রাখল। লোকেরা ইমারতটির চাকচিক্য এবং স্থাপত্যশৈলী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সবাই এর অনুপম গঠননৈপুণ্য এবং বিরল নান্দনিকতায় মুগ্ধ হল। কিন্তু একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে সবাই করতে লাগল–এই জায়গায় একখানা ইট বসানো হয়নি কেন। রাসূল [সা] বলেন : আমিই সেই সর্বশেষ ইট এবং আমিই শেষনবী।' [বুখারী, মুসলিম]

তারকারা যেমন আসমানের নিরাপত্তা দান করে তেমনই মহানবী [সা] ছিলেন সাহাবাদের রক্ষাকবচ। সাহাবারাও ছিলেন অনাগত উম্মতদের নিরাপত্তাসদৃশ। আসমান হতে প্রবল প্রতাপসম্পন্ন তারকা নিভে গেলে যেমন তার ভারসাম্য নষ্ট হবে তেমনই এক দু:সহ কালোরাত নেমে আসবে অনাগত উম্মতদের ভাগ্যাকাশে রাসূল এবং তার সাহাবাদের ওফাতের পর। আবু মুসা আল আসআরী [রা] থেকে হাদিস বর্ণিত আছে : রাসূল [সা] বলেন, 'তারকারাজি আসমানের নিরাপত্তাপ্রহরী। যখন তারকা অন্তর্হিত হয়ে যাবে তখন আসমানকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ পাবে। আর আমি আমার সাহাবাদের নিরাপত্তাস্বরূপ। কাজেই আমি যখন চলে যাব তখন আমার সাহাবাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা তারা পেয়ে যাবে। আর আমার সাহাবারা আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন তারা চলে যাবে, তখন উম্মত সম্পর্কে দেয়া ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।' [সহীহ মুসলিম]

রাসূল [সা]-এর উম্মতকে ছয়টি বিশেষ অনুদানের দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। অর্থবোধক ভাষা, ভীতির প্রভাব, গনিমতের সম্পদ হালাল, জমিনকে সিজদার স্থান এবং পবিত্রতার



www.pathagar.com

উপকরণ, রাসূলকে সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র নবী এবং তাকে শেষনবী বলে বিরল সম্মান প্রদান। হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] বলেছেন, 'অন্যান্য নবীদের চেয়ে আমাকে ছয়টি জিনিষ বেশী দেয়া হয়েছে। ১. আমাকে সর্বব্যাপী অর্থবোধক ভাষা দান করা হয়েছে। ২. ভীতির প্রভাব দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩.আমার জন্য গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে। ৪. জমিনকে আমার জন্য পবিত্র এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ এবং তাকে সিজদার স্থান করা হয়েছে। ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬. আমার দ্বারা নবী আগমনের পথ রুদ্ধ করে আমাকে শেষনবী করা হয়েছে। [মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ]

আল্লাহপাক তার নবীকে সমগ্র পৃথিবী সংকীর্ণ করে দেখিয়েছেন। রাসূল [সা] পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম দিগন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন তার উম্মতের রাজত্বের সীমারেখা। তিনি প্রার্থনা করেছেন তার উম্মত যেন দূর্ভিক্ষ এবং শত্রু দ্বারা যেন ধ্বংস না হয়। হযরত সাওবান [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল [সা] বলেছেন, 'আল্লাহপাক সমগ্র পৃথিবীকে আমার সামনে বর্তুলাকারে প্রদর্শন করেছেন। আমি এর পূর্ব এবং পশ্চিম দিগন্ত দেখেছি। আমার রাজত্ব যতদূর বিস্তৃত হবে আল্লাহ আমাকে ততদূর দেখিয়েছেন এবং আমাকে স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দু'টি খনিজ সম্পদ দান করেছেন। আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করেছি, আমার উম্মতকে যেন ব্যাপক দূর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদের লোকের সাহায্য ছাড়া কোন শত্রু তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যেন ব্যাপক ধ্বংস সাধন না করতে পারে। আমার রব আমার দোয়ার জবাবে এরশাদ করেছেন: 'হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তার কোন পরিবর্তন হয় না।' আর আমি আপনার উম্মতকে এই সুযোগ দান করেছি, যে কোন বছরেই আমি তাদের ব্যাপক ধ্বংস সাধন করব না। বিশ্বের সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোন শত্রু যদি তাদের প্রচুর ধ্বংস সাধন করার প্রচেষ্টা চালায় তবু তাদের নিজ লোকের সহযোগিতা ছাড়া আমি তাদের মহা ক্ষতিসাধন হতে দেব না। যদি না তারা একে অপরকে ধ্বংস করে এবং একে অন্যকে গালি দেয় ও কটুক্তি করে।' [মুসলিম]

রাসূল [সা]-এর প্রচারিত দ্বীনকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সামনে সংগত কোন যুক্তি ছিল না। মিথ্যা অহমিকা, অন্ধগর্ব, এবং গোত্রদ্বন্দ্বের জাত্যাভিমানই তাদেরকে এই মহান দ্বীন অস্বীকার করার প্রেরণা যুগিয়েছে। ফুলতান ইবনে আসিম [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল [সা] একদিন মসজিদে নববীতে এক মজলিসে বসে ছিলেন। তখন মসজিদের ভেতরে এক ব্যক্তি পায়চারী করছিল। হযরত [সা] সেই ব্যক্তির দিকে অপলকনেত্রে চেয়ে হাসলেন। তারপর তাকে ডেকে বললেন : ওহে অমুক। সে ব্যক্তি জওয়াবে বললেন : লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল আমি আপনার খেদমতে হাজির। তিনি আর কোন বাক্য ব্যয় না করে পুনরায় শুধু উচ্চারণ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! হযরত [সা] এরশাদ করলেন, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল ?' তিনি জওয়াবে বললেন, না। হযরত [সা] বললেন, 'তুমি কি তাওরাত পড়?' লোকটি জওয়াব দিলেন, জ্বী হাঁ। হুজুর [সা] বললেন, ইনজিল পড়? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ পড়ি। হযরত [সা] বললেন, পবিত্র কুরআন? তিনি বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, আমি ইচ্ছে করতাম তবে পড়তে পারতাম।' তারপর হুজুর [সা] লোকটিকে শপথ করিয়ে বললেন :'তুমি কি আমাকে তাওরাত ও ইনজিলে পেয়েছ?' লোকটি বললেন: 'আমরা তাওরাত ও ইনজিলে আপনার আবির্ভাবের এবং আপনার আকার



www.pathagar.com

আকৃতির হুবহু বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে, আপনি আমাদের ইসরাঈলী গোত্র হতে আবির্ভূত হবেন। তারপর যখন প্রকৃতই আপনি আবির্ভূত হলেন, তখন আমরা আশংকা করলাম যে আপনি হয়ত সেই ব্যক্তি হবেন। তারপর আমরা লক্ষ্য করলাম এবং দেখলাম যে আপনি সেই ব্যক্তি নন।' হুজুর [সা] জিজ্ঞেস করলেন : 'কিভাবে তোমরা তা লক্ষ্য করলে?' লোকটি জওয়াব দিলেন: 'তার সাথে তার সত্তুর হাজার এমন উম্মত থাকবেন যাদের কোন হিসাবও হবে না, কোন আযাবও হবে না। কিন্তু আপনার সাথে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক দেখা যায়।' হুজুর [সা] বললেন, 'যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, নি:সন্দেহে আমিই সেই ব্যক্তি। তোমার বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন সেইসব লোক আমারই উম্মতভূক্ত এবং তারা সত্তুর হাজার ও সত্তুর হাজার অপেক্ষাও অনেক বেশী হবে।' [আযমাউয যাওয়ারিদ]

তাওরাত এবং বাইবেলে মুহাম্মদ [সা]-এর আগমনের পূর্বাভাস লিপিবদ্ধ আছে। ঈশ্বর মুসাকে বলেছিলেন, 'আমি তাদের মধ্যে তাদের থেকেই একজন নবী পাঠাব তোমার মত। আমি তার মুখের মধ্যে আমার শব্দ দেব। এবং তিনি তার লোকদের আমি যে আদেশ দেব তাই বলবে। [ওল্ড টেষ্টামেন্ট :পঞ্চম গ্রন্থ, ১৮:১৮]

১৬তম পোপ বেনেডিক্ট দেড়হাজার বছরের পুরনো সেই পুস্তকটি দেখার জন্য আবদার করেছেন যেটিকে গসপেল অব বার্ণাবাস বলে প্রচার করা হচ্ছে। গত বার বছর ধরে তা তুরস্কে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত আছে। হাতে লেখা বহু মূল্যবান স্বর্ণখচিত মোটা বই যা স্থানীয় সিরীয় ভাষায় লেখা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, তাতে যীশুখ্রীষ্টের প্রারম্ভিক শিক্ষায় একজন নবী আগমনের পূর্বাভাস দেয়া আছে। পশুচর্মে লিখিত এবং চামড়ার মলাটে মোড়ানো সেই অতি পুরনো বাইবেল ২০০০ সালে কালোবাজার দমন অপারেশনের সময় তুর্কি পুলিশ উদ্ধার করে। বর্তমানে এটি আনকারা জাতীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। কিছুটা সংস্কারের পর এটিকে জনগণের সামনে উন্মুক্ত করা হবে। বইটির একেকটি পাতার ফটোকপির মুল্য ১৫ মিলিয়ন ডলার। তুরস্কের সংস্কৃতি এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ইরতুগ্রুল গুনাই মন্তব্য করেন পুস্তকটি গসপলের খাঁটি ভাষান্তর হতে পারে। সম্ভবত এই কারণে এটি খ্রীষ্টান চার্চ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ভ্যাটিকানরা দাপ্তরিকভাবে তাকে অনুরোধ করে সেই গ্রন্থটি দেখানোর জন্য। এই বিতর্কিত পুস্তকটির সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা এটাই মার্ক, ম্যাথিউ, লুক এবং জন প্রণীত প্রকৃত গসপেলের ভাষান্তর।

যোহনই বাইবেলের একমাত্র সুসমাচার লেখক, যিনি শিষ্যদের সাথে যীশুর শেষ কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেন। এই কথাবার্তা হয়েছিল লাষ্ট সাপারের মেস পর্য়ায়ে যীশুর গ্রেফতারের আগে। তার তিরোধানের পর মানবজাতিকে কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করতে হবে তার আগাম বার্তা তিনি জানিয়ে গেছেন। যোহন লিখিত সুসমাচারে এই পথ নির্দেশকের গ্রীক উপাধি হচ্ছে 'পরাক্লীতস' বা সহায়।

যীশু বলেন, 'আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেব। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার বিষয়ে এবং খোদার সম্পর্কে চেতনা দিবেন।-[বাংলা ইঞ্জিল শরীফ, ইউহান্না, ৪র্থ খন্ড-১৬, ৭-৮]

যীশু আরও বলেন, 'উপরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সমস্ত সত্যের কাছে নিয়ে যাবেন। কারণ তিনি নিজ হতে কিছু বলবেন না,



www.pathagar.com

কিন্তু যা যা শুনবেন তাই বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদেরকে অবহিত করবেন। [বাংলা বাইবেল, যোহন-১৬, ১৩-১৪]

হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই একটি অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেললেন। ইসলামী বিপ্লবী কলেমার অপ্রতিরোধ্য প্রচারের কারণে এশিয়া, ইউরোপ এবং অরণ্যময় আফ্রিকার নিভৃত জনপদে হৃদয় কাঁপানো সাম্য সভ্যতার বিস্ততার ঘটতে লাগল। সুদূর আরবের মরুভূমি থেকে দিগ্বিজয়ী অশ্বের পিঠে আরোহন করে ইসলামের সুমধুর আহ্বান ছুটে চলল পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রান্তরে। ইসলামের মহান নবীর সে কালজয়ী কীর্তি অনুধাবন করে খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেছেন : 'মুহাম্মদ [সা] যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে শুধু সে যুগেরই একজন মনীষী বলা ঠিক হবেনা, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।'

বিশ্বের সকল ধর্ম, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আদর্শকে একই বিধানের আওতায় এনে একটি কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা বড়ই দুরূহ কাজ। দেশ, সীমারেখা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, এবং বর্ণবৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে সার্বজনীন শৃংখলা রক্ষা করা কোন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু একজন বিরল মহামানবের বিষয়ে সে কথা প্রযোজ্য নয়। যিনি আজও এই অশান্ত বিশ্বে বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসক সেজে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে পারেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ [সা]। তার সম্পর্কে বলতে যেয়ে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ণাড শ বলেছেন: 'যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আদর্শের ধারক মানব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কের শাসনাধীনে আনা যেত, তবে একমাত্র মুহাম্মদ [সা] সর্বাপেক্ষা যোগ্যরূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হতেন।'

যে সুনীতির মাধ্যমে উদ্ধত ও অপ্রতিরোধ্য আরব জাতিকে মুহাম্মদ [সা] বশীভূত করে একটি নতুন জাতিস্বত্তার জন্ম দিয়েছেন তা অনুধাবন করে ঐতিহাসিক ড. গ্রেফটাউলি লিখেছেন, 'ইসলামের সে উম্মী নবীর ইতিবৃত্ত বহু আশাব্যঞ্জক। তৎকালের কোন বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের অধীনে আনতে পারেনি, সে উচ্ছৃংখল জাতিকে তিনি বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।'

আর্ণল্ড টয়েনবী ইসলামের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও সৌন্দর্য সম্যক উপলব্ধি করে লিখেছেন, 'মুহাম্মদ [সা] ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ, ও শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছেন। কোন ধর্মই এর চেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি, যে সাফল্য মুহাম্মদ [সা]-এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যার অভাবে অশ্রুপাত করছে সে অভাব কেবল মুহাম্মদী সাম্যনীতির মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ, গোত্র ও শ্রেণীগত পার্থক্যকে চূর্ণ করে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মুল্যায়ন একমাত্র তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন।'

মাইকেল হার্ট তার 'বিশ্বের শ্রেষ্ট একশত মনীষী' বইয়ে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর নাম সর্বাগ্রে লিখার কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন–'তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় দিকেই কৃতকার্য।' তার এ মন্তব্য শুনে অগণিত ভক্তবৃন্দ যখন বলতে লাগল, তিনি পাগল হয়েছেন নাকি? ভক্তদের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখতে বাধ্য হলেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, আসলে আমি পাগল হইনি, যার নাম আমি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তার জন্য পাগল হয়েছে।'



www.pathagar.com

বিখ্যাত দার্শনিক সরোজিনী নাইডু কুরআন পাঠ করে এর উন্মুক্ত মূলনীতিসমূহের গতি এবং প্রাঞ্জলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে এর ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সহজ সাবলীল সিদ্ধান্ত তাকে মোহাবিষ্ট করেছে। তিনি বলেন: ইসলামের সর্বাপেক্ষা চমৎকার আদর্শসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এর ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণা। কারণ কুরআন পাঠকালে আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুসলমানদের জীবনের গতিশীল মূলনীতিসমূহ রহস্যাবৃত নয় বরং সে সকল বাস্তব নীতি সারাবিশ্বে প্রাত্যহিক জীবনে পরিচালিত আচরণসমুহের উপযোগী।'

মুহাম্মদ [সা]-এর নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়কে অনেক ঐতিহাসিক নিছক কল্পকাহিনী হিসেবে বর্ণনা করতে বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ডিলেসী ও' লিয়েরী তাদের সাথে একমত নন। তিনি লেখেন: 'কিন্তু ইতিহাস এটি পরিস্কাররূপে বর্ণনা করেছে যে, ধর্মোম্মাদ মুসলমানগণ কর্তৃক পৃথিবীব্যাপী অভিযান পরিচালনা করার কাহিনী এবং বিজিত জাতিসমুহে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার বিষয়টি রূপকথার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অসম্ভব কল্পকাহিনী। ঐতিহাসিকগণ কখনো এই কল্পকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেননি।' 'ই. আলেকজান্ডার পাওয়েলের লেখায় এ কথারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন: 'কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের পর মুসলমানগণ যে পরিমাণে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা খ্রীষ্টান জাতিসমূহকে লজ্জিত করে।'

ইসলামের নবী মুহাম্মদ [সা]-এর আদর্শপুষ্ট প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর [রা] সম্পর্কে জে.এস.রবার্টসন লিখেন, 'প্রাথমিক যুগের ইসলামের তুলনায় খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অধীনে অবশ্যই অধিক নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছিল। খলিফা আবুবকর [রা] তার অনুসারীগণের জন্য তিনটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন; ন্যায়পরায়ণ হবে, পরাজয় বরণ করার পরিবর্তে বরং মৃত্যু বরণ করবে, দয়ালু হবে, বৃদ্ধ শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করবে না। ফলবান বৃক্ষ ও গবাদিপশু বিনষ্ট করবে না। তোমরা শত্রুকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।'

থমাস কার্লাইল ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা। তিনি মুহাম্মদ [সা]-এর আবির্ভাব এবং তার আদর্শিক অভিযাত্রার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি লেখেন: The revolution brought by Mohammad [SM] was a great spark of fire which within a twinkle of an eye burnt out all the rubbish in humanity and untrue that erected their heads from Delhi to Granada and from earth to sky.'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে : All of the glitters of the world Mohammed [SM] is the most successfull.'

উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষী মহাত্মা গান্ধী মুহাম্মদ [সা]-এর সাহস এবং সত্যবাদিতা সম্পর্কে উন্মুক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন : Mohammed was a great prophet . He was brave and feared no man but God alone. He was never found to say onething and do another. He acted as he felt.'



www.pathagar.com

ড.মরিস বুকাইলি ইসলামকে উপলব্ধি করেছেন তার উপস্থাপিত জীবনাদর্শের সুনিপুন বাস্তবতার আলোকে এবং তার টিকে থাকার শক্তির দৃঢ়তায়। তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ [সা] একজন নিরক্ষর রাসূল ছিলেন কিন্তু তার উপস্থাপিত জীবনাদর্শ ইসলাম ও আল কুরআন আল্লাহপ্রদত্ত এবং তা অবিকৃত অবস্থায় সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মানব সমাজে সংরক্ষিত আছে।'

ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ল্যামারটিন মহানবী [সা] সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সত্যিই অনন্য। তিনি বলেছেন : 'মুহাম্মদ [সা] সেনাবাহিনী, আইন, শাসন, সাম্রাজ্য ও সভ্যতার অন্ধকার থেকে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনপদকে শুধু পরিবর্তন করেননি বরং এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি অসংখ্য দেবতা, কল্পিত ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এমনকি মানব হৃদয়কে জয় করার এক মহাবিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে এসেছিলেন। একটি কিতাব ছিল এসব পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি যার প্রতিটি বর্ণ, আইন ও সংবিধান।'

মুহাম্মদ [সা]-এর অনাড়ম্বর জীবনধারা এবং খোদায়ী আইনের মাধ্যমে স্বার্থক বিশ্বশাসন সম্পর্কে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক বসওয়ার্থ স্মীথ ১৮৪০ সালে এডিনবার্গের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে নিবেদিত চিত্তে উচ্চারণ করেছিলেন: 'ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ [সা] ছিলেন একাধারে পোপ ও সিজার। কিন্তু পোপের অসম্ভব দাবী অথবা সিজারের বিশাল সৈন্যবাহিনী কোনটাই তার ছিল না। যদি কোন মানুষ স্থায়ী সেনাবাহিনী, দেহরক্ষী, রাজপ্রাসাদ, নির্দিষ্ট রাজস্ব ছাড়া কেবল ঐশ্বরিক অধিকার বলে রাজ্যশাসন করার দাবী করতে পারেন তবে মুহাম্মদই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি।'

বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক জন ড্রেপার তার 'এ হিষ্টরি অফ দি ইনটেলেকচুয়াল ডেভলেপমেন্ট অফ ইউরোপ' শীর্ষক গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন, 'মুহাম্মদ [সা] এমন এক মানুষ যিনি মানব ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।'

নামকরা ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী সমালোচক এইচ.জি. ওয়েলসের মুখেও মুহাম্মদ [সা]-এর স্তুতি দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তিনি তার বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব সত্ত্বেও ইসলামের অনুপম বিশ্বাসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত শান্তিময় সমাজব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন অতলস্পর্শী বিবেচকের ভাষায়। তিনি বলেছেন: 'মুহাম্মদ [সা] সেই আকর্ষণীয় বিশ্বাসগুলো মানবজাতিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন। ইসলাম সৃষ্টি করেছিল এমন এক সমাজ, এর আগে দুনিয়ার অস্তিত্বশীল যে কোন সমাজের তুলনায় যা ছিল ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অত্যাচার থেকে অধিকতর মুক্ত।'

মুহাম্মদ [সা] সম্পর্কে গুরু নানকের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করবার মত একটি দলিল। মানবরচিত সাড়াজাগানো বাহ্যিকতাসর্বস্ব মতবাদসমুহের অসারতা নিগুঢ়ভাবে খতিয়ে দেখে তিনি বলেছিলেন : 'এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। সাধু, সংস্কারক, গাজী,পীর,শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার পাবেন যদি তারা পবিত্র নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন।'



www.pathagar.com

# জীবনশিল্পী মহানবীর [সা] মহানুভবতা ও তাঁর সংগ্রামী জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ

**খন্দকার আবদুল মোমেন**

মহানবীর [সা] মহানুভবতার কথা ভাবতে গেলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি। মানুষের হৃদয় কতটা প্রসারিত হলে শত্রুকে ক্ষমা করা যায়, শত্রুর পাশবিকতার জন্য ক্ষোভ না হয়ে করুণা সৃষ্টি হয়–তার মঙ্গল কামনায় মন বিভোর হয়ে পড়ে জীবনশিল্পী মহানবীর [সা] কর্মময় জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনটি আর কোনো মনীষীর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। মহানবীর [সা] বিস্ময়কর জীবন চিত্রের একত্রিত সন্নিবেশ এক নজরে তুলে ধরার প্রয়াসে আলোচ্য নিবন্ধের শুরুতে মহান রাব্বুল আল আমিনের কাছে আমার মোনাজাত, হে আল্লাহ! আমরা জানি মহানবীর গোটা জীবনই মহানুভবতায় ভরপুর–হৃদয়ের লেশমাত্র সংকোচন তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাইতো তিনি মহানবী–মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী। তাঁর জীবনের মহানুভবতার চিত্র যা হীরক খণ্ডের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দেয় সেরকম কিছু ছবি যেন এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে তুলে ধরতে পারি, সে লেখনি শক্তি তুমি এ অধমকে দান কর হে আল্লাহ, সর্ব শক্তিমান।

পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনিভূত অন্ধকারে ঢাকা ছিল যে সমাজ, সে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আলোকিত জীবনে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে মহানবীর [সা] মাত্র তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনের ভূমিকায়। তাঁর জীবনের মহানুভবতাই এ কাজে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে সবচেয়ে বেশি।

মহানবীর [সা] প্রতি তায়েফবাসীদের আচরণ খুবই অমানবিক ছিল। দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি লাঞ্ছিত হলেন, অপমানিত হলেন চরমভাবে, কিন্তু ওই অপমানের প্রতিদানে ও প্রতিক্রিয়ায় মহানবীর [সা] আচরণ অভূতপূর্ব। সে ঘটনায় মহানবীর [সা] জীবনচিত্রটি নিম্নরূপ :

চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর মহানবী একা হয়ে পড়লেন। কুরাইশরা অতি উৎসাহে নির্যাতন বাড়িয়ে দিল। নামাযরত হযরতের গলায় চাদর দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে ওকাবা নামক পাষণ্ড তাকে মারার উপক্রম করলো, আবু বকর উপস্থিত



www.pathagar.com

হয়ে কোনোরকমে তাকে বিপদমুক্ত করেন। এভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হযরতের চলার পথকে কুরাইশ শত্রুরা কন্টকাকীর্ণ করে তাকে অতিষ্ঠ করে তুললো। ক্রমাগত যন্ত্রণা নিপীড়নে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তিনি নিজেকে তার দায়িত্ব পালনে অবিচল রাখলেন।

অবশেষে মক্কা থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ নগরীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মহানবী যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে ছিলেন পালিত পুত্র জায়েদ। দীনের দাওয়াতের আহ্বানে তায়েফবাসীদের প্রতিক্রিয়া "হু! আল্লাহ্ বুঝি খুঁজিয়া খুঁজিয়া আর লোক পাইল না, তোমাকেই পয়গম্বর করিল।" কোনো এক তায়েফবাসীর উক্তি "ভাল দেখেছ! আল্লাহর পয়গম্বর কখনও এমন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসে?" নানা রকম বিদ্রূপাত্মক কথা মহানবীকে নিরস্ত করার জন্য তারা অনবরত বলে যেতে লাগলো। তারপরও মহানবী অবিচল থেকে দীনের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছাতে লাগলেন। অবশেষে তায়েফ বাসীরা তাকে নগর থেকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক লেলিয়ে দিল। তারা মহানবীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ও পাথর নিক্ষেপ করে তাকে জর্জরিত ও রক্তাক্ত করতে লাগলো। জায়েদ সর্বক্ষণ মহানবীকে আগলে থাকলেন। অবশেষে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে কাঁধে করে নগরীর বাইরে পাহাড় শ্রেণীর এক পাদদেশে আঙুর বাগানে আশ্রয় নিলেন। চৈতন্য ফিরে আসলে মহানবী নামায পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জায়েদ মহানবীর পা থেকে রক্তে জমাট পাদুকা অতি সাবধানে টেনে বের করে দিলেন। মহানবী [সা] নামাযে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। নামায শেষে তিনি মোনাজাত করবেন এমন সময় জীবরাঈল [আ] তার সামনে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আপনি চাইলে আল্লাহ পাক এই পাহাড় শ্রেণী তায়েফবাসীর মস্তকে নিক্ষেপ করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।" মহানবী [সা] বললেন, "আমি জগতে শাস্তিদাতারূপে আবির্ভূত হয়নি। আমি মানবজাতির মুক্তিদূত হিসেবে এসেছি।"

মহানবী [সা] আবেগজড়িত কণ্ঠে মোনাজাত শুরু করলেন। গোলাম মোস্তফার "বিশ্বনবী" গ্রন্থে তা নিম্নরূপে বিধৃত :

"হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু, তোমাকে ডাকি। অবিশ্বাসীরা আজ না বুঝিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য দয়া করিয়া তুমি উহাদিগকে শাস্তি দিও না। উহাদিগকে ক্ষমা কর। অবিশ্বাসীরা আজ যে তোমার বাণীকে গ্রহণ করিতেছে না, তাহার জন্য উহাদের দোষ নাই; সে আমারই দুর্বলতা-আমারই অক্ষমতা; এই দুর্বলতার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। হে রহমানুর রহিম! একমাত্র তুমিই দুর্বলের বল, তুমিই অগতির গতি, তুমি ছাড়া আর কোনো সাহায্য নাই, শরণ নাই। প্রভু হে, আমার এই সাধনা কি ব্যর্থ হইবে? তুমি আমাকে জয়যুক্ত করিবে না? তুমি কি আমাকে এমন শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিবে–যাহারা চিরদিনই তোমা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক। একমাত্র তোমার সন্তোষই আমার কাম্য। তুমি সন্তুষ্ট থাকিলে কোন লাঞ্ছনা, কোনে গ্লানি, কোনো আপদ-বিপদ, কোনো দু:খ-বেদনাকেই আমি ভয় করি না। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।" এ এক অভূতপূর্ব মোনাজাত! আল্লাহর প্রতি গভীর



www.pathagar.com

ভালবাসা, মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ, দায়িত্বের প্রতি অটল-অনড় অবস্থা মহানবীর [সা] মহানুভবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহও মহানবীর [সা] মোনাজাতের জবাব দিলেন অহী নাযিল করে। "ধৈর্য ধর–চরম ধৈর্য। নিশ্চয়ই তাহারা [অবিশ্বাসীরা] দেখিতেছে–ইহা [বিজয়] সুদূর পরাহত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি–ইহা নিকবর্তী।"-[৭০:৫-৭]

মহানবীর [সা] মক্কী জীবনের একটি চিত্র নিম্নরূপ :

নবী করিম [সা]-এর দীনের দাওয়াতকে তীব্র প্রতিরোধের মুখে ফেলতেন আবু লাহাব [যার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল উযযা] ও তার স্ত্রী "আরদা"। তার ডাক নাম ছিল উম্মে জামীল। এই আবু লাহাব ছিল মহানবীর [সা] নিকটতম প্রতিবেশী। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। আবু লাহাব ও তার সাথী-সঙ্গীরা মহানবীকে [সা] ঘরের বাইরে নানাভাবে প্রতিহত করতো; তাকে তাঁর বাড়িতেও নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে থাকতে দিত না। তিনি যখন নামায পড়তেন এরা তখন তার উপর ছাগলের নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করতো। 'বাড়ির আঙিনায় রান্না বাড়ার সময় ময়লা ছুঁড়ে দিত। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন রাতের বেলা মহানবীর ঘরের দরজার সামনে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালপালা বিছিয়ে রাখতো। এই ছিল আবু লাহাব, উম্মে জামীল ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতিদিনের নিয়মিত কাজ। দিনের পর দিন মহানবী [সা] তাদের অত্যাচার সহ্য করে দীনের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। মহানবী [সা] সহসাই একদিন লক্ষ্য করলেন তার ঘরের দরজার সামনে ও পথে কাঁটাযুক্ত ডালপালা নেই। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তবে কি বুড়ির অসুখ হলো? চিন্তিত মনে তিনি বুড়ির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলেন। দেখলেন সত্যিই বুড়ির অসুখ। তিনি বুড়ির সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। শত্রুর প্রতি এমন আচরণ অভাবনীয়। মহানবীর [সা] হৃদয় ছিল মহানুভবতায় ভরপুর।

অবশ্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের মহাপাপের শাস্তি স্বরূপ তাদের ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে নাযিল হলো সূরা আল লাহাব, যেখানে মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন :

"ভেঙে গেছে আবু লাহাবের হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে। তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে লাগেনি। অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এবং তার সাথে তার স্ত্রীও। লাগানো, ভাঙানো, চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ, তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।"

মহানবী [সা] ছোটবেলা থেকেই উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার ও প্রসারিত হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। স্বার্থপরতার বিন্দুমাত্র কলঙ্কও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। যে বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য মহানবী [সা] অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন, দিনের পর দিন নির্যাতন নিপীড়নকে উপেক্ষা করে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করে মদিনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন তার বিনিময়ে তিনি কোনো কিছুই আশা করলেন না–কোনো কিছুই গ্রহণ করলেন না। বরং মহানবী [সা] নিজের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যকে, তার উপার্জিত সমস্ত ধন-সম্পদকে এ বিপ্লবের সফলতার জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। বিপ্লবের সাফল্যের যুগে অঢেল ধনসম্পদ হস্তগত হলে জনগণের মধ্যে তা বিলিবন্টন করলেন। নিজে স্বেচ্ছায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অর্থসংকটে অনাড়ম্বর জীবন-



www.pathagar.com

যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এত বড় ত্যাগ পৃথিবীর আর কোনো বিজয়ী বীরের জীবনে দেখা যায় না। মৃত্যুকালে তিনি নিজ পরিবারের জন্য কোনো সঞ্চয় রেখে যাননি, তাদের জন্য একখণ্ড জমিও রেখে গেলেন না। রাষ্ট্রীয় কোনো পদও তাদের জন্য নির্দিষ্ট ও স্থায়ী করে গেলেন না। এ কথা ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই।

মহানবী [সা] অত্যন্ত উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়া থেকে মক্কায় ফেরার পর মহানবী [সা] এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এ সময় তাকে চাচা আবু তালিবের সাথে "হরবে ফোজ্জার" [অন্যায় সমর] নামক এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ওকাজ মেলায় বিভিন্ন উপজাতীয় নেতাদের মধ্যে মত বিরোধের কারণে হরবে ফোজ্জার নামক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এই সংঘর্ষ পাঁচ বছর পর্যন্ত চলেছিল। এতে সহস্র লোকের প্রাণহানি হয়। মহানবীর [সা] মনে এ যুদ্ধের বিভৎসতা ভীষণভাবে রেখাপাত করে। তিনি উৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় একটি মানবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এ প্রতিষ্ঠানটি "হিল্‌ফ্‌-উল- ফুযুল" নামে বিখ্যাত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা বাণী ছিল নিম্নরূপ : ১. অনাথ ও নির্যাতিতকে সাহায্য করতে হবে, ২. দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, ৩. আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বন্ধন স্থাপন করে তাদের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে এবং ৪. অত্যাচারির জুলুম দমন করে দুর্বলকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আরবদের মধ্যে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারিত হওয়ার ফলে এবং তা মেনে চলার শপথের কারণে 'হরবে ফোজ্জারের' আত্মঘাতি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহানবীর [সা] বুদ্ধি বৃত্তিক উদ্যোগে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হবে না। ঐতিহাসিকগণ হিল্‌ফ্‌-উল-ফুযুলকে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের সূতিকাগার [First breeding centre for peace movement] বলে অভিহিত করেছেন।

'আস্‌-সাদিক' [সত্যবাদী] ও 'আল-আমিন' [বিশ্বাসী] খ্যাত মহানবী [সা] ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ডে তাঁর কৌশলী-দক্ষতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেন। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন কা'বা গৃহের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। সমগ্র কুরাইশ জাতির বিভিন্ন গোত্রের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় সংস্কার কাজ এগিয়ে যাচ্ছিলো। এক পর্যায়ে যখন 'হাজরে আসওয়াদ' [পবিত্র কালো পাথর] কা'বা গৃহের দেয়ালে স্থাপনের প্রয়োজন হলো তখন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তুমুল বিবাদ শুরু হলো। সকল গোত্রই দাবি করতে থাকলো এ কাজটি করার অধিকার শুধু তাদেরই। ঝগড়া-বিবাদ এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, অনেকেই তরবারি কোষমুক্ত করে ফেললো। অবস্থা বেগতিক দেখে ঝগড়ার পঞ্চম দিনে আবু উম্মিয়া বিন মুগীরা নামের এক প্রবীণ ব্যক্তি সুন্দর একটি প্রস্তাব সকলের সামনে তুলে ধরলেন। প্রস্তাবটি ছিলো এরকম : পরের দিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি প্রথমে কা'বা ঘরে আসবে এ সমস্যার সমাধান তার উপর ন্যস্ত করা হবে। তিনি এর মীমাংসা করবেন। সকলে তা মেনে নিবে। পরদিন দেখা গেল সবার আগে কা'বা ঘরে হাযির হলেন মহানবী [সা]। ফয়সালা অনুযায়ী তিনি সকল গোত্রের একজন করে প্রতিনিধিকে একটি চাদর বিছিয়ে তার কোণা ধরতে বললেন। মহানবী [সা] নিজ হাতে পাথরটি চাদরের মাঝখানে রেখে চাদরটি উঁচু করে নির্দিষ্ট দেয়ালের দিকে যেতে



www.pathagar.com

বললেন। চাদরটি নিয়ে তারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছালে মহানবী [সা] নিজ হাতে 'হাজরে আসওয়াদ' নামক পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন। মহানবী [সা]-এর বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের জন্য কুরাইশ জাতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেল।

মহানবীর [সা] সংগ্রামী জীবনে ছিল নানা উদ্যোগী কর্মকাণ্ড। মদিনার সনদ [ Charter of Medina] প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং বদর যুদ্ধের পরিকল্পনায় মহানবীর হিকমতের পরিচয় ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। হিজরতের পর মহানবী [সা] মদিনায় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী তিনি প্রথমে মদিনায় একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন যা মস্‌জিদে নববী নামে খ্যাত। এ মস্‌জিদটি ইসলাম প্রচার, ইসলামী শিক্ষা ও প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের কার্যালয়রূপে পরিচিতি লাভ করে। হিজরতের পর মহানবী [সা] লক্ষ্য করলেন মদিনার জনগোষ্ঠী চারভাগে বিভক্ত : ১. মদিনাবাসী আদি মূর্তি উপাসক সম্প্রদায়, ২. ইহুদী সম্প্রদায়, ৩. নবদীক্ষিত মুসলমান [আনসার] এবং ৪. মোহাজেরগণ [মক্কা থেকে আসা মুসলমান]। মহানবী [সা] ভাবলেন এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের নিয়ে পারস্পারিক সমঝোতা ও সহযোগিতা ছাড়া মদিনাতে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রে গঠন ফলবতী হবে না। তাই মহানবী [সা] সকল সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি 'মদিনার সনদ' প্রণয়ন করেন। এ সনদের শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :

১. সবরকম অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অরাজকতা মদিনা থেকে দূর করা হবে, ২. মদিনার ভিতরে এবং বাইরে অবস্থানকারী সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমান অধিকার বর্তমান থাকবে, ৩. ধর্মের ব্যাপারে পরমত সহিষ্ণুতা বজায় থাকবে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে, ৪. হযরতের পূর্ব সম্মতি ছাড়া মদিনাবাসীগণ কারও বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না, ৫. মদিনার জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোনো গুপ্ত ষড়যন্ত্রে তারা বাইরের কোনে শত্রুর সাথে যুক্ত হতে পারবে না, ৬. মদিনা নগরী পবিত্র বলে গণ্য করা হবে এবং বাইরের শত্রুর আক্রমণ হতে মদিনাকে রক্ষার জন্য সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে, ৭. আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী মদিনাবাসীর ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করবেন মহানবী [সা] নিজে, ৮. মদিনার সাধারণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইহুদী সম্প্রদায়কে পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান করা হবে এবং ৯. যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করবে।

মদিনার সনদদৃষ্টে স্পষ্ট বোঝা যায় মহানবী [সা] ছিলেন অত্যন্ত পরিপূর্ণ সুপরিপক্ক রাজনীতি জ্ঞানের অধিকারী। মহানবী [সা] প্রণীত মদিনার সনদ ছিলো পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। এর আগে রাজার কথাই ছিল আইন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সমঝোতা ও সম্প্রীতি, দেশ শাসনে সকলের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা, অসাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সামাজিক গুণের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে মদিনার সনদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। "Civilization on Trail" গ্রন্থে Toynbee বলেন- "The extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding moral achievements of Islam, and in the contemporary world there is, as it happens a crying need for propagation of this Islamic virtue." Bertold



www.pathagar.com

Spuler তার "The Muslim world" গ্রন্থে মদিনার সনদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন- "The constitution..... displays a statesman like ability which Muhammad [sm] developed then."
মহানবী [সা] প্রণীত মদিনার সনদ ছিল কপট ইসলাম ধর্মানুরাগী প্রতারকদের যাচাই-বাছাই করবার একটি ফাঁদ বিশেষ। এই সনদের শর্ত ভঙ্গের কারণে নবী করিম [সা] বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন। বিজ্ঞতা ও কৌশলের দিক থেকে মদিনা সনদ প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ [সা] পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন। মদিনার সনদ সম্পর্কে উইলিয়াম মূর "Life of Mohammad" গ্রন্থে বলেন- The charter of Medina "reveals the man [The Prophet] in his real greatness- a master-mined, not only of his own age, but of all ages."
মদিনায় মহানবীর [সা] সাফল্য মক্কাবাসী কাফেরদের গাত্রদাহের বড় কারণ হয়ে উঠলো। তারা অস্থির চিত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো মদিনার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। যুদ্ধ আসন্ন হয়ে আসলে মহানবী [সা] মদিনাবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আহ্বান জানালেন। মদিনার সনদ অনুযায়ী এ যুদ্ধে সকলের অংশগ্রহণ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য জরুরী। কিন্তু মহানবী [সা] লক্ষ্য করলেন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরিবর্তে ইসলামের শত্রু কোরেশ কাফেরগণ বরং মদিনা আক্রমণ করে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করলেই তারা খুশি হয়। শুধু তাই নয়, ভিতরে ভিতরে তারা কোরেশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঘরে-বাইরে শত্রু। ঘরের শত্রুকে ক্ষুব্ধ না করে বহি:শত্রু কোরেশদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মহানবী [সা]। তিনি ভক্তকূল সঙ্গী-সাথীদের মনোভাব এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য এক সভার আয়োজন করেন। সভায় তিনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী আবু সুফিয়ানকে অস্ত্রশস্ত্রসহ মক্কায় যেতে দিলে কোরেশবাহিনীর শক্তি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। বদর প্রান্তর ছিল মক্কা মদিনা ও সিরিয়ার রাজপথের সন্ধিস্থলে আর এ এলাকাটি মদিনার অন্তর্ভূক্ত। তাই মহানবী [সা] বদর প্রান্তরেই আবু সুফিয়ানকে বাধা দেয়ার কথা পরামর্শ সভায় তুলে ধরলেন এবং সকলের মতামত জানতে চাইলেন। আবু বকর [রা] এবং আলী [রা] মহানবীর [সা] প্রস্তাব সমর্থন করলেন। আল মিক্‌দাহ নামক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর নির্দেশে আপনি যেখানে খুশি চলুন আমরা আপনার সঙ্গে যাব। হযরত মুসার অনুসারীদের ন্যায় আমরা এ কথা বলবো না যে, হে মুসা, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকি। আমাদের কথা হচ্ছে : আল্লাহর হুকুমে আপনি যুদ্ধে চলুন আমরাও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। একথায় নবী করিম [সা] উজ্জীবিত হলেন। কেউ কেউ বললেন ঘরে শত্রু রেখে বদর প্রান্তরে সকলের চলে যাওয়া সমীচীন হবে না। মহানবী [সা] এ যুক্তি সমর্থন করলেন। তিনি তাঁর জনশক্তিকে দুভাগে ভাগ করলেন। গৃহশত্রু দমনে যারা মদিনায় থাকার পক্ষপাতি তাদেরকে মদিনায় রাখলেন আর যারা বদর প্রান্তরে অভিযানে যাওয়ার পক্ষপাতি তাদেরকে নিয়ে তিনি বদর প্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মাত্র ৩১৩ জন। শত্রুপক্ষে ছিল সহস্রাধিক সৈন্য। বদরপ্রান্তরের যে স্থানে মহানবী [সা] সৈন্য সমাবেশ করলেন তা সমর বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুবিধাজনক জায়গা। মাত্র তিনশত তেরজন-এর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মহানবী [সা]



www.pathagar.com

বদরযুদ্ধে কোরেশদের বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করলেন। মহানবী [সা] সমর কৌশলের বিচক্ষণতায় তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকে সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রতায় শত্রুপক্ষ অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী করেছিলেন।

বদরযুদ্ধে শত্রুপক্ষের সেনাপতি আবু যহলের মৃত্যুর সাথে সাথে কোরেশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করছিলো। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে মুসলিমগণ আরও শত্রু নিধন করতে পারতো কিন্তু মহানুভব ও করুণার ছবি মহানবী [সা] অযথা শত্রুহত্যা বন্ধ করার হুকুম দিলেন। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয়, ৭০ জন বন্দী হয়। অপরপক্ষে মাত্র ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। বন্দীদের প্রতি মহানবীর [সা] উদারতা তাঁর মহানুভবতার পরিচয় বহন করে। তিনি বন্দী শত্রুদের প্রতি যে আচরণের নির্দেশ দিলেন তা হলো : প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান বন্দীদের দিতে হবে। মহানবী [সা]-এর সে আদেশ সঠিকভাবে পালিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মূইর বলেন, [যুদ্ধবন্দীদের ভাষায়] "মদিনাবাসীদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, তাহারা আমাদিগকে উট কিংবা ঘোড়ায় চড়িতে দিয়া নিজেরা হাঁটিয়া চলিত। তাহারা নিজেদের সামান্য রুটিও নিজেরা না খাইয়া আমাদিগকে খাইতে দিত, নিজেরা খোরমা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত।"

হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় মহানবীর [সা] সংগ্রামী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হুদাই বিয়ার সন্ধিকে কুরআন শরীফে "ফাতহুম মুবিন" অর্থাৎ মহাবিজয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপনের সদিচ্ছা, সন্ধির শর্তাবলীতে মহানবীর [সা] মহানুভবতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে। মক্কা বিজয়ের পর পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী সেনাপতির মতো আচরণ আমরা মহানবীর [সা] আচরণে দেখি না। তিনি তার দলবলসহ মক্কানগরীতে প্রবেশ করছেন। কোনো দম্ভ, কোনো অহংকার, কোনো প্রতিহিংসা, কোনো প্রতিশোধ বাসনা মহানবীকে [সা] লেশমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। বিজয়ের জন্য তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ করছেন। যে উটের পিঠে চড়ে তিনি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন সে উটের গ্রীবার সাথে তার মাথা নত হয়ে পড়ছে মহান আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য। এ এক অভূতপূর্ব চারিত্রিক মাহাত্ম্য! পৃথিবীর আর কোনো মানুষের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেখা যাবে না। তাঁকে অনুসরণেই মানবকূলের কল্যাণ। এ কল্যাণ প্রাপ্তিই হোক আমাদের কাম্য।



www.pathagar.com

# মহামানব হযরত মুহাম্মদ [সা]

## আখতার হামিদ খান

দুনিয়ার ইতিহাসে অনেক মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তাদের মহত্ত্ব স্থান-কাল আর পাত্রের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন একজন মহামানবের নামও উল্লেখ করা যাবে না, যিনি কালোত্তীর্ণ। হয়তো এককালে তিনি মহান ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি আর মহান বলে স্বীকৃত নন। কারণ, কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহত্ত্বে ভাটা পড়েছে। কেউ হয়তো সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে মহান বলে খ্যাত হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলে তার মহত্ত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না; বরং পাওয়া যায় একটা জঘন্য, বীভৎস রূপের পরিচয়। কিন্তু আমাদের মহানবী [সা] মহামানবদের ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রম, ঘরে-বাইরে তিনি সমভাবে মহান।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রা]কে নবীজীর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এক কথায় জবাব দেন: কুরআন মজীদ ছিল তাঁর চরিত্র। একই প্রশ্নের জবাবে একবার তিনি সবিস্তারে বলেন, কাউকে মন্দ বলার অভ্যাস নবীজীর ছিল না। এমনকি কেউ তাঁর মন্দ বললেও জবাবে তাকে মন্দ বলতেন না। বরং অন্যায়কারীকে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। দু'টি বিষয়ের মধ্যে তাঁকে বাছাই করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলে তিনি সহজটা গ্রহণ করতেন। তবে এজন্য শর্ত এই যে, তাতে গুণাহের কোনও নাম-গন্ধ থাকতে পারবে না। কারণ, পাপ কাজ থেকে তিনি অনেক দূরে থাকতেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো কারো নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অবশ্যই কেউ আল্লাহর বিধান লংঘন করলে আল্লাহ্ নিজেই তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন [অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তিনি তার শাস্তি নির্ধারণ করতেন।] তিনি কখনো নাম নিয়ে কোন মুসলমানের ওপর লা'নত বর্ষণ করেন নি, তিনি কখনো কারো আবেদন প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে এজন্য শর্ত ছিল এই যে, সে আবেদন না-জায়েয কাজের ব্যাপারে হতে পারবে না, গৃহে তিনি হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। বন্ধুদের মধ্যেও তিনি পা ছড়িয়ে বসতেন না। এমন ধীরে ধীরে তিনি কথা বলতেন যে, কেউ মুখস্থ করতে চাইলে সহজেই তা করতে পারতো।



www.pathagar.com

হযরত আলী মুর্তজা [রা] নবুওয়তের সূচনা থেকে ওফাত পর্যন্ত সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত ইমাম হুসাইন [রা] নবীজীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন : তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল এবং কোমল স্বভাবের। কঠোর মেজায এবং পাষাণ হৃদয়ের ছিলেন না। তিনি হৈ চৈ কলহ করতেন না। কোন মন্দ কথা মুখে উচ্চারণ করতেন না। তিনি মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াতেন না এবং কারো সঙ্গে দৃঢ় আচরণ করতেন না। কোন কথা, কোন বিষয় পছন্দ না হলে এড়িয়ে যেতেন। বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া, অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে তিনি দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন উদারমনা, স্পষ্টভাষী, কোমল স্বভাব আর খোশ মেজাযের মানুষ। কেউ হঠাৎ সম্মুখে এলে সে অনেকটা ভীত-বিহবল হয়ে পড়তো, কিন্তু ধীরে ধীরে আপনজনে পরিণত হতো এবং ভালো বাসতে শুরু করতো।

হিন্দ ইবনে আবূ হালা অনেকটা তাঁর ক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি বলেন: তিনি কোমল স্বভাবের ছিলেন, কঠোর মেজাযের ছিলেন না। কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা তিনি পছন্দ করতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ বিষয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। কোন কিছুরই নিন্দা করতেন না। যে কোন ধরনের খাবার সামনে এলে গ্রহণ করতেন। কোন খাদ্যকেই খারাপ বলতেন না। কেউ সত্য বিষয়ের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাঁর রাগ হতো অবশ্য নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো রাগ করেন নি। তিনি কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।

হযরত আনাস [রা] ছিলেন তাঁর বিশেষ খাদেম। তিনি বলেন: আমি দশ বছর তাঁর খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু এ সময়ে কখনো কোন ব্যাপারে আমার নিকট কৈফিয়ত তলব করেন নি। অর্থাৎ তিনি আমাকে বলেন নি যে, এটা কেন করলে? আর ওটা কেন করলে না?

মালিক ইবনে হুয়াইরিস ২৪ দিন তাঁর সোহবতে কাটান। তিনি বলেন: নবীজী ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী [র] 'কীমিয়াই সাআদাত' গ্রন্থে নবীজী সম্পর্কে বলেন: তিনি নিজ হাতে গৃহপালিত পশুকে খাবার খাওয়াতেন। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। খাদেমদের কাজে সহায়তা করতেন। তাদের সঙ্গে একত্রে বসে খাবার খেতেন। নিজে বাজার থেকে সদাই খরিদ করে আনতেন। উত্তম-অধম সকলকে প্রথমে সালাম করতেন। কেউ সঙ্গী হলে তার হাতে হাত দিয়ে চলতেন। দাস-প্রভু এবং হাবশী আর তুর্কীর মধ্যে পার্থক্য করতেন না। দিবা-রাত্র একই পোশাক পরিধান করতেন। কোন তুচ্ছ ব্যক্তিও দাওয়াত দিলে তা কবুল করতেন। যে খাবারই সম্মুখে উপস্থিত করা হতো, তা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতেন। রাতের খাবার থেকে সকালের জন্য আর সকালের খাবার থেকে রাতের জন্য তুলে রাখতেন না। তিনি ছিলেন নেক মেজায, কোমল স্বভাব, প্রশস্ত চিত্ত আর হাস্যোজ্জ্বল। তাঁর মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকতো, তাই বলে তিনি জোরে হাসতেন না। তিনি সর্বদা চিন্তায় ডুবে থাকতেন,



www.pathagar.com

তাই বলে তার চেহারায় চিন্তার ছাপ ছিল না। তিনি দানশীল ছিলেন, কিন্তু তাই বলে অপব্যয় অপচয় করতেন না।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী [রহ] নবীজী সম্পর্কে লেখেন: আপন বংশ-গোত্রের লোকজন এবং খাদেমদের প্রতি তিনি ছিলেন অতিশয় দয়াবান। তাঁর মুবারক যবানে কখনো কোন খারাপ কথা বা গালি উচ্চারিত হয়নি। তিনি কখনো কাউকে লা'নত করেন নি, অভিশাপ দেন নি। অন্যরা কষ্ট দিলে তিনি সবর করতেন, বংশ-গোত্রের লোকজন আর জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের প্রতি বেশি লক্ষ্য আরোপ করতেন। প্রতিটি ব্যক্তি আর প্রতিটি বস্তুর মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তবে আসমানী বাদশাহীর প্রতিই সর্বদা তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো।

বুখারী শরীফে আছে : তিনি অনুগতদের জন্য সুসংবাদদাতা আর গুণাহগারদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী, বে-খবরদের জন্য সতর্ককারী আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল ছিলেন। তিনি সব কিছু আল্লাহর উপর ন্যস্ত করতেন। তিনি দৃঢ় স্বভাব আর দৃঢ়ভাষী ছিলেন না। অন্যায়ের বিনিময়ে অন্যায় করতেন না। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন আর অপরাধীদেরকে মাফ করে দিতেন। ধর্মের বক্রতা দূর করা ছিল তাঁর কাজ। তাঁর শিক্ষা অন্ধজনকে চক্ষু দান করতো আর বধিরদেরকে কর্ণ দান করতো। তিনি ছিলেন সকল সৌন্দর্যের আধার। তাঁর মধ্যে সমস্ত প্রশংসনীয় স্বভাবের সমাবেশ ঘটেছিল। শান্তি ছিল, ন্যায়নীতি ছিল, সীরাত, সততা, সরলতা ছিল তাঁর বিবেক, প্রজ্ঞা ছিল তাঁর কথা, আর হিদায়াত ছিল তাঁর পথপ্রদর্শক। তিনি অপমান-যিল্লতী দূর করেন। অজ্ঞাত আর অখ্যাতদেরকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যান। অজানা-অচেনাদেরকে তিনি শক্তি দান করেন। তিনি সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগুরুতে পরিণত করেন আর দরিদ্রকে পরিবর্তিত করেন ঐশ্বর্যে।

খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক টমাস কার্লাইল [Thomas Carlyle] তাঁর সম্পর্কে লিখেন: তাঁর বাসগৃহ ছিল সাদাসিধা এবং অতি সাধারণ লোকের। তাঁর সাধারণ খাদ্য ছিল যবের রুটি এবং পানি। মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলতো না। [তাঁর জীবনী লেখকরা গর্বের সঙ্গে লিখেছেন] তিনি নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন এবং কাপড়ে তালি দিতেন। কোন প্রতাপশালী সম্রাটেরও অতটা আনুগত্য করা হয়নি, যতটা আনুগত্য করা হয়েছে তাঁর।

খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক, রোমান সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ Decline and Fall of Roman Empire এর লেখক এডওয়ার্ড গিবন [Edward Gibbon] লিখেন: পার্থিব শৌর্য বীর্যের চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও মুহাম্মদ [সা] এর আত্মমর্যাদা বাদশাহ সুলভ শান-শওকত গ্রহণ করেনি। আল্লাহর নবী গৃহের অতি তুচ্ছ কাজও নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। আগুন জ্বালাতেন, ঝাড়ু দিতেন। নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। কম্বল আর জুতা নিজে সেলাই করতেন। দুনিয়াত্যাগী সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসকে ঘৃণা করে অবলীলাক্রম তিনি একজন সাধারণ আরব সৈনিকের মতো অতি সাধারণ আহার গ্রহণ করতেন, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে তিনি প্রাণ খুলে সাহাবীদেরকে আহার



www.pathagar.com

করাতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অধিকন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাঁর চুলা জ্বলতো না।

জনৈক ফরাসী ঐতিহাসিক নবীজীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে লিখেন : তিনি ছিলেন হাসিখুশি, সকলের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী। অধিকন্তু তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন। আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করতেন। অহেতুক কথাবার্তাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি উত্তম মত পোষণ করতেন। তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ইনসাফপ্রিয়। নি:স্ব ব্যক্তিদেরকে তিনি ভালোবাসতেন। নি:স্বদের মধ্যে থেকে তিনি আনন্দ বোধ করতেন। নি:স্ব বলে তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন না, আর বাদশাহ বলে কাউকে বড় মনে করতেন না।

কুরআন মজীদের ইংরেজি অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার মার্মাডিউক পিকথল [Marmaduke Pickthall] বলেনঃ আরবদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করার পরও তিনি অনুসারীদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতেন। দারোয়ান-পাহারাদার আর দেহরক্ষীর প্রয়োজন হতো না তাঁর। অতি সাধারণ এবং স্বাধীনতভাবে তিনি সকলের মধ্যে চলাফেরা করতেন। তিনি চলাফেরা করতেন একজন পথ-প্রদর্শক হিসাবে, একজন সংস্কারক হিসাবে এবং একজন পরিচিত বন্ধু হিসাবে।

জার্মান লেখক ডক্টর গাস্টাভ ওয়ায়েল [Gustav Weil] লিখেনঃ মুহাম্মদ [সা] ছিলেন আপন জাতির মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র ও নির্মল। তাঁর পোশাক আর খাদ্য ছিল অবিশ্বাস্য আড়ম্বরহীন। তাঁর মেজায এমনই সাদাসিধা এবং আড়ম্বরহীন ছিল যে, সঙ্গীদের নিকট থেকে কোন বিশেষ ধরনের সম্মান-মর্যাদা গ্রহণ করতেন না। যে কাজ তিনি নিজে করতে পারতেন, সে কাজে সেবকের সেবা গ্রহণ করতেন না। প্রায়শ তিনি বাজার থেকে সদাই খরিদ করতেন। গৃহে কাপড়ে তালি দিতেন। তাঁকে দেখা যেতো নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতে। যে কোন সময় যে কোন লোক তাঁর কাছে যেতে পারতো, পীড়িতদের সেবা করতেন এবং সকলের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করতেন। তাঁর বদান্যতা আর দান-দক্ষিণার কোন সীমা ছিল না। তাঁর প্রতি সর্বদা অঢেল তোহফা বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি অল্প পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পত্তি রেখে যান এবং তাও বায়তুলমালে দান করে যান।

ওয়াশিংটন আরভিং [Washington Irving] বলেনঃ চরম উৎকর্ষ আর দাপট কালেও তিনি বলেছেনঃ বলেন আর স্বভাব-চরিত্রে সেই অনাড়ম্বরতা বহাল রেখেছেন, শক্তি-সামর্থ্যহীন আর অস্থিরতার কালে যা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। রাজা-বাদশাহ সুলভ জলুস তো দূরের কথা, কোন মজলিসে তাঁর সঙ্গে বিশেষ ব্যবহার করা হলে তা-ও তাঁর কাছে নিতান্তই অসহ্য ঠেকতো।

অমুসলিম লেখক আর ঐতিহাসিকদের এমন অসংখ্য সাক্ষ্য আর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু সূর্য নিজেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। এজন্য বাইরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে



www.pathagar.com

বলে আমরা মনে করি না। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা থেকে নবীজীর উন্নত চরিত্র আর উত্তম স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম [সা] এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করে। নবীজীকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, যদিও সে নিজ গোত্রে ভালো লোক নয়, কিন্তু তারপরও তাকে আসতে দাও। লোকটি নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তার সঙ্গে কোমল ব্যবহার করেন। এতে হযরত আয়েশা [রা] অবাক হন। লোকটি চলে গেলে হযরত আয়েশা [রা] জিজ্ঞেস করলেন : আপনি তো তাকে ভালো মানুষ মনে করেন না, কিন্তু তারপরও কেন তার সঙ্গে এমন কোমল আচরণ করলেন? জবাবে নবীজী বললেনঃ আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার কটূক্তির কারণে মানুষ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

অতিমাত্রায় দানশীলতা আর উদারচিত্ততার কারণে অনেক সময় নবীজী ঋণগ্রস্ত থাকতেন। মদিনায় তিনি সময়ে সময়ে ইয়াহূদীদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, পরিশোধ করতে বিলম্ব ঘটলে তারা কঠোর ব্যবহার করতো, নবীজী হাসিমুখে তাদের কটু কথা বরদাশ্‌ত করতেন।

একদিন এক বেদুঈন গোশত বিক্রয় করছিল। ঘরে খেজুর আছে মনে করে নবীজী খেজুরের বিনিময়ে গোশত নেওয়া ঠিক করলেন। কিন্তু গৃহে গিয়ে জানতে পারলেন যে, খেজুর নেই। ফুরিয়ে গেছে। নবীজী ফিরে এসে বদ্দুকে বললে : এখন তো আমার ঘরে খেজুর নেই। তুমি গোশত ফেরত নাও। বদ্দু হৈ চৈ শুরু করে দেয়। অসদাচার আর কাকে বলে! সাহাবায়ে কিরাম তাকে অনেক বোঝালেন যে, আল্লাহর নবী অসদাচার করছেন না। কিন্তু সে থামতে রাজী নয়। নিজে কথা সে বলেই যাচ্ছে। সাহাবায়ে কিরামের নিকট দৃশ্যটা বিসদৃশ ঠেকায় তাঁরা শাসিয়ে বদ্দুকে চুপ করাতে চান। কিন্তু নবীজী তাঁদেরকে বারণ করে বললেন, তাকে বলতে দাও। অবশেষে তিনি জনৈকা আনসারী মহিলার নিকট থেকে কিছু খেজুর এনে বদ্দুর গোশতের বিনিময় আদায় করনে।

একবার নবীজীর খিদমতে জনৈক ভিক্ষুক উপস্থিত হন। নবীজী তাকে বসতে বললেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভিক্ষুকও উপস্থিত হন। নবীজী তাদেরকেও বললেন, বসো। এখন তো আমার কাছে কিছু নেই। অবশ্য আল্লাহ দান করলে আমি তোমাদের অভাব পূরণ করবো। ইতিমধ্যে নবীজীর খিদমতে চার উকিয়া রৌপ্য হাদিয়া আসে। নবীজী এক উকিয়া করে তিনজন ভিক্ষুককে তিন উকিয়া দান করলেন। অবশিষ্ট উকিয়া সম্পর্কে বললেন, যার প্রযোজ্য নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু রাত পর্যন্ত কেউ আগ্রহ ব্যক্ত করেনি। বাধ্য হয়ে ঘুমোতে গিয়ে তা শিয়রে রেখে দেন। কিন্তু ঘুম আসে না। বারবার উঠে গিয়ে নামায পড়েন। হযরত আয়েশা [রা] নবীজীর এ অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, খারাপ লাগছে কিনা? নবীজী বললেন, না। বললেন : এটা



www.pathagar.com

আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। আমার শংকা হচ্ছে, আমার কাছে এ রৌপ্য থাকাকালে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়!

হযরত আবূ যর গিফারী [রা] হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবীজী তাঁকে বলেন : আবূ যর! ওহোদ পর্বতও যদি আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যায় তবুও আমি এটা পছন্দ করবো না যে, তিন রাত্রি আমার নিকট একটা দীনারও অবশিষ্ট থাকুক। অবশ্য ঋণ পরিশোধের জন্য ছেড়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

কোন কোন সময় এমনও হতো যে, কারো নিকট থেকে কিছু ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধ করে সে বস্তুটা তাকে হাদিয়া হিসাবে দান করে দিতেন। পানাহারের মতো মামুলী জিনিসও একা গ্রহণ করতেন না। উপস্থিত সকলকে নিয়েই তা আহার করতেন।

একবার নবীজী কোথাও যাচ্ছিলেন। এ সময় একজন অভাবী হাত পাতে। কিন্তু তখন দান করার মতো কিছুই ছিল না নবীজীর নিকট। কিন্তু লোকটিকে বিদায় না করে দিয়ে বরং তাকে সঙ্গে গমন করতে বলেন। যদি পথিমধ্যে কোন উপায় হয়ে যায়। হযরত ওমর ফারুক [রা]ও সঙ্গে ছিলেন। তিনি আরয করলেন, আপনি নিজেই তো রিক্তহস্ত। এ অবস্থায় আপনার উপর কি দায়িত্ব বর্তাতে পারে? সেখানে একজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দান করে যান। আল্লাহ অভাবী করবেন না আপনাকে। কথাটা নবীজীর বেশ পছন্দ হয়।

নবীজী আপন কন্যা হযরত ফাতিমা [রা] কে অতিশয় ভালোবাসতেন। হযরত ফাতিমা উপস্থিত হলে নবীজী ভালোবাসার টানে উঠে দাঁড়াতেন। কপালে চুমো খেতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর সংসারে এমন টানাটানি ছিল যে, কোন দাসী-সেবিকা ছিল না। চাকি পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যায়। পানির মশক বহন করতে করতে স্কন্ধে দাগ পড়ে যায়। এক যুদ্ধে কিছু দাসী মুসলমানদের হস্তগত হয়। তিনি ভাবলেন, একজন দাসী তাঁকে দেয়া হলে তাঁর কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। কিন্তু নিজের পিতাকে বলার সাহস হয়নি। হযরত আলী [রা] এর মাধ্যমে সুপারিশ করান। কিন্তু নবীজী বললেন, এখনো আসহাবে সুফফার ব্যবস্থা হয়নি। তাদের জন্য ব্যবস্থা করার আগে অন্য কারো জন্য আমি কিছু করতে পারবো না।

কাফির-মুশরিক-মুসলমান–সকলেই নবীজীর মেহমান হতো। তিনি সমভাবে সকলের মেহমানদারী করতেন। অনেক সময় ঘরে যা কিছু থাকতো, সবই মেহমানদের সামনে পেশ করা হতো আর ঘরের লোকজন অভুক্ত থাকতো। মেহমানের আরাম-আয়েশের প্রতি এতটা লক্ষ্য রাখতেন যে, রাতে উঠে তাদের খোঁজখবর নিতেন। ভিক্ষুকদের যথাসাধ্য সাহায্য করা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি ভীষণ ঘৃণা করতেন। অধিকন্তু তিনি বলতেন, ভিক্ষা করার চেয়ে কাঠের বোঝা বহন করে জীবিকা নির্বাহ করা অনেক উত্তম। একবার জনৈক আনসারী নবীজীর কাছে ভিক্ষা চায়। নবীজী জানতে চাইলেন, তোমার কাছে কি আছে? তার কাছে একটা কম্বল ছিল আর ছিল একটা পান পাত্র। নবীজী তা এনে দু' দিরহাম বিক্রি করলেন। নবীজী তাকে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য দ্রব্য



www.pathagar.com

ক্রয় করে ঘরে দাও, আর অপর দিরহাম দিয়ে রশি ক্রয় করে তা দিয়ে বেঁধে জঙ্গল থেকে খড়ি এনে বিক্রয় করো। পনর দিন পর লোকটি পুনরায় নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়। তখন তার কাছে খরচ শেষে দশ দিরহাম জমা আছে। নবীজী শুনে ভারী খুশি হন এবং বলেন : কিয়ামতের দিন ললাটে ভিক্ষাবৃত্তির চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে এটা উত্তম।

নবীজী নিজের জন্য এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য সাদকা-যাকাত হারাম করেছিলেন। হযরত ইমাম হাসান [রা] একদা সাদকার খেজুর মুখে দিলে নবীজী তাঁকে বারণ করে বলেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমাদের পরিবার সাদকা খায় না? একথা শোনা মাত্রই হযরত ইমাম হাসান [রা] বমি করে দিলেন। কারো কাছে অনুগৃহীত থাকা পছন্দ করতেন না। একবার এক সময়ে হযরত ওমর [রা] এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর [রা] উভয়েই তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর [রা] এর উট ছিল অবাধ্য। বারবার সে নবীজীর উষ্ট্রের আগে চলে যায়। হযরত ওরম [রা] তাকে শাসন করেন। কিন্তু সে কিছুতেই শাসন মানে না। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা] এর অপারগতা বুঝতে পারেন। তখন হযরত ওমর [রা] বললেন, তুমি উষ্ট্রটি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। তিনি বিক্রয় না করে বরং দান করতে চাইলেন। কিন্তু বিনামূল্যে গ্রহণ করতে হযরত প্রস্তুত নন। অবশেষে মূল্য গ্রহণ করতে রাজি হলে নবীজী তা ক্রয় করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা] কে দান করে বললেন : এখন এটা তোমার।

নবীজীর সুবিচার আর ন্যায়নীতির এমনই খ্যাতি ছিল যে, ইয়াহুদীরা পর্যন্ত বিচার-ফয়সালার জন্য তাঁর কাছে বিরোধ উপস্থাপন করতো। নবীজী ন্যায়-নীতি দ্বারা বিচার ফয়সালা করতেন। নবীজী বলতেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাতজনকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে স্থান দেবেন। তাদের একজন হচ্ছে সুবিচারকারী শাসক।

শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডের ব্যাপারে নবীজী কারো সুপারিশ এবং অনুরোধ শুনতেন না। হযরত উসামা ইবনে যায়দ ছিলেন নবীজীর অতি প্রিয়পাত্র। এক অভিযুক্তা নারীর পক্ষে তিনি ক্ষমার আবেদন জানালে নবীজী অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন : আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাও? আল্লাহর শপথ, যদি আমার কন্যা ফাতিমাও এমন কাজ করে, তবে আমি তাকেও একই দণ্ড দেবো।

একদিন নবীজী গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। অনেক লোকের ভিড়। একজন বেয়াদব হুমড়ি খেয়ে নবীজীর সম্মুখে এসে পড়ে। নবীজীর হাতে ছিল একটা পাতলা ছড়ি। তিনি হালকাভাবে লোকটির গায়ে টোকা দেন। ছড়ি লোকটির মাথায় লাগে এবং সে সামান্য আহত হয়। নবীজী তৎক্ষণাৎ ছড়িটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, প্রতিশোধ নাও। লোকটি হেসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।



www.pathagar.com

তাঁর মধ্যে দয়ার গুণ এমনই প্রবল ছিল যে, দণ্ড দানে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যতটা সম্ভব তিনি ক্ষমা করতে চাইতেন। জনৈক ব্যক্তি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করে যে, তার দ্বারা ব্যভিচারের কাজ সংঘটিত হয়ে গেছে। নবীজী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি ঘুরে এসে আবার সামনে উপস্থিত হয়। নবীজী আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। কয়েকবার এরকম করার পর নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পাগল হয়ে যাওনি তো? লোকটি বললো, না, আমি পাগল হইনি। এরপর নবীজী বললেন, তুমি বিয়ে করেছ? লোকটি বললো, হ্যাঁ, আমি বিবাহিত। এভাবে বারবার জিজ্ঞেস করে ব্যভিচারের ব্যাপারে নবীজী নিশ্চিত হতে চাইলেন। লোকটি বললো, হ্যাঁ, আমি সঙ্গম করেছি। এভাবে বিভিন্ন পর্যায় জিজ্ঞাসাবাদে নিশ্চিত হওয়ার পর নবীজী প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে বধ করার নির্দেশ জারি করেন।

আপন-পর, শত্রু-মিত্র সকলেই নবীজীর দয়া-অনুগ্রহের সমভাবে অংশীদার ছিল। মক্কাবাসীদের প্রতি দুশমনীর কারণে একবার সুমামা ইবনে আসসাল নাজহ্ থেকে মক্কায় খাদ্যশস্য পরিবহন বন্ধ করে দেয়। নবীজী জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ জারি করেন যে, খাদ্যশস্য পরিবহন বন্ধ করা যাবে না।

একবার গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে নবীজী গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েন। ফাওরাস ইবনুল হাররাস সে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তরবারি হাতে নিয়ে নবীজীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সে বললো, বলো, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? নবীজী আসমানের দিকে অঙ্গুলীর ইশারায় বললেন, আল্লাহ! নবীজীর জবাব শুনে ফাওরাস শংকিত হয়ে পড়ে। নবীজী তার হাত থেকে তরবারি নিয়ে বললেন, বলো, এখন কে তোমাকে রক্ষা করবে? ফাওরাসের মুখ দিয়ে কোন জবাব বের হলো না। নবীজী তাকে ক্ষমা করে দেন।

নবীজীর কন্যা যয়নব অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ইবনে হাব্বার তাঁকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। শেষ পর্যন্ত এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে হাববার নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে দয়ার সাগর নবীজী তাকে ক্ষমা করে দেন।

নবীজী শিশুদেরকে খুবই পেয়ার করতেন। শিশুদের নিকট দিয়ে গমনকালে তিনি আগে শিশুদেরকে সালাম করতেন। তাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলাতেন। তিনি বৃদ্ধদেরকেও অত্যন্ত সম্মান করতেন। মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক [রা] তাঁর বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতাকে বায়'আত করবার জন্য নবীজীর খিদমতে নিয়ে এলে তিনি কোমল কণ্ঠে বলেন, কেন তাঁকে কষ্ট দিলে? আমি নিজে তাঁর কাছে গমন করতাম।

নবীজী যুদ্ধে নিজ হস্তে কাউকে হত্যা করেন নি। মুনাফিক উবাই ইবনে খালাফ ছিল নবীজীর জীবন দুশমন। সে একটা উন্নতমানের অশ্ব প্রস্তুত করে রেখেছিল এবং সর্বত্র বলে বেড়াতো যে, এ অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে আমি মুহাম্মদ [সা]কে হত্যা করবো। ওহুদ যুদ্ধে সে সারি ভেদ করে নবীজীর কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল। সাহাবায়ে কিরাম তাকে বারণ করতে চাইলেন। কিন্তু নবীজী বললেন, তাকে কাছে আসতে দাও। সে



www.pathagar.com

আরো কাছে এলে জনৈক মুজাহিদের নিকট থেকে বর্শা নিয়ে তার ঘাড়ে মৃদু আঘাত করলেন। সে চিৎকার করে পলায়ন করলো। তাকে বলা হলো, এটা এমন কি আঘাত যে, তুমি চিৎকার করে পলায়ন করলে? সে বললো, জানো না, এটা মুহাম্মদ [সা]-এর হাতের আঘাত!

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী [রা] এর উক্তি অনুযায়ী বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে কিছু কুমারী নারীর মতোই লজ্জাশীলতাকে তিনি ঈমানের অঙ্গ মনে করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর খিদমতে মনেপ্রাণে হাজির থাকতেন। কিন্তু তিনি নিজের কাজ নিজে করা পছন্দ করতেন, নিজ হাতে যে কোন ক্ষুদ্র কাজ করতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রা] এর নিকট জানতে চাওয়া হয় যে, গৃহে নবীজী কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বলেন, নবীজী ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। নিজ হাতে কাপড়ে তালি দিতেন। ঝাড়ুও দিতেন। বকরীর দুধ দোহন করতেন। জুতা ছিঁড়ে গেলে নিজ হাতে সেলাই করে নিতেন। উষ্ট্রকে খাবার দিতেন এবং বাজার থেকে সদাই ক্রয় করে আনতেন।

একদা হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক [রা] নবীজীর খিদমতে হাযির হয়ে দেখতে পান যে, তিনি নিজ হাতে উষ্ট্রের গায়ে তেল মালিশ করছেন। সাংসারিক পরিশ্রমের কাজে নবীজী সর্বদা সমান সমান অংশগ্রহণ করতেন। কুবা আর মদিনার মসজিদের নির্মাণ কাজ হোক, কি যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ হোক, নবীজী সর্বত্র অগ্রবর্তী থাকতেন। একবার এক সফরে সাহাবায়ে কিরাম বকরী জবাই করেন এবং পাক করার কাজ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেন। নবীজী বললেন, আমি জঙ্গল থেকে খড়ি আহরণ করে আনবো। সাহাবায়ে কিরাম অনেক মিনতি জানিয়ে বললেন, আপনি আরামে বসে থাকুন। আমরা সব ব্যবস্থা করবো। নবীজী বললেন, এভাবে আরামে বসে কাটানো আমার পছন্দ নয়।

অপরের কাজ করে দেয়া তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। একবার নামাযের জন্য টেনে ধরে বললো, আমার সামান্য কাজ আছে। আমি যাতে ভুলে না যাই, এজন্য আগে আমার কাজটা করে দাও। নবীজী নিরবে বদ্দুর সঙ্গে গমন করে তার কাজ করে দেন। এরপর নাযাম আদায় করেন।

জনৈক সাহাবী যুদ্ধে গমন করেছেন। তার ঘরে অন্য কোন পুরুষ লোক নেই। আর নারীরা বকরীর দুধ দোহন করতে পারে না। নবীজী প্রতিদিন তাদের ঘরে গিয়ে বকরীর দুধ দোহন করে দিয়ে আসতেন।

হযরত আনাস [রা] দীর্ঘদিন নবীজীর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, নবীজী কখনো তাঁকে জিজ্ঞেস করেন নি যে, তুমি অমুক কাজ কেন করলে আর অমুক কাজ কেন করলে না? তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, শৈশবে একবার রাসূলে খোদা তাঁকে কোন কাজে প্রেরণ করতে চাইলে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন। এই বলে তিনি বাইরে



www.pathagar.com

গিয়ে শিশুদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হলেন। নবীজী পেছন থেকে এসে স্নেহভরে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, আনাস, এখন সে কাজটা করে দাও।

তাঁর অনেক তুষ্টি আর দুনিয়া ত্যাগের অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত আয়েশা [রা] বলেন যে, নবীজীর কখনো কখনো তিনদিন যবের রুটি জুটেনি। অধিকন্তু দুমাস পর্যন্ত তাঁর চুলায় আগুন জ্বলতো না। পরিবারের লোকজন খেজুর আর পানি দ্বারা কাটাতো। কখনো এমন হতো যে, ক্ষুধার তাড়নায় কথা বলা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারতেন। তাঁরা নবীজীকে মেহমান করে নিজেদের গৃহে নিয়ে যেতেন।

দুনিয়ার প্রতি নবীজী কতটা নিরাসক্ত ছিলেন, কয়েকটি দু'আর ভাষা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। একটি দু'আয় নবীজী বলেনঃ হে আল্লাহ! এমন করো, যাতে একদিন আমি খেতে পাই, অপর দিন উপোস করি। যাতে ক্ষুধায় কাতর হয়ে তোমার কাছে কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাই আর খেয়ে তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি। অপর একটা দু'আয় তিনি ফরিয়াদ করেন : হে আল্লাহ! মুহাম্মদের সন্তানদেরকে এ পরিমাণ দান কর, যাতে ক্ষুধার্ত থাকতে না হয়।

তিনি অঙ্গীকার যথাযথভাবে মেনে চলতেন। কাউকে কথা দিলে তা রক্ষা করতেন। তাঁর লেনদেন ছিল নিতান্ত স্বচ্ছ–পরিচ্ছন্ন। এ কারণে কুরায়শরা সর্বসম্মতভাবে তাঁকে 'আল আমীন' উপাধি দিয়েছিল। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার মধ্যে কোন দীনদারী নেই।

একবার আবূ রাফে নামে মক্কার এক ক্রীতদাস কুরায়শের দূত হিসাবে মদিনা আগমন করে। নবীজীর মনমাতানো ব্যক্তিত্বে আবূ রাফে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়। কাফিরদের নিকট ফিরে যেতে অস্বীকার করে। কিন্তু নবীজী তাকে বললেন, একজন দূতকে থাকতে দিয়ে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না। তুমি এখন ফিরে যাও। মক্কায় পৌঁছার পরও তোমার মনের অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলে ফিরে আসতে পারো।

আবূ জাহেল ছিল নবীজীর নিকটতম দুশমন। সেও নবীজীর সত্যতা স্বীকার করতো। একবার সে নবীজীর সম্মুখে স্বীকার করে যে, মুহাম্মদ [সা] আমি তোমাকে মিথ্যা বলি না। অবশ্য দীনের যেসব কথা তুমি আমাদেরকে বলছো, আমি তা সত্য বলে স্বীকার করি না।

সত্যবাদিতা মূলত বীরত্বেরই একটা শাখা। একবার এক ভাষণে নবীজী উপদেশ দিয়ে বলেন : কেউ যখন কোন সত্য সম্পর্কে অবগত হয়, তখন কোন মানুষের ভয়ে সে যেন সত্য বলা থেকে নিবৃত্ত না হয়।

অপর এক প্রসঙ্গে নবীজী বলেন : কেউ যেন নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান না করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : কোন ব্যক্তি কিভাবে নিজকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে? নবীজী বললেন : এভাবে যে, আল্লাহ সম্পর্কে তার কোন কথা বলা দরকার, কিন্তু সে তা বলে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন : আমার সম্পর্কে অমুক কথা



www.pathagar.com

বলতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? তোমার উচিত ছিল আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা। একটা হাদীসে নবীজী বলেন : জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ।

নবীজীর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা আর লেনদেনে পরিচ্ছন্নতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, কাফিররাও নবীজীর নিকট আমানত রাখতো। সায়েব নামে একজন ব্যবসায়ী ছিল। ইসলাম গ্রহণ করে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলে লোকেরা রাসূলে খোদার নিকট তাকে পরিচিত করাতে চায়। কিন্তু নবীজী বললেন, আমি তাকে তোমাদের চেয়ে ভালো জানি। সায়েব বলেন, নবীজী ব্যবসায়ে আমার সঙ্গে শরীক ছিলেন। আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, তিনি সব সময় লেনদেন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন রেখেছেন।

জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে নবীজী কিছু খেজুর ধার নেন। ধার শোধ করার সময় নবীজীর কাছে যে খেজুর ছিল, সেগুলো ততটা উন্নত মানের ছিল না। এ কারণে লোকটি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সাহাবীরা বললেন, তুমি রাসূলের দেয়া জিনিস গ্রহণ করছো না? লোকটি বললো, আল্লাহর রাসূল যদি লেনদেনে স্বচ্ছ না হন, তবে আর কার কাছে স্বচ্ছতা আশা করা যাবে? লোকটির কথা শুনে নবীজীর চক্ষু অশ্রুসক্তি হয়ে পড়ে। তিনি বললেন : সত্য বটে। তাঁর মতে বিশ্বস্ততা আর স্বচ্ছতার সম্পর্ক কেবল বস্তুগত বিষয়ের সঙ্গেই ছিল না; বরং আইনগত এবং নৈতিক বিষয়ও এতে অন্তর্ভূক্ত। নবীজীর হাদীসে আছে : কারো কোন গোপন বিষয় কেউ অবগত হতে পারলে তা গোপন রাখাও একটা আমানত। কেউ কারো সম্পর্কে কোন অসমীচীন কথা বললে বা কোন খারাপ মত প্রকাশ করলে সে কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে ফিতনা ফাসাদের কারণ না হওয়াও একটা আমানত। কেউ একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তাকে যথাসম্ভব সৎ পরামর্শ দেওয়া বা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখাও একটা আমানত। তেমনিভাবে কর্মচারির সঠিকভাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা এটাও আমানত। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীর হক আদায় করা—এসবও আমানতের অন্তর্ভূক্ত। এসব কাজে ত্রুটি আর আলস্য করা আমানতের পরিপন্থী।

একটি হাদীসে নবীজী বলেন : সে সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন নিহিত, কোন বান্দার দীন ততক্ষণ ঠিক হতে পারে না, যতক্ষণ তার যবান—কথাবার্তা ঠিক হবে। কেউ যদি অসদুপায়ে সম্পদ উপার্জন করে তা থেকে ব্যয় করে, তবে তাঁর সম্পদে বরকত দেয়া হবে না। আর অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ দান-খয়রাত করলে তা কবুল হবে না। আর এ থেকে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তার দোযখের সফরের জন্য সম্বল হবে। খারাপ জিনিস খারাপ জিনিসের কাফ্ফারা হতে পারে না। অবশ্য ভালো জিনিস খারাপ জিনিসের কাফ্ফারা হতে পারে। নবীজী আরো বলেন, যত দিন আমানতকে গনীমতের মাল আর যাকাতকে যতদিন জরিমানা মনে করা হবে না, ততোদিন আমার উম্মত সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে।



www.pathagar.com

গীবত, অপবাদ, দোষ খুঁজে বেড়ানো, কুধারণা, মন্দ কথা, দ্বীমুখী নীতি–এসবকে নবীজী ঘৃণা করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবীজী বলেন, কেউ যদি নির্দোষ ক্রীতদাসের উপর অপবাদ আরোপ করে, তবে কিয়ামতের দিন তার পৃষ্ঠদেশে চাবুক মারা হবে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুণাহ্। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম তাওবা কবুলকারী, অতিশয় দয়ালু। [সূরা হুজুরাত : ১২]
নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হয় : গীবত কাকে বলে? জবাবে নবীজী বলেন : তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে পছন্দ করে না। আবার জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে দোষ থাকে? নবীজী বললেন : তার মধ্যে যদি সে দোষ থাকে, তবে তুমি গীবত করলে। আর যদি সে দোষ না থাকে তবে তুমি অপবাদ আরোপ করলে।
মুনাফিকী আর দ্বিমুখী নীতি সম্পর্কে সতর্ক করে নবীজী বলেন : কিয়ামতের দিন দ্বিমুখী নীতির অবস্থা হবে সবচেয়ে খারাপ! মুনাফিক হচ্ছে সে ব্যক্তি, সে যখন যার কাছে যায়, তখন তার।
তোষামোদ আর অহেতুক প্রশংসাকেও তিনি ঘৃণা করতেন। এক ব্যক্তি কারো প্রশংসা করছিল। সাহাবী হযরত মিকদাদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মাটি থেকে ধূলা নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মেরে বললেন : আল্লাহর নবী আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।
নবীজী সবচেয়ে বেশি ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। রাত্রে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তে তার কদম মুবারক ফুলে যেতো। অথচ আল্লাহ পাক তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুণাহই মাফ করে দিয়েছেন। বেশি বেশি ইবাদত করলেও বৈরাগ্যবাদকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। তিনি একটা গৃহে গিয়ে দেখতে পান, ছাদের সঙ্গে একটা রশি ঝুলছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, এক নারী তা ঝুলিয়ে রেখেছে। সে নারী সারারাত ইবাদত করে। নিদ্রা চেপে বসলে চুলের সঙ্গে রশি বাঁধে, যাতে ঘুম না আসে। তিনি রশি খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, নফল ইবাদত ততক্ষণ করবে, যতক্ষণ মন চায়।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা] ছিলেন বড় ইবাদতগুজার। তিনি সারা বছর রোযা রাখার সংকল্প করেন। নবীজী জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন : তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে চক্ষুর। অধিকার রয়েছে স্ত্রীর। আরো বললেন, মাসে তিন দিন রোযা রাখবে। তিনি আরয করলেন, আমার মধ্যে আরো বেশি রোযা রাখার ক্ষমতা রয়েছে। তখন নবীজী বললেন, তাহলে প্রতি তৃতীয় দিন রোযা রাখবে। তিনি পুনরায় আরয করলেন, আরো বেশি রোযা রাখার ক্ষমতা আছে



www.pathagar.com

আমার মধ্যে। নবীজী বললেন, এক দিন বাদ দিয়ে রোযা রাখবে। তিনি পুনরায় অনুরোধ জানালেন কিন্তু নবীজী এর বেশি রোযা রাখার অনুমতি দিলেন না।

একদা দু'জন সাহাবী এসে জানালেন যে, তারা প্রাণীর গোশত না খাওয়া আর বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। শুনে নবীজী বললেন, কিন্তু তুমি তো এ দু'টোই উপভোগ কর।

একটা বৈধ সীমা পর্যন্ত তিনি পার্থিব সুখ-সম্ভোগ উপভোগ করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি আর প্রদর্শনী পরিহার করে চলতেন। অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। একবার তিনি হযরত ফাতিমার গৃহে গমন করেন। সেখানে সাজ-সজ্জার নিমিত্ত পর্দা ঝুলানো হয়েছে ঘরের দেয়ালে। নযর পড়ামাত্রই তিনি ফিরে আসেন। হযরত আলী [রা] ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলে নবীজী বলেন : সাজ-সজ্জার গৃহে অবস্থান করা নবীর জন্য শোভনীয় নয়। একবার হযরত ফাতিমার গলায় স্বর্ণের হার দেখে বললেন : পয়গম্বরের কন্যার গলায় আগুনের হার দেখে তোমাদের কি খারাপ লাগে না?

একবার হযরত ওমর [রা] নবীজীর গৃহে এসে দেখেন, নবীজীর দেহ মুবারকে কেবল একখানা তহবন্দ রয়েছে। নবীজীর গৃহে পাতানো আছে একটা চারপায়া। বালিশে গাছের ছাল ভরা। এক দিকে রাখা কয়েক মুষ্ঠি যব। আসবাবপত্রশূন্য গৃহ দেখে হযরত ওমর [রা] মনে দু:খ পান। তিনি বললেন : কায়সার আর কিসরা আরাম-আয়েশের মজা লুটবে। আর আল্লাহর নবীর এ অবস্থা যে দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ছে। নবীজী বললেন, তারা দুনিয়ার মজা উপভোগ করবে, আর আমরা আখিরাতের। এটা কি তোমাদের পছন্দ নয়? প্রয়োজনীয় বাসগৃহের অতিরিক্ত গৃহকে তিনি মানুষের জন্য শাস্তি মনে করতেন। অধিকন্তু তিনি বলতেন: ঘরে একটা শয্যা নিজের জন্য, একটা স্ত্রীর জন্য, আর একটা মেহমানের জন্য। চতুর্থটা শয়তানের জন্য।

কাফির-মুশরিক আর ইয়াহূদী নাসারা সকলের সঙ্গে তিনি সমান ব্যবহার করতেন। কখনো বিরোধ দেখা দিলে তিনি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করতেন না।

নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদল মদিনা আগমন করলে তিনি নিজে তাদের মেহমানদারী করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতে দেন। আর এ মসজিদেই তাদেরকে নিজেদের ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত করার অনুমতি দান করেন। একাবর এক ইয়াহূদী প্রকাশ্যে বলে: সে আল্লাহর শপথ যিনি হযরত মূসা [আ]কে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একজন সাহাবী একথা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নবীর উপরও? ইয়াহূদী বললো, হ্যাঁ। হাসাবী তাকে একটা চড় মারলেন। ইয়াহূদী নবীজীর দরবারে অভিযোগ করলে তিনি উক্ত সাহাবীকে তিরস্কার করেন। কিন্তু ইয়াহূদী একবার দুষ্টামী করে নবীজীকে আসসালামু আলায়কুমের পরিবর্তে আসসামু আলায়কুম বলে। অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। হযরত আয়েশা [রা]



www.pathagar.com

এজন্য তাদেরকে মন্দ বললেন। নবীজী বাধা দিয়ে বললেন, আয়েশা, মন্দ বলবে না, আল্লাহ তা'আলা সব ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।

আবূ বছীর গেফারী নামে একজন সাহাবী বলেন, কাফির থাকাকালে একবার মদিনা আগমন করে তিনি নবীজীর মেহমান হন। রাত্রে সমস্ত বকরীর দুধ তিনি একাই পান করে ফেলেন। নবীজী দেখেও কিছুই বলেন নি। খায়বরে জনৈক ইয়াহূদী নারী নবীজীর খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে। নবীজী বিষের ক্রিয়া উপলব্ধি করেন। নবীজী ইয়াহূদীদেরকে ডেকে অনুসন্ধান করান। অবশেষে মহিলা অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু এরপরও নবীজী প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অবশ্য এ বিষক্রিয়ার ফলে একজন সাহাবীর ইনতিকাল হলে উক্ত ইয়াহূদী নারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা হয়। জাহেলী যুগে আরবে নারীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালানো হতো। নবীজী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের আচরণ দ্বারা তা সুসংহত করেন।

এক ভাষণে নবীজী নারীপুরুষ সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেন : লোক সকল! নারীদের অধিকার সম্পর্কে আমার উপদেশ মেনে নাও। তারা তোমাদের করতলগত। তারা যদি স্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে, তাহলে তাদের শয্যা পৃথক করবে এবং তাদেরকে মৃদু মারবে। এছাড়া তাদের উপর তোমাদের আর কোন অধিকার নেই। তারা তোমাদের কথা মেনে নিলে তাদেরকে অভিযুক্ত করার ফন্দি খুঁজে বের করবে না। তোমাদের উপর নারীদের এবং নারীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। নারীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তোমাদের শয্যায় তারা অন্য কাউকে আসতে দেবে না। তোমরা পছন্দ কর না, এমন লোককে তোমাদের গৃহে আসার অনুমতি দেবে না তারা। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদের খাওয়া-পরার ভালো ব্যবস্থা করবে তোমরা।

বিয়ের খুতবায় সাধারণত কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো নবীজী পাঠ করতেনঃ তারা তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ, আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ। [সূরা বাকারা : ২২৮]

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে। তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব [সূরা বাকারা : ২২৮]

পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব। দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। [সূরা নিসা : ৩৪]

হে মানব সমাজ! তোমরা ভয় করো তোমাদের পালনকর্তাকে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অনেক পুরুষ এবং নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার সাথে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক। এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের



www.pathagar.com

ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [সূরা নিসা : আয়াত ১]

বৈরাগ্যবাদের অনুসরণে অবিবাহিত জীবন পালনের নিন্দা করে নবীজী বলেন : আমি নারীদেরকে বিয়ে করি। যে আমার নীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রাচীন আরবে বিধবা বিবাহ ছিল নিন্দনীয়। এ প্রথার বিরূদ্ধে নবীজী বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিধবা নারী। পরবর্তীতে তিনি যেসব বিয়ে করেন, সেগুলোর মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা [রা] ছাড়া সকলেই ছিলেন বিধবা। এতীমদের প্রতি তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় দয়ালু। নবীজীর দয়া দেখে সাহাবায়ে কিরামও এতীমদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। হযরত আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভীর উক্তি অনুযায়ী এক একজন সাহাবীর গৃহ এক একটা এতীমখানায় পরিণত হয়েছিল। হযরত আয়েশা [রা] আনসারদের এতীম সন্তানদেরকে তাঁর গৃহে অতি আদর যত্নে লালন পালন করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা]-এর নীতি ছিল–কোন এতীম শিশুকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি খাবার খেতেন না।

একবার এক এতীম নবীজীর আদালতে একটা খেজুর বাগান দাবি করে মামলা দায়ের করে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী এতীমের দাবি প্রমাণিত হয়নি। নবীজী খেজুর বাগানটি বিবাদীর বলে রায় দেন। এতীম শিশুটি রায় শুনে কাঁদতে শুরু করে। এতে নবীজীর মনে দয়া হয়। তিনি খেজুর বাগানটি এতীম শিশুটিকে দান করার জন্য বিবাদীর প্রতি সুপারিশ করেন। কিন্তু সে নবীজীর সুপারিশ মানতে রাযী নয়। উপস্থিত একজন সাহাবী অপর একটা বাগানের সঙ্গে বিনিময় করে উক্ত খেজুর বাগানটি এতীম শিশুকে দান করেন। একটা হাদীসে বলা হয়েছে: যে গৃহে কোন এতীম শিশু প্রতিপালিত হয়, তা হচ্ছে উত্তম গৃহ। আর যে গৃহে কোন এতীমের সঙ্গে অসদাচার করা হয়, তা হচ্ছে অধম গৃহ।

জাহিলী যুগে আরবরা ছিল জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে নিষ্ঠুর। তারা জীবন্ত উষ্ট্রের টুকরা কেটে নিতো, পশুকে দাঁড় করিয়ে তীর নিক্ষেপ করা হতো। হাত পাকা করার মহড়া চালানো হতো। পশুর রক্তও পান করা হতো। নবীজী এসব কাজকে হারাম ঘোষণা করেছেন। একবার একটা উষ্ট্রের প্রতি নবীজীর নযর পড়ে। অনাহারে দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে নবীজী বলেন: এসব ভাষাহীনদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। অনুরূপভাবে নবীজী একটা গাধা দেখতে পান, যার কপাল দাগানো হয়েছে আগুন দিয়ে। এ দৃশ্য দেখে নবীজী বলেন, যে এর কপালে আগুন দিয়ে দাগ দিয়েছে, তার উপর আল্লাহর লা'নত। এ প্রসঙ্গে নবীজী একটা গল্পের উল্লেখ করেন। একবার এক পথচারীর ভীষণ তৃষ্ণা পায়। কোথাও পানির নামগন্ধও নেই। অনেক কষ্টে একটা কূপের সন্ধান পায়। সে চামড়ার মোজা দিয়ে কূপ থেকে অতিকষ্ঠে পানি তোলে। পানি পান করবে এমন সময় একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরের প্রতি তার নযর পড়ে। পানির পিপাসায় তার জান যায় যায় অবস্থা। নিজে পানি পান না করে তা কুকুরকে পান করায়। পরে



www.pathagar.com

পুনরায় পানি তুলে নিজে পান করে। তার এ আচরণ আল্লাহর বেশ পসন্দ হয়। তিনি পথচারীকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: কুকুরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যও কি পুণ্য লাভ হবে? নবীজী বললেন, যে কোন প্রাণীর সঙ্গে সদাচারের জন্য পুণ্য পাওয়া যাবে।

বৃক্ষ রোপণ-নবীজীর বেশ পছন্দ ছিল। তিনি এটাকে পুণ্যের কাজ বলতেন। একটা হাদীসে আছে, যে মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করে এবং তার ফল কোন মানুষ বা প্রাণী খায়, তা বৃক্ষ রোপণকারীর জন্য সাদকা হবে।

সন্তানকে নবীজী অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। হযরত আনাস [রা] বলেন : নবীজী আমাদের পরিবারকে যতো ভালোবাসতেন, আমি অন্য কাউকে ততো ভালোবাসতে দেখিনি। হযরত ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন [রা] সম্পর্কে বলতেন, এরা হচ্ছে আমার ফুলের মালা। একবার নবীজী হযরত ইমাম হুসাইনের মুখে চুমু খাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে আকরা। ইবনে হারেস বলেন : আমার দশজন সন্তান রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোন সন্তানের মুখেই চুমু খাইনি। একথা শুনে নবীজী বলেন : যারা অপরের প্রতি দয়া করে না, তাদের প্রতি দয়া করা হয় না।

হাদীস, ইতিহাস এবং সীরাত গ্রন্থ থেকে হাজার হাজার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

এক কথায় বলা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের সেরা ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। যতোই দিন যাবে, তাঁর মহত্ত্বের খ্যাতি ততোই প্রতিভাত হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক–সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন মহান, অনন্য এবং অদ্বিতীয়। কুরআন মজীদে নবীজী সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে : নি:সন্দেহে মহান চরিত্রের অধিকারী। তাঁর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন।

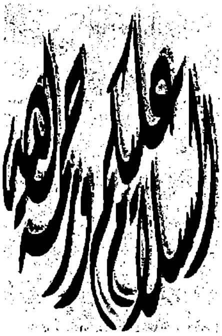



www.pathagar.com

# মদিনা সনদে ইসলামের বিশুদ্ধতা নিরূপন: প্রকৃতি ও পদ্ধতি

**মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান**

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর মুতাবেক ৮ রবিউল আউয়াল সোমবার শেষ নবী মুহাম্মদ [সা] আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে ইয়াসরিবে [পরবর্তীতে মদিনাতুন্নবী সংক্ষেপে 'মদিনা'] হিযরত করেন। তাঁর হিজরতের পূর্বে মক্কার অধিকাংশ মুসলিম পরিবার মদিনায় আগমণ করেন। মক্কা হতে আগত এই সব মুসলিম 'মুহাজির' নামে পরিচিত। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রভুক্ত মুসলিমগণ মুহাজিরদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেন। ফলে তারা 'আনসার' নামে পরিচিতি লাভ করেন। মহানবী [সা] হিজরতের প্রথম বর্ষে মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত যে ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন এ প্রবন্ধে এর প্রামাণিকতা ও তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

মহানবীর স. হিজরাতের দিন-তারিখ নিয়ে একাধিক অভিমত রয়েছে। ইবনে হিশামের মতে, তিনি ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রায় মধ্যাহ্নে কুবায় বনূ আমর ইবনে আউফের এখানে এসে পৌঁছেন। মহানবীর [সা] সমসাময়িক কালের দিনপঞ্জি হিসেব করলে দেখা যায়, ১২ রবিউল আউয়াল ছিল ৬২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। এ দিনটি ছিল জুমাবার, সোমবার নয়। সোমবার হল ৮ রবিউল আউয়াল তথা ১৩ সেপ্টেম্বর। Watt এর মতে- মহানবী [সা] ৬২২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল মদিনার অন্তর্গত কুবা পৌঁছেন। [W. Montgomery Watt, Muhammed at Medina, Oxfood : Oxfood University Press, 1956. P-1] উক্ত সময়ের দিনপঞ্জিতে দেখা যায়, ৪ সেপ্টেম্বর ছিল শনিবার, তা ছাড়া এটি রবিউল আউয়াল মাসে নয়, সফর মাসে পড়ে। সুতরাং আমরা উক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহকে নয় বরং ইবনে হিশাম বর্ণিত সোমবারটি মানদন্ড হিসেবে ধরে উক্ত সময়ের দিনপঞ্জি অনুযায়ী ৬২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ৮ রবিউল আউয়ালকে মহানবীর [সা] মদিনা



www.pathagar.com

পৌঁছার তারিখ হিসেবে উল্লেখ করেছি।" সমসাময়িককালে এখানে তিন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বাস করতো। এক: মদিনার প্রাচীন পৌত্তলিক সম্প্রদায়, দুই: বাইর থেকে আগত ইহুদী সম্প্রদায় এবং তিন : নব-দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। মহানবীর [সা] মদিনায় আগমনের পর ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাভূক্ত মদিনায় "M.A. Wahhab. Lessons from the Constitution of Madinah, Journal of Islamic Administration, University of Chittagong Department of Public Admmintntion. Vol-2, 1996. P. 60" মুহাজির ও আনসার মিলে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশ "M.Hamidullah, The First Written Constitution in the World, Lahore : sh. Muhammad Ashraf. 1981, p.9"। এ সময় নগরীর মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০ হাজার, যার অর্ধেকেই ছিল ইহুদী "Ibid. PP. 9-10"। এখানে বসবাসকারী আরবগণ ১২টি গোত্রে এবং ইহুদীগণ ১০টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। "Ibid. P.13" এই সব গোত্র অধিকাংশ সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকতো। প্রত্যেক গোত্রের ছিল স্বতন্ত্র গোত্রপতি। ফলে মদিনা নগরীতে যেমন কোন সুসংবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো ছিল না অনুরূপ এখানে কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসনও ছিল না। এমতাবস্থায় মদিনায় হিযরত করে মহানবী [সা] নিম্নোক্ত সমস্যাবলির সম্মুখীন হন : এক : মক্কা হতে আগত মুহাজিরদের পানাহার ও আবাসন সমস্যা; দুই : নিজেদের ও স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ; তিন : মদিনায় বসবাসকারী আরব ও ইহুদীদের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা; চার: মদিনায় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও এখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং পাঁচ : মুহাজিরগণ মক্কা হতে চলে আসার কারণে তাঁদের অর্থনৈতিক যে ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার ধকল কাটিয়ে ওঠা। "Ibid. PP. 14-15"

উপরোক্ত সমস্যাবলি সামনে রেখে মহানবী [সা] হিজরতের কয়েকমাস পর মদিনার বিভিন্ন গোত্র, মুহাজির কুরাইশ সম্প্রদায়, মদিনার আনসার সম্প্রদায় এবং মদিনায় বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি লিখিত দলীল সম্পাদন করেন। ইতিহাসে এটি 'কিতাব আল-রাসূল বা মদিনা সনদ' নামে পরিচিত।

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটি নবী মুহাম্মদ [সা]-এর পক্ষ হতে জারীকৃত একটি লিখিত ফরমান, কুরাইশ, ইয়াসরিবের মুমিন-মুসলমান এবং যারা তাদের অনুগামী হয়ে তাদের সাথে সংযুক্ত হবে ও তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে [তাদের জন্য]:

- অন্য লোকজন হতে তারা একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ বা জাতি।



www.pathagar.com

- কুরাইশ মুহাজিরগণ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য রক্তমূল্য পরিশোধ করবে এবং তারা তাদের বন্দীদেরকে মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে মুক্ত করবে।
- বনু আওফ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য রক্তপণ আদায় করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু সায়িদাহ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তপণ আদায় করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু হারিছ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তপণ আদায় করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু জুশম তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য দেবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য দেবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু আমর ইবনে আউফ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য দেবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু নাবীত তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- বনু আউস তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য পূর্ব প্রদত্ত হারে রক্তের মূল্য পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত দয়া ও ন্যায়বিচার মোতাবেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।
- মুমিনরা তাদের নিজেদের ঋণগ্রস্থ কাউকে ছেড়ে দিবে না বরং মুক্তিপণ ও রক্তমূল্য আদায়ের জন্য সাহায্য করবে।
- কোন মুমিন অপর মুমিনের মাওলা বা আশ্রিতের সাথে চুক্তি করবে না।
- ধর্মভীরু মুমিনগণ তাদের নিজেদের কেউ বিদ্রোহী হলে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে থাকবে। তারা মুমিনদের মধ্যে অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। প্রত্যেকের হাত তার বিরুদ্ধে থাকবে, যদি অন্যায়কারী তাদের কারো সন্তান ও হয়।



www.pathagar.com

- কোন মুমিন কাফিরের বদলায় কোন মুমিনকে হত্যা করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করবে না।
- আল্লাহর যিম্মা বা নিরাপত্তা একই। তা হলো: সর্বাপেক্ষা দুর্বলকে [অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে] আশ্রয় দেয়া। মুমিনরা অন্যদের মোকাবিলায় একে অপরের বন্ধু।
- ইহুদীদের মধ্য হতে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের সাহায্য করা হবে এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে। তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের শত্রুদের সাহায্য করা হবে না।
- মুমিনদের চুক্তি একটাই। কোন মুমিন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য মুমিন ছাড়া অন্য কারো সাথে চুক্তি করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ চুক্তি সমতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে না হয়।
- যে সব যোদ্ধা আমাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে তারা একে অন্যের পিছনে থাকবে।
- মুমিনরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় দেয়া রক্তের শোধ নেবে।
- নি:সন্দেহে ধর্মভীরু মুমিনগণ সর্বোৎকৃষ্ট এবং সত্য ও সঠিক পথপ্রাপ্ত।
- কোন মুশরিক [পৌত্তলিক] কোন কুরাইশের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না এবং কোন মুমিনের বিরুদ্ধে গিয়ে কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করতে পারবে না।
- যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রতিদানে সেও নিহত হবে, যদি না নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী [দেয় অর্থের বিনিময়ে] সন্তুষ্ট হয়। মুমিনরা সকলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে থাকবে। হত্যাকারীর বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া মুমিনদের জন্য অন্য কিছু বৈধ নয়।
- মুমিনগণ যারা এই সনদের সাথে একমত হয়েছে এবং যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের জন্য কোন অন্যায়কারীকে সাহায্য কিংবা আশ্রয় প্রদান বৈধ হবে না। যদি কেউ অন্যায়কারীকে সাহায্য করে বা আশ্রয় দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর লানত ও গযব পড়বে। তার কাছ থেকে কোন প্রকার অনুতাপ কিংবা বদলা গ্রহণ করা হবে না।
- যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ [সা]-এর মতামতের প্রতি তা সমর্পণ করবে।
- যত দিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা মুমিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে।
- বনু আউফের ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ। ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম। তারা মাওয়ালী হোক বা নিজেরা হোক। যদি কেউ অন্যায় কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে সে তার নিজের ও পরিবারের জন্য ক্ষতি করে।
- বনু নাজ্জারের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।



www.pathagar.com

- বনু হারিছের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।
- বনু সায়িদার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ কবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।
- বনু জুশমের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ কবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।
- বনু আউসের ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ কবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে।
- বনু সালাবার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে। কিন্তু যদি কেউ অন্যায় কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে সে তার নিজের এবং পরিবারের জন্য ক্ষতি করে।
- সালাবা গোত্রের শাখা জাফনার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু সালাবা ভোগ করবে।
- বনু শুতাইবার ইহুদীরা সেই অধিকার ভোগ করবে যা বনু আউফের ইহুদীরা ভোগ করবে। বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে সততা কাম্য।
- সালাবার মাওয়ালী বা আশ্রিতরা সালাবা গোত্রের মতই অধিকার ভোগ করবে।
- ইহুদী গোত্রের শাখা-প্রশাখাগুলো ইহুদীদের মতই অধিকার ভোগ করবে।
- তাদের কেউ মুহাম্মদ [সা]-এর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধের জন্য বের হবে না।
- কারো ক্ষতির প্রতিরোধ নেয়ার জন্য কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। কেউ যদি হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তা হলে সে এবং তার পরিবার দায়ী হবে। যদি কেউ অত্যাচারিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আল্লাহ এই সনদের সর্বাধিক হিফাযতকারী।
- ইহুদীরা নিজেদের খরচ বহন করবে এবং মুসলমানরা নিজেদের খরচ বহন করবে।
- এই সনদে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে ইহুদী এবং মুসলমানরা একে অপরকে সাহায্য করবে। তাদের একের সাথে অন্যের সম্পর্ক হবে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও কল্যাণকামিতামূলক এবং বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে সম্মানজনক ব্যবহার।
- বন্ধুর দুষ্কর্মের জন্য কেউ দায়ী হবে না এবং অত্যাচারিতদের সাহায্য প্রদান করা হবে।
- যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের খরচ বহন করবে।
- এই সনদপত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের জন্য ইয়াসরিবের উপত্যকা পবিত্র।
- আশ্রিতরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার অন্যায় কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আশ্রয়দানকারীদের মত অধিকার ভোগ করবে।
- কোন স্ত্রীলোককে তার পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।



www.pathagar.com

- যদি এই সনদে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাতে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ [সা]-এর প্রতি [মীমাংসার জন্য] সমর্পণ করা হবে। এই সনদে যা কিছু আছে তার জন্য আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ যত্নবান।
- কুরাইশদেরকে এবং তাদের সাহায্যকারীদের কোন ক্রমেই আশ্রয় দেয়া যাবে না।
- ইয়াসরিবের উপর অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা [ইহুদী ও মুসলমানগণ] একে অপরকে সহযোগিতা করবে।
- যদি তাদেরকে চুক্তি করার এবং তা মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়, তবে তারা চুক্তি করবে এবং তা মেনে নিবে। যদি মুমিনদেরকেও অনুরূপ বিষয়ে আহবান জানানো হয় তাহলে তাদের দায়িত্ব হবে সেটা মেনে নেয়া। যদি কেউ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে তবে তা আলাদা ব্যাপার।
- যে যে দিকে থাকবে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তার ভাগে সে দিক পড়বে।
- বনু আউসের ইহুদীরা এবং তাদের আশ্রিতরা এই সনদের শরীক দলের মত অধিকার ভোগ করবে, যদি তারা সনদের শরীকদলের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করে। বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। যে তা আয়ত্ত করে সে নিজের জন্য করে। এই সনদে যা কিছু আছে আল্লাহ তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।
- অত্যাচারী কিংবা পাপী ছাড়া এই সনদ বাস্তবায়নে কেউ বাধা প্রদান করবে না। যে কেউ যুদ্ধের জন্য বের হবে সে নিরাপদে থাকবে। আর যে মদিনায় বসে থাকবে সে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকবে। যারা অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারা এর ব্যতিক্রম।
- নি:সন্দেহে আল্লাহ সৎ ও ধর্মভীরুদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ [সা] আল্লাহর রাসূল।

আধুনিক গবেষকদের মধ্যে ইউসুফ আল-আইশ মনে করেন, মদিনা সনদটি যথার্থ ও বিশুদ্ধ নয়। তার মতে ধর্মীয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহে এটি বর্ণিত হয়নি। উপরন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক [৮৫ হি.-১৫১হি./ ৭০ খ্রি.-৭৬৮ খ্রি] কোন সূত্র [সনদ] উল্লেখ না করে মদিনা সনদটি বর্ণনা করেন এবং ইবনে সায়্যিদ আন-নাস তাঁর কাছ থেকেই এটি বর্ণনা করেন। আল-আইশ বলেন, কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-মুজানী তাঁর পিতা আবদুল্লাহ এবং পিতামহ আমর সূত্রে মদিনা সনদ রিওয়ায়াত করেন। উক্ত বর্ণনাধারা সম্পর্কে ইবনে হিব্বান আল-বুস্তী বলেন, কাছীর তাঁর পিতা ও পিতামহ সূত্রে একটি জাল সনদ রিওয়ায়াত করেছেন যা কোন কিতাবে অন্তর্ভূক্ত করা কিংবা রিওয়ায়াত করা সঙ্গত নয়। “ইবনে হাজার আল-আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব, লাহোর : নশর আল-সুন্নাহ, খ. ৮, পৃ. ৪২২” আল-আইশের মতে, ইবনে ইসহাক মদিনা সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে কাছীর ইবনে আবদুল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই এর সূত্রটি এড়িয়ে



www.pathagar.com

গেছেন। "Wellhausen, আল-দাওলাহ্ আল-আরাবিয়্যাহ ওয়া সুকূতুহা, ইউসুফ আল-আইশ অনূদিত আরবী সংস্করণ, দামিস্ক : ১৯৫৬, পৃ. ২০, পাদটীকা-৯"
ইবনে ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে কোন সূত্র উল্লেখ না করে মদিনা সনদ বর্ণনা করার কারণে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলীলকে জঈফ প্রতিপন্ন করেছেন সত্য; কিন্তু একে জাল কিংবা বিশুদ্ধ নয় বলে বিবেচনা করাও যথার্থ নয়। কারণ এটি কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুজানীর সূত্র ছাড়াও আবু উবায়দ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম ইমাম ইবনে শিহাব আল-যুহরী [১২৪ হি./৭৪২খ্রি] সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইবনে ইসহাক ছিলেন ইমাম আল-যুহরীর বিশিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম।
মদিনা সনদের বর্ণনাধারা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল-যুহরী পর্যন্ত প্রসারিত এবং ইমাম আল-যুহরী একজন তাবিঈ হওয়ার কারণে এ বর্ণনাটি একটি মুরসাল বর্ণনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর ইমাম আবু হানীফা [১৫০হি./৭৬৭খ্রি], ইমাম মালিক [১৭৯হি./৭৯৫ খ্রি] ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [২৪১হি./৮৫৫ খ্রি]-এর মতে, মুরসাল হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য এবং দলীল হিসেবে উপস্থাপনের উপযোগী। "উবাদুল্লাহ আল-আসআদী, উলূম আল-হাদীস, লক্ষ্ণৌ : মাকতাবা-ই-হিরা, ১৪০৬ হি., পৃ. ১৩৫-১৩৬" ইমাম আল-যুহরী ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবীর [সা] সীরাত রচয়িতাদের অগ্রণী। এ ছাড়াও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে মদিনা সনদটি লিখিত চুক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে "আবুল হাসান আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ, মিসর : দার আল-মাআরিফ, ১৯৫৯, খ. ১, ২৮৬-৩০৪; আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়াল-কুলক, মিসরঃ দার আল ইস্তিকামাহ, খ. ২, পৃ. ৪৭৯; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর আল-কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, আল-কাহেরা: মাকতাবাহ আল-সাআদাহ, ১৩৫ হিঃ, খ. ৩, পৃ. ২২৪-২২৬"। সনদের রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে সনদটির মৌলিকত্ব ও অকৃত্রিমতা প্রমাণ করেছেনঃ

ক. এ সনদে মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়কে একই 'উম্মাহ'য় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এটি বিকৃত কিংবা জাল করা হলে উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে অমুসলিমদেরকে একই উম্মাহয় গণ্য করা হতো না।

খ. এটি বিকৃত করা হলে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে সব ধারা বিদ্যমান বিকৃতকারীগণ সেই সব ধারা বাদ দিয়ে দিতো।

গ. এটি বিকৃত করা হলে মহানবীকে [সা] আরো অধিক ক্ষমতা প্রদান করে এতে নতুন ধারা সংযোজন করা হতো;

ঘ. এর অনুচ্ছেদসমূহ সহজ-সরল ও জটিলতামুক্ত এবং রচনারীতি [style] অতি প্রাচীন [archaic];

ঙ. এই সনদে 'মুসলিম' শব্দের পরিবর্তে 'মুমিন' [believers] শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, এটি মহানবীর [সা] মদিনা যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণীত। সুতরাং দেখা যায়



www.pathagar.com

যে, মদিনা সনদ একটি মৌলিক, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ ও যথার্থ সনদ। "W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina, p. 225"
মদিনা সনদের মূল পাঠ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এতে ভাষাগত অনেক পুনরুক্তি রয়েছে এবং এতে মহানবীর [সা] সময়ে প্রচলিত শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রশংসা কিংবা নিন্দা স্থান পায়নি। "ড. সালিহ্ আহমদ আল-আলী, তানযীমাত আল-রাসূল আল-ইদারিয়্যাহ ফী আল মাদীনাহ্, বাগদাদ : আল-মাজমা আল-ইলমী আল-ইরাকী, ১৯৬৭, সংখ্যা-১৭, পৃ. ৪-৫" ইবনে ইসহাক যখন মদিনা সনদ রিওয়ায়াত করেন তখন অনেক বিশিষ্ট তাবিঈ জীবিত ছিলেন। কিন্তু সমকালীন যুগে কেউ এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। সুতরাং এটি একটি বিশুদ্ধ ও যথার্থ সনদ, কোন জাল সনদ নয়।
ঐতিহাসিক আবদুল মালিক ইবনে হিশাম [২১৮ হি./ ৮৪৪ খ্রি] মহানবীর [সা] সীরাত রচনার ক্ষেত্রে ইবনে ইসহাক প্রণীত সীরাত গ্রন্থকে প্রধান উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক মহানবীর [সা] মদিনায় হিজরতের পর প্রাথমিক পর্যায়ে মদিনায় তাঁর কর্মতৎপরতা বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো :
মহানবী [সা] ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রায় মধ্যাহ্নে কুবায় বনু আমর ইবনে আওফের এখানে এসে পৌঁছেন। "আবদুস সালাম হারুন [সম্পা], তাহযীব সীরাতু ইবনে হিশাম, পৃ. ১১৮, ১৩০"
তিনি সোমবার হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই ৪ দিন সেখানে অবস্থান করেন। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯"
এই সময় তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। "প্রাগুক্ত"

- জুমার দিন জুমার সময় তিনি বনু সালিম ইবনে আওফের এখানে এসে পৌঁছেন এবং রানুনা উপত্যকায় জুমার নামায আদায় করেন। মদিনায় এটি তার প্রথম জুমার নামায। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০"
- এ দিন তাঁর উট আবু আইয়ুব আনসারীর এখানে এসে বসে পড়ে এবং তিনি এখানে অবতরণ করেন। অত:পর সাহল ও সুহাইল নামক বনু নাজ্জার গোত্রের দু'জন এতিম বালক হতে জমি ক্রয় করে মসজিদ আল-নববী এবং তদসংলগ্ন তাঁর জন্য আবাস নির্মাণ করেন। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১"
- পরবর্তী বছরের সফর মাস পর্যন্ত তাঁর মদিনা অবস্থানকালীন সময়ের মধ্যেই মসজিদ আল-নববী ও তার আবাস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২"
- এ সময়ের মধ্যে অধিকাংশ আনসার পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। "প্রাগুক্ত"
- উপরোক্ত বর্ণনার সাথে সংযুক্ত করে ইবনে হিশাম মহানবী [সা] কর্তৃক মদিনায় প্রদত্ত দু'টি খুৎবার উল্লেখ করেন। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩" এর পরই তিনি কিতাব আল-রাসূল তথা মদিনা সনদটি উদ্ধৃত করেন। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৬"
- এর সাথে সন্নিহিত করে ইবনে হিশাম মহানবী [সা] কর্তৃক মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখ করেন। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭"



www.pathagar.com

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত বিষয়গুলো মহানবীর [সা] মদিনায় হিজরতের প্রথম বর্ষেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং বলা যায়, মহানবী [সা] মদিনার পৌঁছার পর এখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় রূপরেখা প্রণয়ন করে মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনগত কাঠামো গঠন করার লক্ষ্যেই তিনি হিজরতের প্রথম বর্ষে 'কিতাব আল-রাসূল' তথা মদিনার সনদ জারী করেন। আল-বালাযুরী বলেন, মহানবী [সা] মদিনায় আগমনের পর এখানকার ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এতে তিনি শর্তারোপ করেন যে, তারা তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। যুদ্ধে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করবে এবং তিনি আহল আল-যিম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। আল-কুরআনের জিহাদের অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর "আল-কুরআন, ২২ : ৩৯" মহানবী স. 'সীফ আল-বাহর' নামক স্থানে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। "আবুল হাসান আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৬" আল-বালাযুরী আরো উল্লেখ করেন, মহানবী [সা] মদিনায় আগমনের পর এখানকার সকল ইহুদী গোত্রের সাথে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন যা একটি দলীলে লিপিবদ্ধ করা হয়। বদর যুদ্ধ শেষে মহানবী [সা] মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর ইহুদী বনু কায়নুকা চুক্তিভঙ্গ করে। ফলে মহানবী [সা] তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। "প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৮" উক্ত বর্ণনা দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর [সা] মদিনায় হিজরতের প্রথম বর্ষে মদিনা সনদ জারী করা হয়। আকরাম জিয়া আল-উমরীর মতে, মদিনা সনদ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকগণ এই সব চুক্তিকে একটি দলীলে সন্নিবেশিত করেন। "ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী, রাসূলের যুগে মদিনা সমাজ, মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৮, খ. ১, পৃ. ১৩৪" প্রমাণ হিসেবে তিনি আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি উপস্থাপন করেনঃ "মহানবী [সা] আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি লিখিত দলীল প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয়, তাদেরকে রক্তমূল্য পরিশোধ, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ প্রদান এবং মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে"। "ইবনে কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ২২৪" এ বর্ণনায় ইহুদীদের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি।

মদিনা সনদের প্রস্তাবনা বা ভূমিকায় বলা হয়েছে, এ সনদ ইয়াসরিবে অবস্থানকারী তিন প্রধান জনগোষ্ঠীর প্রতি জারী করা হয়েছে। এরা হলঃ ক. মক্কার কুরাইশ গোত্রভুক্ত [মুহাজির সম্প্রদায়] ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলমান [আনসার সম্প্রদায়], খ. যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের সাথে সংযুক্ত হবে ও গ. যারা তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। "আবদুস সালাম হারুন [সম্পা], তাহযীব সীরাতু ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪"



www.pathagar.com

এখানে [ক] শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বলতে মক্কা হতে আগত মুহাজির এবং মদিনার আনসার সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যদিও সুস্পষ্ট রূপে 'মুহাজির' ও 'আনসার' শব্দ দু'টি উল্লেখ করা হয়নি। [খ] শ্রেণীর জনগোষ্ঠী দ্বারা মদিনা সনদ জারী করার পরেও যে সব কুরাইশ কিংবা মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সনদের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে সনদের ব্যাপ্তি ও পরিধিকে ব্যাপকতর করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকারের জনগোষ্ঠী দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহে মিত্র পক্ষের কথা বলা হয়েছে। এই সনদে অমুসলিমদেরকেও উম্মাহর অন্ত র্ভূক্ত করে উম্মাহর ধারাণাকে অনেক প্রসারিত করা হয়েছে। "প্রাগুক্ত" এতে মদিনার তিন প্রধান ইহুদীগোত্র যথাক্রমে বনু নযীর, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু এর দ্বারা একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে, এই সনদে মদিনার সকল গোত্রের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং দেখা যায়, এতে যে সব গোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে তাদের মাওয়ালী [আশ্রিত] এবং হালীফকেও [মিত্র] অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইহুদী বনু নযীর ও বনু কায়নুকা ছিল মদিনার আওস গোত্রের হালীফ, অপর দিকে বুন কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের হালীফ। "আবদুল করিম, কিতাব আল-রাসূল [ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান], ইসলামী ঐতিহ্য চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫, পৃ. ১৪" সুতরাং প্রাসঙ্গিকভাবে এদের নাম এসে গেছে। আর এই সনদ প্রয়োগ কিংবা কার্যকর করার বিষয়ে কোন ভৌগলিক সীমারেখা নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং বলা যায়, এই সনদের প্রয়োগ ক্ষমতা শুধু মদিনায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নয়, ইসলামের ভৌগোলিক প্রসারের পরেও এর প্রয়োগ ও কার্যকর ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়।" "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩"

মদিনা সনদ ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এতে 'তাসমিয়াহ' [বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম] ও প্রস্তাবনা বা ভূমিকা ছাড়া মোট ৫৩ টি ধারা বিদ্যমান। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, এটি একটি 'কিতাব' বা লিখিত দলীল। মুহাম্মদ [সা]-এর পক্ষ হতে এটি জারী করা হয়েছে। "আবদুস সালাম হারুন [সম্পা], তাহযীব সীরাতু ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪" ৫২ তম ধারায়ও একে পুনরায় 'কিতাব' বলা হয়েছে। এ ছাড়াও এর ২৩ তম ধারা, ৪০ তম ধারা, ৪৩ তম ধারা, ৪৬ তম ধারা এবং ৫১ তম ধারায় মোট ৭ বার একে 'সহীফা' তথা পুস্তিকা বলা হয়েছে। সনদের ১ম ধারায় এই সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে স্বতন্ত্র একটি 'উম্মাহ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। "প্রাগুক্ত" মদিনার ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একই উম্মাহভূক্ত কিনা সনদের এই ধারা হতে এটি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এর ২৬ তম ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "বনু আওফের ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ"। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫" এখানে উম্মাহ ধর্মীয় বিষয়ে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। আরবদের সামাজিক,



www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো গোত্র ভিত্তিক। সনদের এই ধারার মাধ্যমে মহানবী স. আরবদের গোত্রভিত্তিক কর্মকালে- আমূল সংস্কার সাধন পূর্বক একে জাতিগত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং মহানবী [সা] সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় নয় বরং তিনি মদিনার সকল জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এখানে একটি বৃহত্তম জাতি গঠন করেন। "Watt. Muhammad at Medina, P. 139-141"

ইয়াসরিবে আগত মুহাজিরগণ সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে মদিনা সনদের ২য় ধারায় এদেরকে 'মুহাজির' দল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মদিনার আনসারগণ সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে সনদের ৩য় ধারা হতে ১০ম ধারা পর্যন্ত তাদেরকে গোত্রভিত্তিক উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে গোত্রভিত্তিক উল্লেখ করার মাধ্যমে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বরং এর মাধ্যমে তাদের সামাজিক নিরাপত্তার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। "ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী, রাসূলের [সা] যুগে মদিনার সমাজ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৮"

সনদের ১১শ ধারা হতে ২৩ তম ধারা পর্যন্ত মুমিনদের অধিকার, কর্তব্য, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সীমারেখা, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণ ও ব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহে সাহায্য-সহযোগিতার মানদন্ড প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর ১৬ তম ধারায় ইহুদী সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতিতেই তাদের সাথে ন্যায়ানুগ ও সদয় আচরণের উল্লেখ করার মাধ্যমে ইসলামে রাজনৈতিক মিত্রপক্ষের সাথে নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ করার এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার কোন প্রকার প্রশ্রয় কিংবা স্বীকৃতি প্রদান না করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর ২৪ তম ধারায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির ভার মহানবীর [সা] উপর অর্পণ করা হয়।

সনদের ২৫তম ধারা হতে ৪২ তম ধারা পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে কৃত চুক্তির খুঁটিনাটি দিকগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। এতে গোত্রভিত্তিক মদিনার ইহুদীদের বিবরণ প্রদানপূর্বক তাদের অধিকার ও কর্তব্য, মুমিনদের সাথে তাদের সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহে মুমিনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার সীমারেখা নির্ধারণ এবং ইহুদীদের জন্য আচরণবিধির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এর ৪৩ তম ধারায় ইয়াসরিবের মর্যাদা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এই নগরীকে পুত-পবিত্র নগরী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ৪৪-৪৫ ধারায় আশ্রয়দানকারী ও আশ্রিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এর ৪৬ তম ধারায় কাউকে আশ্রয়দানের আওতাভূক্ত গোষ্ঠীসমূহের মাঝে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা নিরসনের উপায় বলে দেয়া হয়েছে। ৪৭ তম ধারায় মদিনার বাইরের লোকজন বিশেষ করে মক্কার কুরাইশদেরকে এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকজনকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ৪৮ তম ধারায় ইয়াসরিবের উপর আক্রমণ করা হলে ইহুদী-মুসলিম মিলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ৪৯ তম ধারায় সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করলে তা



www.pathagar.com

মান্য করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। ৫০তম ধারায় বহি:শত্রু দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হলে এখানে বসবাসকারী গোত্রসমূহ নিজ নিজ এলাকার দিকটি রক্ষা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫১ তম ধারায় একটি ইহুদী গোত্রকে সনদের শরীক দলগুলোর সমমর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে শরীক দলগুরোর সাথে সম্মানজনক ব্যবহার এবং বিশ্বস্ততাপূর্ণ আচরণের শর্তারোপ করা হয়। ৫২ তম ধারায় এই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল অন্ত রায় ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে এবং ৫৩ তম তথা সর্বশেষ ধারায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মহানবীর [সা] নেতৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ৪৬ তম ধারায়ও অনুরূপ ঘোষণা বিদ্যমান।

মদিনা সনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এই সনদে অনেক ক্ষেত্রে ইয়াসরিবে পূর্ব হতে প্রচলিত অনেক রীতি ও সামাজিক প্রথাকে আইনের মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা সনদের ২য় ধারা হতে ১০ম ধারা পর্যন্ত রক্তপণ আদায় বিষয়ক আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ সনদের ৩৯ তম ধারা হতে ৪৫ তম ধারা, ৪৭ তম ধারা হতে ৫০ তম ধারা এবং ৫২তম ধারা এর অন্তর্গত সকল শরীকদলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এর ২১ তম ধারায় মক্কার কুরাইশদের সাথে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করে মূলত: শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল হীন চক্রান্তের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে মদিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয় এবং এর অভ্যান্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত হতে রক্ষা পায়।

মদিনা সনদের কোথাও মহানবীর [সা] পদমর্যাদা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু এই সনদের প্রস্তাবনা বা ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "এটি নবী মুহাম্মদ [সা] এর পক্ষ হতে জারীকৃত একটি লিখিত সনদ"। "আবদুস সালাম হারুন [সম্পা], তাহযীব সীরাতু ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪"। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী [সা] মদিনায় আগমনের পর মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্র এবং প্রধান প্রধান ইহুদী গোত্রের পক্ষ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে তিনি এই সনদ জারী করেন। যদি তিনি মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন তা হলে এই সনদ জারী করার তার কোন আইনগত কর্তৃত্ব থাকে না এবং তা মান্য করার বিষয়ে সনদের শরীক দলগুলোর কোন বাধ্যবাধকতাও থাকে না। সুতরাং বুঝা যায়, এই সনদ জারীর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তাঁর কর্তৃত্বের বিষয়টি মেনে নিয়েছিল।

মদিনা সনদের ২৪ ও ৪৬ তম ধারা দু'টিতে শরীক দলগুলোর পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী [সা] কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬" কিন্তু এতে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার আপীলের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত ফয়সালাকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সনদে বিভিন্ন শরীক দলের অধিকার



www.pathagar.com

এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণের জন্য নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি বা সংস্থার প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে উক্ত পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন নবী মুহাম্মদ [সা]।

মদিনা সনদের ৩৭ তম ধারায় মহানবী [সা] কে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ [সা]-এর কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত সনদে শরীক দলগুলোর মধ্য হতে কেউই যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না। "প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫" এতেও বুঝা যায়, মদিনা সনদ জারীর মাধ্যমে মহানবী [সা] মদিনার সর্বময় শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি উপাদান প্রয়োজন। এগুলো হলো: ১. নির্দিষ্ট ভূখন্ড [Territory] ২. একটি জনগোষ্ঠী [Population], ৩. সরকার [Government] এবং ৪. সার্বভৌমত্ব [Sovereignty]। মহানবী [সা] যখন মদিনায় হিযরত করেন তখন মদিনায় রাষ্ট্র গঠনের প্রথম দুটি উপাদান বিদ্যমান ছিল। কিন্তু গোত্রভিত্তিক শাসন পরিচালিত হওয়ার কারণে এখানে সরকার ও সার্বভৌমত্ব ছিল অনুপস্থিত। মদিনা সনদে জারীর মাধ্যমে এখানে তাদের প্রাচীন গোত্র প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং তারা একটি 'উম্মাহ' বা জাতিসত্তায় পরিণত হয়। বিবদমান বিষয়ে ফয়সালাদানের বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহানবী [সা] সরকার প্রধান রূপে আবির্ভূত হন। একটি আদর্শ সরকারের জন্য প্রয়োজন প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং একটি বিচার বিভাগ। সনদের ২৪ ও ৪৬ তম ধারা অনুযায়ী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মহানবী [সা] আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হন এবং এর দ্বারা তিনি বিচার বিভাগীয় বিষয়াদিরও দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অপর দিকে, এই সনদটি মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম লিখিত আইন বা সংবিধানের মর্যাদা লাভ করে। "M. Hamidullah, The First Written Constitution in The world. P.4"

মহানবী [সা] মদিনায় আগমনের পর মদিনায় শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং একে বহি:শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। তাই মহানবী [সা] অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে মদিনা সনদ জারীর মাধ্যমে মদিনার সকল অধিবাসীর জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করেন এবং এই সনদ অনুযায়ী তাঁকে মদিনা রাষ্ট্র ও উম্মাহর প্রশাসন এবং আইন ও বিচার বিষয়ক সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তিনি মদিনায় আগমন করার পর এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত জনগোষ্ঠী মহানবীর [সা] আদর্শ এবং তাঁর জারীকৃত সনদের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রমাণ করে যে, একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করে ও ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্র গঠনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং দেশের সকল নাগরিক একটি



www.pathagar.com

রাজনৈতিক উম্মাহয় পরিণত হতে পারে। "ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ও মোঃ মফিজ উদ্দিন, মদিনার সনদ পর্যালোচনা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, ৩৬ বর্ষ, সংখ্যা, ৩, পৃ. ১৭"

উপসংহারে বলা যায় যে, মদিনা সনদ জারীর মাধ্যমে মহানবী [সা] প্রথমবারের মত মদিনাকে একটি নগররাষ্ট্রে পরিণত করেন এবং তিনি নিজে বিচারব্যবস্থা, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ সনদের মাধ্যমে আইনের শাসন তথা ন্যায়বিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ফলে কেউই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার সাহস পায়নি। এর মাধ্যমে আরবের চিরাচরিত গোত্রীয় প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয়, যুদ্ধরত গোত্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। এই সনদের মাধ্যমে মদিনার সকল গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান ঘটে এবং একটি 'উম্মাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভাবে এ সনদ বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান এবং সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার মর্যাদা লাভ করে।

www.pathagar.com

# উত্তম চরিত্রের ঠিকানায় মুহাম্মদ [সা]

## মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ বেলালী

আল্লাহ্ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানবজাতিকে তার খলিফা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানুষেরা কালাতিক্রমে দায়িত্বের কথা ভূলে শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়ে মানব রচিত বিধান অনুসরণ করে। ইতিহাস নিংড়ানো তথ্য থেকে প্রমাণিত–এ পৃথিবীতে অনেক দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বিশাল সাম্রাজ্যের স্থপতি, রাজা-মহারাজা ও সম্রাট, বিজয়ী বীর, অনেক প্রভাবশালী দল ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজকাঠামোতে তোলপাড় সৃষ্টিকারী বিপ্লবী নেতা, সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আর্বিভূত নিত্য নতুন ধর্মের প্রবর্তক, নৈতিক সংষ্কার ও আইন প্রণেতার আর্বিভাব ঘটেছে। তাদের রেখে যাওয়া অবদান, তৎপরতা ও চেষ্টাসাধনার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে কোথাও তাদের পরিপূর্ণ কল্যাণ ও সফলতা নাই; বরং সফলতার সম ব্যর্থতার পাহাড় বিদ্যমান। মানবজাতিকে তারা সঠিক পথের সন্ধান-ই দিতে পারে নাই। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। নবী মোহাম্মদ [সা] হলেন তাদের সকলের মধ্যে উত্তম এবং অন্যতম। তার নৈতিক চরিত্র, আন্তরিকতা, সত্যবাদীতা, অনড় মনোবল, ধৈর্য, নিষ্ঠা, মানবপ্রেম, এবং আল্লাহর প্রতি অফুরন্ত ভয় ও ভালবাসা ছিল অতুলনীয়। আর সেজন্যই সকল শ্রেণীর মানুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ইসলামের প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি করেছে। জন উইলিয়াম ড্রেপার বলেছেন: Four years after the death of Justinian, in AD 569 was born at mecca, in Arabia, the man [Muhmmad] who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race. অর্থৎ: সম্রাট জাস্টিনের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ [মতান্তর] খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন "মুহাম্মদ" যিঁনি পৃথিবীর সকলের মধ্যে মানবজাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।



www.pathagar.com

**বিশ্বনবীর চরিত্র**

চরিত্র কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় কার্যাবলিই চরিত্রের অর্ন্তভুক্ত। সাধারণত মানুষ তার দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও ভাব-ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাই করে সেটাই চরিত্র। এক কথায় কর্মই মূলত চরিত্র। সুতরাং কর্মের ভিত্তিই চরিত্রের মূল ভিত্তি। সে সূত্র অনুযায়ী বিশ্বনবীর সমস্ত কর্মকান্ডই তাঁর চরিত্র। আল্লাহ তায়ালা রাসূল [সা]-এর মধ্যে পূর্ণ শাসন ক্ষমতা এবং অতুলনীয় সৎ চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। অথচ তিঁনি ছিলেন নিরক্ষর, কোন শিক্ষকের দ্বারা তিঁনি শিক্ষার আলো পাননি। আল্লাহ নিজেই তাঁকে সুন্দর চরিত্র, উত্তম আদর্শ এবং প্রশংসনীয় স্বভাব শিক্ষা দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নিকট উত্তম চরিত্রের মডেল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এডওয়ার্ড গীবন এর ভাষায়- Those who saw him were suddenly filled with reverence; those who came near him loved him; Those who described him would; say "I have never seen his like either before or after" অর্থৎ যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছে আকস্মিকভাবে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছে। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা তাঁকে ভালবেসেছে। যারা তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে , আমি পূর্বে এবং পরে তাঁর মত অনুরূপ কাউকে দেখিনি।

**ব্যবহারিক জীবন**

তিঁনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ তো করতেন-ই না; বরং ক্ষমা করে দিতেন। বন্ধুদের সাথে তার আচরণ ছিল খুবই উত্তম এবং বিনয়ী। তিঁনি জীবনে কখনো গরীব, ফকির, মিসকিন, গোলাম, দাসী, শরীরিক বিকলাঙ্গদের ঘৃণা করতেন না। তাদের সাথে যে আচরণ করতেন তাতে তাঁকে তাদেরই বন্ধু ও প্রিয়জন বলে মনে হত। তাছাড়া তিঁনি গোলামদের সাথে একত্রে বসে পানাহার করতেন। আরোহীর পিছনে গোলাম অথবা অন্য কাউকে অরোহী করে নিতেন। তাদের খাদ্য এবং পোষাক পরিচ্ছদ থেকে রাসূলের খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ ভিন্ন হত না। বিশ্বনবীর এ মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সর্ত্বেও তার স্বাভাবিক জীবন যাপন দেখে জর্জ বার্নার্ড-শ বলেন: I have studied him-the wonderful man-and in my opinion far from being an Anti-Christ he must be called the saviour of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much-needed peace and happiness. অর্থৎ "আমি মুহাম্মদের জীবনী নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমার অভিমত এই যে, এই চমৎকার মানুষটি দাজ্জাল তো ছিলেন-ই না, বরং তাকে মানবজাতির ত্রাণকর্তারূপে পরিচিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদের ন্যায় একজন ব্যক্তি যদি সমস্ত পৃথিবীর একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তা হলে তিনি বর্তমান বিশ্বের সমস্যাদি এমনভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবেন, যা বিশ্বের জন্য বহন করে আনবে অপরিহার্য, বহু-প্রতিক্ষিত সুখ ও শান্তি।



www.pathagar.com

**পারিবারিক জীবন**

বিশ্বনবী মোহাম্মদ [সা] পরিবারের সকলকে ভালবাসতেন। স্ত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না; বরং সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। তাদেরকে কখনও কষ্ট দেননি বরং সকল সময় তাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারিক কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি সন্তানদেরকে অনেক বেশি ভালবাসতেন। পুত্র ইব্রাহীম যখন জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাকে দুধ পানের জন্য মক্কার অনেক দূরে কামার পরিবারে দেওয়া হয়। তাকে দেখার জন্য পায়ে হেঁটে প্রায়ই ঐ বাড়ীতে যেতেন এবং কোলে নিয়ে আদর করে বাড়ী ফিরতেন। তাছাড়া তিঁনি বলতেন, ফাতিমা আমার কন্যা, আমি তাকে দুনিয়ার সবার থেকে বেশি ভালবাসি। কোথাও সফরে যাওয়ার সময় সব শেষে তিনি ফাতিমার নিকট থেকে বিদায় নিতেন এবং ফিরে এসে সর্বপ্রথম ফাতিমার সাথে সাক্ষাত করতেন। তাছাড়া তিঁনি হযরত হাসান এবং হুসাইনকে তার কলিজার টুকরা বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন ।

**সামাজিক অবদান**

সমাজ সংস্কারক হিসাবে তার অবদান অতুলনীয়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অশ্লীল ও অমানবিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিঁনি ব্যক্তি জীবনে সমস্ত অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। নাচ, গান, মদ, জুয়া, বেগানা নারীর দিকে হস্ত উত্তোলন তো দূরের কথা তাদের দিকে চক্ষু উঁচু করেও দেখতেন না, অন্যদেরকেও নিষেধ করতেন। সামাজিক অশ্লীলতা এবং নোংরামি কার্যকলাপ বন্ধের জন্য তিঁনি সদা ব্যস্ত থাকতেন। কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো, রুগীর জন্য সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কেউ মারা গেলে তার জানাযাতে উপস্থিত হওয়া, অলিমা সহ অন্যান্য দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সমাজের সমস্ত বিবাদ সংঘাত মিমাংসার কাজেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। সমাজে সকলের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন তৈরি করে ঐক্যের প্রাচীর বিনির্মানে মশগুল থাকতেন। নিজে অমুসলিদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করতেন এবং সাহাবাদেরকেও আদেশ দিতেন। তাদের প্রতি কেউ জুলুম করলে তিনি সুষ্ঠ বিচার করতেন। এ জন্যই অমুসলিমরাও রাসূলের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তামুক্ত থাকত।

**রাজনৈতিক অঙ্গন**

তিনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদও বটে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তার ভূমিকা ছিল শান্তি পূর্ণ। তিনি শক্তিশালী হওয়া সত্বেও সবসময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করতেন। মক্কার কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়া সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু কাফেররা তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে পরবর্তীতে আল্লাহর আদেশে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের সাথে যোগাযোগ বহাল রাখতেন। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে কারোর সাথে আপোষ করতেন না। অপর দিকে মদিনা রাষ্ট্র সুস্থ পরিচালনার জন্য তিনিই



www.pathagar.com

সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান রচনা করে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এবং সাহাবাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার নিমিত্তে মাজলিসে সূরা [সংসদ] গঠন করেন।

**অর্থনৈতিক ক্ষেত্র**

শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবীদদের থেকেও তিনি অনেক বড় অর্থনীতিবীদ ছিলেন। তার অর্থনৈতিক চিন্তা চেতনা এবং দর্শন থেকে বর্তমানে গবেষণা করে সুস্থ ও সুদ মুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যার সুনাম ও সফলতা এদেশ সহ সকল দেশের মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তি জীবনে কোন প্রকার সুদ, ঘুষ, অবৈধ হাদিয়া-মুনাফা, গ্রহন করতেন না। বরং অনুসারীদের উপর ঐ সমস্ত আদান প্রদান সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। তাছাড়া বিবাহের সময় যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে কখনো ধোঁকা এবং ওজনে কম দিতেন না। অন্যের সম্পদের প্রতি কোন লোভ-ই ছিল না। মক্কার লোকেরা তার নিকট বিনা প্রমাণে সম্পদ গচ্ছিত রাখত। তিঁনি কখনও আমানতের খেয়ানত করেন নাই। তাছাড়া দানের হাত ছিল অনেক বড়। সম্পদ কখনও জমা রাখতেন না। গরীব দু:খিদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ সম্বলটুকুও মানুষের জন্য উৎসর্গ করেন।

**বিশ্বনবী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশংসা**

মানব সভ্যতায় কোন ব্যক্তি সকল ক্ষেত্রে বেশি চরিত্রবান , মর্যাদাবান ও প্রসংশিত, তা নিয়ে যুগযুগ ধরে চিন্তা ও গবেষণা চলে আসছে। কোন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তির মোহনা? এ গবেষণার সমাধান হিসাবে যার নাম বারবারই এসেছে তিনি হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ [সা]। তিনি বলেন, চরিত্র জগতে আপনার চরিত্রই হল মহান চরিত্র। সুতারং সে চরিত্রকেই তোমরা মডেল হিসাবে গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য রাসূল মুহাম্মদ [সা] এর আর্দশই সর্বোত্তম আদর্শ। বিশ্বনবীর চরিত্রই যে শ্রেষ্ঠ সে কথা অমুসলিম গবেষকরাও অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে। তার প্রশংসা করতে গিয়ে টমার্স কার্লাইল বলেন: On Hero, Hero Worship and Heroic in History: Hero as prophet. অর্থৎ শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা নবী-রাসূলদের ন্যায় অতি অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেও তিনিই "হিরো" নায়ক ছিলেন। তাছাড়া সম্প্রতিক গবেষক মাইকেল এইচ, হার্ট তার "দ্যা হানড্রেট" বই লিখতে গিয়ে প্রমাণ দিলেন সকলের পূর্বে মুহাম্মদ [সা]-এর নাম ও জীবনী উল্লেখ করে। তার কাছে প্রশ্ন করা হল, আপনি অমুসলিম হওয়া সত্বেও মুসলমানদের নবীকে প্রথমে কেন উল্লেখ করলেন? তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন, আমি স্বতন্ত্র মনে বিচার বিচক্ষণ করে তার উপর কোন মহান ব্যক্তিই পেলাম না, এজন্যই আমি তার জীবনী প্রথমে উল্লেখ করেছি।



www.pathagar.com

**উত্তম চরিত্রে অসত্য মন্তব্য**

বিশ্বনবীর উত্তম চরিত্র দেখে যুগে যুগে এক শ্রেণীর নষ্ট, চরিত্রহীন এবং জ্ঞান পাপীরা তার সম্পর্কে না জেনে, না বুঝে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়। তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমান ও তাদের প্রাণপ্রিয় নবীকে হেয় করা, বিশ্বের মাঝে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে দেওয়া, এবং মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে ঘৃণা তৈরি করা। ইতালিয়ান কবি "দান্তে" তার ডিভাইন কমেডিয়া কাব্যে রাসূল [সা] কে নরকের [INFERNO] নিম্নতম অংশে স্থান দিয়েছে। তাছাড়া ইউরোপীয় ইহুদি, খৃষ্টান এবং অমুসলিমরা একত্রে রাসূল [সা] এর অপবাদমূলক দুইটা বই লিখেছে "বিবিলিওথেক অরিয়েন্টাল [bibliotheque-orintale], হ্যামফ্রি প্রিদো [hamphry prideaux]। বই দুটিতে প্রথমেই নবী কারীম [সা] কে ধাপ্পাবাজ বলা হয়েছে। ড. সৈয়দ আশরাফ আলী বলেন, ঐ বই দুটির মধ্যে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা ব্যতিত সত্য কথার কোন স্থান-ই দেওয়া হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন ভাবে ঐ সমস্ত চক্রান্তবাজরা রাসূল [সা] কে ব্যঙ্গ করেছে। ডেনমার্কে অপ্রিতিকর কার্টুন ছাপা, এবং সর্বশেষ ১১ সেপ্টম্বর ২০১২ সালে আমেরিকায় নাকুলা বাসিল [Nakola bassely] ইনোসেন্স অব মুসলিম নামক সিনেমার মধ্যে রাসূল [সা]-কে সন্ত্রাস, বিশৃংখলাবাদী, নারীভোগী, রক্তপিপাসু ইত্যাদি হিসাবে উপস্থাপন করেছে। [নাউযুবিল্লাহ] তাদের এ মিথ্যাচার সারা পৃথিবীর মুসলমানদের হৃদয়কে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। অথচ কোন মুসলমান-ই ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্ম ও ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা, বানোয়াট রচনা করেনি। উত্তম চরিত্রের এটাই সর্বোত্তম উদহারণ হিসাবে জাতির কাছে আজ বিবেচিত।

**বাস্তবিক পক্ষে**

বিশ্বনবী মুহাম্মদ [সা] সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এটি যেমন সত্য; তেমনিভাবে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তার মত চরিত্রবান মানুষের আগমন ঘটবে না এটিও চিরন্তন সত্য। মুষ্টিমেয় যারা তাঁর চরিত্র নিয়ে কু-মন্তব্য করে, তাদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে তারা নিজেরাই চরিত্রহীন ব্যক্তি। নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্য তাদের বোঝা অন্যের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া চিন্তা ও গবেষণার বিষয় হল, একজন ব্যক্তি এত অল্প সময়ে একটি পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার পরিবর্তন সাধন করে সে স্থানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রবর্তন করেছেন। তিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পরাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক মহলের সাথে সম্পর্কসহ সমস্ত সমস্যাগুলি ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী সমাধান করেন। আমার প্রশ্ন, একজন চরিত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত মহৎ কাজগুলি করা কি সম্ভব? মোটেও সম্ভব নয়; বরং তার দ্বারা সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ তিনি কখনও দেশ ও জাতির ক্ষতি করার কোন কাজ-ই করেননি। তার এ মহত্ব, সাহসিকতা, অনঢ় মনোবল ও প্রচেষ্টা দেখে আলফ্রেড দ্যা লামার্টিন বলেন: Philosopher, orator apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational



www.pathagar.com

dogmas, of a cult without images; the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may will ask is there any man greater than he? অর্থাৎ- দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম প্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী, ধর্মমতের এবং প্রতিমা বিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুনঃসংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্ম সাম্রাজ্যের সংস্থাপক কর্তা -ই হল মুহাম্মদ। যে সমস্ত মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মহত্ব পরিমাপ করা হয়ে থাকে সেগুলোর প্রত্যেকটির আলোকে তাঁকে বিবেচনা করা হলে, আমরা একথা সহজেই বলতে পারি তার তুলনায় মহান বা মর্যদাবান কোন মানুষ কখনোই জন্মগ্রহণ করেনি এবং করবেও না।

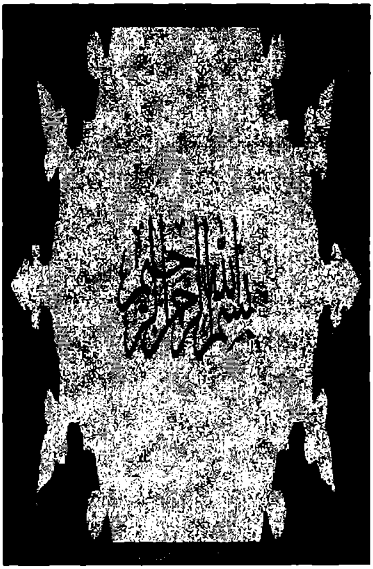



www.pathagar.com

# রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্বনবী [সা]

এস এম আবদুছ ছালাম আযাদ

সমগ্র পৃথিবী ছিল তখন অমানিশার তিমিরে ঢাকা। মানুষগুলো ছিল বন্য প্রাণীর মত হিংস্র। যখন তখন ঘটে যেতো খুন রাহাজানির মতো বেদনাদায়ক ঘটনা। গোত্রপতির মর্জির উপর চলতো গোত্র। এক গোত্র অপর গোত্রকে সহ্য করতে পারতো না। যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকতো সর্বদা।

নারী সমাজের কোন অধিকার ছিল না। ভোগের সামগ্রী হিসাবে তারা ব্যবহার হতো। বেচা-কেনা হতো বাজারে। যখন ইচ্ছে ভোগ করতো, আর যখন ইচ্ছা বাজারে বিক্রি করে দিতো সাধারণ পণ্যের মতো। কন্যা সন্তানকে হত্যা করতো নির্দ্বিধায়।

স্রষ্টা বলে কারো একক ইবাদত বা দাসত্ব তারা করতো না। হাতের গড়া মূর্তি ছিল তাদের পুঁজনীয়। চাঁদ সূর্যের পুঁজায় তারা মশগুল হতো। লাত, মানত, হুবল, উজ্জা ছিলো তাদের বড় বড় পুঁজার মূর্তি।

এক কথায় তখনকার মানুষ একত্ববাদ বলে কিছু মানত না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোন শৃঙ্খলা তখন ছিল না। দুরাচারী, পাপাচারী হিসাবে তারা নিজেদের গড়ে তুলেছিল। সত্য মিথ্যার বালাই ছিল না। বাহুবল যার যত বেশি ছিল সে ছিল মান্যবর।

এমন এক বিভীষিকাময় সময়ে সমগ্র দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল পবিত্র মক্কা নগরীর বুকে এক মহিমান্বিত পরিবারে ৫৭০ খৃষ্টাব্দ, মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল মতান্তরে ৯ই রবিউল আউয়াল সুবেহ সাদিকের শান্তিময় অনন্য সুন্দর ও বরকতময় সময়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম মানব হযরত মুহাম্মদ [সা] দুনিয়ায় আগমন করলেন।

শিশু জীবন হতে বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করে হযরত মুহাম্মদ [সা] নবুওত প্রাপ্ত হন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে আল্লাহর নির্দেশে জন্মভূমি মক্কা নগরী পরিত্যাগ করে ইয়াসরিব্ তথা মদিনায় হিযরত করেন। মদিনায় যাওয়ার পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইসলামী রাষ্ট্রই সমগ্র পৃথিবীর জন্য একমাত্র আদর্শ। প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণকর।



www.pathagar.com

ইতিহাসের পাতায় এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক বিরল সংযোজন। এই ইসলামী রাষ্ট্র মহানবী [সা] নিজেই পরিচালনা করেন। বিশ্বনবীর রাষ্ট্র চালনার কয়েকটি গুরুত্বপর্ণ দিক নিম্নরূপ:

**এক-সর্বাত্মক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা**

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ছিল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশ ইত্যাদি নির্বিশেষে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে সকলের সমানাধিকার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য হযরত মুহাম্মদ [সা] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামী গণতন্ত্র। গণরায় বা জনমতের প্রতি বাস্তবিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা গণতান্ত্রিক বিধান আল্লাহর নিকটও প্রিয়। আল্লাহ পাক কালামে ইলাহির সূরা-আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন "কাজেই তাহাদিগকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" সূরা আশ্ শুয়ারার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে "যারা তাদের পালন কর্তার আদেশ মানে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে কর্মসাধন করে এবং আমি তাদের কে যে রিজিক দান করেছি তা হতে খরচ করে।"

হযরত [সা] কালামে ইলাহির ঐ নির্দেশ মোতাবেক ইসলামিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্ব নবী [সা] এর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সকল মানুষের সমঅধিকার ছিল। যেমন উহুদের যুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বনবীর ইচ্ছা ছিল যে, মদিনার ভিতর থেকে শত্রু পক্ষকে দমন করা। কিন্তু সাহাবায়ে আজমায়িনদের [রা] সাথে পরামর্শ করতে গেলে অধিকাংশ সাহাবী [রা] মদিনার বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করার পরামর্শ দেন। মহানবী [সা] সাহাবা [রা]দের পরামর্শ মোতাবেক মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করেন। আহযাবের যুদ্ধের প্রাক্কালে সাহাবায়ে আজমায়িন [রা] গণের পরামর্শের ভিত্তিতে "খন্দক" খনন করে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করেন। ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বর্ণ, গোত্র, বংশ সকল মহল ও সকল মানুষের স্বাধীনভাবে আপন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। ইসলাম মনে করে যে, গণ মানুষের অভিমত ও সার্বিক সহযোগিতা রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই কারণেই মহানবী [সা] কালামে ইলাহির নির্দেশ মোতাবেক "মজলিশে শুরা" গঠন করেন।

"মজলিসে শুরা" গঠন করার সময় ঐ সমস্ত লোকদেরকে শুরার সদস্য করা হতো যাদের নিম্নলিখিত গুণাবলী রয়েছে। যেমন খোদা ভীরুতা, পদলোভহীনতা, বিচক্ষণতা, আমানতদারী, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রজ্ঞাবান, কর্মঠ, সুবিচারক ইত্যাদি।

**দুই : সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা**

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] বিশ্ব শান্তি ও সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর পরই "মদিনার সনদ" ঘোষণার মাধ্যমে সর্বাত্মক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা দুনিয়ার ইতিহাসে নজির স্থাপন করতে সক্ষম হয়। মদিনা সনদের মাধ্যমে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র নির্বিশেষে একসূত্রে গ্রথিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের নগর রাষ্ট্রের



www.pathagar.com

গোড়া পত্তন ঘটে। মদিনায় ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা, সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আন্তজাতিক সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় এবং ব্যাক্তিগত জীবনের বিবাদ মিমাংসার সর্বোচ্চ ক্ষমতাসহ সমুদয় ক্ষমতা এ সনদের অর্ন্তগত ছিল। এ সনদ ছিল দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংবিধান। এ দ্বারা ইসলামের বিস্তৃতি যেমন ঘটে তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুদৃঢ় ও সুসংহত মজবুত ঐক্য।

**তিন: শক্তিশালী প্রশাসন কায়েম**

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ইসলামী রাষ্ট্র চালনার জন্য গড়ে তুলেছিলেন একটি শক্তিশালী ও সুসংহত প্রশাসন। এ প্রশাসনের কাণ্ডারী ছিলেন বিশ্বনবী নিজেই। তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি যে সমস্ত কাজ সরাসরি নিজের হাতে আন্‌জাম দিতেন সেগুলো হলো শৃঙ্খলা বিধান, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, প্রতিনিধি নিয়োগ, কর্মচারী নিয়োগ, ঈমাম ও মোয়াজ্জিন নির্ধারণ, যিজিয়াকর আদায়কারী নিয়োগ, জমি বন্টন, বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের সমাধান অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে চুক্তিপত্র করণ, সেনাবাহিনী সজ্জিত করণ, যাকাত আদায়কারী নিয়োগ ইত্যাদি। হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর [রা] সার্বক্ষণিক বিশ্বনবী [সা]কে পরামর্শ দিতেন এবং সহযোগীতা করতেন। বিশ্বনবী [সা] হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর [রা] কে পৃথিবীর পরামর্শক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বিশ্বনবী [সা] বলেন, আমার আকাশবাসী দুজন উজির হলো জিব্রাইল ও মিকাঈল [আ] এবং পৃথিবীবাসী দুজন পরামর্শ দানকারী হলো আবু বকর ও ওমর [রা]।

ইসলামের ব্যাপক প্রসারতার ফলে বিশ্বনবী [সা] গোটা ইসলামী রাষ্ট্রকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। সেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশাসক নিয়োগ করেন। প্রশাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি গঠন করেন সেক্রেটারিয়েট। যে সব বিভাগ নিয়ে তিনি সেক্রেটারিয়েট গঠন করেন সে বিভাগগুলো হচ্ছে হিসাব রক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ, গোপন চিঠি পত্র ও অনুবাদ বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, লেখক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, উন্নয়ন ও প্রকৌশল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ,শিক্ষা বিভাগ, সার্বিক নিরাপত্তা বিভাগ, সীল মোহর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। উপরোক্ত বিভাগের জন্য সু-নির্ধারিত তদারককারীও ছিলেন।

**চার : পররাষ্ট্র ব্যবস্থা**

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্বনবী [সা] এর বৈশিষ্টময় দিক হলো পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে নিপুণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। হযরত [সা] সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র মদিনায়ে মনোয়ারাকে বহিশত্রুর হীন আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। তিনি বাহরাইন, আম্মান, ইয়ামন, ইরানী দখলদারী ও সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে রুমিয়দের কর্তৃত্ব তুলে দেন। মিশর, রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার রাষ্ট্র চালকদের নিকট দুতের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তিনি সর্বদা বর্হিবিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতের জান-মাল ইত্যাদির সার্বিক নিরাপত্তা সাধনের মাধ্যমে খোদায়ী মতবাদ আল-ইসলামের সুনাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং প্রসার ঘটে।



www.pathagar.com

**পাঁচঃ সামরিক ব্যবস্থা**

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বিক প্রতিরক্ষা, ইসলামী বিপ্লব উত্তর সংঘাত, বিবাদ, বিসম্বাদ উত্তরণের জন্য বিশ্বনবী [সা] ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে দক্ষ সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। রাসূল [সা] রাষ্ট্রনায়ক ও সেনা-অধিনায়ক হিসাবে কোন অভিযানে কোথায়, কিভাবে, কি পরিমাণ সৈন্য প্রেরণ করতে হবে তার সিদ্ধান্ত দিতেন। যারা নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধাভিযানে অংশ নিতে আগ্রহী তারা নির্দ্দিষ্ট রেজিঃ বহিতে আপন আপন নাম লিখে দিতেন। শত্রু মোকাবেলার জন্য আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজন মত ঢাল, তলোয়ার, ধনুক-তীর, বল্লম ও দূর নিক্ষেপন যোগ্য অস্ত্র এবং দাব্ববাহ্ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করা হতো। ইসলামী রাষ্ট্র মদিনার নাগরিকদেরকে তরবারী,বল্লম, তীর, ধনুক, অশ্ব চালনা সহ বিভিন্ন -যুদ্ধ কৌশল এবং নিয়ম-নীতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

**ছয়ঃ গোয়েন্দা বিভাগ**

সম্ভাব্য ও প্রকৃত শত্রুর অবস্থা জানার লক্ষ্যে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় তত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

**সাতঃ জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান**

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সুন্দর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তবে এই জন্য পৃথক কোন প্রকার নিয়মিত বাহিনী ছিল না। কিছু সংখ্যক সাহাবী [রা] নিজ ইচ্ছায় নিরাপত্তা বিভাগের কাজ করতেন। এদের মাঝে যাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে ভাতা দেওয়া হতো। এ বিভাগে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত যুবায়ের, আলী, কায়েস ইবনে আসাদ, অসিম ইবনে সামিত, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ্ প্রমুখ সাহাবী [রা] গণ। তারা বাজার পরিদর্শন, অপরাধ দমন, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দেখাশুনা করতেন।

হযরত [সা] নিজেই ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যবহারিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, প্রয়োজনে শাসন করতেন। এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক জীবন সুন্দর সুখীময় হয়ে উঠেছিল এবং নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের গৌরব লাভে সক্ষম হয়েছিল।

**আটঃ সমর ব্যবস্থা**

ইসলাম অহেতুক যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, খুনাখুনীর পক্ষে সম্মতি দেয় না। বিশ্বনবী [সা] ও তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু মজলুমের সাহায্যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও জালেমদের বিরুদ্ধে তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তবে তার সমর নীতি ছিল নির্যাতন, নীপিড়ন, অত্যাচার ইত্যাদির উৎখাতের মাধ্যমে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন এবং ইনসাফ ভিত্তিক বিচার প্রতিষ্ঠা করা। হযরত [সা] দুনিয়ার বুকে অসভ্য ও বর্বর সমর নীতির পরিবর্তে অধিকতর মানবিক ও আন্তর্জাতিক সমর আইনের প্রবর্তন



www.pathagar.com

সাধন করেন। যে সমস্ত নাগরিক স্বাধীনভাবে আপন ধর্ম পালনে ইচ্ছুক তাদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ [সা] বলেন, কোন সময়ে আক্রমণের আশা পোষণ করো না। নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর শরনাপন্ন হও। এ কথা স্মরণ রাখ যে, যখন শান্তি বিপর্যস্ত হবে তখন তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাত। হযরত [সা] আরো বলেন, শত্রু শিবিরি হতে গ্রেপ্তার হলেও তারা যেন কোন নির্দোষ নারী, শিশু, দুর্বল ও অসমর্থ বৃদ্ধলোককে হত্যা না করে। তিনি সাহাবা [রা]দের এ নির্দেশও দিতেন যে, তারা যেন ফলন্ত বৃক্ষ না কাটে কিংবা পরাজিতদের সম্পদ বিনষ্ট না করে।

পবিত্র কালামে ইলাহির নির্দেশ সুত্রই বিশ্ব নবী [সা] এর সমর নীতির মূলসূত্র ছিল। যেমন সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহর পথে ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু সীমালংঘন করো না।" ১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ ফিতনা নির্মূল না হয় এবং যতক্ষণ না দ্বীন [ইসলাম] প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"

বিশ্বনবী [সা] এর যুদ্ধ কৌশল ছিল পরিকল্পনা সম্বলিত। যাতে অত্যন্ত কম আক্রমণে উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং কম লোক বা অল্প জীবনের ক্ষতি হয়। হযরত [সা]-এর জীবনে ২৭টি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। তিনি সরাসরি ৯টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তিনি কখনো যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হতেন না। কেননা যদি শত্রু পক্ষ হতে সন্ধি বা চুক্তির প্রস্তাব আসে। পবিত্র কালামে ইলাহির সূরা আনফালের ৬১নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তুমিও সে দিকে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নি:সন্দেহে তিনি শ্রবনকারী, পরিজ্ঞাত।" সূরা আন্ নিসার ৯০নং আয়াতে বলা হয়েছে, "অত:পর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।" কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশের প্রতি রাসূল [সা] নজর রাখতেন এবং শত্রু পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব আসে কিনা তা দেখতেন।

**নয়ঃ চুক্তি পালন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা**

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদে [সা] ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ধি ও চুক্তি পালনে ছিলেন সচেতন। তিনি কারো সাথে কখনো চুক্তিবদ্ধ হলে তা বাস্তবায়ন করতেন। তা ব্যাক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্টিগত ভাবে। এ সম্পর্কে হযরত [সা] বলেন, ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা ভংগ করা হারাম। তা হলো মুনাফেকের লক্ষণ। শান্তি ও চুক্তির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশই ছিল তাঁর মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে সুরা আন ফালের ৬১নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তারা যদি সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তুমিও সেদিকে আগ্রহী হও।" এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন যে, "কোন জাতির সাথে কারো সন্ধি বা চুক্তি হলে নির্ধারিত মেয়াদ না শেষ হওয়া পর্যন্ত তা ভঙ্গ করা যাবে না। যদি অন্যথা হয় তাহলে উভয়ের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে চুক্তিনামা উহার দিকে নিক্ষেপ করবে।"



www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবু জান্দল ইসলাম গ্রহণ করে অত্যাচারিত হয়ে শিকল পরা অবস্থায় বিশ্বনবীর সমীপে উপস্থিত হন। বিশ্বনবী [সা] তাকে ধৈর্য্য ধারনের উপদেশ দেন। কিন্তু চুক্তির বরখেলাফ করেননি। কেননা চুক্তিতে স্বাক্ষর ছিল যে, কোন নও মুসলিম মক্কা থেকে মদিনায় গেলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে। এ সন্ধিনামায় বিশ্বনবী [সা] এর স্বাক্ষর দান ছিল তাঁর অপূর্ব রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল হিসাবে দেখা গেলেও মূলত: তা ছিল মুসলমানদের অনুকূলে। এতে কোন সন্দেহ নেই, এই সন্ধি ইতিহাসের পাতায় এক বিরল ও ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত।

**দশ : ইনসাফ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা**

বিশ্বনবী [সা] ইসলামী রাষ্ট্রে ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক মহান আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জমিনে প্রেরণের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। কালামে ইলাহির সূরা হাদিদের ২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও হেদায়েত সহকারে প্রেরণ করেছি এবং এতদসংগে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মিযান। এ দ্বারা তাঁরা যেন ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে।" বিশ্বনবী [সা]-এর ঐ ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থায় কোন প্রকার স্বজন প্রীতির সুযোগ ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যারা আঞ্চলিকতার প্ররোচনা দেবে তারা আমাদের দল ভুক্ত নয়। সাহাবাগণ আঞ্চলিকতা সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত [সা] বলেন, "অন্যায়ভাবে স্বগোত্রের সাহায্য ও পক্ষ অবলম্বন করা। [আবু দাউদ] তাই বিশ্বনবী [সা] অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার পর বিচারে মৃত্যুদন্ড হলে তা সহসা কার্যকর করতেন। তবে বাস্তব প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে গ্রেপ্তার করতেন না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মহানবী [সা] আল্লাহর প্রদত্ত আইন মোতাবেক বিচার করতেন। তিনি ইনসাফ ভিত্তিক বিচারের জন্য বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হতেও পৃথক করেছিলেন। ইসলামের প্রসারতার ফলে বিশ্বনবী [সা] প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি যাদেরকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিতেন তারা ছিল উন্নত চরিত্রের অধিকারী, প্রজ্ঞাবান ও ফকীহ।

**এগারঃ বিশ্বনবীর মানবাধিকার**

মানবাধিকার কায়েমের ব্যাপারে বিশ্বনবীর অবদান অনস্বীকার্য। মানবাধিকার লংঘিত হয় এমন কোন তৎপরতা বা কর্মকাণ্ড বিশ্বনবী [সা] পছন্দ করতেন না। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন, "একে অপরের খুন বা রক্ত, ইজ্জত, হুরমত, মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ইত্যাদি অপরের কাছে এ দিন, এ মাস ও এ নগরীর ন্যায় পবিত্র।"

তিনি আরো বলেছেন, "তিনটি বিষয়ে বনি আদমের রয়েছে মৌলিক অধিকার, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু জাতির প্রতিও বিশ্বনবী



www.pathagar.com

[সা] সমান ভাবে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে যে হত্যা করে সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না। [বুখারী]। বিশ্বনবী [সা] এর এমন নিরপেক্ষ ও উদার মানবাধিকার দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ক্রীতদাস সমস্যার সমাধানে তিনি বলেন, "ক্রীতদাসেরাও তোমাদের ভাই। তোমরা নিজেরা যা খাবে এবং যা পরবে তাদেরকেও তা আহার এবং পরিধান করতে দেবে।" "এভাবে তিনি মুনিব দাসের প্রভেদ ধ্বংস করেন। এক মুক্ত দাসের নিকট হযরত [সা] বিয়ে দিলেন আপন ফুফাতো বোন। এক মুক্তদাসের পুত্রকে বানালেন সেনাপতি, আরেক মুক্ত দাসকে বানালেন মদিনার মসজিদের প্রথম মোয়াজ্জিন। এভাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন উদার মানবাধিকার, যে মানবাধিকারের দৃষ্টান্ত আর কেউ স্থাপন করতে আজো সক্ষম হয়নি।

### বারঃ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম পূর্ব আরবে নারী সমাজের অবস্থান ছিল পশুর ন্যায়। তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। ছিল না কোন বৈধ অধিকার। নারী কেবল মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার হতো। ভোগের পণ্য হিসাবে ব্যবহার হতো। বিশ্বনবী [সা] নারী জাতির মর্যাদার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেস্ত।" তিনি আরো বলেন, "যার তিনটি মেয়ে আছে, সে তাদের লালন পালন করল, ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিল এবং যথা সময়ে বিয়ে দিল-সে জান্নাতী।" প্রশ্ন করা হলো, যার দুইটি মেয়ে আছে? হযরত [সা] বললেন, সেও। জিজ্ঞাসা করা হলো, যার একটি মেয়ে আছে? বিশ্বনবী [সা] বললেন, সেও। এ দ্বারা বুঝা যায়, বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে কতটুকু মর্যাদা দিয়েছে।

### তের :চিকিৎসা ব্যবস্থা

নাগরিক জীবনের আরেকটি মৌলিক অধিকার হলো চিকিৎসা ব্যবস্থা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] রোগীর পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে দিয়েছেন অত্যাধিক জোর। প্রাক আরবে চিকিৎসার প্রচলন ছিল। রাসূল [সা] চিকিৎসা ব্যবস্থার মাঝে সংস্কার সাধন করে জন সুবিধার্থে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচলন করেন। এই সময়কার কয়েকজন চিকিৎসা বিশারদ হলেন। হযরত হারিস ইবনে সালাহ ও ইবনে আবু রাদা [রা]। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে ভাতা নিতেন। বিনা মূল্যে নাগরিকদের চিকিৎসা করতেন।

### চৌদ্দঃ শিক্ষা ব্যবস্থা

যে জাতি শিক্ষার দিক দিয়ে বেশি অগ্রসর সে জাতির সার্বিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে বিশ্বনবী [সা] জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন বেশি। তিনি গুরুত্বারোপ করেই ক্ষান্ত হননি বরং এর বাস্তবায়ন করেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মসজিদে নববীতে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে হযরত সাইদ ইবনুল আস [রা]কে নিয়োগ করেছিলেন। এখানে একটি শিক্ষাগৃহ স্থাপন করা হয়েছিল। অনাথ, আশ্রয়হীন লোকজন



www.pathagar.com

সেখানে থাকতেন এবং জ্ঞান অর্জন করতেন। অবশ্য আকরাম ইবনে আবুল আকরামের গৃহ ছিল প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র।
বদর যুদ্ধের বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ হিসাবে প্রত্যেক দশজনকে পড়ালেখা শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। হযরত [সা] জনগণকে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দান করতেন এবং বলতেন, "জ্ঞান অর্জন কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।" "বিদ্যানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।" "প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ"। "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।"
উপরোক্ত হাদিস সমূহ প্রমাণ করে যে, মহানবী [সা] জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

**পনের : মহানবীর [সা] আদম শুমারী**

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আদম শুমারী বেশ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র চালকদের হাতে নাগরিকদের স্পষ্ট তালিকা থাকা আবশ্যক। দূরদর্শী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] বহু আগে আদম শুমারীর কথা উপলব্ধি করেন। হিজরী ২য় বর্ষে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নাগরিকদের একটি পরিপূর্ণ তালিকা তৈরী করেন। পরিসংখ্যান বিভাগে তা সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম লিখিত আদম শুমারী। বিশ্ব নবীর জীবদ্দশায় ২বার আদম শুমারী হয়েছিল বলে জানা যায়।

**ষোল: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা**

হযরত মুহাম্মদ [সা] রক্তচোষা সুদী অর্থ ব্যবস্থার ভিত ধ্বংস করে শোষণহীন যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। যে অর্থ ব্যবস্থা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একমাত্র অর্থনৈতিক আদর্শ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার ছিল এ ব্যবস্থার ভিত্তি। এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল বায়তুলমাল। ইসলামের ইতিহাসে বায়তুল মালের গুরুত্ব খুবই বেশি। বায়তুলমালের উৎস ছিল গণিমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ মাল, মালের যাকাত ও যিজিয়া কর ইত্যাদি। বায়তুলমালে অধিক সম্পদ জমা হলে বিশ্বনবী অস্থির হয়ে উঠতেন এবং অভাবগ্রস্থ নিঃস্ব, মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। কারণ আল্লাহ পবিত্র কালামে সূরা হাশরের ৭নং আয়াতে বলেছেন যে, "ধন সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মাঝে শুধু আবর্তিত না হয়।" রাজস্ব বিভাগ ছিল বায়তুলমালের অধীনে। এ বিভাগে রাসূল [সা] এর নিয়োগকৃত যোগ্যতম কর্মচারীগণ কাজ করতেন। তিনি অর্থনীতিতে এনেছিলেন সুদৃঢ় মজবুতি। সমূলে উৎখাত করেছিলেন মওজুদদারী ব্যবস্থা, সুদ প্রথা, কালোবাজারী ইত্যাদি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রমিকের অধিকার। তিনি শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে তার পাওনা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও বিশ্বনবী [সা] ব্যবসা বাণিজ্যের পথ কে সুগম করেছিলেন এবং অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ



www.pathagar.com

করেছিলেন। বেকার শ্রমজীবি, রুজিহীন, অক্ষম মজুর শ্রমিককে সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছেন। অর্থাৎ বিশ্বনবী [সা] অর্থনীতিতে এনেছিলেন এক আমূল পরিবর্তন, যা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একমাত্র অর্থনৈতিক আদর্শ, যা ছিল সকলের জন্য কল্যাণের।

**উপসংহার**

এখন এ কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যেভাবে রাষ্ট্র চালনা করেছেন তা পৃথিবীর শেষ অবধি সকল জাতি ও গোষ্ঠির জন্য একমাত্র মডেল। আজকের আধুনিক বিশ্ব অশান্তির আগুনে জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হবার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিশ্বনবী [সা] এর আদর্শের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। যদি এ মুহূর্তে আল্লাহ প্রদত্ত এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দুনিয়ার জমিন হতে জুলুম, শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ইত্যাদির চির অবসান ঘটবে। মানবতা সার্বিকভাবে মুক্তি পাবে। আজকের অশান্ত বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বনবীর প্রবর্তিত আইনের বিকল্প নেই। আল্লাহ সকল মানুষকে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। আমিন।

------------------------

তথ্যসূত্র-বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থ।



www.pathagar.com

## পরমার্থ ॥ কে জি মোস্তফা

আমাদের প্রাণে আজ মূর্ছিত দিন
ভালবেসে কে বাজাবে আলোকের বীণ ॥

ভয় হয় যদি সেই আলোর গানে
শুকনো পাতায় কোন দহন আনে
তাই ভাবি যতবার
নেই সমাধান তার
অবশিত মন থাকে আঁধারে বিলীন ॥

সেই ভয় সেই দ্বিধা সরিয়ে ফেলে
প্রথম আলোর মতো কে তুমি এলে
যদি আমি মুছে যাই
যেন তোমাকে হারাই
অসীমের অনুগ্রহে শোধ হবে ঋণ ॥



www.pathagar.com

## মহানাবিক ॥ আল মুজাহিদী

বলো
কবে আসবে আবার এ বাংলায়
আঁধারের পর্দা ছিঁড়ে জ্বলন্ত আভায়
আসবে কখন
সূর্যকরোজ্জ্বল জীবন্ত রেখায়।
ইতিহাসে নেমে আসে
গাঢ়তম অন্ধকার
সম্মুখে দাঁড়ানো স্ফীতকায় কুৎসিত তিমির পাহাড়
বিদীর্ণ বিথার, আমাদের উত্তরাধিকার–
সূর্য আসেনি এখানে
বহুদিন বহুকাল–
গ্রহ-তারা, নক্ষত্র নিলয় ছিন্নভিন্ন। এখানে ওড়েনি
কাল-কেতু
কেউ বাঁধেনি মিলন সেতু
বহুদিন বন-বনান্তরে গান নেই। সাড়া নেই প্রাণে
এতো কঠিন প্রহর
নির্জন, নিথর
এখানে কাটে না বন্দরের কাল
বলো, হে নাবিক
কবে আসবে আবার এ-বাংলায়
আরব সাগর পার হয়ে
আমার সমুদ্রে
বঙ্গোপসাগরে ভাসাবে জাহাজ
টালমাটাল!
কবে দেখা হবে? দেখা দেবে কালের মাস্তুল
কবে শেষ হবে বন্দরের কাল
শোধ হবে দিবসের ঋণ
মেটাবে মাশুল–
হে মহানাবিক,
আমরা তো ভুলে গেছি সমুদ্রের চিহ্ন, দিক



www.pathagar.com

দিন রাত্রি, আহ্নিক বার্ষিক–
গতি। কালচক্র–
আমরা বিস্মৃত সময়ের পাদবিক
দিক চিহ্নহীন
আকাশে ওড়াই মিথ্যে ফানুশ রঙিন
শুধু ঘোরাফেরা তমসায়–গাঢ়তম কুয়াশায়
দিশেহারা। আমরা তো বিপ্রতীপ নান্দনিক
পৃথিবীর প্রান্তসীমা
কখনো সুপ্রভ ইংগিত
ফিরে পাই না সম্বিৎ
নি:সঙ্গ নির্জীব অবসাদে ভেঙে পড়ে প্রতিটি প্রত্যুষ
পাহাড়, পর্বত হিন্দুকুশ
জীবনের চারপাশে ঘেরা
আমরা তো বাঁধিনি কখনো ডেরা
মৃত্যুর কফিন
ম্লান করে দেয় জীবিতের দিন
আমরা কেন মৃত্যুর কায়া গড়ি,
কালো কুটিল শর্বরী
ছায়া ফেলে প্রতিদিন
কঠোর কুঠার কেটে ফেলে দিক
কালোগ্রীবা পাহাড়ের মৃতস্তূপ হিম, সুকঠিন
বলো, কবে আসবে আবার এ বাংলায়
রুপোলি মেঘের ছায়ায়
নদী মেখলা এ বাংলায়
হে মহানাবিক,
ভাসাবে আলোর ভেলা
কখন রোদেলা
প্রজ্জ্বল আকাশ
আলো, শুধু আলো একরাশ
ছড়াবে বিদ্যুৎ রেখা
বলবে সুদীপ্র ধ্রুবতারা
কেবল বলবে প্রাণে–প্রাণে
নিখিল আস্তির সাড়া।



www.pathagar.com

## মানুষ স্বভাবে নেই ॥ **জয়নুল আবেদীন আজাদ**

এখনো সূর্য ওঠে, শিশির ঝরে
রাত শেষে হয় ভোর,
এখনো পাখিরা ওড়ে, ফুলেরা হাসে
চারিদিক সুন্দর।

তারকা রবির আলো এখনো আছে
মানুষের আলো নেই,
সুরভিত ফুলগুলো এখনো হাসে
মানবের হাসি নেই।

প্রকৃতি আগের মত স্বভাবে আছে
স্বভাবে মানুষ নেই,
আদম এখন শুধু সুরতে আছে
সৌরভে মোটেও নেই।

মিলাদে ও জলসায় আবেগ আছে
সীরাতে রাসূল নেই,
প্রকৃতিতো মুসলিম আগের মত
আমরা তেমন নেই।



www.pathagar.com

## মহানবী [সা] স্মরণে ॥ **হাসান হাফিজ**

তুমি তমসার মধ্যে অজ্ঞতা ও অন্ধতার সাম্রাজ্য ফুঁড়ে
জ্বেলেছিলে আলো অনি:শেষ,
মানবতা, যে ছিল লাঞ্ছিত আর উপেক্ষিত
তাকে তুমি দিয়েছিলে প্রকৃত সম্মান
এই প্রাপ্তি মানুষের কলুষিত ইন্দ্রিয়পরতা থেকে
দায় মুক্তি, উজ্জ্বল উদ্ধার,
সেই মরুময়তার শুষ্ক কালো দিনে অভিশপ্ত কালে
তুমিই সৃজন করলে মরুদ্যান, মানুষকে মুক্তির হদিশ দিলে
মানুষ তখনই চেনে, চিনতে পারে নিজেকে অন্যকে
এর আগে পৌত্তলিকতার মোহ, আসক্তির নষ্ট বিষ
কেড়ে নিয়েছিল বোধ, দৃষ্টিশক্তি, ভালোমন্দ বোঝবার শক্তি ও ক্ষমতা
তুমি এলে, ফুল ফুটলো, পাখি পেল হারানো সুরের খোঁজ
তুমি বন্ধু শোষিতের, বঞ্চিতের,নিপীড়িত দলিতের
মানব মণ্ডলী ধন্য কৃতার্থ হয়েছে পেয়ে তোমার সান্নিধ্য সুধা
একইসঙ্গে আদর্শের দ্যুতি
দৃঢ়বদ্ধ চারিত্রকাঠামো আর স্বপ্ন অগণন।



www.pathagar.com

## মুহম্মদঃ নক্ষত্র-হৃদয় ॥ হাসান আলীম

তোমার জন্ম-নক্ষত্র উদয়ে সেদিন মদিনার
দূর্গ থেকে চিৎকার করেছিল ইহুদী সমাজ,
এখনও সে নক্ষত্র ধরে নীলাকাশ, কিন্তু আর
ইহুদীরা চমকিত হয় না মোটেও। বে-লেহাজ
পাপিষ্ঠ হৃদয় দ্রুত ফারাণের পার্বত্য চূড়ায়
বিভেদ আর ঘৃণার বিষমন্ত্র বারুদ ছড়ায়,
ভেঙে ফেলে সীসাঢালা প্রাচীরের একাত্ম হৃদয়,
ছিঁড়ে ফেলে সবুজাভ মানচিত্র অলিন্দ নিলয়।
আজ সেই শুক্লাতিথি প্রতীক্ষিত পবিত্র প্রহর,
এই দিনে কেঁপেছিল পারস্যের রাজার প্রাসাদ,
আলোকিত হয়েছিল সিরিয়ার শহর নগর।
ইউরোপ, আমেরিকা কাঁপুক এখন, বরবাদ
হোক সব দুনিয়ার জালিম শাসক। মুহম্মদ
নক্ষত্র-হৃদয় তুমি–ভালবাসা–বুকের শহদ।



www.pathagar.com

## যমজ কবিতা ॥ **মুকুল চৌধুরী**

সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া
এক.
বসে আছি মাছ হয়ে আলোর উৎসবে

সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া, বসে আছি মাছ হয়ে আলোর উৎসবে।
বিজন-নির্জনে যেনো অদৃশ্যে বসে এক মাছের শিকারী
বড়শি ফেলেছে, টোপ তার ইশ্‌কের অপরূপ দানা
চার সে তো আরও সুস্বাদু; আমি মাছ খাদ্যলোভী
অবিশ্রাম ঘুরছি এই পুষ্পময় অতল–অথইয়ে।
সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে রহস্যের অনন্ত ফোয়ারা।

আলো তার আলোর মোহনা, বিচ্ছুরিত অচিন্ত্য আলোক।
রঙ তার বহুবর্ণ, তবু রঙধনু নয় সে-তো
আলো তার দিগন্ত-উৎসারী, তবু চন্দ্রালোক নয় সে মতো
সুবাস অমৃতসম, তবুও বসুধা শিহরণে আমূল উন্মাদ
দৃষ্টি তার অভয়ের, তবু কেনো ভয়শূন্য নয় কোলাহল।
আলো তার তবে কী হে অভিন্ন মোহনা, বিস্ফারিত অমর্ত্য গোলক।

আলো যেনো আলো নেই, হয়ে গেলো প্রসন্ন মাছের ছায়া আশ্চর্য উচ্ছ্বাসে।
যতোবার ডুবে যাই ততোবার দেখি সেই ছায়া
যতোবার ভেসে উঠি ততোবার সবুজ গম্বুজ
হাতছানি দিয়ে ডাকে, যেনো এক প্রোজ্জ্বল পাহারা
হৃদয় অবধি বেঁধে নিতে চায় তার লাল-নীল রঙিন রশ্মিতে।
মাছ শেষে নির্ভয়ে মিশে গেলো রশ্মিজ্জোল বহুবর্ণ সৌন্দর্য পাবনে।



www.pathagar.com

দুই.
## মাছ ঘুরে ভর দিয়ে অলখ ডানায়-

মাছ ঘুরে পানির অতলে, আকাশের মতন অলোক সুন্দর!
আশেপাশে অপূর্ব সংবাদ-ঐ দেখো, চন্দ্রকে ঘিরে সমুজ্জ্বল তারকারা;
ঐ দেখো-বেহুঁশ মাছেরা। আরও শোনো-বিনয় মিশ্রিত সুর,
যেনো 'বানাত সুয়াদ'-পড়ছেন সবিনয়ে দণ্ডিত কাব। ঐ শোনো-
বুরদার নজরানা; বুসিরীর গিরিশিখর উজ্জ্বল করা অজর অশ্রুধারা।
সাদীও গাইছেন তাঁর অমর পঙক্তিমালা, 'সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি....'
মাছ ঘুরে; ভারতের তোতা পাখি আমীর খসরুর সাথে দেখা। গাইছেন,
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি, বলতে পারবো না কেমন জায়গা ছিল...।'
শামস-ই-তাবরিজের হাত ধরে রুমীও তৎপর। ঐ তো ইকবাল,
বাঙলার এক কবির কব্জি ধরে তরবারির মতো চমকাচ্ছেন।

মাছ ঘুরে অবিভক্ত অমরতায়, ভর দিয়ে বরাভয়ে
আবেগের অলখ ডানায়, দেখা হয় বহুবর্ণ মাছের মিছিল।
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যায়, দেখে-ওয়ায়েস করণীর যুগান্তরের দান।
দেখে শাহজালাল; জালালুদ্দীন তাবরিজী জায়নামাযেই দাঁড়িয়ে আছেন।

মাছ ঘুরে এক কলরবে স্পন্দিত প্রেমের উদ্যানে।
মাছ ঘুরে আলোর স্রোতনাদে তৃপ্ত এক অনন্য আকাশে।

রাত্রিশেষ, সহসাই সন্তর্পণে ফিরে এসে দেখে-
মাছ নয়,
মানুষের শ্বাস ধরে সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়ায়
বসে আছে পিপাসা-নির্বাণ এক প্রশান্ত হৃদয়।



www.pathagar.com

## তোমাকে সালাম হে রাসূল [সা] ॥ **আশরাফ আল দীন**

ইয়া নবী সালামু আলাইকা।
বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে তোমাকে সালাম, হে রাসূল!

পলিমাটির এই শ্যামল সবুজ সুন্দর দেশে আজ থেকে হাজার বছরেরও আগে
আল্লাহতে ঈমান এনে তোমার নবুয়তকে মেনে নিয়েছিল কিছু বিশ্বাসী মানুষ;
এর মাঝে ছিল না কোন রাজনীতি, ছিল না রাজ্য-লিপ্সা বা জাগতিক প্রলোভন।
মেধাহীন মূর্তিপূজা আর পঙ্কিল আচার যাদের বিবেককে করেছিল কষাঘাত
দীর্ঘদিন যারা কিছু সহজ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায়নি, পায়নি মনের খোরাক
তারাই সকল রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে একে একে হয়েছিল কাতার বন্দী,
দাঁড়িয়েছিল সুদৃঢ় স্তম্ভের মতো, সকলে মিলে সিসাঢালা প্রাচীর যেনো,
সমর্পিত বান্দার নম্রতা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে সৃষ্টির ফিৎরতকে ভালোবেসে
আস্থা ও গর্ব নিয়ে এদেশে ইসলাম এসেছিল, হে রাসূল!
বিনা যুদ্ধে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও অস্থিত্বের প্রবল আবেগে।
এদেশে ইসলাম এসেছিল অত্যাচারিত-নি:স্বকে ফিরিয়ে দিতে মুক্ত জীবন
আর, অপশাসনের শক্ত হাত গুঁড়িয়ে দিয়ে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে।

তাই, আজো দেখো কোটি কোটি বনি আদম এদেশের ফসলি জমিনে দাঁড়িয়ে
বিনয়ে বলতে থাকে: ইয়া নবী সালামু আলাইকা।

মাঝখানে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই পরাক্রান্ত ও গর্বিত অতীতের পর
সেই সুশাসন সেই ন্যায়বান সমাজ-স্বাধীনতা আর জ্ঞান ও শিল্প চর্চার পর
আজ আমরা এই জনপদের সহজ সরল মানুষগুলো কি যেন হারিয়ে বসে আছি;
দরূদের উচ্চারণ বদলায় নি এতটুকুও, পাগড়ী ও মিনার আজো টিকে আছে, তবু

কি যেন আজ আর নেই!
যে গর্ব ও আস্থা নিয়ে তকবির হেঁকেছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা



www.pathagar.com

যে জ্ঞান-তপস্যা ও সাধনায় যে চরিত্র ঐশ্বর্য ও ত্যাগে সুদীর্ঘ ছিল তাদের প্রতিবিম্ব
সেখানে কোথায় যেন ছেদ পড়েছে বেশ; সম্পদ হারানোর নিঃস্বতা বুকে বাজে।
আমাদের আস্থার ভেতর ঘূণ পোকাদের আস্তানা দেখি ভয়াবহভাবে সুদৃঢ় ইদানিং!
আত্মপরিচয়ের সঙ্কট যেনো আমাদের খুঁড়ে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত; প্রশ্নবোধক অস্থিত্ব।
অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত আমাদের শেকড় আর এ মাটির আসল সন্তান আমরাই
তবু, বেনিয়াদের সাথে আমরাও ঢঙ করি লেজকাটা ভুঁইফোড় মুর্খদের মতো!
দূর্ভাগা আমরা! আমাদের যেনো কোন অতীত নেই, কীর্তি নেই, কৃষ্টি নেই।
আর, আমাদের গর্বের বস্তু হয়ে গেছে কিছু লোকাচার ও পৌরাণিক গল্প!

হে রাসূল! তোমার উম্মতের একটি দল বীর্যবান সুপুরুষদের আওলাদ হয়েও
বাংলাদেশের সবুজ জমিনে নিরাপত্তহীনতায় কলাপাতার মতো কাঁপে আজ,
মুসলমান পরিচয় দিতে ইতিউতি তাকায়, ঈমানের কথা বলতে লজ্জায় মরে যায়
গা থেকে গেঁয়ো গন্ধ মোচনের জন্যে অঙ্গে তুলে নেয় ভিন্ সংস্কৃতির নামাবলী!
হে রাসূল ! ওদের হৃদয়ে যে পচন ধরেছে হীনমন্যতার তা ঢাকার জন্যে কেউ
অবলীলায় গায়ে চাপায় বেদাতের
আলখাল্লা।

তবু হতাশায় নয়, হে রাসূল! আশায় বেঁধেছি বুক; নতুন একটি প্রজন্ম প্রস্তুত!
আল্লাহর রহমতের পাবনে যেন নতুন পলি পড়ে এই জনপদে
জিন্দা-দ্বীনের জিন্দা-দিলের আর প্রভাতের প্রশান্তিভরা যুগ যুগবাহী জীবনের।



www.pathagar.com

## রাসূলকে ভালোবেসে ॥ জুলফিকার সাইদুল

সেদিন ধ্বসে পড়েছিলো পারস্য প্রাসাদের চৌদ্দ চূড়া,
দীপ্র আলোকে জ্বলে উঠেছিল সিরিয়ার প্রাসাদ ভবন–
সে আলো প্রাচীন মূর্তিবাদের প্রথামূলে কুঠার আঘাত
মরু দিগন্তে উদিত মরুভাস্কর।
–মা আমিনার ঘর
বিরল বাতাসে পরম হরষে খাচ্ছিল দোল,
তখন সুবিহ্ সাদিক। নূরে প্লাবিত আমিনা মাতৃক্রোড়
তন্ময় চোখে সেই আলোক হেরে নিলো আমিনা জননী
পরিতৃপ্ত হলো মাতৃক্রোড় মরু কুটীরের রূপ শোভা
জ্যোতির্মুগ্ধ নূর তরংগে তরংগিত সমুদ্র সমান
হিল্লোলিত হল সেই আলোকের বিভা। প্লাবিত পাবন
সে জ্যোতি আলিফ-হা-মিম-দাল। গর্ভ কালে আদিষ্ট স্বপনে
আমিনা জননী। রাখিলেন বিশ্বের অশ্রুত পূর্ব নাম
আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম। সে জ্যোতি
সমগ্র ধরণীতে, জাজিরা আরবে শুষ্ক-খর্জ্জুর ডালে লোহিত
সাগরের ভাসমান তরণীর পালে পালে
লেগেছিলো হাওয়ার চমক। আনন্দে উদ্বেল দোল।
জান্নাতী হুর গিলমান দুলছিলো উল্লাস উপপল্লবে
কুটীরের মাঝে ছিলেন উপবিষ্টা, ঈসা মাতা মরিয়ম
বিশ্ব মহিয়সী নারী বিবি হাজেরা খাতুন তার পার্শ্বে
ফেরাউন ভার্য্যা বিশ্ব নন্দিনী পতি ভক্তা আসিয়া খাতুন।

হাসি মুখে গাহিলেন তারা স্তবস্তূতি আগমনী গান
সেই অশ্রুত পূর্ব নাম উচ্চারিলেন পরম শ্রদ্ধায়,
জপিলেন সমস্বরে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম।
দিবা রাত্র মিলে মিশে জানালো শুকরিয়া। তিনি এলেন।



www.pathagar.com

বিশ্ব নন্দিত দুলাল। বিশ্ব চরাচরে। মা আমিনার ঘরে।

পূর্বে দেশে বসতি ইহুদী জ্যোর্তিবিদ, দেখেছিলো নভেঃ
নতুন জ্যোতিষ্ক। জ্যোতির্জ্ঞানে জ্ঞাত ছিলো; আবির্ভূত তিনি–
সেই প্রতিশ্রুত নবী।

যিনি মানুষের শোকে দু:খে হবেন
সমব্যথী। অসহায় জনে যিনি নিরাপদ আশ্রয়।
বিশ্বধামে তিনি কালাকাল চরিত্রে স্বরূপ উত্তম।
ধ্যান যোগে জ্ঞাত হয়ে সেই পূতপবিত্র প্রসিদ্ধ নাম
পূর্বেই পরম শ্রদ্ধাভরে তারা তাই পড়ে নিয়েছিলো
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম।
অতীব সংগোপনে
তারা এসেছিলো নবীতীর্থ আমিনা কুটীরে দেখিবার
সেই জ্যোর্তিময় মুখোচ্ছবি। পূর্ণিমা চাঁদ। জ্যোতির জ্যোতি
উভলোকে যিনি হবেন সকল মানুষের শাফায়াতকারী
যার সুপারিশ বিনে হেন জ্বীন-ইনসান পরিত্রাণ পাবে না
কোনো যোগ্যতা বলে সেই মানদণ্ডে বিচারের দিনে।



www.pathagar.com

## কাঁপে চাঁদ ॥ **শরীফ আবদুল গোফরান**

সময়ের আবরণে আবছায়ায় উড়ে যায়
সোনালী ডানার চিল
অনন্ত নীলের মাঝে
ঘোরলাগা গোলাপ সন্ধ্যায়
মেঘের চাদর ঠেলে উঁকি দেয়
রবিউল আউয়ালের চাঁদ

সাগরের কিণারে ডুবে যাওয়া
লাল সূর্য তখন ডুকরে কেঁদে ওঠে
কাঁদে বিশ্ব মানবতা

মজলুমের আহাজারিতে কঁকিয়ে ওঠে
কারাগারের লোহকপাট
মস্তকহীন মানুষের মিছিল
আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দে মিলিয়ে যায়
অসহায় ধর্ষিতা নারীর করুণ আর্তনাদ

তখন আকাশের বাঁকা চাঁদ লজ্জায় নুয়ে পড়ে
সাগরের ঢেউ আর আবেগপ্রবণ বাতাস
মর্সিয়া ক্রন্দনে কাঁপিয়ে তোলে।



www.pathagar.com

## রাসূলের বাণী ॥ মোঃ আমিনুল ইসলাম

রাসূলের বাণী
যতটুকু জানি
মেনে নিতে হবে এই জীবনে
সুখ পাবো জানি তাতে মরণে।

আচার আর ব্যবহার
হবে সংযত
জিহবার ব্যবহার
মুমিনের মতো
কথা যেন রাখি আমি স্মরণে।

মেহমান এলে পাবে
ভালো ব্যবহার
প্রিয় নবী দিয়েছেন
এই অধিকার
মুমিনকে চেনা যায় ধরনে।
রোদনের প্রবাহে
হবে দিল সাফ
রাসূলের পথে হবে
সব গুণাহ মাফ।



www.pathagar.com

## আসহাবে সুফফার দুধের বাটি ॥ **মনসুর আজিজ**

তোমার হাসির বর্ণচ্ছটা ছিলো বৃষ্টির ফেনার মতো সাদা
দৃষ্টির হীরক জ্যোতি ভরে দিতো আসহাবে সুফফার দুধের পেয়ালা
তৃপ্তির বাটি ঘুরে ঘুরে বিলাতো জ্ঞানের দ্যুতি
নম্রতায় খুলে যেত হিকমার বন্ধ দুয়ার
পিপাসায় অপূর্ণ ছিলো ইলমের কলস
তোমার ঠোঁটের কম্পনে উৎকর্ণ হতো সুফফার দল
চোখের সান্নিধ্য পেয়ে জ্ঞানের সাইমুম উঠতো মনে
মরুময় প্রতিটি হৃদয়ে জেগে উঠতো ওয়েসিস
দুলে উঠতো খেজুরের নাবালেগ পাতা
আলোকিত ইলমের খোর্মা ছড়াতো পৃথিবীর দশদিকে

আসহাবে সুফফাকে সাজিয়ে রেখেছি সুদৃশ্য কিতাবের তাকে
তোমার অহিংস দৃষ্টির পারদ নেমে গেছে খাদে
আমার হাসিতে এসিড বৃষ্টি
ধারালো দাঁতের হাসিতে জেগে ওঠে শয়তান
কিশোর বিশরের মাথায় ছিলো আপনার সমৃদ্ধির ছায়াদার নরম হাত
আমার বিষাক্ত হাত প্রসারিত হয় মানুষের কল্লা কেড়ে নিতে

প্রিয় রাসূল, আমার বিবর্ণ মুখের কাছে আপনি ধরুন
আসহাবে সুফফার দুধের বাটি
আমি একটু বৃষ্টির ফেনার মতো প্রশান্তিময় হাসি
ছড়িয়ে দিতে চাই অশান্ত পৃথিবীতে।



www.pathagar.com

## তুমি আসতেই ॥ শহীদ সিরাজী

এক অদ্ভুত মমত্ববোধ তোমার দু'চোখে
তাবৎ দুনিয়ার চোখ খুলে দিলে তুমি
সেই বুড়ির ছড়ানো কাঁটা খুলে গেল চোখ
হিন্দার হৃদয় পেলো নতুন জীবন।

চোখের ধুলোতে চোখ ঘুমঘুম রাত
সওর গুহার মুখে মাকড়শা জাল নিপুণ শিল্পী হলো
কবুতর বাসা হলো এক লহমায়
সুরাকার পদছাপ বালির জমিনে হলো বাঁক ফেরা বাঁক।

তোমার দু'চোখের ভাষা পড়ে সেই উন্মুক্ত তরবারি
হারালো যে ভাষা
তার নাম ভালবাসা
তায়েফের প্রান্তরে রক্তাক্ত ঘাম দেখলো পৃথিবী
তার নাম ক্ষমা

তুমি আসতেই ইয়াসরিব হলো আলোকিত
হলো মদিনাতুন্নবী, নগরীর চাবি পেলে হাতে
এক আবেগঘন আবহে
অবনত হলো নগরীর যত নেতা, হলে প্রিয়তম সকলের
তুমি আসতেই লেখা হলো মদিনা সনদ।



www.pathagar.com

## সালাম হে রাসূল [সা] ॥ আলতাফ হোসাইন রানা

রাসূল আমার প্রিয় রাসূল [সা]
মহান এক, আল্লাহ্ মহান
ভালোবাসি রাসূল তোমায়
ভালোবাসি সারা জাহান ।

যুগে যুগে আসলো ধরায়
আদম-মূসা-ঈসা [আ]
সবার শেষে তুমি হলে
মানব জাতির দিশা ।

ধরার বুকে এলে তুমি
হয়ে রহমতের দান
তোমার উপর নাযিল হলো
মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

দূর করেছো পাপ-পঙ্কিল
সকল কালিমা রাশি
আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে
আনলে ধরায় হাসি।



www.pathagar.com

## জীবনে সীরাত ॥ নাজমা ফেরদৌসী

ঝঞ্ঝারাত ভীতির অন্ধকার লেবাসে সবকিছু ঢেকে দিলে
মানুষের মনে-প্রাণে আকুতি ঝরে,
আলো চাই
বিজলির ক্ষণিক প্রভা নয়, প্রভাতের নিভাঁজ আলো চাই
আঁধার নয়.আলো চাই
আলো চাই, জীবনে কেবলই ভালো চাই
মানবতার কান্নায় শুধু ভালোর আকুতি,
প্রভাতের প্রভা চাই হৃদয়ে সঘন প্রতীতি

আঁধার গহীন গুহার আবর্ত থেকে মাথা তুলবার সাহস চাই
বুকভরা সাহসে সেই আলোর উৎস খুলেছিলেন তিনিই
হেদায়েতের আলোকধারা প্রভাতের প্রভা নিয়ে আসে
মাথা তুলেছিল রাখাল বালক এবং ক্রীতদাস সমাজও;
দেড় হাজার বছর গত হলো তবু অনন্য সে আলো
মানবাধিকার মানবাধিকার চিৎকার এখন প্রয়োজন নেই আর

পশুত্ব বিদায় নিয়ে হারাবে নিজ নিয়মে
গহীন আঁধারে কেবল তাঁর সেই আলোর প্রভা নিয়ে আমাদের
দাঁড়িয়ে যেতে হবে সাহসিকতায়
সে আলোয় প্রতিবিম্বিত
এক টুকরো আলো জ্বালাবার ঝুঁকিটুকু নিতে হবে পরম মমতায়।

তার আগে দেখে নেই কিভাবে মহানবী [সা]
বর্বর অন্ধকারের সময়কে আলোকিত করে এনেছেন এক নতুন প্রভাত
তাঁর সেই আলো মেখে এসো প্রত্যয়ী কথা বলি
আঁধারের ছায়া মুছে সাহসের দিন আনি হাতে রেখে হাত
আমাদের সবুজ জনপদ জুড়ে কুরআনের শব্দে বর্ণে সমীরণ ছন্দে
জন থেকে জনে জীবনে জীবনে জাগুক সীরাত।



www.pathagar.com

## এসেছেন সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ ॥ হোসেন মাহমুদ

চরাচর ঢেকে ফেলেছে অশুভ কালো ছায়া
চোখের তারায় নিভে গেছে আলোর নাচন
কার কাছে গিয়ে কে পাতে সাহায্যের হাত
সব মুঠিতেই জমে আছে খর ধুলো বালি।

আকাশের নক্ষত্র আর কোন সান্ত্বনা নয়
বুকের ভেতর শুধু দু:খের করুণ রোদন
নিভে গেছে কখন শেষ মোমবাতির শিখা
আহত ঘোড়ার মত যন্ত্রণায় কাঁদে বাতাস।

আত্মার অদম্য আকুতি খোঁজে চির সত্য
মরুভূমির বালি তা চালান করেছে উদরে
খেজুরের চিরল পাতায় ক্ষীণ প্রাণের চিহ্ন
পৃথিবী অপেক্ষা করে কারো পদশব্দের।

এবং কালের অমোঘ বিউগল বেজে ওঠে
একটি আশ্চর্য ভোর নেমে আসে জনপদে
সমগ্র বিশ্ব জেনে যায় এসেছেন সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ
আবার হেসে ওঠে শৃঙ্খলিত সত্য-সুন্দর।



www.pathagar.com

## তুমি যদি আবার আসিতে! ॥ **রফিকুল ইসলাম ফারুকী**

আমার জীবন জুড়ে যত দু:খ তাপ–যত হাহাকার আছে
তার সবটুকু বিলীন করেছি তোমার শাশ্বত প্রেমবাগে
তোমাকেই শুধু ভালোবাসা দেয়া যায় সুগভীর অনুরাগে
ঠাঁই দাও এ অধম কবিকে এবার–নবীজি তোমার কাছে;

পৃথিবীর অশান্ত জমিনে আর কাউকেই দেখি না এমন
যেমন তোমার মতন বিশ্বস্ত আছে ধরাতলে খাঁটি প্রাণ
যার নামে লিখা যায় লাখো চিরায়ত প্রেম ভাসানোর গান
যে গান সহসা সুধাময় করে তোলে হতাশার এ জীবন;

হে রাসূল, তোমাকেই নিয়ে লিখে যাবো শুধু কবিতার ডালি
হৃদয় উজাড় করে দেবো প্রেম-তবু শাফায়াত চাই প্রাণে
দেখা দিও কঠিন হাশরে বিচার আসরে, থাকো যেইখানে
তোমার নামেই দূর করেছি আজ জীবনের শত চোরাবালি;

তুমি যদি আবার আসতে হে রাসূল–গোলাম হতো এ কবি,
তোমার কদম মুবারক ছুঁয়ে ছুঁয়ে-দু:খ পোহাতাম সবি।



www.pathagar.com

## তোমার প্রতি ভালোবাসা ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল

তায়েফের পাথরের আঘাতগুলো বসন্তের কালচে দাগের
মত সারা শরীরে সাক্ষী হয়ে আছে।
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
        আমরা হায়েনার মত হতাম না।
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
        আমাদের অশান্তি হত না।
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
ইলমে গায়েব নিয়ে বিভ্রান্তি হতো না।
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
ওয়াছে কুরুনীর মত আশেক হতো।
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
হেরা গুহায় মাকড়সার জাল তে
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
বেলালের মত ঈমানের পরীক্ষা দিত।
তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকলে
হামজার মত আকাশে গোসল দিত।



www.pathagar.com

## এতিম নবী ॥ **ইসমাইল হোসেন মুফিজী**

এতিম হয়ে দয়ার নবী আসলেন এ দুনিয়ায়
তাইত এতিম শিশুগুলোর বক্ষ ভরে আশায়।

নবীর উটনী গেলো মদিনায়
বসলো সেদিন যেথায়
মাসজিদ নির্মাণ হবে
বললো সবাই সেথায়
জমির মালিক দু'জন এতিমের মূল্য করেন আদায়।

নবী ঈদের নামায শেষে
দেখেন ঈদের কোণে বসে
একজন এতিম কাঁদে
চোখের জলে ভেসে
পুত্র বলে নিলেন কোলে রাখলেন মা আয়শার ছায়ায়।

নবী বলেন উম্মতে
দাও গো এতিমের হক
প্রেম ও মুহাব্বাতে
দিলেন তিনি ছবক :
এতিম বলে গলা ধরে ফেলো না অবহেলায়।



www.pathagar.com

## সব প্রার্থনায় ॥ **মমতাজ মহল মুক্তা**

হৃদয়ের নকশি কাঁথায়
কে তোমার নাম লিখে রাখে
লাল নীল বাহারি সুতোয়
সুনিপুণ সূঁচের ফোঁড়ে
অনুপম তোমাকে করে
নিশিদিন ভালোবেসে
কবিতার গোলাপ ফোটায় ?

আমি সেই বিমুগ্ধ কবি
মনের দেয়ালে আঁকি
জলরঙা ছবি
আমার অস্তিত্ব জুড়ে আছ
আছ তুমি সব প্রার্থনায়।

## বিশ্বনবী ॥ **মো: হারুনুর রশিদ**

বিশ্ব নবী ধ্যানের ছবি
জগৎ প্রতিনিধি
আসলো নিয়ে শান্তি সুখের
নতুন গতিবিধি।
জাগলো তাতে সর্বহারা
শক্তি পেলো ঢের,
উঠলো দুলে বায়ুর সনে
নিশান তৌহিদের।



www.pathagar.com

## নব দিগন্ত॥ **মোহাম্মদ আবু ইউসুফ**

আকাশে সূর্য দীপ্তিমান বায়ু মণ্ডল সক্রিয়
তবুও যেন অন্ধকারের অতল গভীরে
নিমজ্জিত হয়ে আছে পৃথিবী।
মানুষের কোলাহল, পাখিদের কিচির মিচির
বন বাদড়ের হায়নাগুলোর জীবন চক্র থেমে নেই,
তবুও যেন জীব-যান অচল।
তবে কি পৃথিবী অন্য কোন গ্রহে অবস্থান নিয়েছে
না কি অন্য কোন কিছুর আলামত, নাকি অদৃশ্যের ইশারা!
হে রাসূল আমার
সত্যের বাহক আপনি,
আপনিই আমাদের পথ দেখান।

## এখনই সময় ॥ **কাজী তাবাস্সুম**

হে নবী তোমার সকল শিক্ষা
ঘরে ঘরে আছে তবু
সে বাণী পড়ার জানার মানার
সময় হয় না কভু।

ভুলে সেই বাণী ভুল পথে চলে
হচ্ছে ক্ষতি নিতি
তুবও আমরা ফিরিনা সে পথে
ছাড়ি নাকো দূর্নীতি।

তোমার শিক্ষা মানায় যে আছে
শান্তি সর্বময়
মাথা উঁচু করে সে কথা বলার
এখনই সঠিক সময়!



www.pathagar.com

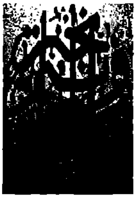

# শান্তির দিশারী রাহমাতুল্লিল আলামিন

**শহিদুল ইসলাম**

মহাবিশ্ব এক মহাবিস্ময়। নিখিল এ ধরণীর অপরূপ সৌন্দর্য এবং কলাকৌশল দেখে মানুষের মনে সহজাত প্রশ্ন জাগে, এটা কি এমনিতেই হল? না এর পিছনে কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে? জগৎ কি মানুষের তৈরি মরণাস্ত্রের সাহায্যে ধ্বংস হবে না মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে। দুনিয়ার জীবনই কি একমাত্র জীবন, না জীবন ও জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবার পর অবশিষ্ট কিছু থাকবে? প্রভৃতি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরদানের চেষ্টায় দার্শনিকদের বাগ-বিতণ্ডায় শতাব্দির পর শতাব্দি কেটে গেছে কিন্তু মানুষ একমতে আসতে পারেনি। আসলে মহাপরিকল্পনাকারী মানুষ সৃষ্টির পর মানুষের এ সহজাত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এবং তাদের শান্তিতে বসবাস করার জন্য শান্তির শাস্ত্র পাঠিয়েছেন। আর এ মহাশাস্ত্রের ধারক-বাহক হলেন নবী-রাসূলগণ। তিনি মানুষের ভেতর উপযুক্ত ব্যক্তিকে বার্তাবাহক হিসাবে নির্বাচন করেন। নবুয়াতের ক্রমধারায় মানুষের পরিচয় এবং দুনিয়ার বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাকে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ করে পাঠানো হয়েছে তিনি হলেন রহমাতুল্লিল আলামিন, সর্দারে কায়েনাত, মরুর বুকে আরবি ভাষী হযরত মুহাম্মদ [সা]। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত প্রাপ্তির পর তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব একত্ববাদ ও নিজের নবুয়তের কথা ঘোষণা করলেন। তারপর অবতীর্ণ আয়াতগুলো মুখস্ত করার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে তাড়াহুড়া শুরু করলেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আপনার এত তাড়াহুড়া করার কোন কারণ নেই, আমি আল্লাহ এগুলো আপনার দিলে গেঁথে দেওয়ার ব্যবস্থা নিলাম।" বিশ্ব জুড়ে যার পাঠশালা আর স্বয়ং আল্লাহ যার শিক্ষক তার জানতে কি কিছু বাদ থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী, জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেয়ে তারা সৃষ্টির রহস্য এবং বস্তুর স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই দেখতে পাই দর্শন আকাশের চিরভাস্য দার্শনিক সক্রেটিস তার জ্ঞান সম্পর্কে বলেন, "I know a thing that I know nothing." পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, "আমি জ্ঞান সমুদ্রের বালুকণার বেলায় দাঁড়িয়ে শামুক-ঝিনুক নিয়ে খেলা করছি এখনও অথৈ সমুদ্র অজানা রয়ে গেল"। আসলে মানুষকে অপূর্ণ



www.pathagar.com

Imperfect করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু সে জানতে পারে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক বলেন, "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী পরন্তু তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না তার মনোনীত রাসূল ব্যতিত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন" [সূরা জীন, আয়াত ২৬, ২৭]। যেহেতু মুহাম্মদের [সা] স্বয়ং শিক্ষক হলেন আল্লাহ এবং সারা জাহান যার পাঠশালা সেহেতু তার আর কিছু জানতে বাকি থাকার কথা নয়। তাই তিনিই বলতে পারেন, "আমি হলাম জ্ঞানের শহর, আর হযরত আলী হল তার দরজা স্বরূপ"। সক্রেটিস বলেছেন, "know thyself" অর্থাৎ নিজেকে জানো। কিন্তু হযরত আলী বলেছেন, "যে নিজেকে জানতে পেরেছে সে তার সত্তাকে জানতে পেরেছে"। স্বয়ং আল্লাহ যেহেতু মুহাম্মদ [সা] এর শিক্ষক সেহেতু নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, নীতি বিজ্ঞানী, আইনবিদ, সমাজ সংস্কারক হওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব। "Necessity is the father of invention" মানুষের প্রয়োজনে মানুষ আবিষ্কার করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মানবতা এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে এই মানুষ আবার পশুত্বের কারণে নিকৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম হয়ে যেতে পারে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের এ রকম করুণ দুর্দশা যাতে না হয় তার জন্য আল্লাহ পথহারা মানুষের দিশারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশনা। তাইতো আমরা দেখতে পাই মুহাম্মদ [সা] অসভ্য বর্বর জাহিলিয়াতার যুগের মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তিনি সকল জীবের, সকল ভাষার, সকল দেশের মানুষের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তাই আল্লাহ বলেন, "নবী হে! আপনাকে তামাম সৃষ্টির জন্য রহমতের মূর্ত প্রতীক [রহমাতুল্লিল আলামীন] হিসাবে পাঠিয়েছি"। তিনি যে সমাজ চিন্তা উপহার দিয়েছেন তা মানব সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বের মানুষ আজ শান্তি চায় কিন্তু কোন পথে শান্তি আসবে? পৃথিবীতে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন মতাদর্শ আছে যেমন-পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ইসলাম প্রভৃতি। পুঁজিবাদ ব্যক্তি মালিকানাকে সীমাহীনভাবে গুরুত্ব দেয়। যার কারণে পুঁজিবাদ সবশেষে গিয়ে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানাকে একেবারে বিদায় জানায়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে প্রধান্য দেয়। ব্যক্তি নিজে কাজ করবে সীমাহীন কিন্তু পাবে প্রয়োজন মত। কিন্তু সমাজতন্ত্র যে মতাদর্শ প্রদান করে তাতে ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা হয়। মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর। ব্যক্তিস্বার্থ না থাকলে সমষ্টি স্বার্থ প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে? কারণ মানুষ দেবতাও নয় আবার পশুও নয়। সে সামাজিক জীব। তার যেমন আছে খারাপ দিক তেমন আছে মানবতার দিক। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের মনুষত্বকে যেভাবে জাগিয়ে তোলা যায় এবং পশুত্বকে যেভাবে দমিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে টেক্সবুক বোর্ডের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। কারণ একজন মানুষ যদি শিক্ষা পেয়ে আচরণের পরিবর্তন করতে না পারলো, তার সুপ্রবৃত্তিকে না পরিস্ফুটন করতে পারলো তাহলে তার জ্ঞান চর্চার কোন সার্থকতা নেই। তাই শিক্ষা



www.pathagar.com

ব্যবস্থায় মানুষের মননশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে মানবমনকে বিকশিত করতে হবে। ইসলামে এমন অর্থব্যবস্থা আছে যেখানে ব্যক্তি বিকাশের সাথে সাথে আছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার দিক। সম্পদকে খাঁটি করার স্বার্থে এবং মানবতাকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আছে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি। যেখানে জবাবদিহীতা নেই সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তাহলে আমাদের প্রকাশনার দিক দিয়ে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মারদাঙ্গা ও অশ্লীল প্রকাশনা এবং মানহানিকর কিছু প্রকাশনার জগতে যেন প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ইসলামে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং তার উপর প্রত্যাবর্তন করার উপর কঠিন জবাবদিহীতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানবতার এমন কোন অন্ধকার কোণ নাই যেখানে ইসলামের জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটেনি। রিজিকের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। তিনি বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। একটি পাখি সকালে নীড় ছেড়ে সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরেছে, অথবা সমুদ্রের জলজ প্রাণী  এমন কি প্রকাণ্ড নীল তিমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা গিয়ে তীরে ভেসে ওঠেছে এমন ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি। মানুষ স্বভাবত সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীব। বর্তমান বিশ্ব চালিত হচ্ছে রাজনীতি দ্বারা। এ রাজনীতি কি ধর্ম ছাড়া হবে। ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হলে কি হবে? এ বিষয় নিয়ে আল্লামা ইকবাল বলেন, ধর্ম থেকে যদি রাজনীতিকে পৃথক করা হয় তাহলে চেঙ্গিসী বর্বরতা অবশিষ্ট থাকে। ইসলামে সকলের অধিকার, নিশ্চিত করা হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, শ্রমিক, দাস-দাসীসহ সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আজ নারী মিডিয়ায় ফ্যাশান ও মডেলের নামে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাতে তারা ভোগের জীব হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। পশ্চিমা সমাজে যারা নারী অধিকার বিষয়ে সোচ্চার তাদের ভিতর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কথা ধরা যাক, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪৫ সেকেন্ড অন্তর একজন করে নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। ব্রিটেনে প্রতি বিশজনে একজন নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে ৫০% নারী তাদের সহকর্মীদের নিকট যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। তাদের সমাজে পারিবারিক ভাঙন এবং ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইসলামে নারীকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এবং ধর্ষণকারীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে সামান্যতম ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর এই কঠোর সামাজিক অনুশাসন শান্তির পূর্বশর্ত।

ইসলামে বিভিন্ন বিশ্বাস আছে। আর এ সমস্ত বিশ্বাস কোনো লৌকিক বা অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নয়। এটা ধর্ম তাত্ত্বিক চিন্তা অথবা ভয়-ভীতি থেকে উদ্ভুত মানসিক অবস্থা নয়। ভাগ্যের প্রতি তথা তকদীরে বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। তকদীর সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস এর তথ্য উপাত্ত হলোঃ মানব জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে পুং শুক্রানু ও স্ত্রী ডিম্বানু মিলিত হয়। পুং শুক্রানু এর অশ্লীল ক্রমোজমের সিম্বল xy। স্ত্রী ক্রমোজমের সিম্বল xx। এই মিলনের ফলে যে জাইগোট তৈরি হয় তার ভেতর DNA [Deoxyribo Nucleic Acid, RNA (Ribo Nucleic



www.pathagar.com

Acid] থাকে। এ জাইগোট ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয়। কোষের শক্তি ঘরকে বলা হয় মাইক্রকনড্রিয়া। কোষের যাবতীয় জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে প্লাজম মেমব্রেন। কোষের ভেতরে থাকে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিউপ্লাজম। কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিভিন্ন জড় বস্তুকে বলা হয় অর্গানাস্টিক পদার্থ। আর এ তরল অংশকে বলা হয় হায়ালোপ্লাজম। এ কোষটির অতি সূক্ষ্ম আঠালো পদার্থকে বিজ্ঞানী হকিংস বলেন, এটা এত ক্ষুদ্র যে, একটি বালিকণার কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। আর এটা এত আঠালো যে, পৃথিবী থেকে যদি চন্দ্রেও নিয়ে যাওয়া হয় তবুও এর সম্প্রসারণ শেষ হবে না। এই ক্ষুদ্র আঠালো পদার্থের ভেতর গাণিতিকভাবে মানুষের ভাগ্য লেখা আছে যা মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব। কে কি করবে, কি খাবে, কোথায় মরণ হবে, তার পরিণতি কি হবে ইত্যাদি বিষয়। বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ তম সমাবর্তন ২০০১ অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর ভাষণে ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। স্টিফেন হকিংসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "জীব ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হিউম্যান জেমস প্রকল্প সার্থকভাবে শেষ হয়েছে। ৩০০ কোটি ডিএনএন বেইজ পেয়ারর্স এর মাধ্যমে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল কর্মকাণ্ড তার চিন্তা হোক অথবা তার শারীরিক অবকাঠামো, রোগ সংবেদনশীলতা, জীবন কিংবা মৃত্যু সম্ভাবনাই হোক সংকেত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে।"

আসলে ইসলাম বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা। অন্য কোনো মতে, অন্য কোনো পথে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই যা নাজিল হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] এর ওপরে। এই মহানবী এবং মহাজ্ঞানী ৫৭০ সালের ১২ রবিউল আউয়াল মরুর বুকে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ [সা] এর মর্যাদা আল্লার কাছে অনেক বেশি। পূর্বের নবীরা পর্যন্ত তার উম্মত হওয়ার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছেন। আমরা তার উম্মত হতে পেরে গর্বিত। এই বিশ্বে নবীর আগমন গোটা সৃষ্টির খুশির সংবাদ। হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ [সা]কে দান করা সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং বেহেস্তের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। আর আমাদেরকে তার সান্নিধ্য লাভ করার তৌফিক দান কর।



www.pathagar.com

# মুহাম্মদ [সা]-এর আগমন ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন

**গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী**

মুহাম্মদ [সা]-এর আগমন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 'হে আহলে কিতাবগণ, রাসূলদের আগমন ধারার ওপরই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে আমার কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে করে তোমরা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একথা বলতে না পারো যে, কোথায়, আমাদের কাছে তো জান্নাতের সুসংবাদদাতা আর জাহান্নামের সতর্ককারী হিসাবে কেউ আসেনি, আজ তো সত্যি সত্যিই তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী একজন রাসূল এসে গেছেন, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [সূরা মায়দো-৫/১৯]।

**মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আগমন :** আমরা জানি রাসূল [সা] আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে পৃথিবীতে আগমন করেন। সে সময়ের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ পেশ করলে সুবিবেচক পাঠকগণের পুর্বাপর জ্ঞানকে শানিত করতে সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

হযরত নূহ [আ]-এর জাতির ধ্বংসের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর জাতির লোকেরা নূহ [আ]-কে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছিল। হযরত নূহ [আ] আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আত্মরক্ষার্থে নৌকায় চড়ে বেঁচেছিলেন। হযরত হূদ [আ]-এর সময় আদ জাতি ধন-সম্পদে প্রাচুর্যশীল ও শক্তিশালী ছিল। তারা হযরত হুদ [আ]-কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছে। বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে। হযরত সালেহ [আ]-এর সময় সামুদ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা সুরম্য প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বিশাল ঘর-বাড়ি তৈরীর কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারা প্রাচুর্যের অহংকারে তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে মিথ্যাবাদী বলে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হলে, আল্লাহ তায়ালার গযবের ভয়ে হযরত সালেহ [আ] তাঁর এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। হযরত লুত [আ]-এর জাতির লোকেরা প্রকাশ্যে



www.pathagar.com

সমকামীতা ও জিনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের নবীর কোনো কথাই মানতে রাজি ছিল না। এমনকি তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত ফেরেশতারাও নিরাপদ ছিল না। তারা লূত [আ]কে মিথ্যাবাদী বলে সম্পূর্ণ রূপেই আল্লাহতায়ালার অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবরাহিম [আ] ছিলেন আল্লাহতায়ালার নবী। নমরূদ ও তার লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। বিভিন্নভাবে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে মারার চেষ্টা করেছিল। হযরত ইউসুফ [আ]কে বাল্যকালে তাঁর দুষ্ট প্রকৃতির ভাইয়েরা গভীর অরণ্যে কূপে ফেলে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যৌবনে তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন মিসর অধিপতির স্ত্রীর [জুলেখা] যৌনাচারের অপবাদে কারাবরণ করতে হয়েছিল। হযরত শোয়ায়ব [আ] ছিলেন মাদইয়ানবাসী ও আছহাবে আইকাব এর নবী। ঐ জাতি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তারা মানুষকে ঠকাত। ওজন ও মাপে কম দিত। তারা আল্লাহতায়ালার অবাধ্য ছিল। তারা শোয়ায়েব [আ]কে নবী মানার পরিবর্তে তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করেছিল।

হযরত মূসা [আ]-কে মিথ্যা 'রব' এর দাবিদার ফেরাউন ও তার লোকরো যাদুকর, মিথ্যাবাদী ও ক্ষমতালোভী বলে অপবাদ দিয়েছিল। ফেরাউন হযরত মুসা [আ] ও তাঁর অনুসারীদরেকে নীল নদে ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করেছিল। এমনিভাবে অনেক পীড়া দিয়েছেন হযরত দাউদ [আ], হযরত ইউনুস [আ], হযরত ইদরিছ [আ] ও হযরত আইয়ূব [আ]। আল্লাহর দ্বীনরে শত্রুরা জেনেবুঝে হযরত সোলায়মান [আ]কে যাদুকর বলে অপবাদ দিয়ে তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করেছিল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা ব্যাবিলনে হারুত ও মারুত নামে দু'জন ফেরেশতা দিয়েও ঐ জাতিকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন। হযরত জাকারিয়া [আ]কে গাছের সাথে বেঁধে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। হযরত ইয়াহইয়া [আ] আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার অপরাধে ইহুদি শাসক হিরোদ এন্টিপাস প্রথমে তাঁকে জেলে পাঠায়, অত:পর তাঁর শিরচ্ছেদ করে হিরোদের নর্তকী কন্যাকে খণ্ডিত শির উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিল।

হযরত মূসা [আ]-এর মৃত্যুর পর স্বঘোষিত ইহুদি সমাজের মুর্খ ও ধর্মজ্ঞানহীন সাধারণ জনগণ সে সময়ের আহবার ও রূহবারদের দ্বারা ধর্মের নামে সীমাহীন শাসন ও শোষনে ছিল জর্জরিত। যারা আহবার বা রূহবার হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করতো তারা সমাজের লোকদেরকে আসমানী কিতাবের তথা তাওরাতের জ্ঞানসহ সকল প্রকার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। আহবার [বিজ্ঞ, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, ইহুদি পণ্ডিত বা কালি] ও রূহবারগণ [ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু, পাদ্রী বা পুরোহিত] সাধারণ মানুষের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নিত। সাধারণ লোকদেরকে কাজে খাঁটিয়ে তাদের মজুরী দিত না বা দিলেও সামান্য দিত। এমনি আরো অনেকভাবে সাধারণ মানুষেক তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসন, শোষণ ও নির্যাতন করত। অর্থাৎ আহবার ও রূহবারগণ ধর্মকে তাদের ব্যবসায়ের পুঁজি ও সাধারণ মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার হাতিয়ার বা কৌশল বানিয়ে নিয়েছিল।



www.pathagar.com

এমনি অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। খ্রিস্টপূর্ব ৭৩৮ অব্দে আসুরিয়ার শতধা বিভক্ত স্বঘোষিত ইহুদিদের পদানত করে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে ঐ সকল অঞ্চলের লোকদের অজ্ঞতা, মূর্খতা আর ধর্মীয় জ্ঞানহীনতাকে পুঁজি করে লোকদেরকে ঐ সমাজের আহবার ও রূহবার অর্থাৎ যারা ধর্মের কথা বলে তাদের কথা মানতে নিরুৎসাহিত করতে শুরু করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলিয়নরা ফিলিস্তিন দখল করে তাদেরকে ২০০ বৎসর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখে। এ সময় তাদেরকে সকল প্রকার ধর্মচর্চা থেকে বিরত রাখে। তারপর ইহুদিরা পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। তখন তারা ধর্মচর্চা কি তা সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

অতপর খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ থেকে ৩২৩ অব্দ পর্যন্ত তারা গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের অধীনে চলে যায়। পরবর্তীতে তারা মিসরীয় টলেমী শাসনাধীন ও পরে গ্রীক রাজবংশ স্কুডিয়ার অধীনে চলে যায়। এভাবে চলতে চলতে খ্রিষ্টপূর্ব ১১৪ অব্দে লোকেরা সম্পূর্ণ ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। তারা দেব-দেবী, ভূত, পেতনী, পীর, ডাইনী এমনকি তারা সে সময়ের বীরদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে শুরু করে। পূজা অনুষ্ঠানে মোমবাতি, আতশবাজি, মদ, জুয়া, পাশা খেলা, নাচ, গান, আনন্দ ফুর্তি করত। সে সময়ে যারা অপরাধ করত তাদের শাস্তি ছিল মন্দিরের খাঁচায় আবদ্ধ বাঘ বা সিংহকে আহার করতে দিত সকল অপরাধীকে।

প্লেটো ও এরিস্টটলের দেশ গ্রীক সমাজে শিশু হত্যার ব্যাপক প্রচলন ও বৈধ ছিল। তখন প্রায় সকলেই অনাচার-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার, ভোগ-বিলাস, আনন্দ-ফুর্তি আর বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এমনি সময়ে হযরত ঈসা [আ] দুনিয়ায় আগমন করেন। হযরত ঈসা [আ] আল্লাহর একত্ববাদের দীক্ষা দিতেন। বস্তুবাদের পরিবর্তে আখিরাতে নাজাতের জন্যে আমলের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, দুনিয়ায় সম্পদ জমা রেখো না, কীট-পতঙ্গ খেয়ে ফেলবে, জং ধরে নষ্ট হয়ে যাবে, চোর ওঁৎ পেতে থাকবে, চুরি করে নিয়ে যাবে। ঈসা [আ]-এর এ ধরনের দাওয়াত ও দীক্ষা ঐ জনপদের লোকেরা আর আহবার ও রূহবারগণ মেনে নিতে পারেনি। তাই ঐ সকল আহবার ও রূহবারগণই হযরত ঈসা [আ]-এর নবুয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল যে, তাঁকে ধর্ম প্রচারের সুযোগ দিলে সে সমস্ত লোকজনকে বিভ্রান্ত করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদ্রোহ ঘটাবে। ফলে ধর্ম ও রাজ্য উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহীকে শূলে চড়াতে হবে। এমনি দাবির মুখে বেথেলহ্যামের গর্ভনর পন্টিয়াছ পিলটে বা পিলাটুস তাঁকে শূলে চড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল। ঈসা [আ]-এর উর্ধাগমনের অল্প সময়ের ব্যবধানে লোকজন খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। রোম সম্রাট সেকুলারিষ্ট নিরো ধর্মীয় উত্থান ঠেকাতে ও তার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে মিথ্যা অজুহাতে হাজার হাজার খ্রিষ্টান নর-নারীকে গ্রেফতার করে শূলে চড়ায় ও বাঘ এবং সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করে আর পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করেছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দে তিতুসের নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসসহ আশেপাশের এলাকা



www.pathagar.com

থেকে ৯৭ হাজার খ্রিষ্টানকে বন্দী করে দাস-দাসী করা হয়। ১১ হাজার খ্রিষ্টানকে অনাহারে ও নিরোর সৈন্যদের তরবারি প্রশিক্ষণের শিকারে পরিণত করে হত্যা করা হয়েছিল।

হযরত ঈসা [আ] এর পরবর্তী সময়ে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আগমনের পূর্বে লোকদের মধ্যে কোনো প্রকার ধর্মজ্ঞান বা ধর্মচর্চা না থাকার কারণে বিশেষ করে মিসর, গ্রীক, রোম, ইরান, পারস্য ও আরব উপসাগরীয় এলাকাসহ আরো বেশ কিছু জনপদের সকল লোকজনই গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল। এমনি এক গোমরাহি, অসভ্যতা ও বর্বরতার যুগ, যে যুগকে পৃথিবীর ইতিহাসে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যে সময়ে আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। উলঙ্গ হয়ে নারী-পুরুষ এক সাথে কাবা ঘর তওয়াফ করত।

ভারতবর্ষের মহারাজ অশোক এবং রাজা কনিষ্কের যুগের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়ে যায়। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের কথা তখন কেউ আর মনে রাখেনি। বৌদ্ধ রাজের কোনো অস্তিত্ব তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। বৈদিক ধর্মের কোনো নির্দশন তখন আর পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধের নামে যারা ভক্তিতে গদগদ তাদের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, রাজত্বের মোহ, ভোগ বিলাসের স্পৃহা ও বিশ্বাসের দুর্বলতা বা নৈতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে তারা যে কোনো লজ্জাস্কর কাজে দ্বিধা করত না। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারীরা গাছপালা তরুলতা এমন কি জড় পদার্থের সামনে মাথা নত করতে দ্বিধা করত না। ইরানের জনপদ শাহানশাহী জুলুমের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য তখন শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আইন-কানুনকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হতো। আরব ছিল নৈতিকতা বির্গিহত ও শান্তি বিনষ্টকারী কার্যকলাপের অভয়ারণ্য। সেখানকার অধিবাসীরা জীবজন্তুরও অধম জীনবযাপন করত। মোট কথা, পৃথিবীর কোথাও মানবীয় মহত্ত্ব ও গুণাবলী বা শান্তির কোনো পরিবেশ ছিল না। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে এক শোকার্ত করুণ অবস্থা বিরাজ করছিল। ঐ সকল জনপদের অধিবাসীরা যেন সৃষ্টিকর্তার নিকট ফরিয়াদ করছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এই জালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে তুমি আমাদের সরিয়ে নাও অথবা তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন উত্তম সাহায্যকারী বন্ধু পাঠাও'। [সূরা আন নিসা-৭৫]

এমন অবস্থায় অন্ধকার বিশ্বে ভারতবাসীর কর্তব্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের অমিয় বাণী স্মরণ করা যাতে তিনি বলেছেন, 'হে অর্জুন ! যখন ধর্মের হানি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায় তখন আমি পূণ্যবানদের রক্ষা করি এবং পাপের বিনাশ সাধন করে ধর্মকে কায়েম রাখি'। ইরানবাসীর কর্তব্য ছিল জরথ্রুষ্টের বাণী অনুসারে পথ প্রদর্শকের অনুসন্ধান করা। ইহুদিদের প্রয়োজন ছিল ফারাণের পর্বতশীর্ষ থেকে আলো বিকিরণের অপেক্ষা করা। আর খ্রিস্টানদের কর্তব্য ছিল হযরত ইব্রাহীম [আ]-এর দোয়া ও হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম [আ]-এর সু-সমাচারকে আশা-ভরসার কেন্দ্র বানানো। কিন্তু বিশ্বজোড়া ফিতনা-ফাসাদ ও যুগের অন্ধকার মানুষের বিবেককে এমনই অন্ধকার আচ্ছন্ন করে



www.pathagar.com

রেখেছিল যেন হুশ-জ্ঞান বা বিবেক বিবেচনা বলতে বা ন্যায়-অন্যায় এর কোনো হিতাহিত জ্ঞান কারো মধ্যে ছিল না। এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু উম্মূল-ক্বোরা বা মক্কা নগরীতে, হারাম শরীফের পাশে, হাজরে আসওয়াদের বরাবর সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, রাহমাতুলল্লিল আলামীন মুহাম্মদ [সা] ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দিন ঊষালগ্নে পৃথিবীতে আগমন করেন।

এমনই এক অন্ধকার যুগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর মুক্তির জন্যে পাঠালেন। 'মুহাম্মদ [সা]-এর পাঠানোর উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন. 'সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে আমি স্বয়ং তোমাদেরই মাঝ থেকে একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, তাঁর কাজ হচ্ছে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাবে, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করবে, আমার কিতাবের অর্ন্তনিহিত জ্ঞান তোমাদেরকে শিক্ষা দেবে, সর্বোপরি তোমরা যে সকল বিষয় জানতে না তা তোমাদেরকে জানাবে। [সূরা বাকারা-১৫১]

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেন, 'তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবন বিধান [দ্বীন] সহকারে তাঁর রাসূল [সা]-কে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এই জীবন বিধান [দ্বীন]-কে দুনিয়ার সকল বিধি-বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করতে পারেন, মোশরেকরা তা যতোই দু:সহ মনে করুক না কেন! [সূরা আত তাওবাহ-৩৩]।

আল্লাহ তায়ালা শুধু মুহাম্মদ [সা]-কেই দ্বীন কায়েমের বা জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। অতীতের সকল নবী রাসূলদেরকেও এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মানুষ ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে 'দ্বীন'ই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ আমি দিয়েছিলাম নূহকে আর যা আমি তোমাদের কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, উপরন্তু যার আদেশ আমি দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম, তোমরা আমার এ 'দ্বীন' বা জীবন বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করো আর কখনো অনৈক্য সৃষ্টি করো না। অবশ্য যে দ্বীনের দিকে তুমি লোকদেরকে আহ্বান করছো, এটা মোশরেকদের কাছে একান্ত দুর্বিসহ মনে হয়, মূলত আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে নিজের দিকে নিয়ে আসেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহ অভিমুখী হয় আল্লাহ তাকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করেন। [সূরা শুরা-১৩]। আল্লাহ তায়ালার এ হুকুম মেনে সকল নবী রাসূলগণ 'দ্বীন' কায়েমের চেষ্টা করেছেন।

তখনো তাওরাত, যাবুর ও ইনজিলের আলেম বা আহবার ও রূহবারগণ আল্লাহর রাসূল [সা]-এর নবুয়াতের বিরোধিতা করেছিল। ঐ সকল আহবার ও রূহবারদের অনুসারীরা কাবাঘরে ৩৬০ টি মূর্তি রেখে পূজা করত। ৩৬০টি মূর্তি তাদের বিভিন্ন দেব-দেবীর গোত্র ও ধর্মের প্রতীক ছিল। এ সকল মূর্তি পূজারীরা সকলেই সকল মূর্তি বা দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। অর্থাৎ তারা ছিল ধর্মনিরপেক্ষবাদী। আল্লাহর রাসূল [সা] মক্কা বিজয়ের পর এ সকল মূর্তিগুলো কাবাঘর থেকে অপসারণ করেছিলেন। আর এখন আমাদের ঘরে ঘরে এমনকি আমাদের পকেটে পকেটে মূর্তি শোভা পাচ্ছে। আমাদের



www.pathagar.com

মুসলিম মিল্লাতের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম [আ]-কে যে মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগে নমরুদ আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল আমরা সে মুসলিম মিল্লাতের জাতির পিতার আদর্শ ভুলে বাতিলের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি।

হযরত মুহাম্মদ [সা] মানুষকে শিরকের ভ্রষ্টতা, মুর্তি পূজা, মারামারি, হানাহানি, অশ্লীলতা ও পাপচারিতা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার রবুবিয়াতের ও একত্ববাদের আহ্বান জানান। ক্রমান্বয়ে মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর, অনেক রক্ত আর শহীদের বিনিময়ে এক স্বর্ণ যুগের সূচনা করেন। মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও সুবিচারের নিশ্চয়তা পায়। আল্লাহর রাসূল [সা] ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, অনেক রক্ত আর শহীদের বিনিময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ উপহার দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই তাঁর রাসূল [সা]কে তাঁর কাজের মূল্যায়ন করে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্যে আমার দ্বীনের পরিপূর্ণতা দান করলাম, আর এ দ্বীন হচ্ছে তোমাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত স্বরূপ, আর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে দ্বীন আল ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করে দিলাম।' [সূরা আল মায়িদা-৩]

রাসূল [সা] দীর্ঘ দশ বৎসর ইসলামী খিলাফত পরিচালনা করেন। রাসূল [সা] ১০ম হিজরির ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে বিদায় [হজ্জের] ভাষণ দান করেন। তিনি ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সুপ্রিয় পাঠক, আল্লাহর রাসূল [সা] যে সমাজে ও সময়ে আগমন করেছিলেন আমরা কি তার চাইতে কঠিন সমাজে অবস্থান করছি? এ বিষয়টা বিবেচনায় রেখে আমাদের দায়িত্ব সচেতন হতে হবে।

**উম্মতে মুহাম্মদী [সা]-এর দায়িত্বঃ** নবী রাসূলগণের প্রথম কাজ ছিল মানুষদেরকে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দাওয়াত দেয়া। সূরা আর রাদ-এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, [অতীতে যেমন আমি নবী রাসূল পাঠিয়েছি] তেমনি করে আমি আপনাকেও একটি জাতির কাছে নবী করে পাঠিয়েছি, এর আগে অনেক কয়টি জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের কাছে আমি নবী পাঠিয়েছি। যাতে করে তাদের কাছে আমার কিতাব শোনাতে পারে, যা আমি আপনার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি। এ সত্ত্বেও তারা অনন্ত করুণাময় আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে। আপনি তাদের বলে দিন, তিনিই আমার মালিক, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নাই, সর্বাবস্থায় আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।" [সূরা আর রাদ-৩০]। আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেছেন যে, 'আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে [তাদের কাছে বলতে পারে,] তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত করো এবং আল্লাহ তায়ালার বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করে।' [সূরা আন নাহল-৩৬]।

উম্মতে মুহাম্মদী [সা] দুনিয়ার মানুষের জন্যে সাক্ষী। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, "এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা



www.pathagar.com

দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের ওপর [হেদায়াতের] সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো এবং একই ভাবে রাসূল [সা]ও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারেন। যে কেবলার ওপর তোমরা এতোদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলে, আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কে রাসূল [সা]-এর অনুসরণ করে আর কে তাঁর কথা থেকে ফিরে যায়। তাদের ওপর এটা ছিলো একটা কঠিন পরীক্ষা। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাদের হেদায়েত দান করেছেন তাদের কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে বড় দয়ালু ও মেহেরবান।" [সূরা বাকারা-১৪৩]। '[সে দিনের কথা স্মরণ করো] যে দিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে তাদের ওপর সাক্ষী উত্থিত করবো এবং এ লোকদের ওপর আমি আপনাকেও [রাসূল [সা]কে] সাক্ষী হিসাবে নিয়ে আসবো, আমি আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, মুসলমানদের জন্যে কিতাব হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কিত সব কিছুর ব্যাখ্যা, আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত ও মুসলমানের জন্যে। [জান্নাতের] সুসংবাদ স্বরূপ।' [সূরা আন নাহল-৮৯]

উম্মতের কাজ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকা বা দাওয়াত দেয়া। সূরা আল ইমরানের ২০৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাশা করেছেন যে, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।' আল্লাহ তায়ালা উক্ত সূরার ১১০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মনবতার কল্যাণের জন্যে। তোমাদের কাজ তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" আল্লাহ তায়ালা আরোও বলেছেন, 'আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা মানুষকে সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং নিজেদের জীবনে ইনসাফ কায়েম করে' [সূরা আরাফ-১৮১]।

আমরা যারা মুহাম্মদ [সা]-এর উম্মত বা তাঁর দলের লোক বলে নিজেদেরকে দাবি করছি তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, মুহাম্মদ [সা] যে কাজ যেভাবে করেছেন, যে আদর্শ জীবন বিধান বা আইন-কানুন রেখে গেছেন, সে আদর্শ জীবন বিধান বা আইন-কানুন মেনে চলা, সে আদর্শ জীবন বিধান বা আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা আর অন্যদেরকে তা মানানোর চেষ্টা করা ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আহ্বান করা ও উদ্বুদ্ধ করা। আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানার জন্যে ও সে মোতাবেক আমল করার জন্যে রাসূল [সা] আমাদের জন্যে দু'টো জিনিস রেখে গেছেন। রাসূল [সা] বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কিতাব বা কুরআন ও আমার সুন্নাহ বা হাদিস।' [মাজহারী]।

আমরা যারা সালাত আদায় করি, প্রতি ওয়াক্ত সালাতের প্রতি রাকায়াতে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, 'ইহ্ দীনাছছিরাতাল মুস্তাক্বিম' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক সহজ ও সরল পথ দেখাও' [সূরা আল ফাতিহা-১/৬]। রাসূল [সা] এ 'ছিরাতাল মুস্তাক্বীম' পাওয়ার জন্যেই উক্ত দু'টো জিনিসের কথা বলেছেন। তা



www.pathagar.com

ছাড়া আল্লাহ তায়ালাও কুরআনের শুরুতেই বলেছেন, 'এই সে গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, উহা যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলবে তাদেরকে সঠিক, সহজ ও সরল পথ দেখাবে' [সূরা বাকারা-২]। আর এ সঠিক, সহজ ও সরল পথ পাওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, 'গায়েব [আল্লাহ]-কে বিশ্বাস করতে হবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আল্লাহ তায়ালা যে রিযিক দান করেছেন তার থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে, রাসূল [সা]-এর ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর পূর্বের নবীদের ওপর যা কিছু নাজিল করা হয়েছিলো তার ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর বিশ্বাস করতে হবে পরকালের বা শেষ বিচারের দিবসের প্রতি।' [সূরা বাকারা-৩ ও ৪]। এ রকম বিশ্বাস ও কুরআন ও হাদিসের পথ অনুসরণ করলেই আমরা রাসূল [সা]-এর অনুসারী বা উম্মত হতে পারবো। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল [সা]-এর কথা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।' [সূরা আলে ইমরান-১৩২]

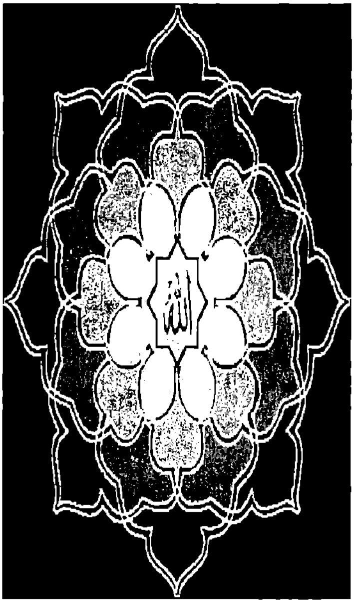



www.pathagar.com

# জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী [সা]

## রাফিউল ইসলাম

পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বা মহাকরুণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা আহযাবের ৫৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম পাঠাও।"

এ থেকে বোঝা যায়, মহানবী [সা] মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় উপহার। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে অভ্যস্ত কোনো অমুসলিম পণ্ডিতও কখনও বিশ্বনবীর [সা] অতুল ব্যক্তিত্বের অনন্য প্রভাব, মহত্তম মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর কথা অস্বীকার করতে সক্ষম নন। কারণ, মানব সভ্যতার সবচেয়ে সমৃদ্ধ পর্যায়গুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বনবী [সা]-এর অতুলনীয় মহত্ত্ব ও গুণের ছাপ স্পষ্ট।

সূরা আহজাবের ৪৫ ও ৪৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"

এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সংযোগস্থলে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ৫ জন আল্লাহ প্রেরিতপুরুষ বা রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা রাসূলদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বা "উলুল আযম" হিসেবে খ্যাত। তাঁরা সবাই নানা পদ্ধতিতে একই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন মানবজাতির কাছে এবং তাদের লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। তাঁদের বক্তব্যে ছিল এক আল্লাহর প্রশংসা এবং জুলুম ও অজ্ঞতার আঁধারে ছেয়ে যাওয়া বিশ্বে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা।

প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও বন্যার পর যখন হযরত নূহ [আ]-এর কিশতি জুদি পাহাড়ে নোঙর করে তখন এই মহান রাসূল ও তাঁর অল্পসংখ্যক অনুসারী বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তোলার তথা মানবজাতির নতুন সভ্যতার ইতিহাস গড়ার কাজ শুরু করেন।

হযরত নূহ [আ]-এর পর বাবেল অঞ্চলে একত্ববাদ ও এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানিয়েছেন হযরত ইবরাহিম [আ]।

এরপর হযরত মূসা [আ] তাঁর অলৌকিক লাঠি নিয়ে নিজ জাতিকে রক্তপিপাসু ও খোদাদ্রোহী সম্রাট ফেরাউনের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য তৎপর হন। ফেরাউন নিজেকে



www.pathagar.com

খোদা বলে দাবি করত এবং জনগণকে নিজের দাস করতে চেয়েছিল। এরপর এলেন হযরত ঈসা [আ]। তিনি দাসের মালিক ও ক্রন্দনরত বঞ্চিত বা দুর্বলদের মধ্যে শোনালেন মহান আল্লাহর অশেষ দয়ার বাণী এবং দিয়েছেন সর্বশেষ রাসূল [সা]-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ।

এরপর বিশ্বের জাতিগুলো যখন নানা ধরনের মনগড়া খোদা বা মূর্তির পূজা করছিল এবং অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও কুসংস্কার সর্বত্র জেঁকে বসে তখন মক্কা শহরে ইসলামের চির-উজ্জ্বল মশাল নিয়ে আবির্ভূত হন বিশ্বনবী [সা]। তিনি মানবীয় মর্যাদা, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে উপহার দেন সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম বক্তব্য। এভাবে তিনি মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষকের অক্ষয় আসনে সমাসীন হন।

বিশ্বনবীর [সা] মধ্যে সব নবী-রাসূল ও আউলিয়ার গুণের সমাবেশ ঘটেছে, তিনি উচ্চতর সেইসব গুণাবলির পরিপূর্ণ ও পরিপক্ব সংস্করণ– যেসব গুণ যুগে যুগে নবী-রাসূল ও আউলিয়ার মধ্যে দেখা গেছে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ির ভাষায়, "যখন মহানবীর [সা] পবিত্র নাম মুখে আনি, এর অর্থ যেন হযরত ইবরাহিম [আ], হযরত নূহ [আ], হযরত মুসা [আ], হযরত ঈসা [আ], হযরত লোকমান [আ] এবং সব সালেহ বা সত্য ও খ্যাতনামা মহৎ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব বিশ্বনবীর [সা] মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমন্বিত, প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়েছে।"

আজকের এই সভ্যতার যুগে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল এবং যুক্তি ও সত্যের অন্ধ-বিদ্বেষী মহলগুলো আল্লাহ প্রেরিত ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা এ লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে ও ষড়যন্ত্র করছে। ২০০৬ সালে এ ধরনেরই এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আওতায় ডেনমার্কের 'জিইল্যান্ড-পস্টেন' নামে একটি দৈনিক বিশ্বনবীর [সা] প্রতি অবমাননাকর কিছু কার্টুন ছাপে। ২০১১ সালে উগ্রবাদী মার্কিন পাদরি টেরি জোন্স পবিত্র কুরআন পোড়ানোর হুমকি দিয়ে ধর্ম-অবমাননার আরো এক জঘন্য নজির প্রতিষ্ঠা করে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বনবীর [সা] প্রতি অবমাননাকর ছায়াছবি নির্মাণ আল্লাহ প্রেরিত ধর্মগুলোসহ ইসলামী ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর বিরুদ্ধে এইসব অন্ধ ও অশুভ চক্রের ক্রুসেড অব্যাহত রাখার জোর অপচেষ্টাই তুলে ধরছে।

অবশ্য বিশ্বনবীর [সা] পবিত্র চেহারা এত বেশি উন্নত, সুন্দর ও পছন্দনীয় গুণাবলিতে ভরপুর যে এইসব অন্ধ ও গোঁড়া চক্রের অবমাননায় তাঁর চির-উজ্জ্বল চেহারা বা সম্মানের বিন্দুমাত্র হানি ঘটবে না। যাদের মধ্যে জ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই এবং যারা অজ্ঞতা ও অন্ধ-বিদ্বেষের দাস কেবল তারাই এই মহামানবকে নিয়ে ঠাট্টা ও উপহাস করতে পারেন। আর ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

প্রামাণ্য ছায়াছবি নির্মাতা আব্বাস লা-জাওয়ার্দি কিছুকাল আগে 'কোন্ স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি ছায়াছবি নির্মাণের জন্য পশ্চিমা দেশগুলো সফর করেছিলেন। তিনি নিরাপত্তা প্রহরীদের কড়াকড়ি সত্ত্বেও কুখ্যাত পাদরি টেরি জোন্স ও ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট কুর্ট ওয়েস্টগার্ডের সাক্ষাৎকার নিতে সক্ষম হন। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আপনারা কি কুরআন পড়েছেন? তারা দু'জনই উত্তর দেয় যে, কখনও তারা এই মহাগ্রন্থ পড়েনি এবং কুরআন না পড়েই তারা মহানবী [সা] ও কুরআন-অবমাননার পদক্ষেপ নিয়েছে।



www.pathagar.com

অধ্যাপক হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী পিএইচডি বলেছেন, ‘যখন ইউরোপ কুরুচি ও মূর্খতার গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাইনি সন্দেহ করে নারীদের জীবন্ত পোড়ান হত, জ্ঞানার্জনকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো, তখন মুসলমানেরা স্পেনের প্রতিটি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষা বিলি করছিল।’

স্যার উইলিয়াম মূর বলেছেন, ‘সর্বশ্রেণীর ঐতিহাসিকরা একবাক্যে হযরত মুহাম্মদের যৌবনকালীন স্বভাবের শিষ্টতা ও আচার ব্যবহারের পবিত্রতা স্বীকার করেছেন। এরকম গুণাবলি সে সময় মক্কাবাসীর মাঝে বিরল ছিল। এই সরল প্রকৃতির যুবকের সুন্দর চরিত্র, সদাচরণ তার স্বদেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ‘আল-আমিন’ বা বিশ্বাসী উপাধি পান।’

বাসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন, ‘হযরত মুহাম্মদ একাধারে সিজারের মত শাসনতন্ত্রের শীর্ষভাগে ছিলেন আবার পোপের মত ধর্ম মন্দিরের উচ্চ আসনেও সমাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পোপের মত জাঁকজমক ও সিজারের মত সেনাবল ছিল না। বেতনভোগী সেনা, দেহরক্ষী সেনা, রাজকীয় প্রাসাদ ও নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া স্বর্গীয় অধিকারবলে রাজত্ব দাবি করার একমাত্র দাবিদার কেবল হযরত মুহাম্মদই। কারণ ক্ষমতার উপকরণ ও আশ্রয় ছাড়াই তিনি সব ধরনের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।’

জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন, ‘ইসলাম কখনো অন্য কোন ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করেনি। কখনো ধর্মের জন্য নির্যাতন, ধর্মমত বিরোধীদের দণ্ডের ব্যবস্থা কিংবা দীক্ষা ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করেনি। ইসলাম তার মত বা বক্তব্য জগতের সবার সামনে তুলে ধরেছে কিন্তু কখনো কাউকে তাঁর মত গ্রহণে বাধ্য করেননি। ইসলাম আশপাশের দেশগুলোতে তৎকালে প্রচলিত শিশুহত্যা ও আরবের দাসত্ব প্রথা তিরোহিত করেছে। ইসলাম কেবল এর অনুসারীদের ওপরই নয়, বাহুবলে বিজিত সবার ওপরই সমভাবে নিরপেক্ষ বিচার স্থাপন করেছে।’

তাইতো কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [সূরা সাবা : ২৮]

পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বা মহাকরুণা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।”

সূর্য যেমন বিশ্বকে আলোকিত করে তেমনি নবী-রাসূলরা আলোকিত করেন মানুষের মন, চিন্তা ও আচরণ। মানব-সভ্যতা মূলত তাদের মাধ্যমেই এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণতার দিকে। মানব সভ্যতার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও মানুষের জ্ঞানগত উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর রেখে যাওয়া আলোকিত শিক্ষা। তাঁর মহতী ও আলোকিত শিক্ষার গুণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বেদুইন এবং রুক্ষ প্রকৃতির আরব জাতি সভ্য, উদার, দয়ালু ও শিক্ষানুরাগী জাতিতে পরিণত হয়।



www.pathagar.com

কোনো এক যুদ্ধে একদল আহত মুসলমান পিপাসা-কাতর অবস্থায় মাটিতে পড়েছিল। কোনো এক মুজাহিদ আহত সহযোদ্ধাদের জন্য পানি নিয়ে এলে প্রত্যেকেই পানি পান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ওই পানি অন্য কোনো আহত ভাইকে দিতে বলে। ফলে তাদের সবাই তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শহীদ হন।

ইসলাম জ্ঞানচর্চার ওপর অশেষ গুরুত্ব দেয়ায় মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। ইসলামের সেই সোনালি সভ্যতা নির্মাণে ইরানের মুসলিম জ্ঞানী-গুণীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপও মুসলিম বিজয়ের সুবাদে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকিত কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশ্বনবী [সা]-এর আলোকিত শিক্ষায় ও পবিত্র কুরআনে জ্ঞান শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপের কারণেই ওই সোনালি সভ্যতা গড়া সম্ভব হয়েছিল।

অথচ মানবতার মুক্তির দূত ও মানবীয় চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর অবমাননার ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে যুগে যুগে। কিন্তু অজ্ঞতা ও অন্ধকারের শক্তিগুলোর শত বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বে বিশ্বনবীর [সা] খ্যাতি ও মর্যাদা দিনকে দিন বাড়ছে এবং তাঁর চির-উজ্জ্বল গুণগুলোর প্রভাবও মানুষের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। এমনকি নিরপেক্ষ অমুসলিম বিশ্লেষক, বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতরাও একবাক্যে বিশ্বনবীর [সা] অতুল মহত্ত্বের কথা দ্বিধাহীনভাবে ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যুগে যুগে।

ঊনবিংশ শতকের বিশিষ্ট জার্মান লেখক, কবি ও রাজনীতিবিদ গ্যাটে বিশ্বনবীর [সা] অসাধারণ নানা সাফল্য ও মর্যাদার প্রাচুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন, 'আমরা ইউরোপীয়রা আমাদের সব ধ্যান-ধারণা নিয়েও এখনও সেইসব বিষয় অর্জন করতে পারিনি যা অর্জন করেছেন মুহাম্মদ এবং কেউই তাঁকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। আমি ইতিহাসে অনুকরণীয় মানুষের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত খুঁজতে গিয়ে এ ক্ষেত্রে কেবল নবী মুহাম্মদকেই খুঁজে পেয়েছি; আর এভাবেই সত্য অবশ্যই বিজয়ী হবে ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করবে। কারণ, মুহাম্মদ সারা বিশ্বকে বশ করেছেন স্বর্গীয় একত্ববাদের বাণীর মাধ্যমে।'

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট খ্রিস্টান ঐতিহাসিক আর এফ বুদলি বিশ্বনবীর [সা] প্রতি একদল ব্যক্তির নানা অপবাদের নিন্দা জানিয়ে 'মুহাম্মদ [সা]-এর জীবনী' শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, 'এটা বর্তমান যুগের অন্যতম অদ্ভুত ব্যাপার যে, কোনো যুক্তি বা কারণ ছাড়াই বিশ্বের একদল মানুষ মুহাম্মদ [সা] সম্পর্কে একই ধরনের কিছু নেতিবাচক সন্দেহ পোষণ করছেন। অথচ মুহাম্মদ [সা]-এর জীবন খুবই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। আমি মুহাম্মদ [সা]-কে নিয়ে লিখিত একটি বই পড়েছি যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য লেখা হয়েছে। লেখক বইটির বেশ কিছু পৃষ্ঠায় অযৌক্তিক ও অন্যায্য বক্তব্য রেখে সেই পৃষ্ঠাগুলোকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। অথচ তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে কী ব্যাখ্যা দেবেন যে এমন একজন মানুষ কিভাবে মানুষের উন্নতির জন্য এমন উন্নত ও কার্যকর বিধান আনতে পেরেছেন? কিভাবে তিনি একদল মানুষকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে পেরেছেন যে তারা খুব কম সময়ের মধ্যেই এমন বিশাল ও গৌরবময় ইসলামী সভ্যতার



www.pathagar.com

ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপের সুবাদেই বড় বড় জাতিগুলোকে এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়?'

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক আর এফ বুদলি আরো বলেছেন, 'মরুচারী আরবদেরকে অনুগত করা ছিল মুহাম্মদ [সা]-এর বড় ধরনের সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁর এই সাফল্যকে সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনাগুলোর সমতুল্য বলা যায়। তিনি এইসব গোত্র ও জাতির মধ্যে বিস্ময়কর একতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুহাম্মদ [সা]-এর জীবনী নিয়ে চিন্তা করতে গেলে মানুষ তাঁর প্রজ্ঞা বা দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে অভিভূত হয়' এবং তারা মুহাম্মদ [সা]-কে এমন এক জীবন্ত মানুষ বলে মনে করেন যাঁর মৃত্যু হবে না কোনো যুগেই।'

ব্রিটেনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল মুহাম্মদ [সা]-এর পবিত্রতা সম্পর্কে একদল গোঁড়া বা অন্ধ-বিদ্বেষী ব্যক্তির অবমাননাকে তাদের যুক্তির দুর্বলতার ফসল বলে মনে করেন। কার্লাইল বলেছেন, 'আজকের যুগের সভ্য মানুষের জন্য এটা খুব বড় রকমের বিচ্যুতি যে, মুহাম্মদ [সা] প্রতারক ছিলেন–এমন কথা বিশ্বাস করা। এ ধরনের লজ্জাজনক ও অর্থহীন কথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় হয়েছে আজ। কারণ, তিনি যে বাণী ও ধর্ম এনেছেন তা শত শত বছর ধরে অত্যুজ্জ্বল প্রদীপের মত আলো বিকিরণ করছে। আমার প্রিয় ভায়েরা! আপনাদের কেউ কি কখনও দেখেছেন একজন মিথ্যাবাদী এমন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম গড়তে এবং তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম? স্রষ্টার শপথ করে বলছি, এ ধরনের অভিযোগ খুবই অদ্ভুত। কারণ, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণেরই ক্ষমতা রাখেন না। আর এমন ব্যক্তি কিভাবে ইসলামের মতো একটি ধর্ম মানব সমাজের কাছে উপহার দিতে পারেন?'

কার্লাইল আরো লিখেছেন, 'এটা খুবই বড় ধরনের সমস্যা ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার যে, বিশ্বের জাতিগুলো যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ওপর ভর না করেই এ ধরনের বোকামিপূর্ণ অভিযোগ মেনে নিচ্ছেন! আমি বলব, এটা অসম্ভব, এই মহান ব্যক্তি তথা মুহাম্মদ [সা] অবাস্তব কোনো কথা বলেছেন। তাঁর জীবন ইতিহাস থেকেই জানা যায় তিনি যৌবনকালেই জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ছিলেন। মুহাম্মদের [সা] জীবনের ভিত্তি ও তাঁর সব কাজ এবং পছন্দনীয় গুণগুলো সত্য ও পবিত্রতা-ভিত্তিক। আপনারা তাঁর বক্তব্যগুলো লক্ষ্য করুন, তাতে কি স্রষ্টার বাণী ও অলৌকিকতা দেখা যায় না? এই মানুষ অস্তিত্বের অসীম উৎস [তথা আল্লাহর কাছ] থেকে মানুষের জন্য বাণী বয়ে এনেছেন। মহান আল্লাহই এই মহান ব্যক্তিকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখিয়েছেন।



www.pathagar.com

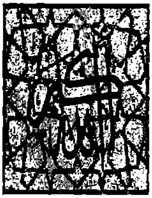

# বিশ্বের প্রখ্যাত কবিদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ [সা]

**সাকী মাহবুব**

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা] পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মহৎ মনীষীর গুণাবলী ও আদর্শ চরিত্রে তাকে অতিক্রম করতে পারেননি। পৃথিবীর সকল মহাপুরুষের সকল মহৎ গুণাবলী তার মাঝে একক ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। ফলে তিনি যে কোন বিবেচনায় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। এই বিশাল ব্যক্তিত্ব যুগ যুগ ধরে সকল প্রকার মানুষের হৃদয় জয় করে চলছেন। তার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছিল অগণিত বনী আদম। মানুষের এই অশেষ প্রীতি ও মুগ্ধতার ছোঁয়া পড়েছে বিশ্ব সাহিত্যেও। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মুহাম্মদ [সা] এমনই একজন মহামানব যিনি বিশ্ব সাহিত্যে আদর্শ ও ব্যক্তি চরিত্রের বিচারে সব চাইতে বেশী স্বরণীয়। বস্তুত সাহিত্য ও ঐতিহাসিকতার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এমন মহাপ্রাণ আর একজনও নেই। মহানবী [সা] এর মহান জীবন চরিত বিশ্ববাসীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক জীবন্ত উৎস। তাই সর্বকালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে নিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য কবি সাহিত্যিক তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বিশ্বনবী [সা] এর উপর বিশ্বের খ্যাতিমান কিছু কবিদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই আমরা যার কবিতা দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি তিনি হলেন প্রসিদ্ধ কবি হাসসান বিন সাবিত [রা]। তিনি রাসূলে কারীম [সা]কে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তার কবিতার কিছু অংশ–

"তোমার তারিফ করি সে ভাষা আমার জানা নেই
আমি তো অধম কবি, ভাষায় দারুণ দূর্বলতা
প্রশংসা পাবে না তুমি আমার অক্ষম কবিতায়
তোমার পরশ পেয়ে এ কবিতা অমরতা পাবে



www.pathagar.com

এই আশা বুকে নিয়ে হাসান তোমার কৃপা চায়।

প্রখ্যাত কবি কাব ইবনে যুহাইর [রা] নবীজিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন:

তুমি নূর ঘুচায়েছ তিমির বিশ্ব জাহান
খোদার হাতের তুমি প্রভাময় মুক্ত কৃপাণ ৷৷

আরবী কবিতার জগতে নাত ধর্মী রচনায় ইমাম শরফুদ্দীন ইবনে সাঈদ আল বুসিরীর কাসিদাতুল বুরদা এক উন্নত স্থানের অধিকারী। এর কয়েকটি লাইন উদাহরণ দিচ্ছি:

পাপ করেছি ঢের যদিও আশা তবু এ বুক জুড়ে
দিবেন না মোর দয়াল নবী বাঁধন ছিড়ে তাড়িয়ে দূরে ৷৷
দয়াল নবীর পাক শাফায়াত সেদিন যদি না পাই আহা
ধ্বংস ছাড়া ভাগ্যে আমার রইবে না আর বাঁচার রাহা ৷৷
ভাবছি মনে তার তারিফের কাব্য কুসুম মালা গাঁথি
এই হবে মোর রোজ হাশরে বিপদকালের শ্রেষ্ঠ সাথী।

আরবী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে আরেকটি বিশ্বখ্যাত অনবদ্য নাত রচনা করেছেন শেখ সাদী। মূলত : ফার্সী কবি হলেও আরবীতে এ নাত বর্তমানেও সমান জনপ্রিয়। বালাগাল উলা বেকামালিহী নাতটির অনুবাদ-

তাবৎ পূর্ণতা নিয়ে শীর্ষে হয়েছে উপনীত।-
অপার সৌন্দর্যে তিনি আলো করেছেন তমসাকে
আশ্চর্য চরিত্র তার অতুল সৌন্দর্যে মণ্ডিত
রাহমাতুল্লিল আলামীন হাজার সালাম তাকে।

ফারসী সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভা মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বিশ্ববিশ্রুত কাব্যের বহু ছত্রে প্রিয়নবীর [সা] নাম অত্যন্ত ভক্তিভাবে উচ্চারণ করেছেন এভাবে:

ইঞ্জিলে রয়েছে নাম নবী মোস্তফার
প্রাণের সাগর তিনি নবীদের সরদার।
ইঞ্জিলে রয়েছে তার দেহের গড়ন, অবয়ব,
আহার, পানীয়, রোজা, রীতি-নীতি আছে যত, সব।

রাসূল [সা] প্রেমিক আর এক কবি আল্লামা জামী মনের ভাব ব্যক্ত করেন এভাবে:

হে সৌন্দর্যের রাজা, হে মানব কুলের সর্দার
তোমার চেহারার জ্যোতিতে চাঁদ পেল আলো।
তোমার প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নেই
সংক্ষেপে এইটুকু বলি। আল্লাহর পরেই তোমার আসন।

কবি হাফিজ বলেন:

দেখ শত শত মনি ভবের বাজারে বিকাইছে প্রতিদিন
মোর কহিনুর মণি পার্শ্বে হইল সব মণি জ্যোতিহীন।
ওমর খৈয়ামের উচ্চারণে আমরা শুনি:
ওহে ঐ ব্যক্তি যে বিশ্বের অদ্বিতীয়



www.pathagar.com

আমার মন চক্ষু ও জীবনের চেয়েও প্রিয়
জীবনের চাইতে প্রিয় কোন জিনিস নেই
অথচ আমার জীবন হতে শত গুণ বেশি প্রিয় তুমি।

উর্দু সাহিত্যের প্রধান কবি ড: আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল নবী-প্রেমের এক নিখাঁদ চিত্র অংকন করেছেন এভাবে–:

না ফুটিত যদি এ কুসুম কলি, করিত না কভু বুলবুলি গান
হাসিত না কভু ফুলের কলিরা, মাতায়ে নিখিল পুষ্পোদ্যান
না আসিত যদি এ সাকী বহিত না সূরা সূরার বাটি
তৌহিদ বীণ বাজিত না কভু, বিশ্ব হত না খোদার ঘাঁটি।

সাধক কবি মীর্জা আসাদুল্লাহ গালিব আল্লাহও রাসূলের প্রতি তার ভক্তি ও প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করতে গিয়ে গেয়ে উঠেন:

কি আনন্দ! কি আনন্দ! যখন তোমার কথা ভাবি
আমার আত্মার ঘর আলোকিত বেহেশতী বাগান।
আল্লাহ আমাকে দাও চিরন্তন অপার করুণা
নবীর আদর্শে হোক আমার জীবন উজ্জীবিত।

জার্মান কবি গ্যাটে এক দীর্ঘ কবিতায় রাসূলে কারীম [সা] এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তার কবিতার কিছু অংশ:

দেখ ঐ গিরি প্রস্রবণ আনন্দে উজ্জ্বল
যেন তারার এক চমক মেঘের উপরে
পালে তারে তরুণ বয়সে সদায় আত্মিকগণ
চুড়াঘন মধ্যবর্তী ঝোঁপের মাঝারে।

ইউনুস আমীর বলেন।

তোমার নামের দীপ জ্বেলে আমি জ্বলি নিজে
তোমার একত্ববাদ পবিত্র কুরআনে জ্বলে কী যে।
তোমাকে স্মরণ করে নত হই তোমার সমীপে
তুমি ছাড়া কেউ নেই প্রদীপ্ত আমার দীল দীপে।

আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি খোশহাল খান খটক লেখেন:

হে রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা
আপনার নামের জন্য আমি যে
কোরবান হতে চাই।

আশেকে রাসূল কবি আমীর খসরু যে নাতটি মহানবীর [সা] রওজা মুবারকের পার্শ্বে পাঠ করেছিলেন তার কিছু অংশ তুলে ধরছি:

নূরানী চেহারা ও মূর্তিদের ঈর্ষার কারণ
যতই তারিফ করি সেই খানে রয়েছে বিপদ
পরীর চেয়েও তুমি দ্রুতগামী ফুলের মতন



www.pathagar.com

নরম দেহের অবয়ব।
যা কিছু রয়েছে ভালো সবি তো সত্যের বাহাদুরী
এখন তুমিই আমি এবং আমিই তুমি হয়ে গেছি
আমিতো এ দেহ আর তুমিতো সেখানে প্রাণবান
কেউ আর বলবে না তুমি আমি ভিন্ন দেহ প্রাণ।

ফারসী সাহিত্যের আর এক বিখ্যাত কবি ফরিদুদ্দীন আত্তার রাসূল [সা] এর শানে ১৪টি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার কবিতার কিছু অংশ:

কি বলব আমি? তাঁর প্রশংসায় আল্লাহই পঞ্চমুখ
যে নামের সাথে মিশে আছে তাঁর নাম।
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
মুহাম্মদ সে তো সত্যবাদী আল আমীন,
সমগ্র জগতের জন্যে শাশ্বত রহমত
দুজাহানের শ্রেষ্ঠ মানব
দ্বীন ও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সংগঠক।
মুহাম্মদ এ বিশ্বের গৌরব তিনি
মানবতার অনন্য শিক্ষক।

মরমী কবি লালন শাহ বিশ্বনবী [সা] কে নিয়ে বেশ কিছু নাত রচনা করেছেন। যেমন:

তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাবো না
দেখা দিয়ে দীনের রাসূল ছেড়ে যেও না।।
আমরা সব মদিনাবাসী
ছিলাম যেমন বনবাসী
তোমার হতে জ্ঞান পেয়েছি
পেয়েছি শান্তনা।।

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামই রাসূল [সা]কে নিয়ে সবচেয়ে বেশী কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তার রচনার কিছু অংশ তুলে ধরছি:

আসিছেন হাবিবে খোদা, আরশ পাকে তাই উঠেছে শোর,
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ-পানে যেমন চকোর,
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আমার আভাস পেয়ে
তেমনি করে হরষিত ফেরেশতা সব উঠলো গেয়ে।
হে মদিনার বুলবুলি গো গাইলে তুমি কোন গজল,
মরুর বুকে উঠলো ফুটে প্রেমের রঙিন গোলাপ-দল।

ইসলামী রেনেঁসার কবি ফররুখ আহমদ রাসূল [সা]কে নিয়ে লিখেছেন এভাবে:

কে আসে কে আসে সাড়া পড়ে যায়
কে আসে কে আসে নতুন সাড়া
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া



www.pathagar.com

হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে, তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত।

এমনিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য কবি সাহিত্যিকগণ তাদের নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে রাসূল [সা]কে নিয়ে রচনা করেছে অংসখ্য কবিতা, গান। যা বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর।

**তথ্য সূত্রঃ**


১. সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী [সা] -মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত।
২. কবি ও কবিতার প্রতি রাসূল [সা] এর অনুরাগ ও উৎসাহ -মুকুল চৌধুরী।
৩. বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ [সা]–রুহুল আমিন বাবুল।
৪. মাসিক মদিনা /সীরাত সংখ্যা মে- ২০০৩।
৫. মাসিক মদিনা আগষ্ট- ১৯৯৫।
৬. নতুন কলম এপ্রিল–১৯৯৬।
৭. কবি ও নকীব আল্লামা ইকবাল আবু জাফর।

www.pathagar.com

# হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর জীবন: সংক্ষিপ্ত পাঠ

**মো: জিহাদ হোসেন**

৫৭০ ইয়াসী সনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজী বিদায়লগ্নে পৃথিবীর বুকে মা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মুহাম্মদ [সা]। মহানবী [সা] মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাহার পিতা আব্দুল্লাহ পরলোক গমন করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব নাতীর মুখ দেখামাত্র পুত্রের শোক ভুলে গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব নাতীর নাম রাখেন মুহাম্মদ। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী, তায়েফের এক গরীব মহিলা হালিমা হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর লালন পালনের ভার নিলেন। মা হালিমা মহানবী [সা]কে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর দেখলেন আধমরা গাছ জীবিত হয়েছে, দূর্বল ছাগল সবল হয়েছে, শুকনো কূপ পানিতে ভরে গেছে, হালিমার শুকনো স্তন দুধে ভরে উঠেছে। নবীজী দুই মাস বয়সে হামাগুড়ি দিয়েছিলেন, তৃতীয় মাসে এক পা দু'পা করে হাটতে পারতেন, এবং পঞ্চম মাসে দৌড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবম মাসে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে কথা বলেছিলেন। মহানবী [সা]কে চার বছর বয়সে সিনাচাক করা হয়েছিল। মহানবী [সা]-এর পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাঁকে মা আমেনার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসলেন দুধমা হালিমা। হযরত মুহাম্মদ [সা] ছয় বছর বয়সে মাকে হারালেন। এরপর মহানবী [সা]-এর লালন পালনের ভার দাদা মুত্তালিব গ্রহণ করলেন । দাদার মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব মহানবী [সা]-এর লালন পালনের দায়িত্ব নেন। মহানবী [সা] চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় যেতেন। মহানবী [সা] ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর চুল ছিল ঘন এবং কৃষ্ণ বর্ণের। মহানবীর গাত্রবর্ণ ছিল দুধে আলতা গোলার মতো। তাঁর দেহ মোবারক ছিল মধ্যমাকৃতির। তিনি পথ চলতেন সর্তকতার সহিত যেন মাটিও কষ্ট না পায়। মহানবী সুস্পষ্ট, সাবলীল ও নম্রভাবে কথা বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল শ্রুতিমধুর। তিনি সাধারণত লুঙ্গি, জামা, চাদর ও সাদা পাগড়ী ব্যাবহার করতেন। বিবি খাদিজা মৃত স্বামী ও পিতার ব্যবসা যখন একাই দেখাশুনা করতে পারছিলেন না, তখন তিনি এসব দেখাশুনার ভার দিলেন হযরত



www.pathagar.com

মুহাম্মদ [সা]কে। নবীজির সততা, নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে মহানবীকে বিবাহ করেন বিবি খাদিজা। তখন বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর আর নবীজির বয়স পচিশ বছর। মহানবী [সা]-এর প্রায় সবকটি সন্তান খাদিজার গর্ভের। মহানবীর দুই পুত্র ছিল কাশেম ও তাহের, যারা শৈশবে মারা যায়। তার কন্যা সন্তান মোট চার জন। তারা হলেন : জয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা [রা]। বিবি খাদিজা পরলোক গমন করলে তিনি আরও বিবাহ করেন, তারা হলেন, সাওদা বিনতে জাময়া, আয়শা বিনতে আবুবকর, হাফসা বিনতে ওমর, জয়নব বিনতে খুজাইস, উম্মে সালমা, জয়নব বিনতে জোহাস, জুওয়াইরিয়া, উম্মে হাবিবাহ, সুফিয়া, মাইমুনা ও মারিয়া কিবতীয় [রা]। এরপর মহানবী [সা] নতুন করে কাবাগৃহ মেরামত শুরু করেন। তিনি সব সময় মানুষের ভালমন্দ নিয়ে ভাবতেন। এসব ভেবে আনমনা হয়ে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এভাবে চলে গিয়েছিল সুদীর্ঘ পনেরো বছর। মহানবী [সা] চল্লিশ বছর বয়সে ২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নবুওয়াত পান। এরপর থেকে কখনো মানুষ রূপে আবার কখনো অদৃশ্য ভাবে জিব্রাইল [আ] নবীজীর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। মহানবীর নবুওয়াত লাভের পর সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন হযরত খাদিজা [রা] এরপর হযরত আলী[রা] এরপর খাদিজার গোলাম জায়েদ [রা] এরপর হযরত আবু বকর [রা]। এরপর থেকে মহানবী আল্লাহর পথে আসার আহ্বান জানান। আল্লাহ এক এবং নিরাকার, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, হযরত মুহাম্মদ [সা] তাঁর প্রেরিত রাসূল এ কথাটা সকলের কাছে পৌছে দেন নবী কারীম [সা]। কুরাইশ নেতাগণ নবীজীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে অত্যাতার করত। পথে কাঁটা দিয়ে রাখত, নামাজ পড়ার সময় সেজদাতে গেলে মাথায় বালি ও জীবজন্তুর পঁচা ভূড়ি দিয়ে রাখত। অনেকে আবার নবী কারীম [সা]কে ধন, সম্পদ, নারী ও সম্মান দিতে চাইল শুধু ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য। নবী কারীম [সা] তবুও দাওয়াত বন্ধ করলেন না। নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বৎসরে হযরত হামজা [রা] ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর কুরাইশ নেতা ঘোষণা করেন যে ব্যক্তি মুহাম্মদের মাথা কেটে আনবে তাকে ১০০টি উট পুরষ্কার দেওয়া হবে। এ কথা শুনে হযরত ওমর [রা] তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে চলেন, পথে জানতে পারলেন তার ভগ্নি ও ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর ভগ্নিপতিদের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তারা সূরা ত্বহার কয়েক আয়াত পাঠ করছেন। ওমর তাদের অনেক অত্যাচার করার পরও তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত হন। আবারও ওমর তাদেরকে উক্ত সূরা পাঠ করতে বলে, তারা পাঠ করে এবং ওমর নিজের অজান্তে কালেমা পাঠ করেন। তারপর তিনি নবীজীর পবিত্র দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের দশম বছরে রমজান মাসের ৭ তারিখে চাচা আবু তালিব পরলোক গমন করেন। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর ইহুদীগণ তাঁকে আরও বেশী অত্যাচার করেন। চাচার মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতে তিন দিন পর নবীজীর প্রাণপ্রিয় বিবি খাদিজাতুল কোবরা স্বামীকে রেখে পরলোক গমন করেন। এরপর নবীজী আল্লাহর আদেশে তায়েফ শহরে চলে



www.pathagar.com

যান। তায়েফের গুন্ডার দল মহানবীর পবিত্র শরীর মোবারককে আঘাত করে রক্তে জর্জরিত করে ফেলে। রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় রাতে অনেকের মতামত অনুযায়ী ২৭শে রজব কাবা শরীফে শয়ন করেন, সেই রাতে জিব্রাইল ও মেকাইল [আ] এসে নবী কারীম [সা]কে বোররাকে আরোহন করালেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করলেন। জিব্রাইল [আ] আযান দেবার পর সকল পয়গাম্বরকে নিয়ে নামাজের সময় নবীজী ইমামতী করেন। তারপর জিব্রাইল [আ] হযরত মুহাম্মদ [সা]কে নিয়ে প্রথম আসমানে হযরত আদম [আ], দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা [আ], তৃতীয় আসমানে ইউসুফ [আ], চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস [আ], পঞ্চম আসমানে হারুন [আ], ষষ্ঠ আসমানে মূসা [আ] এবং সপ্তম আসমানে ইব্রাহীম [আ]-এর সঙ্গে মোলাকাত করেন। এরপর জিব্রাইল [আ] আর সামনে অগ্রসর হলেন না। এখানে হযরত আল্লাহর দর্শন লাভ করেন এবং এখানে নামাজ ফরয করা হয়। সেই রাতে ভোর হওয়ার পূর্বে মেরাজ গমনের ছফর শেষ করেন। এ কথা কুরাইশগণ জানতে পারলে তারা বিশ্বাস করে না, নবীজী তাদের বিশ্বাস করানোর জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। এরপর রবিউল আউয়াল মাসে শুক্রবারে হযরত মুহাম্মদ [সা] মদিনায় হিযরত করেন। মদিনায় পৌছে দুটি ইয়াতিম বালকের জমি ক্রয় করে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। হিজরীর প্রথম বছরে রাসূল [সা]-এর ৫৩ বছর পূর্ণ হয়। হিজরীর দ্বিতীয় সনে ইসলামের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এসময় বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিজরীর চতুর্থ সনে ইয়াহুদীদের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ হয়। পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সপ্তম হিজরী সনে খয়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অষ্টম হিজীতে মক্কাবিজয় করা হয়েছিল। হিজরীর নবম সনে আল্লাহপাক হজ্জ মুসলমানদের জন্য ফরজ করেন। দশম হিজরীতে হযরত মুহাম্মদ [সা] বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে বলেন। নবী করীম [সা] পরলোক যাত্রার পূর্বে সকলকে তার মাজারে সেজদা করতে নিষেধ করেন। এবং তার সঙ্গিদের মাজারে গিয়ে দোয়া করে বলেন, আমি অল্প দিনের মধ্যে তোমাদের কাছে আসছি। মৃত্যুর পূর্বে বৃহস্পতিবার নবীজীর রোগ আরও বেড়ে যায়। তখন নবীজীর বয়স ৬৩ বছর। রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে সোমবার দিবা পূর্ব রাত্রে হযরত মুহাম্মদ [সা] সুস্থ হয়েছিলেন। সোমবার প্রভাতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং আজরাইল [আ] বেদুইনের বেশে ঘরে আসার অনুমতি চাইলে, নবী কারীম [সা] অনুমতি দিলেন। জিব্রাইল [আ] এসে বলেন, আপনার জন্য বেহেশত সাজানো হয়েছে, সকলে অপেক্ষা করছে। রাসূল হাত তুলে বিদায় নিয়ে চক্ষু বন্ধ করলেন। আল্লাহ তায়ালার  অশেষ অনুগ্রহে রাসূলের জানাজার নামাজ আবু বকর [রা], গোসল আলী [রা] করানোর সুযোগ পেলেন। এরপর মদিনাতে বয়ে গেল শোকের তুফান।



www.pathagar.com

# পারিবারিক সংকট নিরসনে রাসূল [সা]-এর দর্শন

**মোঃ আব্দুস ছালাম**

Islam is the complete code of life ইসলাম একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সবধরনের সমস্যা নিরসনে ইসলামের সমাধান আছে। আল্লাহর রাসূল [সা] এ সকল সমস্যার বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান প্রকাশ করেছেন। যেমন:

মানুষের জীবনে একটি পর্যায়ে পরিবার গঠন করতে হয়। তখন একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা জৈবিক চাহিদা পূরুণের জন্য একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এ বন্ধনই পারিবারিক বন্ধন। ইসলাম একমাত্র ধর্ম যেখানে পারিবারিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং রাসূল [সা] একমাত্র মহামানব যিনি উপদেশ বাণী প্রচার করার পাশাপাশি পারিবারিক সম্পর্ক Practical দেখিয়েছেন। বিবাহ করার পর স্ত্রীর সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতে হবে তার সকল চিত্র রাসূল [সা] প্রমাণ করেছেন। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে কেমন ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবহার করতে হবে, হযরত মুহাম্মদ [সা] একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে তা বাস্তবায়ন করেছেন।

যাদের স্বামী মারা যায় তাদের জন্য ইসলামের বিধান হল, তাদের নির্দিষ্ট সময় [ইদ্দত] পার হলে তারা ইচ্ছা করলে বিবাহ করতে পারে। যদি চরিত্র হেফাজত করতে পারে তবে তা আলাদা বিষয়। অনেক মহিলা আছে যাদের অকালে স্বামী মারা যায়। যেমন–যুদ্ধের ময়দানে, দূর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে। তাদের তো জৈবিক চাহিদা আছে। কিভাবে তারা তাদের জৈবিক চাহিদা মিটাবে, অবৈধ পন্থায় তো জৈবিক চাহিদা পূরণ করা যাবে না। রাসূল [সা] এর দর্শন হলো সক্ষম সামর্থবান পুরুষ তাদের বিবাহ করবে। একজন পুরুষ কিন্তু স্ত্রী মারা যাবার পর সাধারণত : বিয়ে না করে থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে এ চিত্র দেখা যায় না যে, বিধবা মহিলাদেরও বিবাহ দিতে হবে। আমরা এ চিত্র না পাল্টানোর কারণে সমাজ ব্যবস্থা জেনা-ব্যভিচার দিয়ে ভরে গেছে।



www.pathagar.com

আমাদের সমাজে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, রাসূল [সা] এর দর্শন চালু না থাকার কারণে ধর্ষণ, জেনা-ব্যভিচার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যে সকল নারীরা আজকে ভাসমান, যারা যৌনাচার করে জীবিকা নির্বাহ করছে, রাসূল [সা] এর দর্শন হলো তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন না করলে একাকি করা সম্ভব নয়। এজন্য রাসূলের আদর্শের সরকার প্রতিষ্ঠা করা ঈমানী দায়িত্ব।

আমাদের সমাজে নারীদের মনোভাবও পাল্টানো দরকার। নারীদের মনে করতে হবে যে মেয়েটার স্বামী মারা গেছে, সে যদি আমার বোন হতো, আমার খালা হতো, আমার একান্ত বান্ধবী হতো, অথবা আমার মেয়ে হতো ইত্যাদি। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বিবাহ বন্ধন না থাকার কারণে সমাজে যে যৌনাচার চালু আছে তা রক্ষা করে আদর্শ সমাজ গঠন করা সহজ হবে। আজকের সমাজে অনেক নারী পুরুষ আছে যারা ইসলামী আদর্শ চর্চা না করার কারণে, রাসূলের আদর্শ গ্রহণ না করার কারণে বিবাহ বন্ধন ছাড়া জৈবিক চাহিদা পুরণ করছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, পরকালীন চিন্তা করুন, রাসূলের আদর্শ ধরুন, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন।

ইসলাম ধর্ম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নাই যে ধর্মে শৃঙ্খলা ভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা আছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে বলে দেয়া আছে কোন কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হালাল এবং কোন কোন নারীর সাথে বিবাহ হারাম। অন্য যে কোন ধর্মে এত সুন্দর বিধান নেই। অন্য ধর্মের যৌন সম্পর্কটা অনেকটা পশুর মতো। কেবল মাত্র যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি হলেই তাতের সম্পর্ক শেষ। তারা পশুর মতোই একাধিক নারীর সাথে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদেরকে নাড়া দেয় না। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ [সা] এ ক্ষেত্রে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] বলেছেন," পরিবার গড়ে তোলা আল্লাহর ইবাদত এবং প্রশান্তির "Power House"। সমাজ জীবনে যদি পারিবারিক শৃঙ্খলা না থাকে, তাহলে মানুষ বন্যজন্তু জানোয়ারের রূপ ধারণ করে। আমরা যদি আমাদের সমাজ জীবনে একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব যে, পরিবারে আল্লাহর রাসূল [সা]-এর আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে সেখানে ভবিষ্যত বংশধর কল্যাণধর্মী আদর্শ দ্বারা বিবেকবান মানুষ উপহার দিচ্ছে। পক্ষান্তরে যে পরিবারে ইসলামী আদর্শ, নবীর আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে না, সেখানে আমরা শিক্ষিত নাগরিক দেখছি। কিন্তু তারা কল্যাণকামী মানুষ নয়। তারা ব্যক্তি কেন্দ্রিক। সমাজ, দেশ, জাতির জন্য তারা কল্যাণ ধর্মী নয়। পরকালীন মুক্তির চিন্তা তাদেরকে নাড়া দেয়না। বস্তুবাদী শিক্ষায় তারা তাদের মেধাকে ঝাঁঝরা করেছে। সুতরাং কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নবী মুহাম্মদ [সা] এর আদর্শে পরিবার গঠন করতে হবে।

সন্তান-সন্ততি হলো একটি আদর্শ পরিবারের সৌন্দর্য, যদি তা হয় রাসূলের আদর্শের নমুনায়। এজন্য আল্লাহ কুরআনে শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে এমন স্ত্রী



www.pathagar.com

ও সন্তান দান কর, যা আমাদের নয়নে তৃপ্তি আনয়ন করে।" রাসূল আরো বলেছেন, "মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। বাকী থাকে তিনটি আমল। তার মধ্যে নেক সন্তানাদির কথা উল্লেখ আছে। আবার সন্তানদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের জন্য কুরআন পাকে আল্লাহ সুন্দর মীরাসী বন্টন ব্যবস্থা করেছেন। এ বিধান মানলে সমাজ ও পরিবারে অনাবিল শান্তি প্রবাহিত হয়। কুরআন এর আদর্শ ও রাসূলের মডেল যারা গ্রহণ করতে পারে না তাদের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের জের ধরে অনেক প্রাণ হানি ঘটে থাকে। আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট তার প্রমাণ।

অনেক পরিবারে দেখা যায় শুধু কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে অনেক পুরুষ একাধিক বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে রুঢ় আচরণ করে। কিন্তু যে পুরুষ আল্লাহর রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করেছেন তিনি ছাড়া। কারণ রাসূল [সা] তার পারিবারিক দর্শনে বলেছেন : যার কন্যা সন্তান হওয়া সত্বেও ঐ সন্তানদের যত্নের সাথে লালন পালন করবে এমন মা-বাবা রাসূলের সাথে জান্নাতে থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন, "আমি যাকে ইচ্ছা সন্তান পুত্র বা কন্যা দান করি, যাকে ইচ্ছা কিছুই দিই না।" তাই রাসূলের অনুসরণ পরিবার প্রথা মজবুত রাখার সর্বোত্তম মাপকাঠি। অথচ সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ মহান আল্লাহতাআলার হাতে।

রাসূলের আদর্শভিত্তিক পরিবারে পর্দার বিধান কড়াকড়ি ভাবে অনুসরণ করা হয়। পর্দা ইসলামী পরিবারের একটি Vital issue। পর্দা পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি করে এবং সমাজটাকে শৃঙ্খল রাখে। রাসূল [সা] বলেছেন, "দাউসরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ হাদীসের মূল কথা হলো, যে পরিবারে অশ্লীলতা বিদ্যমান অথচ পরিবার কর্তৃপক্ষ এটা প্রতিরোধ করে না, তারা দাউস, শুধুমাত্র হিজাব না থাকার কারণে আজকে সমাজে ধর্ষণ বেড়ে গেছে। উদাহরণঃ বিদ্যুতের দুটি তার নেগেটিভ ও পজেটিভ কানেকশন দেওয়ার পর যদি প্লাষ্টিক বা পর্দা দিয়ে ঢাকা না হয় তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। আর যদি পর্দা দিয়ে ঢাকা হয় তাহলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, আজকে রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করার কারণে সরকারীভাবে তাদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। পরিবার হলো University এর VC হলো বাবা-মা। শিক্ষক হলেন দাদা-দাদী, নানা-নানী, বড় ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী সদস্য। তাই পারিবারিক সংকট মোকাবেলায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলীকে আগে রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে, তবে, শিশুরা সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে এবং মানব কল্যাণ সমৃদ্ধ জাতি আমরা পাব। স্বামী-স্ত্রীতে যদি মনোমালিন্য হয় আল্লাহর রাসূল [সা] তার বিজ্ঞ সমাধান দিয়েছেন। যদি সমাধান না হয় তাহলে পরামর্শের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে ছাড়াছাড়ির বিধান আছে। অর্থাৎ পরিবার কখনও বিষণ্ন থাকতে পারে না। তবে রাসূল [সা] বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর, তার মধ্যে এমন গু'নাবলী থাকতে পারে, যা



www.pathagar.com

তোমাদের প্রশান্তি আনতে পারে।" অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী দু'জন চাকরীজীবী হওয়ার কারণে পারিবারিক অশান্তি বাড়তে পারে। তাই রাসূলের দর্শন হলো স্ত্রীদের এধরণের কাজে না যাওয়াই উত্তম। যদি স্ত্রী চাকুরী করে তাহলে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী চেয়ে টাকা নিতে পারবে না। যদি স্বচ্ছায় দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। এভাবে রাসূল [সা] নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

আজকে পশ্চিমারা তাদের সমাজ ব্যবস্থা হতে শান্তি না পেয়ে রাসূলের আদর্শের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আজকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করছে। সুতরাং যদি সহজভাবে পারিবারিক সংকট মোকাবেলা করতে চাই তাহলে রাসূলে জীবনাদর্শ অনসরণ করা দরকার।

পরিশেষে আল্লাহর রাসূল [সা] এর আদর্শের মাধ্যামে সংকট নিরসনের পর, রাষ্ট্রীয় ভাবে যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করলেন, তারপর ইসলামী পারিবারিক আইন কুরআনের আলোকে জারি করে পরিবার ও সমাজ পরিচালনার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করলেন। আল্লাহ কুরআন পাকে দেওয়ানী আইন ৭০টি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন ৭০ এবং Civillaw দন্ডবিধি-Penal Law ৩০ এসব বিধানের আলোকে পারিবারিক সংকট নিরসননীতি তৈরী করে তা সমাজে বাস্তবায়ন করেছেন। আজকেও আমরা যদি তা গ্রহণ করি তাহলে সুন্দর কল্যাণকামী সমাজ গঠিত হবে। বিশ্বের যে সকল দেশ যতটুকু ইসলামী শরিয়া গ্রহণ করেছে তারা ততটুকু সফল হয়েছে। সুখ ও শান্তি পেতে হলে আমাদেরও তাই করতে হবে।

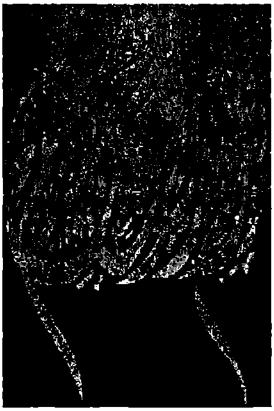



www.pathagar.com

# শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরনে রাসূলের [সা] পদ্ধতি

## জুবায়ের হুসাইন

নিরক্ষরতা বা মূর্খতা একটি জাতির জন্য বিরাট অভিশাপ। নিরক্ষরতা জাতিকে সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অক্ষরজ্ঞান না থাকলে ব্যক্তি তার কর্মপন্থা ও মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের প্রণালী ও নিয়মনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টির গুরুত্ব অধিক। আর সুখের কথা, মহানবীর [সা] এ ধরায় আগমন ঘটেছিল বিশ্বমানবতার শান্তি ও কল্যাণের বাহক হিসেবে বিশ্ববাসীর উন্নতি ও অগ্রগতির সকল পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য। এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি নিজেকে একজন সফল নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মানবীয় সফলতার সকল ক্ষেত্রে যথাযথ দিকনির্দেশনা দানের মাধ্যমে তিনি গোটা উম্মতকে একটি ফলপ্রসূ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা উপহার দিয়ে গেছেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। তাই মহানবী [সা] শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সাথে সাথে আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণেও জাতিকে যথার্থ দিকনির্দেশনা দান করেছেন।

মহানবী [সা] ছিলেন উম্মি। আরবি উম্মি শব্দের অর্থ নিরক্ষর। মনে রাখা দরকার যে, উম্মি আর মূর্খ কখনো এক কথা নয়। উম্মি বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে কোনো স্কুল-কলেজ বা মাদরাসায় লেখাপড়া করেননি। মূলত এটিও মহান আল্লাহতায়ালার হিকমত যে, তিনি মহানবীকে [সা] উম্মি বা নিরক্ষর হিসেবে প্রেরণ করেছেন যাতে পবিত্র কুরআন তাঁর রচিত বলে কেউ সন্দেহ পোষণ করতে না পারে এবং দুনিয়ার কোনো মানুষ যাতে তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে না পারে। তাই বলা যায়, দুনিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে লেখপড়া করেননি বলে তিনি উম্মি হলেও স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছিলেন তাঁর সরাসরি শিক্ষক। আর তিনি ছিলেন আল্লাহতায়ালার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সফল ছাত্র। আল্লাহপাকের দেয়া সে শিক্ষার আলোকেই মহানবী [সা] শিক্ষা ও জ্ঞান বুদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, "হে নবী! আমি আপনাকে এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা আপনি জানতেন না এবং আপনার পূর্বপুরুষরাও জানত না।"



www.pathagar.com

[সূরা আন'আম : ৯২] প্রিয়নবী [সা] নিজেই ইরশাদ করেন, "আমি বিশ্বাবাসীর শিক্ষকরূপে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি।"

শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে রাসূলের [সা] অসাধারণ ভূমিকায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শুধু তাঁর অনুসারী ভক্তবৃন্দের মুখনি:সৃত বক্তব্য থেকেই নয় বরং ইসলামের ঘোরবিরোধী এবং ইসলামের প্রতিপক্ষদের সারিতে অবস্থানকারী অনেক নিরপেক্ষ গবেষকের স্বীকারোক্তিতেও এর প্রমাণ মেলে। এ ক্ষেত্রে টমাস কারলাইলের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। টমাস কারলাইল বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'মুহাম্মদ [সা] ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ। কোনো শিক্ষকের সামনে তিনি বসেননি কোনোদিন, প্রচলিত পন্থায় তিনি কোনো আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করেননি, অথচ তাঁরই মুখনি:সৃত প্রতিটি বাক্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসাধারণ ও বৈচিত্র্যময় উপকরণ। প্রয়োজন ছাড়া তিনি কোনো কথাই বলতেন না এবং তখন তিনি নীরব থাকতেন। যখন কোনো কথা বলতেন তখন তা হতো বুদ্ধিদীপ্ত ও বিচক্ষণতা সমৃদ্ধ।' [Life of the Holy Prophet]

শিক্ষার প্রতি মহানবীর [সা] অনুরাগ ও তা বিস্তারে তিনি কতটুকু আগ্রহী ছিলেন, বদর যুদ্ধ-পরবর্তী একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বদর যুদ্ধে যেসব কাফির সৈন্য মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হয় তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা লেখাপড়া জানতো, নবী করিম [সা] তাদের মুক্তিপণ স্থির করলেন– দশটি ছেলেকে অক্ষরজ্ঞান দান করা। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লেখাপড়া শেখাবে। এরপর তারা মুক্ত হয়ে যাবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহানবী [সা] মুক্তিপণ হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থ-সম্পদ বা অন্য কিছুও নির্ধারণ করতে পারতেন। বিশেষ করে মুসলমানদের আর্থিক সঙ্কটের সে মুহূর্তে এমনটা করাই ছিল স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুসলিম জাতির মহান শিক্ষক, বিশ্ববাসীর মুক্তির মহান বার্তাবাহক প্রিয়নবী [সা] অর্থের লোভ করেননি। শিক্ষাকে তিনি অর্থের ওপরে প্রাধান্য দিলেন। এমনকি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি কট্টর ইসলামবিদ্বেষীদেরকেও শিক্ষকের মহান মর্যাদা দানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না। বরং জীবনের সর্বপ্রথম সুযোগেই তিনি শত্রুদের দ্বারা মদিনার প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সকলকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। মূলত শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে নবী করিমের [সা] এ অসাধারণ ভূমিকার ফলেই তৎকালীন আরবের চরম মূর্খ ও বর্বর জাতিকে তিনি বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা মানে হচ্ছে সুশিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা। তৎকালীন আরব সমাজে মূলত এই আদর্শ শিক্ষারই অভাব ছিল প্রকট; তাই সে যুগে ইমরুল কায়েসের মতো প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তা ইতিহাসের পাতায় জাহিলি যুগ হিসেবেই খ্যাতি লাভ করে। কারণ তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আদর্শ ও নৈতিকতার কোনো বালাই ছিল না। মহানবী [সা] এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং বুঝতে পারলেন এ অধ:পতিত জাহিলি জাতিকে একমাত্র নৈতিক ও আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই তারা একটি সভ্যসমাজে পরিণত হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি মূলত দু'টি ধারায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রথমত, শিক্ষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরব জাতিসহ অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত



www.pathagar.com

হয়ে গড়ে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। দ্বিতীয়ত, বহুবিধ বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করার মাধ্যমে শিক্ষার আলো-বঞ্চিত একটি জাতিকে সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

**শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা**

শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী করার জন্য এবং শিক্ষার প্রতি জন-মানসকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মহানবী [সা] পবিত্র কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, "যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহা কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।" [সূরা বাকারা : ২৬৯] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না এ দু'ব্যক্তি কি সমান হতে পারে?" আরো ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের মাঝে যারা জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।" [সূরা মুজদালাহ : ১১] এ ছাড়াও শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী [সা] নিজে বর্ণনা করেন, "পৃথিবীতে জ্ঞানী [আলিম] ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আকাশের তারকার ন্যায় যা পানি ও স্থলভাগকে করে আলোকিত।"

"জ্ঞান [ইলম] অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।"

"রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারারাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"

মূলত শিক্ষাকে ব্যাপক করার মাধ্যমে একটি সভ্য ও নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়াই ছিল নবী করিমের [সা] উপরোক্ত বাণীসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

**শিক্ষা বিস্তারে বাস্তব কর্মসূচি**

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের লক্ষ্যে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক মহানবী [সা] যেসব বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন তা নিম্নে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

**শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন :**

পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য মহানবী [সা] ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত দারুল আরকামকে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করেন এবং সেখানে দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বপ্রথম বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্র। এমনিভাবে হিজরতের আগে মদিনার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য নবী করিম [সা] মুসা ইবনে উমাইরকে [রা] শিক্ষক হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন। হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর [রা] মদিনায় আবু উসামা ইবনে যুরারার বাড়িতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে নবীজির [সা] নির্দেশ মতো সেখানে শিক্ষাকার্যক্রম চালু করেন। মদিনায় এটিই ছিল সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। হিজরতের পর প্রিয়নবী [সা] দীর্ঘ আট মাস যাবৎ আবু আইউব আনসারীর [রা] দ্বিতল ভবনের নিচ তলাকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তথায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। এটি ছিল মদিনার দ্বিতীয় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র।

**আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান** : নবী করিম [সা] শিক্ষাকার্যক্রমকে অধিকতর ব্যাপক ও সার্বক্ষণিক করার জন্য সাহল ও সুহাইল নামের দুই ভাইয়ের কাছ থেকে একটি জমি খরিদ করে সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা সুফ্ফা নামে সর্বাধিক পরিচিত।



www.pathagar.com

সেখানে তিনি সার্বক্ষণিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন। সে শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদেরকে বলা হতো আহসাবে সুফ্ফা। নিরক্ষর লোকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ছিল সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই শিক্ষাকেন্দ্রে মহানবী [সা] নিজে শিক্ষাদানসহ সার্বক্ষণিক শিক্ষক হিসেবে হযরত সাঈদ ইবনে আ'সকে [রা] নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক আল্লামা বালাজুরীর বর্ণনা মতে, হিজরি দ্বিতীয় সনে মহানবী [সা] দারুল কুররা নামে আরো একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, শুধু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, বরং দাওয়াত ও জিহাদী কর্মসূচির শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মহানবী [সা] নিয়মিত এসব শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে কোনো বেমানান কাজ পরিলক্ষিত হলে কিংবা কোনো বিষয়ে তাদেরকে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তা বন্ধ করে দিতেন এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়ার উপদেশ দিতেন। একবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে অকারণে হাসাহাসি করতে দেখে প্রিয়নবী [সা] সাথে সাথে তাদের মৃত্যু-পরবর্তী কঠিন অবস্থার কথা বলে হাসাহাসি থেকে বিরত থাকতে বলেন।

**শিক্ষাদান পদ্ধতি**

মহানবীর [সা] শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিকে কয়েকবার উচ্চারণ করে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদেরকে বিষয়টি কণ্ঠস্থ করিয়ে দিতেন। আবার কখনো লিখে রাখার পরামর্শ দিতেন এবং ছাত্ররা তা লিখে রাখতেন। নবী করিম [সা] যাদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতেন তাদেরকেও তিনি এ বলে উপদেশ দিতেন যে, তোমরা শিক্ষার্থীদের মেধানুযায়ী বিষয়াবলি উপস্থাপন করবে।

**শিক্ষক প্রেরণ**

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে অশিক্ষিত ও মূর্খ জাতিকে একটি সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার জন্য মহানবী [সা] প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি ভ্রাম্যমাণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দূর-দূরান্তে শিক্ষক প্রেরণ করেন। যার ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। হিজরি ১১ সালে মহানবী [সা] হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালকে [রা] ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করেন এবং একজন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। এমনভাবে হযরত আবু মুসা আশ'আরীকেও [রা] একটি এলাকায় পাঠানো হয়।

**প্রশিক্ষণকেন্দ্র :** যারা অন্যদেরকে শিক্ষা দেবেন, তাদের আগে প্রশিক্ষণ দেয়া অতীব জরুরি। তাই মহানবী [সা] মদিনার কেন্দ্রীয় শিক্ষালয়ে একটি প্রশিক্ষণ সেল স্থাপন করেন। দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহ থেকে মেধাবী যুবকদেরকে বাছাই করে মদিনায় এনে তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। অত:পর তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন।



www.pathagar.com

**মসজিদভিত্তিক শিক্ষা :** নবী করিম [সা] সাহাবায়ে কেরামকে নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেসব মসজিদকে ভিত্তি করে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষাকার্যক্রম চালু করার নির্দেশ প্রদান করেন। ওমানের নওমুসলিমদেরকে মসজিদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে নবী করিম [সা] যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বুখারী শরীফসহ নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রহসমূহে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

**অন্যান্য ভাষা শেখা :** প্রিয়নবী [সা] মাতৃভাষার লিখন ও পঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোক নির্বাচন করে তাদেরকে অন্যান্য রাষ্ট্রের ভাষা শিক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা করেন। হযরত যায়েদকে [রা] নবী করিম [সা] হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দেন এবং মাত্র সাত দিনে তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অনুরূপভাবে হাবসী, ফার্সি, সুরইয়ানী, গ্রিক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও মূর্খতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেমন বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষা ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

সুতরাং, মহানবী [সা] এক বিশেষ হিকমতের জন্য উম্মি হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হলেও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই গণ্ড মূর্খতায় আচ্ছাদিত আরব জাতি অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে সুশিক্ষার সম্মানজনক আসনে সমাসীন হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতের হার কম না হলেও আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতের অভাব যথেষ্ট। যার ফলে গোটা দেশ আজ নানাদিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত। আর এখন তো শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলাম ও নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার হীন ষড়যন্ত্র চলছে। পর্যায়ক্রমে জাতিকে নৈতিকতা বিবর্জিত একটি বর্বর জাতিতে পরিণত করার কাজ বেশ জোরেশোরেই এগিয়ে চলেছে। এখনি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। নইলে আগামী দিনে প্রিয় বাংলাদেশে নেতৃত্বের আসনে যারা সমাসীন হবে, তাদের দ্বার এ জাতির ভাগ্যোন্নয়নের কোনো আশা করা যাবে না।



www.pathagar.com

# সুন্নাতে রাসূল [সা] ও স্বাস্থ্য

## ডাঃ মোঃ শহীদুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন আমাদের উত্তম আদর্শ। পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ'। অর্থাৎ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। [সূরা আহজাব, আয়াত ২১] আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর স্বাস্থ্যকর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেই স্বাস্থ্যকর জীবন সম্ভব; একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আধুনিক সব ওষুধ সব ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগ ভালো করতে পারে না। নবী করিম [সা] তার বাস্তব জীবনে চর্চা করে দেখিয়ে দিয়েছেন, বিভিন্ন হাদিসে বলে গেছেন কিভাবে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ জীবনযাপন করা যায়। কিভাবে রোগ প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, তা তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে, যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান ততটা উন্নত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, হাই তোলার সময় তিনি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দিতে বলেছেন [সহীহ বুখারি]। হাই তোলা মানুষের একটি সাধারণ শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার। হাই তোলার সময় আমরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানি। আর এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস থেকে হাজারো জীবাণু মুখে প্রবেশ করতে পারে। জীবাণু যাতে মুখে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য নবী করিম [সা] হাই তোলার সময় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দিতে বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ [সা] ডান কাত হয়ে শুতেন। তাঁর ডান হাত রাখতেন ডান গালের নিচে। সাহাবীদেরকেও এভাবেই শুতে বলতেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ডান কাতে শোয়াই অধিক স্বাস্থ্যসম্মত। এতে হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপ পড়ে কম। পেটের ভেতর ভারী যকৃৎ ঝুলে থাকে না। ফলে পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে না। পাকস্থলীর স্বাভাবিক নড়াচড়া ঠিক থাকে এবং পাকস্থলীর ভেতরের খাদ্যদ্রব্য হজমের উপযোগী হয়ে সহজেই খাদ্যনালীর পরবর্তী অংশে চলে যেতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান যখন ততটা উন্নত ছিল



www.pathagar.com

না, সেই সময়ে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে নবী করীম [সা] এসব স্বাস্থ্যকর বিষয় চর্চা করে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে অজু করতে হয়। অজু কিভাবে করতে হবে, শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ ধুতে হবে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা যখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুইসহ ধৌত করবে। তারপর মাথা মাসেহ করবে, আর দু'পা গিরা পর্যন্ত ধুবে।" [সূরা মায়েদা, আয়াত ৬] অজুর ফরজ এগুলো। অজু করার সময় শরীরের এসব অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াও তিনবার করে হাত ধুতে হয়, কুলি করে মুখ ধুতে হয়, নাক পরিষ্কার করতে হয়। এগুলো অজুর সুন্নাত। নিয়মিত হাত ধোয়ার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা যায় বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত। অজুর মাধ্যমে হাত ধোয়ার পর খুব কম জীবাণুই হাতে লেগে থাকতে পারে। তাই নিজের ও অন্যের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কাও কমে যায়। মুখ ও দাঁতের যত্নেও হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন যথেষ্ট যত্নবান। সাহাবীদেরকেও তিনি মুখ ও দাঁতের যত্নের কথা বলেছেন। দিনে পাঁচবার অজু করার সময় কুলি করে মুখ ধোয়ার মাধ্যমে মুখের জীবাণুর সংখ্যা অনেক কমে যায়। দাঁত মাজা বা ব্রাশ করার ফলে দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকা ময়লা ও জীবাণু পরিষ্কার হয়। দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। দাঁতের ক্যারিস বা ক্ষয়রোগ হওয়ার আশঙ্কা কমে। প্রতিবার অজুর আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। আমাদের জন্য বোঝা হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকলে হযরত মুহাম্মদ [সা] সবাইকে প্রত্যেক ইবাদতের আগে দাঁত মাজার নির্দেশ দিতেন। [সহীহ বুখারি] মুখ ধোয়ার পরই নাক ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এর মাধ্যমে নাকের ভেতর লেগে থাকা ধুলোবালি আর রোগজীবাণু পরিষ্কার হয়। সাধারণভাবে বেশির ভাগ রোগজীবাণুই মুখ ও নাকের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। অজু করার সময় দিনে পাঁচবার মুখ ও নাক ধুয়ে ফেলার ফলে রোগব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়। অজুর এসব সুন্নাত কাজ আমাদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এবং রোগব্যাধিমুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সুন্নাত অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। অতিভোজন তিনি পছন্দ করতেন না। অতিভোজন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, অতিভোজনের ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ইত্যাদি হতে পারে। নবী করীম [সা] পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাবার দিয়ে এবং এক-তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে বলেছেন। বাকি এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখতে বলেছেন। [ইবনে মাজাহ]

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] নিয়মিত মধু খেতেন। প্রতিদিন সকালে অন্য কিছু খাওয়ার আগে এক কাপ পানিতে এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করতেন। এরূপে মধু পান



www.pathagar.com

করলে খাদ্যনালীর কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। বিভিন্ন রোগে উপকার হয়। রোগজীবাণুও ধ্বংস করতে পারে।

খোলা পানীয় ও খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রাসূলুল্লাহ [সা] খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় ঢেকে রাখতে বলেছেন। [সহীহ্ বুখারি] খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার কথাও বলেছেন তিনি। [সহীহ্ বুখারি]

সুস্থ থাকার জন্য নবী করীম [সা]-এর আদর্শকে আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, "বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১]।

www.pathagar.com

# শি'বে আবু তালিব উপত্যকায় অন্তরীণ মুহাম্মদ [সা]

**আরিফুল ইসলাম সোহেল**

আসমান ও জমিনের শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও পবিত্রতম মানুষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]। সত্যের পথে ঈমানী পরীক্ষায় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে শিবে আবু তালিব উপত্যকায় অর্ধাহার ও অনাহারে বন্দী অবস্থায় জীবনী শক্তি প্রায় নি:শেষিত হয়ে পড়েছিল। রাসূল [সা] এর প্রিয়তম চাচা আবু তালিব বন্দীরের মধ্যে অন্যতম। এ জন্য রাসূল [সা] এর দু:খের শেষ ছিল না। অপলক দৃষ্টিতে বৃদ্ধ চাচা আবূ তালিবের দিকে তাকিয়ে দু'চোখের পানিতে বুক ভাসাতেন। আরবের শ্রেষ্ঠ বণিক তিনি। বয়সের ভারে ন্যুজ। তার বয়স ৮০ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছে। ক্রমাগত কয়েক বছর যাবত দু:খ-দুর্দশা, বিপদ-মুসিবতের কারণে তার স্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে ভেঁঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে শিবে আবু তালিব গিরিবর্তের অবরোধ তার শক্তি-সামর্থ্য নি:শেষ করে দিয়েছিল। অর্থ-বিত্তে চাচা আবু তালিব ছিলেন আরব সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষুধার কষ্ট কী তা তিনি কখনও অনুভব করেননি। শুধুমাত্র স্নেহভাজন ভাতিজা মুহাম্মদকে [সা] ভালবাসার জন্য শিবে আবু তালিবের বন্দী জীবনে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অসম্ভব কষ্ট করেছেন তিনি। চাচার এই আত্মত্যাগের জন্যই রাসূল [সা]-এর দু'চোখের পানি অঝোর ধারায় ঝরতো। নিজের কথা ভেবে দু:খ ছিল না তাঁর। দু:খ শুধু বয়োবৃদ্ধ চাচা আবু তালিব, প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা [রা]হ বনী হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের বন্দী মাসুম শিশু সহ সঙ্গী-সাথীদের জন্য। তারা সত্য পথের পথিক ও রাসূল [সা] এর বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রসেনানী। যে সকল অগ্রসেনানী শুধুমাত্র সত্যের পথ অবলম্বন করার কারণেই বন্দী বেশে শিবে আবু তালিব নামক উপত্যকায় কারাবরণ করে সুদীর্ঘ ২ বছর অন্তরীণ ছিলেন।

সম্প্রতি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশ্ব বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ- "আর-রাহীকুল মাখতুম" এর ১৩৮ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা শিবলী নো'মানীর সিরাতুন্নবী [সা], কবি গোলাম মোস্তফার "বিশ্বনবী"-সহ বেশ কয়েকটি সিরাত গ্রন্থে শিবে আবু তালিবে রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ৩ বছর আন্তরীণ থাকার কথা বলা হয়েছে।



www.pathagar.com

**শিবে আবু তালিবে অন্তরীণ [কারাবরণের] প্রেক্ষাপট:**

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ লক্ষ্য করলেন যে, অন্যায়-অত্যাচার এবং নানাবিধ বাঁধা-বিপত্তি সত্বেও আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ [সা]-এর নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়েই চলছে। তারা ঈমানী চেতনায় সম্মুখ-সমরে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবের মিছিল নিয়ে রাসূল [সা] ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। সে মিছিলে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন দুর্দান্ত প্রতাপশালী হযরত ওমর ফারুক [রা] এবং বীর সৈনিক হযরত আমির হামজা [রা]-এর মত নেতৃত্ব। অপর দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হাবশার অধিপতি নাজ্জাশী মুসলমানদের স্ব-সম্মানে আশ্রয় দান করে ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছেন। এদিকে হাবশা ত্যাগ করে মক্কার প্রতিনিধিদেরকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যা কোন ভাবে মেনে নিতে পারেনি আবু জাহ্লসহ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের অবস্থান ছিল খুবই সুদৃঢ়। তাদের ভয়-ভীতির কারণেই মক্কার ব্যক্তিবর্গ আবু জাহ্ল ভয়ে সামাজিক ভাবে রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীদের বয়কট করে। আবু জাহ্ল ও তার বাহিনী রাসূল [সা]কে হত্যার পরিকল্পনা সহ সঙ্গী-সাথীদের চিরতরে এক সঙ্গে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিল। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ মক্কার সমুদয় গোত্রের সমন্বয়ে বনি-হাশেম ও বনু-মুত্তালিব গোত্রের সাথে পক্ষপাতিত্বমূলক একটি চুক্তি সম্পাদন করলো। যে চুক্তি বাস্তবায়নে শর্ত জুড়ে দেয়া হল:

১। মক্কার কোন ব্যক্তি বনি হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সাথে আত্মীয়তা করবে না।

২। উক্ত গোত্রদ্বয়ের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে কোন প্রকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করবে না।

৩। এমনকি, কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যও পাঠাবে না। সেই সাথে যতদিন পর্যন্ত তারা [বনি হাশেম ও বনু মুত্তালিব] মুহাম্মদ [সা]কে হত্যা [নাউযুবিল্লাহ] করার জন্য আমাদের [কুরাইশ] হাতে সমর্পণ না করবে ততদিন পর্যন্ত এ চুক্তি বলবৎ থাকবে।

এ চুক্তিপত্রটি মনসুর-ইবনে-ইকরিমা ইবনে আমের ইবনে হাশেম লিখেছিল। কারো কারো মতে নযর ইবনে হারেস লিখেছিল। কিন্তু সঠিক ইতিহাস হলো, এই চুক্তিপত্রটি স্বহস্তে লিখেছিল বোগাইজ ইবনে আমের ইবনে হাশেম। লিখিত চুক্তিপত্রটির পবিত্রতার ছাপ দেয়ার জন্য কাবা মন্দিরে আটকিয়ে রাখার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছিল। সেই চুক্তি মতে, নবী কারিম [সা] এবং তাঁর গোত্রকে বন্দী করে সবাইকে একসঙ্গে ধ্বংস করে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শেষ পর্যন্ত চাচা আবু তালিব অপারগ হয়ে রাসূল [সা]কে তাদের হাতে তুলে দেবে না মর্মে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। সেই সাথে সমাজ সংসার ছেড়ে দিয়ে রাসূল [সা]সহ বনি হাসেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের নারী-পুরুষ ও শিশুসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাধ্য হয়ে গিরি-দূর্গ শিবে আবু তালিবের মধ্যে আত্মনির্বাসিত হলেন। ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পিছনে পড়ে থাকলো। এই সঙ্কীর্ণ গিরি-দূর্গের মধ্যে-সুদীর্ঘ ৩ টি বছর কারারুদ্ধ জীবনে রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-



www.pathagar.com

সাথীদের নিয়ে কি যে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, তা বর্ণনা করলে বুকের পাজর ভেঙ্গে যায়। অশ্রু ধারায় ভরে উঠে দু'চোখের পাতা। শুধুমাত্র সত্যের পথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে স্বক্রিয় থাকার কারণেই ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ শি'বে আবু তালিবে রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীদের এই অন্তরীণ কারাবাস।

**বন্দী জীবনে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা ও ধৈর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন**

শ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল [সা]। বিশ্ব মানব সভ্যতার যাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। যিনি বিশ্ব মানবতার জন্যই শুধু নয়, সকল সৃষ্টির জন্যই একমাত্র অনুপম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা উসওয়াত। সেই মহা মানবের শিবে আবু তালিবের বন্দী জীবনে কালিমার বিপ্লবী ঝান্ডা উড্ডীন ও সত্য প্রচারের সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য কুরাইশ নেতারা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় শুধু দেয়নি বরং হযরত মুহাম্মদ [সা] যেখানেই সত্যের বাণী প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছেন, সেখানেই একদল লোক তার পশ্চাত থেকে রাসূল [সা] এর নামে নানা কুৎসা রটনা করতো। কেউ বলতো, এই লোকটি জাদুকর! কেউ বলতো এটা একটা ভন্ড তপস্বী! কেউ বলতো এ একজন মায়াবী কবি ! কেউ বলতো এ একটা আস্ত পাগল! এর কথায় তোমরা কান দিও না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এত সব অপপ্রচার এবং চরম অত্যাচারের পরেও রাসূল [সা] নিরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছেন। দিয়েছেন ধৈর্য্যের পরিচয়। বন্দী জীবনে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে রাসূল [সা] এমন সব ত্যাগ ও কুরবানীর উপমা পেশ করেছেন, যা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। যুগিয়েছে ত্যাগ ও কুরবানীর পথে নতুন উজ্জীবনী শক্তি। যে ত্যাগ ও কোরবানী প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য। শত বাধা-বিপত্তি, জেল-যুলুম, উপেক্ষা করে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার। চলতে শিখাবে রক্ত-পিচ্ছিল কন্টকাকীর্ণ সিরাতুল-মুস্তাকিমের পথে। যে পথ ধরেই ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় জালিমের বন্দীশালায় জেল-যুলুম, হুলিয়া আসবে। সত্যের পথিকদের শরীর হবে ক্ষত-বিক্ষত, রক্ত ঝরিয়ে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মত ঈমানী পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। যেমনটি হয়েছিলেন, শি'বে আবু তালিবে বন্দী অবস্থায় মুহাম্মদ [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীরা। বন্দী জীবনে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় ৩টি বছর এত কঠিন ছিল যে, জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য তাদেরকে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কস [রা] ক্ষুধার জ্বালায় শি'বে আবু তালিবে বন্দী বেশে এক রাতে একটি শুকনো চামড়া আগুনে ঝলসিয়ে ক্ষুধা নিরারণ করেছিলেন। পানি ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে বৃক্ষপত্র ভক্ষণের ফলে তাদের মল ছাগ ও মেষাদির মলের ন্যায় হয়ে পড়েছিল। এই ৩ বছরের মধ্যে তাদের মধ্যকার শিশু পুত্র-কন্যাসহ বন্দীবস্থায় অনেকেই মৃত্যু বরণ করে। এর পরেও নিষ্পাপ মাসুম ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা যখন ক্ষুৎ-পিপাসায় অস্থির হয়ে গগণ বিদারী চিৎকার করত, তখন আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলেও বাইরে থেকে পাষন্ড হৃদয় কুরাইশরা সে ক্রন্দন শুনে অট্টহাসিতে ফেটে



www.pathagar.com

পড়তো। আনন্দ আর উচ্ছাসে সুখ অনুভব করতো বেঈমান কুরাইশ নেতারা। আবার তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ও নেতৃবর্গ দু:খিতও হতো। স্বহৃদয় ব্যক্তিদের মাঝ হতে হযরত খাদীজা [রা] এর নিকটাত্মীয় হাকিম ইবনে হাবাম স্বীয় দাসের মাধ্যমে হযরত খাদীজা [রা]-এর নিকট বন্দীদের জন্য সামান্য খুরমা ও যব পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আবু জাহ্ল দেখতে পেয়ে তা জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। আবু বোখতারী সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন: "এক ব্যক্তি তার ফুফু খাদীজার [রা] নিকট সামান্য খাবার পাঠাচ্ছে তাতে তুমি বাঁধা দিচ্ছ কেন? তুমি এত নিচ!" এ ভাবে হিসাম ইবনে আমেরী নামে এক ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের নিকটে গোপনে শিবে আবু তালিব কারান্তরালে খাবার পাঠাতেন। যা কোন ভাবে মেনে নিতে পারেনি আবু জাহ্লসহ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের অবস্থান ছিল খুবই সুদৃঢ়। একদিকে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও শয়তানী লীলা; অপর দিকে সেই অবস্থান থেকে ধৈর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও মনুষত্বের উজ্জল দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসীর জন্য স্থাপন করলেন: শিবে আবু তালিবে বন্দী রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীরা। বন্দী বেশে রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীদের ত্যাগ, সংযম ও সত্যনিষ্ঠা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সত্যের পথে ছিলেন অটল-স্থির। নেতার প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য, আল্লাহর উপরে অবিচল আস্থা ও নির্ভরতা ইতিহাসের পাতায় বিরল। সত্য ও নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ, সকল দু:খ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত, বন্দী অবস্থায় তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়নি। তারা জীবনকে বাজি রেখে কেবলমাত্র সত্যকে আলিঙ্গন করে একমাত্র মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়ার প্রত্যয়ে রাসূল [সা]-এর সাথে বন্দী জীবনে ধৈর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কৃতকার্য হয়েছেন ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায়। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ ঘোষণা করা হলো:

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জান-মাল ও ফসলাদি সহ সম্পদের ক্ষতি দ্বারা। যারা ধৈর্য্যের সাথে এর মোকাবেলা করে, তুমি সে সব ধৈর্য্যশীলদের জন্য সুসংবাদ দাও। যারা বিপদ-আপদে উপনীত হলে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং বলে, নিশ্চয় আমরাতো আল্লাহর জন্যই একদিন আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এ আয়াতের বাস্তবতার আলোকে প্রিয় রাসূল [সা] শিবে আবু তালিবের বন্দী জীবনে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় বিচলিত না হয়ে ধৈর্য্যের সাথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে জারী রেখে ছিলেন তার মিশনারী কাজ।

### নীতির প্রশ্নে আপোষহীন এবং সত্যের প্রচার ও বিকাশে নির্ভীক

আশ্চর্যের বিষয়! এত বড় দূর্দিনেও হযরত মুহাম্মদ [সা] তাওহীদের বিপ্লবী ঘোষণা–কালেমার পথে এক আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না। সমস্ত আরাধনা পাওয়ার একমাত্র সত্ত্বা আল্লাহ্। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। যিনি আসমান ও জমিনের অধিপতি রাজাধিরাজ। যার কাছে একদিন আমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সুতরাং, রাসূল [সা] পৌত্তলিক



www.pathagar.com

সংস্কৃতি, তথা প্রতিমা পূঁজাকারীকে তাওহীদের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার আহবান জানান। যা আবু জাহ্‌ল সহ আরবের কুরাইশ নেতারা মেনে নিতে পারেনি। আবু তালিবের কাছে এর প্রতিকার চাইলে তিনি বিষয়টি নিয়ে রাসূল [সা]-এর সাথে আলোচনা করেন। নীতির প্রশ্নে আপোষহীন, নির্ভীক, বিপ্লবী রাসূল [সা] দৃঢ়চেতা মানসিকতা নিয়ে সুস্পষ্ট ও দ্বার্থহীন কণ্ঠে চাচা আবু তালিবকে জানিয়ে দেন "আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, এর পরিবর্তে যদি তারা এটা কামনা করে যে, আমি কালেমার মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারে বিরত থাকি, তাহলেও আমি তা করব না। ইসলামের সু-মহান বার্তা বিপ্লবী কালেমার ঝান্ডা নিয়ে হেরার পথের আলো জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দিষ্ট সংগ্রামে অন্তত পক্ষে আমি আমার এ জীবন বিলিয়ে দেব।" আবু তালিব নবীর এ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও নীতির প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব লক্ষ্য করে সত্য প্রচার ও প্রসারে তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। যার ফলশ্রুতিতে শি'বে আবু তালিবে ৩টি বছর বন্দী বেশে হযরত মুহাম্মদ [সা] তার মিশনারী কাজ স্থগিত রাখেননি। প্রতি বছর অর্থাৎ ৮, ৯ ও ১০ম হিজরীর জিলহজ্জ মাস পবিত্র বলে পরিগণিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে হজ্জ মৌসুমে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত জনতার সামনে কালেমার বিপ্লবী ঘোষণা সহ সত্যের প্রকাশ ও প্রচারে নির্ভীক দা'য়ীইলাল্লাহর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বন্দী জীবনের শত দু:খ কষ্ট সহ্য করেও দাওয়াতী কাজের মিশন অব্যাহত রেখেছিলেন।

## আল্লাহর সাহায্যে শিবে আবু তালিবের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ

সুদীর্ঘ ৩ টি বছর শিবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ থাকার পর শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের পক্ষ থেকে রাসূল [সা] ও তার সঙ্গী-সাথীদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হলো। চুক্তি ভঙ্গ করতে কুরাইশদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা শিহাব ইবনে আমের ও আব্দুল মুত্তালিবের দৌহিত্র যুবায়েরকে সঙ্গে নিয়ে উভয়ে মিলে মোত'আম ইবনুল আদ্দির কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে আবুল বোখতারী, ইবনে হিশাম এবং যুম'আ ইবনুল আসওয়াদ এ চুক্তি ভঙ্গ ও তাদের মুক্তি আন্দোলনে সমর্থন দান করে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে শিবে আবু তালিব থেকে বন্দীদের মুক্তি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরদিন উল্লেখিত সবাই মিলে পবিত্র হেরেম শরীফে উপস্থিত হয়ে সেখানে যুবায়ের সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বলেন:

"হে মক্কাবাসীগণ! এটা কেমন কথা যে, আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করবো। ভালো ভালো খাবার খাব। আর বন্দী বনি হাশেমদের ভাগ্যে সামান্য খাবারও জুটবে না? বন্দী বেশে তারা মানবেতর জীবন যাপন করবে; তা হয় না। খোদার কসম! এ অন্যায় চুক্তিপত্র ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।" এ কথা শুনার পর আবু জাহ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলো: "সাবধান! এ চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষে কাউকে কিছু করতে দেয়া হবে না।" যুম'আ দাঁড়িয়ে বললো, "তুমি মিথ্যাবাদী! এ চুক্তি



www.pathagar.com

সম্পাদনের সময় আমরা রাজী ছিলাম না।" এমন বাক-বিতন্ডার মধ্য দিয়ে যখন দু'পক্ষ তুমুল হট্টগোল শুরু করলো; ঠিক সে সময় বন্দীদের জন্য আল্লহর পক্ষ থেকে সাহায্যের নজির উপস্থাপন করার জন্য রাসূল [সা]-এর পরামর্শে বৃদ্ধ চাচা আবু তালিব গিরিগুহা থেকে বাইরে এসে উক্ত হট্টগোল সভা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, "তোমাদের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র আল্লাহর মনোনীত নয়। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখ চুক্তিপত্রটি কীট ও পোকা-মাকড় কেটে নষ্ট করে ফেলেছে। এ কথা যদি সত্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি মুহাম্মদকে তোমাদের হস্তে সমর্পন করতে রাজি আছি। আর যদি সত্য হয়; তবে তোমাদের উচিৎ আমাদের সঙ্গে এইরূপ শত্রুতা না করে বন্দী জীবন থেকে আমাদের মুক্তি দেয়া।" কুরাইশ নেতৃবর্গ কৌতূহল নিয়ে বললো, "এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এটাও সত্য।" মোত'আর ইবনে আদ্দি নামক এক সাহসী ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে হেরেম শরীফে আবু জাহ্ল কর্তৃক সংরক্ষিত চুক্তিপত্রটি দ্রুত নিয়ে এলে উপস্থিত সকলেই দেখতে পেলেন একমাত্র আল্লাহর নামটি ছাড়া আর সমস্তই কীটদষ্ট হয়ে পাঠের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। মোত'আম ইবনে আদ্দি অবশিষ্ট চুক্তিপত্রটি স্বহস্তে ছিঁড়ে ফেলেন। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও চুক্তিপত্র লেখক বোগাইজ ইবনে আমেরের হাত অবশ হয়ে যাওয়ার দৃশ্যপট সামনে রেখে আবু জাহ্ল ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ নিরুৎসাহ হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। অত:পর জনতা ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে আবু জাহ্লকে পদদলিত করে মোতআম ইবনে আদ্দি, ইবনে কায়েম, যুম'আ ইবনুল আসওয়াদ ও আবুল বোখতারী প্রমুখ মিলে সশস্ত্র হয়ে যোবায়েরের নেতৃত্বে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে তৎক্ষণাৎ শিবে আবু তালিব দুর্গে গমন করে বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে আসলেন। রাসূল [সা]সহ তার সঙ্গী-সাথী বনি হাশেম গোত্রকে অবরোধ থেকে উদ্ধার করে শিবে আবু তালিবের অন্তরীণ জীবন থেকে নিয়ে এলেন স্বাধীন, খোলা-আকাশ ও নির্মল আলোর সমাজে। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ ৩ বছর শিবে আবু তালিব কারান্তরালে বন্দী জীবন থেকে সবাই মুক্তি লাভ করল।

**উপসংহার** : কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে করেছিল, মুহাম্মদ [সা.] ও তার ধর্মের নাম-নিশানাসহ তাওহীদের বিপ্লবী মিশন এইবার চিরতরে মুছে যাবে। কেননা, নব দীক্ষিত মুসলমানরা সংখ্যায় অতি নগন্য। তার উপর তাদের অধিকাংশ আবিসিনিয়ার নির্বাসিত। অবশিষ্ট হাতে গোণা যারা ছিল তারা এবং তাদের সমর্থকবৃন্দও এখন সঙ্কীর্ণ গিরি-দূর্গের কারা অন্তরালে বন্দী। কাজেই এ সুযোগে তাদের নির্বাসিত করে মারতে পারলেই ইসলামের উপদ্রপ হতে মক্কা ভূমি একেবারে মুক্ত হবে। এই ভেবে আবু জাহ্ল ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সত্যের পূজারী কালেমায় বিশ্বাসী মুসলমান দলনে প্রবৃত্ত হলো। সেই দলনের ধারাবাহিকতায় সত্যপন্থীদের উপরে বর্তমানে নির্যাতনের এই ষ্টিম রোলার। মুলত যারা বিপ্লবী কালেমার দাওয়াত প্রচার ও প্রসার করতে গিয়ে পদে পদে বাধাগ্রস্থ হবে; তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও মহা বিজয়। সেদিন বেশি দূরে নয়- হত্যা, নির্যাতন, জেল-যুলুম, হুলিয়া বন্ধ হয়ে সত্যের আলো উদ্ভাসিত হবে।



www.pathagar.com

এ জন্য প্রয়োজন, আল্লাহর উপর পূর্ণাঙ্গ আস্থা, তার কাছে ধর্ণা দিয়ে তারই সাহায্য কামনা করে ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে পথ চলা। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামী আন্দোলনের পথে এই কঠিন পরীক্ষার পরেই অপেক্ষা করছে সত্য পন্থীদের জন্য একটি সুবহে সাদিক ও আলো ঝলমলে সোনালী প্রভাত।
যে প্রভাতের নায়ক হবে আজকের নির্যাতিত, মজলুম ইসলামী আন্দোলনের সত্যপন্থী সাথীরা। যাদের ধৈর্য্য ও ত্যাগসহ কোরবানীর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে আল-কুরআনের রাজ। সেদিনের জন্য আমরা ইসলামী আন্দোলনের সাথী-কর্মীরা অপেক্ষাই শুধু নয়, অধির আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকবো।

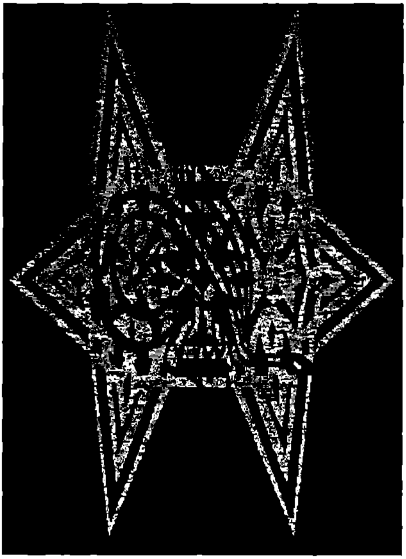



www.pathagar.com

# রাসূলের [সা] আপোসহীনতা

**এস.এম.জহির উদ্দীন**

আরবের সামাজিক অবস্থা তখন কলুষতায় পূর্ণ। বিত্তবানদের আধিপত্য সুদৃঢ়। বিত্তবান অর্থই ছিল অত্যাচার, যুলম, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, অন্যের অধিকার হরণ, নারী লিপ্সা, বিলাসিতা, অপচয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

পশুর ন্যায় হাট-বাজারে বিক্রি হতো অসহায় নারী-পুরুষ। তাদের ছিল না কোন মত প্রকাশের অধিকার, ছিল না নিজের ইচ্ছা মত কিছু করার। স্বাধীনতা বলতে যা ছিল তা মনিবের অনুকম্পা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল। নারীর অন্যতম কাজই ছিল গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি বিত্তবান পুরুষদের দৈহিক চাহিদা মেটানো। পূর্ব-পুরুষদের রীতির অন্ধ অনুকরণে জীবন চালিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এসব লোক যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসব করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এসব করার হুকুম করেছে। [হে রাসূল!] তাদেরকে বলুন, আল্লাহ কখনও ফাহিশা কাজের হুকুম দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বল যা [আল্লাহর কথা কিনা] তোমরা জান না?" –সূরা আল আ'রাফ : ২৮

কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তারা লজ্জায় মুখ লুকাতো। তাদের মনোভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুখবর দেওয়া হয় তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং কষ্টে রাগ দমন করে নেয়। মানুষ থেকে তারা লুকিয়ে বেড়ায় কারণ এমন খারাপ খবরের পর কেমন করে মুখ দেখাবে! ভাবতে থাকে যে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে?" –সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯।

আল্লাহ ক্রোধ প্রকাশ করে আরো বলেন, "আল্লাহ কি তার সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন, আর তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন?" –সূরা আয্ যুখরুফ : ১৬।

ধর্মীয় অবস্থা ছিলো চারদিকে দেব-দেবীর জয়-জয়কার, ঘরে ঘরে নানা আকৃতির মূর্তি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেব-দেবীর হাতেই যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার চাবিকাঠি। যারা বিত্তবান বা ক্ষমতাশালী দেব-দেবী সন্তুষ্ট হয়েই তাদের এ অবস্থানে নিয়ে এসেছে আর



www.pathagar.com

নির্যাতিত, নিপীড়িতদের প্রতি দেব-দেবী নাখোশ বিধায় তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস। কতিপয় লোক পূর্ববর্তী নবীদের অনুসৃত দীনের কিয়দংশ ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেন। তাতেও ছিল বিকৃতি। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধার অন্তরায় এমন রীতি এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল কিছু রীতি আঁকড়ে ধরে অনেকে ধর্মীয় জীবন পার করতেন।

সমাজের এমনই এক সময়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর [সা] আগমন। যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলের দাওয়াত ছিল এক। তাঁদের সকলের দীন ছিল ইসলাম। অর্থাৎ এক ও অভিন্ন দাওয়াত দেওয়ার জন্যই মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষ যখন অধ:পতনের নিম্নসীমায় পৌঁছে গেছে তেমন সময়ই আল্লাহ তায়ালা অধিকাংশ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকলের দাওয়াত দানের পদ্ধতিও ছিল এক। প্রথমে একান্ত আপনজনদের মাঝে চুপে চুপে তারপর কিছু লোক তৈরি হলে প্রকাশ্যে।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর [সা] পদ্ধতিও ছিল তাই। ওহী প্রাপ্তির খবর প্রথমেই জানালেন স্ত্রী খাদিজা [রা]কে। খাজিদা [রা] বিবাহের পূর্ব থেকেই মহানবীকে [সা] জানতেন। সানন্দে মেনে নেন তাঁর দাওয়াত।

চাচা আবু তালিবের ছেলে আলী [রা]। বয়স মাত্র ১০। রাসূলের তত্ত্বাবধানেই তিনি প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। অর্থাৎ রাসূলের [সা] চরিত্র ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। তাই রাসূলের [সা] দাওয়াত তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। পালক পুত্র যায়িদও ছিলেন রাসূলের [সা] যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই প্রশান্তচিত্তে ইসলামী আলোয় উদ্ভাসিত হন। আবু বকর ইবনু কুহাফা [রা] ছিলেন সমাজের সর্বজন সমাদৃত, সম্মানিত, জনপ্রিয় ও বন্ধু বৎসল ব্যক্তি। সমাজের অনেকেই ধর্ণা দিত তাঁর নিকট। কেউ সাহায্যের জন্য, কেই পরামর্শ, কেউ সখ্যতা বা বন্ধুত্বের জন্য। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] যান আবু বকরের নিকট। দাওয়াত দেন ইসলামের। মহান আল্লাহ অমায়িক এ পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে কবুল করে নেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি শুধু নিজে গ্রহণ করেননি, সাথে সাথে অন্যের কাছেও এ দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। একে একে ইসলামী আঙিনায় প্রবেশ করাতে থাকেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের।

কেটে যায় তিন বছর। বেশ কিছু সত্য সন্ধানী ব্যক্তি ইসলামী আলোয় উদ্ভাসিত হন। ধীরে ধীরে এ দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের জন্য। রাসূল [সা] তাই করেন। শুরু হয় বিপত্তি। বাধার প্রাচীর সামনে রেখে প্রচণ্ডভাবে গর্জে ওঠে প্রতাপশালীরা। তারা অনুধাবন করে, রাসূলের [সা] দাওয়াত সাধারণ কোন কথা নয়। 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ'র মূল কথা হলো-প্রতাপশালীদের যাবতীয় ক্ষমতা, বিলাসী জীবন, শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদির অবসান হওয়া। কোমর বেঁধে লেগে যায় রাসূলের [সা] কিছু নিকটাত্মীয়সহ বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা। শুরু হয় নতুন দীন গ্রহণকারী লোকদের উপর অমানবিক অত্যাচার। চাচা



www.pathagar.com

আবু তালিবের প্রতাপশালিতার কারণে রাসূলকে [সা] প্রথম দিকে ক্ষতি করতে না পারলেও তারা নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। প্রবীণ চাচা আবু তালিবকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে মুহাম্মদকে [সা] তাঁর মিশন থেকে নিবৃত করার লক্ষ্যে। অতিষ্ঠ হয়ে চাচা আবু তালিব বিনয়ের সাথে মুহাম্মদের [সা] নিকট কুরাইশদের অভিপ্রায় বর্ণনা করেন। কিন্তু দীনের প্রতি আপোষহীন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার এক হাতে সূর্য ও আরেক হাতে চন্দ্র এনে দেয় তার বিনিময়েও আমি এ দাওয়াত ত্যাগ করতে পারবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ এই দীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই।"

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা নানা দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এমনকি বখাটে, মূর্খ লোকদের লেলিয়ে দিয়েও রাসূলকে [সা] কষ্ট দিতে থাকে। রাসূলকে [সা] দেখা মাত্র তারা কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী, পাগল ইত্যাদি গালাগাল দিতে থাকে। চারদিকে রাসূলের [সা] সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। হাজরে আসওয়াদের পাশে কুরাইশ সরদারদের এমনই এক সমালোচনার মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ [সা] সেখানে হাজির হন। ক্ষিপ্ত কুরাইশগণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাসূলও নীরবে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন শেষে কাবা তাওয়াফ শুরু করেন। তাদের পাশ দিয়ে ঘোরার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করে। রাসূল [সা] নীরবে দ্বিতীয় বার ঘুরে আসেন। তারা আবারও তদ্রূপ মন্তব্য করে। এবারও রাসূল [সা] নীরবে সহ্য করেন। তৃতীয় বার ঘোরার সময় তারা অনুরূপ মন্তব্য করলে রাসূল [সা] দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যান এবং স্পষ্ট ঘোষণা করেন, "হে কুরাইশগণ, যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ, [যদি তোমরা ঈমান না আন] আমি তোমাদের জন্য সর্বনাশ বয়ে এনেছি।" এ বলিষ্ঠ ঘোষণায় কুরাইশ সরদারগণ হতবাক হয়ে যায়।

নানা অপ কৌশল মুকাবিলা করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। কুরাইশ সরদারগণ সলাপরামর্শের মাধ্যমে এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হে মুহাম্মদ, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, পূর্ব পুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, দেব-দেবীকে গাল-মন্দ করছ, জাতির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ। তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থ-সম্পদ লাভ, আমরা তোমাকে বিত্তশালী বানিয়ে দেব। আর যদি পদমর্যাদার প্রত্যাশী হও তাহলে আমাদের সরদার বানিয়ে নেব। যদি বিপুল ক্ষমতাধর হতে চাও, আমরা তোমাকে বাদশা বানিয়ে দেব। কুরাইশগণ এসব লোভনীয় প্রস্তাবের মাধ্যমে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে [সা] তাঁর মিশন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। এমনকি তারা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর লোভ দেখাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু আল্লাহর রাসূল [সা] আবারও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "সম্পদ, পদমর্যাদা বা রাজা-বাদশা হওয়া কোনটিই আমার লক্ষ্য নয়। আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তোমাদের জন্য সাবধানকারী ও সুসংবাদদানকারী হতে আমাকে আদেশ করেছেন, তাঁর আদেশ অনুসারে আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের



www.pathagar.com

বাণী পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দিয়েছি। এখন তোমরা যদি আমার এ দাওয়াত গ্রহণ করে নাও তাহলে সেটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের ও আমার ব্যাপারে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করবো।"

কুরাইশগণ বার বার ব্যর্থ হলেও তখনো নিরাশ হয়নি। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তারা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আবারও তারা এক অভিনব প্রস্তাব নিয়ে আসে। আর তা ছিল এক বছর রাসূল [সা] তাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন [নাউযুবিল্লাহ] পক্ষান্তরে তারাও এক বছর রাসূলের [সা] উপাস্যের ইবাদাত করবে। এর প্রতিউত্তরে রাসূল [সা] আল্লাহর বাণী ঘোষণা করেন, "হে কাফিররা! আমি তাদের ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত করো। আর তোমরা তার ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদাত করি। আমি তাদের ইবাদত করবো না যাদের ইবাদত তোমরা কর।" –সূরা আল কাফিরুন ঃ ১-৪

রাসূল [সা] দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেন আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত তো করিই না বরং কখনই করবো না।

একদিকে সত্য সন্ধানী নারী-পুরুষের সত্য দীনে দাখিল অন্যদিকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, বিলাসিতায় মগ্ন ব্যক্তিদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি, দুটো গতিই চলতে থাকে প্রবল বেগে। অসহনীয় শারীরিক, মানসিক, আর্থিক নির্যাতনেও মহানবীর [সা] দীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা শিথিল না হয়ে বরং আরো বেগবান করে। আর অপর গতির শিথিলতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সময় আসে সত্য প্রতিষ্ঠার। সময় আসে নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের।



www.pathagar.com

# ইহুদীদের অপপ্রচার এবং রাসূল [সা]-এর পবিত্রতা

**রাশেদুর রহমান**

কোন ইতিহাস একবার যখন লেখা হয়, তা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা খুবই কঠিন। জর্জ ডব্লিউ হার্টম্যান ১৯৪৫ সালে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন জার্নাল অব সোস্যাল সাইকোলজিতে।[১] বিষয়টি কতটা সত্যি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসকে পরিশুদ্ধ করতে হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য, উপাত্ত, যুক্তি এবং সামঞ্জস্যতা-অসামঞ্জস্যতা।[২] বিচার করতে হয়। কিন্তু স্বার্থবাদী মানুষেরা অতীতে লিখিত যুক্তিহীন ইতিহাসকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে নির্দ্বিধায়। ইহুদীবাদী খুব সচেতন একটি গ্রুপ ইচ্ছে করেই এমনি যুক্তিহীন ইতিহাসকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। এই ইতিহাসের উপর নির্ভর করে তারা মুহাম্মদ [সা]- এর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অভিযোগের তীর। ইহুদীবাদীদের দাবি, মুহাম্মদ [সা] তার প্রথম জীবন থেকেই ইহুদীদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন [নাউজুবিল্লাহ]। আমরা এই প্রবন্ধে বনু কুরাইযার ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবো ইহুদীদের দাবি কতটা অযৌক্তিক এবং মিথ্যা। এক্ষেত্রে আমরা বারাকাত আহমেদের 'মুহাম্মদ এন্ড দি জিওস: এ রি-এক্সামিনেশন'।[৩] গ্রন্থটির সহযোগিতা নেবো। সেই সঙ্গে মুসলিম সূত্রগুলোর দেয়া তথ্য কুরআনুল কারীম এবং হাদীসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে ইহুদীদের অভিযোগ কতটা ভিত্তিহীন তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

ইহুদীদের একটি ওয়েবসাইটে মুহাম্মদ : জিওস এন্ড দি জিহাদ।[৪] প্রবন্ধে অভিযোগ করা হয়েছে মুসলিম-ইহুদীদের দ্বন্দ্ব আধুনিক কোন বিষয় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাসূল [সা]-এর সময়কার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তাদের দাবি, রাসূল [সা]-এর ইহুদী বিরোধী মনোভাব কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে সংরক্ষিত আছে। কুরআনুল কারীম এবং হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব দেয়াই কেবল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সেই সঙ্গে রাসূল [সা]-এর পবিত্রতা এবং তিনি যে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য রহমত হিসেবে পৃথিবীতে



www.pathagar.com

এসেছিলেন তাও প্রমাণ করা এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কঠিন কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

মুসলিম সূত্রগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম রাসূল [সা]-এর জীবনী লিখেছেন ইবনে ইসহাক।[৫] এছাড়া ইবনে সা'দ।[৬] এবং আল ওয়াকিদি[৭] ও রাসূল [সা]-এর জীবনী লিখেছেন। ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থেরই বিস্তৃত রূপ দিয়েছেন ইবনে হিশাম।[৮] ইবনে ইসহাকের সীরাত রাসূলুল্লাহ, ইবনে সা'দ ও আল ওয়াকিদির কিতাব আল মাঘাজি [রাসূল [সা]-এর যুদ্ধাভিযান] গ্রন্থগুলোতে বনু কুরাইযার ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে মক্কা ও মক্কার আশপাশের সকল মুশরেক গোত্রগুলোর সম্মিলিত শক্তি [১২০০০] মদিনা আক্রমণ করে। তবে মুসলমানরা আগেই খন্দক খোঁড়ায় তেমন কোন যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি। এই যুদ্ধ মূলত বনু কুরাইযার ইহুদীদের ষড়যন্ত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। তাদের কূটনীতিক দলই মক্কার মুশরেকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদিনা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূল [সা] বনু কুরাইযার বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করে জিব্রাইলের [আ] ইঙ্গিতে।[৯] সবগুলো মুসলিম সূত্রই স্বীকার করেছে, বনু কুরাইযার ৬০০/৯০০ জন যোদ্ধা পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে। ইবনে ইসহাক তার বর্ণনায় যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্তসার:

নবীজী বনু কুরাইযাকে ২৫ দিন অবরোধ করে রাখলেন। এতে ইহুদীরা বুঝে গেল যে তাদের সঙ্গে একটি সমাপ্তিতে আসতে চাচ্ছেন রাসূল [সা]। এই অবস্থায় তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ তিনটি বিকল্পের কথা বললেন। এক. মুহাম্মদ [সা]কে সত্য নবী হিসেবে মেনে নাও এবং নিজেকে নিরাপদ কর। দুই. নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা কর এবং মুহাম্মদ [সা]-এর বিপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে একজনকে বিজয়ী করছেন। তিন. আজ শনিবার সাবাত দিবস। চল আমরা মুহাম্মদ [সা] এবং তার সঙ্গীদের চমকে দিয়ে আঘাত করি। ইহুদীরা কা'ব বিন আসাদের তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, এরপর বনু কুরাইযা নবীজীর কাছে আবু লুবাবাহকে আলোচনার জন্য প্রেরণের অনুরোধ জানায়। আবু লুবাবাহ তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, সেই সঙ্গে নিজের গলায় হাত দিয়ে ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে ইঙ্গিত করেন, তাদেরকে হত্যা করা হবে। বনু কুরাইযার মিত্র আওস গোত্র রাসূল [সা]কে ইহুদীদের উপর দয়া প্রদর্শনের অনুরোধ জানায়। রাসূল [সা] সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ নিয়োগ করলে উভয়পক্ষই তা মেনে নেয়। সা'দ বিন মুয়াজ [রা] বনু কুরাইযার সকল সক্ষম পুরুষদের হত্যার আদেশ দেন। তাদের সম্পদ, স্ত্রী এবং সন্তানদের মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দেয়ার ঘোষণা দেন।[১০]

ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনার সঙ্গে মিল রেখেই বনু কুরাইযার ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ এবং আল ওয়াকিদি। তবে বনু কুরাইযাকে[১৫] দিন অবরোধ করে রাখা হয়েছিল বলে মত দিয়েছেন ইবনে সা'দ।[১১] বনু কুরাইযার সকল [যোদ্ধা] পুরুষকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন প্রথম এবং পরবর্তী যুগের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই।



www.pathagar.com

এছাড়া অমুসলিম গবেষকদের মধ্যে সকলেই এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। মন্টগোমারী ওয়াট[১২], গুইটেন[১৩] ও গেইগারের[১৪] মতো ঐতিহাসিকরা মুসলিম সূত্রগুলো গ্রহন করেছেন নির্দ্বিধায়। এমনকি ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের মতো ঐতিহাসিকও বিষয়টি স্বীকার করে ঘটনার পক্ষে সহানুভূতি দেখিয়েছেন।[১৫] কিন্তু বিষয়টি কিভাবে সম্ভব হতে পারে! যেখানে নবীজীর জীবনে পরিচালিত সকল যুদ্ধে উভয়পক্ষে নিহতের সংখ্যা পাঁচশত এবং প্রতিপক্ষের নিহতের সংখ্যা তিনশতেরও কম।[১৬] সেখানে কিভাবে নবীজী ঠান্ডা মাথায় ৬০০/৯০০ জনকে হত্যার অনুমোদন দিতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখেননি কোন ঐতিহাসিকই। এমনকি মুসলিম ঐতিহাসিকরাও বিষয়টিতে এক প্রকার দায়সারা বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাঘাযী অধ্যায়ের 'খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী [সা]-এর প্রত্যাবর্তন ও ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের অবরোধ' অনুচ্ছেদে ৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৭] এর মধ্যে আয়েশা [রা] ও আনাস [রা] দুটি করে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [রা], আবু সাঈদ খুদরী ও বারা ইবনে আযেব [রা] একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র আয়েশা [রা] ও আবু সাঈদ খুদরী [রা]-এর হাদীস দুটিতেই বনু কুরাইযার ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। দুজনেই 'তুক্বতালাল মুক্বাতিলাতু'[১৮] শব্দ ব্যবহার করেছেন নিজেদের হাদীসে। অর্থাৎ, যুদ্ধে [ষড়যন্ত্রে] লিপ্ত পুরুষদের হত্যা করতে হবে। এই হাদীস দুটিতে স্পষ্টই মক্কার মুশরেকদের সঙ্গে যারা আঁতাত করেছিল তাদেরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনুল কারীমে সুরা আহযাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করছেন:

তারপর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল তাদের দুর্গ থেকে আল্লাহ তাদের নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দী।[১৯]

কুরআনুল কারীমেও কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই। এবং লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো, এখানে দুটি দলের কথা বলা হয়েছে। এই দুই দল দিয়ে আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দুই দল বলতে পুরুষ ও মহিলাও হতে পারে, আবার পুরুষদের মধ্যেও দুই দল হতে পারে। পুরুষদের মধ্যে দুই দল হবে বলেই মত দিয়েছেন বারাকাত আহমেদ। তার মতে, বনু কুরাইযার সেইসব লোকদেরই হত্যা করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, যারা মক্কার মুশরেকদের সঙ্গে আঁতাত করেছিল।[২০] বনু কুরাইযার সকল পুরুষকে হত্যা করার কোন কারণই ছিল না। নেতাদের কৃত অপরাধের দায় নিশ্চয়ই জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দেননি রাসূল [সা]।

ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্যদের বর্ণনায় কিছু সাংঘর্ষিক বিষয় বনু কুরাইযার ঘটনায় সন্দেহ করার মতো যুক্তি এনে দেয়। যেমন আয়েশা [রা] বর্ণিত হাদীসে বনু কুরাইযার একজন নারীর উল্লেখ রয়েছে। যাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই নারী তাকে হত্যা



www.pathagar.com

করা হবে, এই বিষয়টি জানতো। মৃত্যু আসন্ন জেনেও সে হাসছিল অনবরত।[২১] আবার আবু লুবাবাহ [রা] বনু কুরাইযার নিকট গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হবে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বনু কুরাইযার সকলের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট ছিল মৃত্যুর বিষয়টি। এদিকে সা'দ বিন মুয়াজ [রা]-এর রায় ঘোষণার পর মদিনার বাজারে এনে দলে দলে তাদেরকে যখন হত্যা করা হচ্ছিল, তখন কা'ব বিন আসাদকে ইহুদীরা জিজ্ঞেস করল তাদের সঙ্গে কি আচরণ করা হচ্ছে? কা'ব বলল, তোমরা কি বুঝতে পারছো না? যারা যাচ্ছে তারা আর ফিরে আসছে না। আল্লাহর শপথ, সবাইকে হত্যা করা হবে।[২২] এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, ইহুদীরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও জানতে পারছে না তাদের ভাগ্যে কি রয়েছে। সমগ্র বনু কুরাইযা গোত্র মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত জানে না, অথচ আয়েশা [রা]-এর বর্ণনা মতে একজন নারী বিষয়টি জানতো! এতে ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেয়া আয়েশা [রা]-এর দ্বিতীয় হাদীসটি[২৩] ইমাম বুখারী মারফু[২৪] হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেছেন, বনু কুরাইযাকে মদিনায় এনে বনু নাজ্জার গোত্রের বিনতে হারিসের বাড়িতে রাখা হয়েছিল। এবং তাদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।[২৫] ৬০০/৯০০ জন সক্ষম পুরুষকে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে। তবে তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৬০০-৫৪০০ জন হতে পারে। বিনতে হারিসের বাড়ি নিশ্চয়ই দুর্গ ছিল না। যদি তা না হয়ে থাকে, তবে এত বিশাল জনসংখ্যা কিভাবে একটি বাড়িতে ধারণ করা সম্ভব? এছাড়া বনু কুরাইযার পুরো গোত্রকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখার মতো রশি জোগাড় করাও তো সেই সময় কঠিন ছিল। যাই হোক, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদীদেরকে হত্যা করার দায়িত্ব পালন করেছেন আলী [রা] এবং যুবায়ের রা.। তাদের কোন বর্ণনাই নেই এই বিষয়ে! এত বিশাল সংখ্যার ইহুদীদের হত্যা করে থাকলে তাদের মনে নিশ্চয়ই কোন প্রভাব পড়ত। যা তারা দীর্ঘদিন মনে রাখতেন এবং লোকজনদের বলতেন। অথচ তাদের বর্ণনায় কোন হাদীসই নেই! এছাড়া ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, ইহুদীদের মদিনার বাজারে গর্ত খুঁড়ে হত্যা করা হয়েছিল।[২৬] বাজারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গণহত্যার মতো কোন ঘটনা ঘটানো বোকামির পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। বনু কুরাইযাকে হত্যা করা হলে তাদের দুর্গের কাছে হত্যা করাই হতো সবদিক থেকে ভাল।

কুরআনুল কারীম এবং হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে মুসলিম সূত্রগুলোর দেয়া বর্ণনা অনেকটাই ভিত্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। এই সন্দেহ সংশয় এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর বারাকাত আহমদ তার 'মুহাম্মদ এন্ড দি জিওস: এ রি-এক্সামিনেশন' গ্রন্থে মত দিয়েছেন, সম্ভবত ১৬/১৭ জন নেতৃস্থানীয় ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের গুরুতর অপরাধের জন্য।[২৭] আমরাও এই মতই পোষণ করি। সংখ্যার তারতম্য কিছুটা হতে পারে। কিন্তু ৬০০/৯০০ জন ইহুদীকে বনু কুরাইযার ঘটনায় হত্যা করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভাল জানেন সকল বিষয়ে।



www.pathagar.com

এবার ভিন্ন দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ইহুদীদের অভিযোগ, মদিনায় আসার পর নবী [সা] যখন দেখলেন ইহুদীরা তাকে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করছে না। তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন।[২৮] এভাবেই তিনি প্রথমে বনু নাজীর ও বনু কাইনুকাকে মদিনা থেকে বিতাড়ন করলেন এবং সর্বশেষ বনু কুরাইযাকে ধ্বংস করলেন। প্রায় সকল অমুসলিম ঐতিহাসিকেরা বিষয়টি স্বীকার করেছেন। পিস উইথ রিয়েলিজম ডট কমে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, তিনটি গোত্রকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করে নবীজী মদিনাকে ইহুদীমুক্ত করলেন।[২৯] ইহুদীবাদীদের এই দাবি কতটা যৌক্তিক? মদিনা এবং মদিনার আশপাশের পুরো এলাকা জুড়ে প্রায় ৩৬ হাজার থেকে ৪২ হাজার ইহুদীর বসবাস ছিল। গোত্রের সংখ্যাও ছিল প্রায় দশটি।[৩০] বনু কুরাইযা, বুন নাজীর ও বনু কাইনুকা ছাড়াও বনু আওফ, বনু আল নাজ্জার, বনু সাইদাহ, বনু জুশান, বনু আওস, বনু তা'লাবাহ, বনু সুতাইবাহ এবং বনু হারীসার ইহুদীরাও বসবাস করতো মদিনা এবং মদিনার আশপাশের এলাকায়।[৩১] তিনটি ইহুদী গোত্রের বহিস্কারের পরও অন্যরা মদিনাকে হারাম ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত মদিনাতেই ছিল। বনু কুরাইযার ঘটনার পর মদিনায় থাকা ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার থেকে ২৮ হাজার।[৩২] রাসূল [সা] ইহুদী বিরোধী হয়ে থাকলে এই বিশাল সংখ্যার ইহুদীরা মদিনায় থাকার সুযোগ পেয়েছে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই ইহুদীবাদীদের কাছে। সত্যি বলতে ইহুদীবাদীদের অপপ্রচারকে মুসলিম ঐতিহাসিকরা এতটাই নগন্য মনে করেছিল, যে এ ব্যাপারে কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি তারা। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকদের এই নিরবতাই ইহুদীদের অপপ্রচারকে আরো শক্ত অবস্থানে নিয়ে গেছে।

রাসূল [সা]-এর পবিত্রতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমেই ঘোষণা করেছেন। তাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

লাক্বদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ।[৩৩]

ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন।[৩৪]

উপরের দুটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করছেন, তোমাদের জন্য অবশ্যই রাসূল [সা]-এর আদর্শই উত্তম আদর্শ। আবার বলছেন, এই পৃথিবীর জন্য রাসূল হচ্ছেন রহমত স্বরূপ। এইসব ঘোষণা রাসূল [সা]-এর পবিত্রতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। মানুষের কাছ থেকে রাসূল [সা]-এর পবিত্রতার সার্টিফিকেট নেয়ার প্রয়োজন নেই। মহান রাব্বুল আলামীন ইহুদীবাদীদের অপপ্রচার বন্ধ করার সকল পথই খোলা রেখেছেন। তবে মুসলিম ঐতিহাসিকরা এতদিন পর্যন্ত সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু তাদের এই উদাসীনতাই ইহুদীবাদীদের নোংরা অভিযোগগুলোকে বড় করে তুলেছে বিশ্ববাসীর সামনে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইহুদীরা এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ দেশের সমর্থন পাচ্ছে। এর কারণ, ১৮৩২ সালের পর থেকে ইহুদীরা নিজেদের দিকে পৃথিবীর সহানুভূতি টেনে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে ইহুদীদের গণহত্যার বিষয়টি পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গি আরো



www.pathagar.com

বদলে দিয়েছিল। ১৮৩৩ সালে ওয়েসবাডেনের এক ইহুদী রাব্বি আব্রাহাম গেইগার 'জুদাইজম এন্ড ইসলাম' শিরোনামে লেখা বইতে সর্বপ্রথম ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথমদিককার সংগ্রাম বিশেষ করে বনু নাজীর ও বনু কাইনুকার বহিস্কার এবং বনু কুরাইযার ধ্বংসকরণের কথা করুণ সুরে বর্ণনা করেন। এর আগে কোন ইহুদীবাদী ঐতিহাসিকই বনু কুরাইযার ঘটনা নিয়ে এতটা আলোচনা করেনি। এর মধ্যে ইহুদী ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক স্যামুয়েল 'এ কনস্যুলেশন ফর দি ট্রিবিউলেশন অব ইসরাইল-থার্ড ডায়ালগ'[৩৫] বইতে ইহুদীদের কষ্টকর অতীতকে আকর্ষণীয় করে লিপিবদ্ধ করলেও বনু কুরাইযার ঘটনা বর্ণনা করেননি। ইহুদীদের অপপ্রচার যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অপপ্রচারের বিপক্ষে মুসলিম ঐতিহাসিকদের যেমন সচেতন হতে হবে তেমনি মুসলিম উম্মাহকেও সচেতন হতে হবে। ইহুদীবাদীদের হাত থেকে মুসলমানদের বাঁচতে হলে এর বিকল্প নেই। আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

## টীকা ও তথ্যসূত্র


১. জার্নাল অব সোস্যাল সাইকোলজি, ভলিউম ২২, নভেম্বর ১৯৪৫, পৃষ্ঠা. ২২১-২৩৬।

২. আল মুকাদ্দিমা, ইবনে খালদুন, গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা-২০০৭, পৃষ্ঠা: ১০৪।

৩. Muhammad and the Jews: A Re-examination, Barakat Ahmad, Vikas Publishing House, New Dilhi, 1979.

৪. Muahammad: Jews and the Jihad, www.peacewithrealism.org, 20th January, 2013.

৫. ৮৫ হিজরীতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার ইবনে খিয়ার। তিনিই প্রথম রাসূল [সা]-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থটির নাম সিরাত রাসূলুল্লাহ।

৬. আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানি আল বসরী ১৬৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাব তাবাকাত আল কুবরা দি বুক অব দি মেজর ক্লাসেস সিরিজের অন্তর্ভুক্ত।

৭. ১৩০ হিজরীতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমর আল ওয়াকিদি। তিনি বিশেষ কওে রাসূল [সা]-এর যুদ্ধ গুলোর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তার লেখা গ্রন্থ কিতাবুল মাঘাজি।

৮. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম ২১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থেরই বিস্তারিত রূপ দিয়েছেন। তার লেখা গ্রন্থ আস সীরাহ আন নবুবিয়্যাহ।

৯. আর রাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, খাদিয়া আখতার রেজায়ী অনূদিত, আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা-২০০৮, পৃষ্ঠা: ৩২৫ ও ৩৩৭।

১০. ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের সংকলন সীরাতে ইবনে হিশাম, আকরাম ফারুক অনূদিত, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০৯, পৃষ্ঠা: ২২৩-২২৫।

১১. Muahammad: Jews and the Jihad, www.peacewithrealism.org, 20th January, 2013.

১২. Muhammad at Medina, Montgomery Wat, Oxford, The Clarendon Press-1956, p. 208-220.

১৩. Jews and Arabs: Their Contacts Through the Ages. S. D. Goitein, New York: Schocken Books-1955.

১৪. Judaism and Islam, Abraham Geiger, English Translation from German by a Member of The Ladies League, Vepery-1898 [এই বইয়ে আব্রাহাম গেইগার প্রমাণ




www.pathagar.com

করতে চেয়েছেন রাসূল [সা] সব সময়ই চাইতেন ইহুদীরা তাকে নবী হিসেবে মেনে নিবে। কিন্তু ইহুদীরা নবী হিসেবে মেনে না নেয়ায় মুহাম্মদ [সা] তা ভাল চোখে দেখেননি। এই কারণেই ইহুদীদের ধ্বংস করতে চেয়েছেন তিনি [নাউজুবিল্লাহ]।

১৫. Muhammad: A biography of the Prophet, Karen Armstrong, San Francisco: Harper, 1992.

১৬. Muhammad and the Jews: A Re-examination, Barakat Ahmad, Ibid, p. 23.

১৭. সহীহ্ আল বুখারী, চতুর্থ খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০১১.

১৮. মুক্বাতিলাতু'র শাব্দিক অর্থ যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তি। বনু কুরাইযার সঙ্গে মুসলমানদের সরাসরি কোন যুদ্ধ হয়নি। তাহলে যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তি বলতে কি বুঝানো হয়েছে। এখানে যুদ্ধের পরিবর্তে ষড়যন্ত্র শব্দ প্রয়োগই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। এর অর্থ, বনু কুরাইযার কেবল সেই সকল পুরুষদেরই হত্যা করা হয়েছিল, যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

১৯. কুরআনুল কারীম, সুরা আহযাব, আয়াত ২৬, তাহফীমুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ।

২০. Muhammad and the Jews: A Re-examination, Barakat Ahmad, Ibid, p. 81.

২১. সহীহ্ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০১১, ৩৮১৬ নম্বর হাদীস, আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত।

২২. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২২৬।

২৩. সহীহ্ আল বুখারী, ৩৮১৬ নম্বর হাদীস।

২৪. যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র রাসূল [সা] পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু হাদীস বলে।

২৫. Muhammad and the Jews: A Re-examination, Barakat Ahmad, Ibid, p. 82.

২৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২২৫।

২৭. Muhammad and the Jews: A Re-examination, Barakat Ahmad, Ibid, p. 91.

২৮. Muahammad: Jews and the Jihad, www.peacewithrealism.org 20th January, 2013.

২৯. Ibid.

৩০. Muhammad and the Jews: A Re-examination, Barakat Ahmad, Ibid, p. 40-43.

৩১. Ibid, p. 41.

৩২. Ibid, p. 43.

৩৩. কুরআনুল কারীম, সুরা আহযাব, আয়াত-২১।

৩৪. কুরআনুল কারীম, সুরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭।

৩৫. Consolation for the Tribulations of Israel, Samuel Usque, English Translation from the Portuguese by Martin A. Cohen, The Jewish Publication Society of America-1965.



www.pathagar.com

# মহামানব মুহাম্মদ [সা] প্রসঙ্গ বিধর্মীদের অপপ্রচার

**জাইদী রেজা**

জন্ম তার নিউইয়র্ক সিটিতে ২৮ এপ্রিল, ১৯৩২। ধর্ম বিশ্বাসে একজন খ্রিস্টান। নাম মাইকেল এইচ হার্ট। একজন বিখ্যাত Astrophysicist এবং ইতিহাসবিদ। আমেরিকার বিখ্যাত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে স্নাতক ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Astrophysics-এ.পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও আইনের ওপর গ্রাজুয়েশন করেন। ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসায় তিনি বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে, আমাদের এই মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সির পৃথিবীতেই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে।

তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "দি হান্ড্রেড" এ মানব সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ একশত জন ব্যক্তির মধ্যে মহামানব মুহাম্মদ [সা]-কেই সবার ওপরে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। মানবধিকার রক্ষা, সমাজ সংস্কার, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানাবিধ কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য। রাসূল [সা]কে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে তার গ্রন্থে স্থান দেবার জন্যে তিনি নন্দিত ও নিন্দিত হয়েছেন।

ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেছেন, "He was the master mind not only of his own age but also of all ages."

মানবধিকার প্রতিষ্ঠায়, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায়, এ পৃথিবীতে সফলতম মানুষটি কে?

সামাজিক ভারসাম্য, ন্যায়বিচার, সমাজ ও সভ্যতার বৈপ্লবিক রূপান্তরে সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকায় স্বাক্ষর রেখেছেন, সেই মানুষটি কে?

কার সফল অনুসরণের মাধ্যমে অন্ধকার, সভ্যতা বিবর্জিত মানবগোষ্ঠী পেয়েছিল সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের জীয়নকাঠি, সেই মানুষটি কে?

বিলাস-জীবনের অসারতা, ত্যাগের মহিমা, নি:স্বার্থপরতা, সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পূরণ, সম্পদের সুষম-মানবিক বণ্টন, জবাবদিহিতা, ইত্যাকার নানাবিধ গুণাবলীর সফলতম বাস্তবায়ন কার মাঝে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছে? সেই মানুষটি কে?



www.pathagar.com

তিনিই মহামানব মুহাম্মদ [সা]। সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণবিশিষ্ট এমন আর কোন মানুষের এই ধরাধামে আগমন ঘটেনি এবং ঘটবেও না।

মেজর আরথার ক্লাইন কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন, "তিনি ছিলেন যে কোন যুগ বা কালের গভীরতমভাবে খাঁটি ও স্থির সংকল্পকারীদের অন্যতম। একজন মানুষ হিসেবে তিনি শুধু মহতই নন, মানব ইতিহাসের এ যাবত উপস্থাপিতদের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ও নিখাঁদ তিনি। মহৎ শুধু নবী হিসেবে নন, দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা হিসাবেও তিনি তৈরি করে গেছেন এক মহৎ জাতিকে, ইসলামের রাষ্ট্রসমূহের এক বিরাট সাম্রাজ্যকে এবং এই তিনের চেয়েও বৃহত্তর এক সত্য বিশ্বাসকে।"

মিঃ আর ডি সি ব্যাডলের মত অমুসলিমের বাস্তবতা ও সত্যের স্বীকৃতি দেখুন, বলেছেন, "লক্ষ্য করলে খুব আশ্চর্য লাগে যে, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অন্যান্য মহৎ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতাদের চেয়ে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অনেক বেশী। মুসা, কনফুসিয়াস অথবা বুদ্ধের সমসাময়িক রেকর্ডাদি যেখানে আমরা পাই না, যীশুর জীবনী সম্পর্কে যেখানে আমরা অংশেরও অংশ মাত্র জানি, সেখানে নবী মুহাম্মদ [সা]-এর ইতিহাস চরমভাবে পরিস্কা। এখানেই অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তার পরিবর্তে আমরা পাই ইতিহাস। মুহাম্মদ [সা]কে আমরা ততটুকু জানি যতটুকু জানি আমাদের কালের খুব নিকটে বেঁচে থাকা মানুষদের সম্পর্কে। তার বাহ্য জীবন সম্পর্কে রেকর্ডাদি, তার যৌবন পরিজন সম্পর্কে, তার স্বভাব কোন কিছুই কাল্পনিকও নয়, জনশ্রুতিও ন্য। তার জীবন-ব্রত ঘোষিত হবার পর তার পারিবারিক রেকর্ডাদি অজ্ঞাত হতবুদ্ধি কোন ধর্ম প্রচারকের অস্পষ্ট প্রথা নয়। মৌলিকতা ও সংরক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অনন্য। তার সমসাময়িক গ্রন্থ আমরা পাই যার প্রামাণিকতা সম্পর্কে কেউ এপর্যন্ত কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। কোন ইহুদী, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান কখনও বলতে পারে না যে, তার ধর্ম তার চোখের সামনে এত অলৌকিক দ্রুততার সাথে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। মনে হয়, একথা জোর দিয়ে প্রকাশ করা আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল যে, মুহাম্মদ [সা] তার শেষ নবী আর ইসলাম তার শেষ ধর্ম।"

এছাড়াও জর্জ বার্নারড শ, টমাস কার্লাইল, ডক্টর জঙ্গন, প্রফেসর ড্রেপার, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, কবি জন মিলটন, স্যার উইলিয়াম মুর, প্রফেসর ফিলিপ কে হিটটিসহ হাজারো অমুসলিম মনীষী, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক যে মহামানব সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করেছেন যে, তার মত নিষ্কলুষ, পবিত্রতম উত্তম মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ নেই, সেখানে কিছু কুলাঙ্গার, ইয়াহুদী, ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা এই মহামানবকে নিয়ে বিকৃত সিনেমা, কার্টুন, বই-বুকলেট ইত্যাদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রসার ও প্রচার করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে স্যাম ভাসেলির মত বিকৃত মানসিকতার ইসলাম বিদ্বেষীরা কুরআন ও ইতিহাসের এই মহামানবকে নিয়ে যে সিনেমাটি নির্মাণ করছে তাতে বিশ্ব মুসলিমের হৃদয় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত।

পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও জিও টিভির প্রধান নির্বাহী হামিদ মীরের ভাষায়, "আমার কষ্ট ও যন্ত্রণা ছিল বর্ণনাতীত। আমি যখন ওই চলচ্চিত্রটি দেখা শুরু করি তখন আমার কাছে মনে হতে লাগল কেউ যেন আমার মন ও মস্তিষ্কে হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। আমি নিজেকে অনেক শক্ত মনের মানুষ বলে জানি। কিন্তু স্যাম ভাসেলির নির্মিত



www.pathagar.com

ইনোসেন্স অব মুসলিম নামের এই চলচ্চিত্র বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদ। কারণ এই চলচ্চিত্রের দৃশ্য এবং সংলাপগুলো বোমা বিস্ফোরণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আল কায়েদার হামলায় তিন হাজার লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ইউটিউবে প্রচারিত এই ভিডিওচিত্রটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। আমি ওই চলচ্চিত্রটি কয়েক মিনিটের বেশি দেখতে পারিনি। এই ভয়াবহ চলচ্চিত্রটির বিবরণ দেয়াও আমার জন্য অনেক কষ্টকর। আমি শুধু এতটুকু বলব, এই চলচ্চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য দেখে স্যাম ভাসেলির বিপরীতে ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসবাদকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। আমেরিকার জন্য এটা বড় পুরস্কার, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী স্যাম ভাসেলি এত বড় অপকর্ম করার পরও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশ্রয়েই আছে। আমেরিকার পক্ষ থেকে আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোর ওপর অনেক অভিযোগ আরোপ করা হয়। অথচ দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা কখনো খৃস্টান অথবা ইহুদি ধর্মের এমন অবমাননার কথা চিন্তাও করে না যা করেছে স্যাম ভাসেলি ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ [সা] সম্পর্কে। স্যাম ভাসেলির সন্ত্রাসবাদ আমাকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মুসলমানদের প্রিয় নবীকে অবমাননা করায় খৃস্টান বাদশাহর প্রতি রাগান্বিত হয়ে তিনি তলোয়ার হাতে নিয়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দস বিজয় করেছিলেন। কিন্তু আফসোস, আজ মুসলিম বিশ্বের কোনো শাসকের মধ্যে এই অনুভূতি ও উদ্যমটুকু নেই যে, নবীজির অবমাননাকারী কুচক্রীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।"

মুসলমানরা ছিল সিংহের জাতি, তাদের যুগ ছিল ইতিহাসের সফলতম যুগ। সমাজ বিনির্মাণ, ব্যাক্তি ও জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্পদের সুষম বন্টন, দারিদ্র দূরীকরণে তারা ছিল সবচাইতে সফল। কিন্তু আজ তারা বিড়াল হয়ে মিউই মিউই করছে। এই বাস্তবতায় আমাদের সর্বপ্রথম দরকার মহান সাহাবীদের মত ঈমানী স্পৃহা, ধৈর্য, সততা ও জিহাদী চেতনা।

**তথ্যসূত্র–**

১. The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History - Michael H. Hart
২. ইসলাম অ্যান্ড হার মরাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু - মেজর আরথার ক্লাইন লেওনারদ।
৩. দ্য মেসেনজার - আর ডি সি ব্যাডলে।
৪. সত্য সমাগত - এস এ সিদ্দিকী।
৫. হামিদ মীর এর লিখা - পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক; প্রধান নির্বাহী, জিও টিভি
দৈনিক জং উর্দু থেকে অনুবাদ: জহির উদ্দিন বাবর। #



www.pathagar.com

# মুসলিম বিশ্বের সমস্যা

মাস্টার নজরুল ইসলাম

১৩০ কোটি জন অধ্যুষিত মুসলিম বিশ্বের অবস্থান বিশ্বমানচিত্রে নানা কারণে তাৎপর্য বহন করে। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সম্পদের প্রাচুর্য, জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক ঐক্য, জলসীমার অবস্থন, নৌ, বিমান এবং স্থলপথে যোগাযোগের সুবিধা মুসলিম বিশ্বকে করেছে ঐতিহ্যমণ্ডিত। মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক সাজুয্যের বৈশিষ্ট্য হলো এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবী মুহাম্মদ [সা]-এর রেসালাতের প্রতি অকৃত্রিম আস্থা, দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজান মাসে সিয়াম সাধনা, সম্পদের উপর জাকাত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এক দিনে খানায়ে কা'বাকে তাওয়াফ করা। এ ছাড়াও তাহজীব তামুদ্দুনের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য, সাদৃশ্যতা মুসলিম বিশ্বের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে করেছে একই মালার গাঁথা ফুল। বর্তমান আবস্থায় মুসলিম বিশ্বকে বুঝতে হলে বিশ্বে মুসলিমের অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা থাকা আবশ্যক।

**বিশ্ব মুসলিমের অবস্থান–** ১. বর্তমান বিশ্বের জন সংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশী মুসলিম। ২. বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ১৩০কোটি। ৩. ৫৭টি ওআইসি ভুক্ত দেশে মুসলিম জনসংখ্য ৯০কোটি। ৪. বিশ্বের বাকী দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ কোটি। ৫. ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা ৩ কোটি। ৬. উত্তর আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি। ৭. ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। ৮. ৫৭টি মুসলিম দেশ পৃথিবীর ২৩% ভূমির অধিকারী। ৯. ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত স্থানে মুসলিম দেশগুলো অবস্থিত।

**অর্থনৈতিক অবস্থান–**১. ১৩%আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ২. ৮৭% বাণিজ্য বর্হিবিশ্বের সাথে। ৩. সকল মুসলিম দেশই উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত। ৪. ৫টি মুসলিম দেশ উচ্চ মানব উন্নয়ন ভুক্ত। ৫. ২৫টি মুসলিম দেশ মধ্য মানব উন্নয়ন ভুক্ত। ৬. ২৭টি মুসলিম দেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন ভুক্ত। ৭. বিগত ৩০০ বছর যাবৎ পশ্চাদপদ। ৮. দেশগুলোর মধ্যে চিন্তার ঐক্য নেই। ৯. অনেক দেশ পরস্পরের বৈরী। ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও ভূ-আয়তনবেষ্ঠিত এই বিশ্ব গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উপনিবেশিক শাসন মুক্ত হলে



www.pathagar.com

ধারণা করা হয়েছিল, যে চেতনা, আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে দেশগুলো স্বাধীন হলো, সম্ভবত অল্পদিনের মধ্যে দেশগুলো মুসলিম দেশ থেকে রিভার্ট হয়ে ইসলামী দেশে রূপান্তরিত হবে। দেখা গেল, ইউরোপীয়রা দখলদারিত্ব ছেড়ে দিলেও শাসন ক্ষমতায় রেখে যায় তাদের তৈরী করা মানসিক দাস। এসব দাসেরা ক্ষমতায় বসে বিশ্বাসী জনতার সাথে ইউরোপীয় প্রভুদের চেয়ে খারাপ আচরণ শুরু করে। ইসলামী হুকুমাত কায়েমের লক্ষ্য নিয়ে সদ্যস্বাধীন হওয়া দেশের নব প্রতিষ্ঠিত সরকারের নেতারা দেশগুলোকে সমাজতন্ত্রের দিকে নয়তো বুর্জোয়া পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের দিকে নয়তো একনায়কতন্ত্র অথবা রাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণ যে ত্যাগ ও কোরবানী করলো এর বিনিময়ে তারা শাসক গোষ্ঠীর নিকট থেকে পেল জেল যুলুম, মৃত্যুদণ্ড অথবা নির্বাসন। শাসক গোষ্ঠীর এই নিষ্ঠুর আচরণের কারণে জনগণ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা টিকে থাকার জন্য অবলম্বন হিসেবে বেছে নিল পশ্চিমা প্রভুদের সমর্থন। ইউরোপীয় প্রভূরা এ সুযোগে শাসক ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। সম্পদের প্রাচুর্যতা বিশেষ করে তেল, গ্যাস, স্বর্ণ, কয়লার প্রাচুর্যতায় কিছু মুসলিম দেশ উপকৃত হলেও এর পুরো ফায়দা নিয়েছে পাশ্চাত্য বিশ্ব। মুসলিম বিশ্বের বিক্রিত তেলের পুঁজি পাশ্চাত্যের ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামুলক। জমাকৃত এই অর্থ পাশ্চাত্য আবার দরিদ্র মুসলিম দেশে উচ্চ সুদে বিনিয়োগ করে অথবা ঋণ দিয়ে যে ডলার আয় করে তা দিয়ে তারা নিজেদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে এবং ইসরাঈলকে অস্ত্র কেনার জন্য দান করে । অথচ পেট্রোডলার যদি কোন দরিদ্র মুসলিম দেশে বিনিয়োগ করে অথবা জনগণের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দান করে তাহলে পশ্চিমারা বলবে এটা কোন সন্ত্রাসীগ্রুপকে দেয়া হয়েছে। উপমহাদেশের পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে মিশর এর দিকে লক্ষ্য করতে পারি। বৃটিশদের গোলামী থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। কিন্তু স্বাধীন হবার পর দু'দেশের শাসক যে কুকর্ম করেছে তার খেসারত এই দু'দেশের জনগণকে দিতে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। পাকিস্তানের অস্তিত্ব এখন টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। মিশরের একনায়ক শাসক হোসনী মোবারক শয়তানের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় টিকে ছিল ত্রিশ বছর। এমনিভাবে তিউনিশিয়া, মরোক্কো, আলজেরিয়া, ইন্দেনেশিয়া প্রভৃতি দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মুসলিম বিশ্বে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধানতম কারণ হলো জনগণ ও শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব, অবিশ্বাস। এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ফাঁক থাকার কারণে শূন্য স্থানে বৃহৎ শক্তিগুলো বসে নাড়নকাঠি নাড়ে। এরা ডিভাইড এন্ড রুল নীতি প্রনয়ন করে দলের সঙ্গে দলের, জনগণের সঙ্গে দলের, সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ তৈরী করে উভয় পক্ষের পিছনে ইন্ধন যোগায়। বিশেষ করে গরীব মুসলিম দেশগুলোতে বহুজাতিক কোম্পানী, বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ, এডিবি সুকৌশলে অর্থনীতির মায়াজালে জনগণকে আবদ্ধ করে ইচ্ছেমত শোষণ করছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা,



www.pathagar.com

নিরক্ষরতা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সমস্যা। সেখানেও পশ্চিমাদের নানা রকম ষড়যন্ত্র। জনগণ যাতে ব্যাপক হারে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে সে জন্য তারা অনুদান এবং ঋণ প্রদানে নানা রকম শর্ত জুড়ে দেয় যা কোন ক্রমেই দরিদ্র জনগোষ্ঠির পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নয়। এছাড়া শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি, মারামারি তাদের ষড়যন্ত্রের ফসল। মুসলিম দেশে পশ্চিমাদের এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা কোন পাশ্চাত্যপন্থী রাজনৈতিক দলের দ্বারা সম্ভব নয়। ইসলামী রাজনৈতিক দলের দ্বারাই সম্ভব। সম্ভবত দেশে দেশে আজ সেই আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র মানবতার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভোগবাদী গণতন্ত্রের কুপ্রভাব ইতিমধ্যে সারাবিশ্বকে গ্রাস করেছে।

মানবজীবনের সকলপ্রকার নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে মিথ্য কুহুক, আর রঙ্গিন ফানুস নিয়ে পাশ্চাত্য যাত্রা শুরু করে আজ অবধি যেখানে পৌছিয়েছে সেখান থেকে ফেরার পথ তারা ইতিমধ্যে তালাশ করা শুরু করেছে। তারা উপভোগের নামে যা করেছে তা মানবতার প্রতি চরম অপমান। উদরকে করেছে হারাম খাদ্যের আস্তানা এবং নারীকে করেছে যৌন উম্মাদনার নায়িকা। মহিলারা মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গা থেকে কাপড় খুলতে খুলতে অর্ন্তবাস আর জাঙ্গিয়া অবশিষ্ট রেখে পুরুষের মনভঞ্জন করেও নিস্তার পাচ্ছে না। নারীরা এখন ক্লান্ত। তাদের আর্তনাদ কামুক পুরুষদের মনে কোনো করুণা সৃষ্টি করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের আদর্শ মডেল ভারতভূমি এখন মহিলাদের জন্য জাহান্নাম। পত্রিকার তথ্যমতে ভারতের মহিলার সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়। এই ভারতই পাশ্চাত্যের মডেল বলে গর্ব করে থাকে।

কোনো মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র কোনোক্রমেই মুক্তির বারতা নিয়ে আসতে পারে না। এখানে প্রয়োজন কুরআনিক আইন। কেননা এই আইনের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্মিক পরিচয় জন্মসূত্রে পাওয়া। মুসলমানেরা কুরআনিক আইনের বেশকিছু ধারা স্ব-উদ্যোগে মেনে চলে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পেলে জনগোষ্ঠী অন্য যে কোন আইনের চেয়ে কুরআনিক আইনে বেশী আনুগত্য দেখাবে। ফলে রাষ্ট্র হবে বেশী স্থিতিশীল ও কর্যকরী। মুসলিম দেশের শাসকরা যদি এ বিষয়ে এগিয়ে আসে তাহলে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে তারা জনগণকে সবচেয়ে বেশি কাছে পাবে এবং সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলার জন্য জনগণই হবে শাসকদের জন্য ঢাল।



www.pathagar.com

# নবী প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় বিশ্ব মুসলিম

## এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার মুক্তির দূত, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সব নবী-রাসূলের সর্দার ও রাহমাতুল্লিল আলামীন। মুমিন হওয়া নির্ভর করে তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রদানের উপর। ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্তুতির চেয়ে অধিক প্রিয় হই। ইমাম মুসলিম [রা] আনাস [রা] থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন, অর্থসম্পদ এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার অন্যতম কারণ, ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর প্রতি ভালবাসা ঈমানের স্বাদ অনুভব করারও অন্যতম উপায়। আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া।

২. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফুরি থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফুরির দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূতপবিত্র। তাঁর জীবনের কোথাও কোন কালিমা নেই। তিনি সবার আদর্শ। মুসলিম-অমুসলিম সবার কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য মহামানব। রাসূলের চারিত্রিক সৌন্দর্যের সার্টিফিকেট তাঁর নবুওয়াতের বহু আগেই মক্কার কাফের-মুশরেকরা 'আল-আমিন' তথা 'বিশ্বস্ত' খেতাবে ভূষিত করে দিয়েছিলেন। আর আজ চৌদ্দশত বছর পরে যখন তাঁকে নিয়ে বানানো হলো চরম বিকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ সিনেমা 'ইনোসেন্স অব মুসলিম'। যে সিনেমাটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারী লিপ্সু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একসাথে একাধিক নারীর



www.pathagar.com

সাথে শয্যাগ্রহণকারী হিসেবেও দেখানো হয়েছে। স্ত্রীদের কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতাপেটা করার দৃশ্যও সংযোজন করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিধনকারী হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে। কখনো দাড়িবিহীন সন্ত্রাসী হিসেবে, আবার কখনো জুব্বা গায়ে ভণ্ড চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নবীর সাহাবী ও স্ত্রীদের কুৎসিত ভাবে উপস্থাপন করেছে। আর সমসাময়িক কালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ও বিজ্ঞাপন তৈরির পাশাপাশি কুরআন অবমাননার প্রতিযোগিতা চলছে। এ পরিস্থিতিতে যার সামান্যতম ঈমান আছে, সে এই হীন অপকর্মের প্রতিবাদ না করে পারে না। তাই সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে। এ বিক্ষোভ কোথাও কোথাও সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ২০ জন শহীদ হয়েছে। সহিংস বিক্ষোভ হয়েছে লেবানন, মিসর ও সুদানে। লিবিয়ার বেনগাজিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ চারজন নিহত হয়েছে। এছাড়াও বিক্ষোভ হয়েছে তিউনিসিয়া, ইরান, মরক্কো, ইরাক, ফিলিস্তিন ও ইয়েমেনসহ বিশ্বের সর্বত্র। শুধু মুসলিম বিশ্ব নয়, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও প্রতিবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচীতে রূপ নেয় এবং একটি স্বত:স্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে ফ্রান্সের কার্টুন প্রকাশের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে আফগানিস্তানের মুসলমানরা। প্রায় কয়েক হাজার আফগান নাগরিক দেশটির পূর্বাঞ্চলে রাস্তায় নেমে পড়েন। তারা রাজধানী কাবুল অভিমুখী একটি প্রধান সড়ক অবরোধ করে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর উস্কানিমূলক তৎপরতার প্রতিবাদ জানান। আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জালমাই মার্কিন চলচ্চিত্র ও ফরাসী কার্টুনকে উস্কানিমূলক আখ্যা দিয়ে এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে মার্কিন দূতাবাসের নিকটে শত শত নারী পুরুষ ইসলাম ধর্মের অবমাননায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, পশ্চিমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাজিলের মুসলিমদের একটি সংগঠন ন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিয়ন বিতর্কিত চলচ্চিত্রটির বিরুদ্ধে আইনি অভিযোগ দায়ের করে। এ অভিযোগের সূত্র ধরে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রৌসেফ জাতিসঙ্ঘে তার ভাষণে 'পশ্চিমাদের ইসলামভীতি' নিয়ে সমালোচনা করার কয়েক ঘণ্টা পরই ব্রাজিলের আদালত ইসলাম বিদ্বেষী চলচ্চিত্র সে দেশে নিষিদ্ধ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননার প্রতিবাদ, সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ এবং এর সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করছে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন। এর নিন্দা করছেন খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু বেনেডিক্ট, জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মিসরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান। প্রতিবাদ জানায় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি। সংস্থাভূক্ত মুসলিম দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কঠোর ভাষায় আমেরিকায় তৈরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবমাননাকর সিনেমার নিন্দা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা ইসলামবিরোধী উস্কানি দেয়ার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনের অবকাশে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এ দাবী



www.pathagar.com

জানিয়েছেন তারা। পবিত্র কাবা শরীফের ইমাম ও খতিব শেখ সালেহ আল তালিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবমাননায় পশ্চিমা দেশগুলোর অসৎ অবস্থানের নিন্দা জানিয়েছেন। জুমার নামাজের খুৎবায় তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং পশ্চিমা দেশগুলো বাক স্বাধীনতার কথা বলে মহানবীর অবমাননাকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, অথচ তারাই হলো কাস্ট অথবা জিউইসের চরিত্রের ব্যাপারে যদি কেউ কোন সন্দেহ পোষণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং তাকে পাকড়াও করে। তিনি পশ্চিমাদের এই দ্বৈতনীতির নিন্দা করেন। কাবা শরীফের ইমাম মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে সহিংস প্রতিক্রিয়া না জানানো হয়। কেননা এর ফলে নিরীহ মানুষের প্রাণহানী হয় এবং অযথা সম্পদের ক্ষয় হয়। তিনি যথাযথভাবে মহানবীর শিক্ষা মেনে চলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে অভিযোগ খণ্ডন করারও আহ্বান জানান। সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিশ্বব্যাপী যারা পবিত্র ধর্ম এবং আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তি করার চেষ্টা চালায়, তাদের প্রতি তা বন্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি মুসলিমদের প্রতি তাদের ইসলামী বিশ্বাস ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশ্নে অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের শীর্ষ আলেম দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফী দা. [রা] বলেছেন, পশ্চিমা ইহুদী ও খ্রিষ্টান বিশ্বে এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মুসলমানদের বুকে ছুরিকাঘাত করেছে। তিনি অবিলম্বে চলচ্চিত্র নির্মাতাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রদানসহ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে মুসলিম জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিবাদের ধ্বনিতে মুসলিম বিশ্ব যখন মুখর তখনও দেশে দেশে রাসূল, ইসলাম ও কুরআনকে অবমাননা করছে নতুন নতুন আইডিয়া দিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীরা। এর কারণও সবার বোধগম্য। স্যামুয়েল পি হান্টিংটন তার Clash of Cvilizations [সভ্যতার দ্বন্দ্ব] বইয়ে বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানকে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব মুসলিম বিদ্বেষীদের লক্ষ্য হল, মুসলমানদের চারদিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। তাই দেখা যায়, কথায় কথায় মুসলমানকে জঙ্গি বলা, ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম বলা, রাসূলকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চলছে হরদম। এ ক্ষেত্রে মিডিয়া হলো বড় হাতিয়ার।

এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের এগুতে হবে খুব সাবধানে। পা ফেলতে হবে খুব বুঝেশুনে। ওদের যেকোন উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের মোকাবেলা করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে। প্রতিবাদের ভাষাও হতে হবে বজ্রকঠিন। অন্যায়ের প্রতিউত্তর হবে চপেটাঘাত স্বরূপ। এদের একটি সিনেমার পরিবর্তে হাজারো সিনেমা তৈরি করে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম আর রাসূল উত্তম চরিত্রের অধিকারী এ বিষয়টি গোটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। তুলে ধরতে হবে আমেরিকান নাগরিক মাইকেল এইচ হার্টের সাড়া জাগানো বই-এ ১০০ A Ranking of the Most Influentail persons in History' যা 'দ্য হানড্রেড' নামে পরিচিত, সেখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহামানব হিসেবে এক নাম্বারে রাখা হয়েছে এর কথা।



www.pathagar.com

স্মরণ করিয়ে দিতে হবে পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৌরবমণ্ডিত অবস্থানের স্বীকৃতির কথা। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্মই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" শেষ নবীর অনুপম চরিত্র ও বহুমুখী প্রতিভায় আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়ে তিনি এ মর্মেও আশা প্রকাশ করেন যে, "আমি আশা করি, সে সময় খুব দূরে নয় যখন সকল দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমি একতাবদ্ধ করতে এবং কুরআনের যে নীতিসমূহ একমাত্র সত্য ও যে নীতিসমূহই মানবকে স্বস্তির পথে পরিচালিত করতে পারে সে সব নীতির উপর ভিত্তি করে এক সমরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।"

বিশ্ব :মনীষার সৌকর্য সাধনে মহানবীর অতুলনীয় অবদানের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান করেন অপর ইউরোপীয় মনীষী আলফ্রেড দ্য লামার্টিন। তাঁর গ্রন্থে ১৮৫৪ সালে এই ফরাসী ঐতিহাসিক, কবি ও রাজনীতিবিদ উল্লেখ করেন: "দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুন:সংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের সংস্থাপক কর্তা-এই দেখ মুহাম্মদ! যে সমস্ত মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মহত্ত্ব পরিমাপ করা হয়ে থাকে, সেগুলির প্রত্যেকটির আলোকে তাঁকে বিবেচনা করা হলে, আমরা এ কথা সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি "কোন মানব কি তাঁর অপেক্ষা মহত্তর ছিলো?"

জন উইলিয়াম ড্রেপারও ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত A history of the intellectual development of Europe গ্রন্থে স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, "সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বৎসর পর ৫৬৯ [মতান্তরে ৫৭০] খ্রিষ্টাব্দে আরবে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ, যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মানবজাতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।"

বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক ও ভারতের সাবেক গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্ট সম্পৃক্ত বক্তৃতায় ইসলামের নবী প্রবর্তিত মুসলিম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঘোষণা করেন :"মুকুটধারী সম্রাট থেকে দীনতম প্রজা পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই মুহাম্মদ প্রবর্তিত আইন সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাজ্ঞতম মনীষীবৃন্দের চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে গ্রথিত এই ইসলামী আইন হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উদ্দীপ্ত ন্যায়শাস্ত্র।"

পিয়েরে ক্রাবাইট নারী মুক্তির পথিকৃৎরূপে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচিহ্নিত করে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম-ই হচ্ছেন নারী অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।"

একইভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য-সুষমা, মহত্ত্ব-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে বক্তব্য দেন: খ্রিষ্টান পাদ্রী



www.pathagar.com

রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ, মনীষী টমাস কার্লাইল, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ ডব্লু. ডব্লু.মন্টোগোমারী ওয়াট।

স্বভাবতই ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত এই মহামানব একইভাবে আলোড়িত ও আকৃষ্ট করেছেন কারেন আর্মস্ট্রং, আর্নেস্ট রেনান, এইচ. জি. ওয়েলস, পি.কে.হিট্টি, ভন হ্যামারপার্গস্টল, ভন ক্রেমার, টমাস প্যাট্রিক হিউজ, অঁরি পিরেন, আলফ্রেড গিলম, লিঁও সিটানি, এমানুয়েল ডায়েশ, স্যামুয়েল জনসন, এমারসন, উইলিয়াম ম্যুর, স্টানলি লেনপুল প্রমুখ পাশ্চাত্য জগতের অমুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দকে।

এ উপমহাদেশেও মাহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, স্যার সি. ভি.রমণ, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জহরুলাল নেহেরু প্রমুখ মনীষী ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুবিমল চরিত্র-মাধূর্য ও বিভিন্ন গুণের অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করেছেন।

যে নবী অমুসলিম মনীষীদের প্রশংসার পাত্র, যে নবীকে ভালোবেসে তাঁর সুন্নাহ সাধ্যানুযায়ী জানার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে বিশ্বের প্রায় দেড় শত কোটি মুসলমান, পৃথিবীর সেই সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তির গঠনমূলক সমালোচনা মুসলমানরা সহ্য করতে রাজি, কিন্তু তথাকথিত সমালোচনার নামে নবীর শানের খেলাপে কুৎসা রটনা করা কোনও ধর্মভীরু মুসলমান কোনদিনও সহ্য করেনি, আর  সহ্য করা সম্ভবও নয়। তাই আজো ভারতীয় বংশোদ্ভূত কুখ্যাত সালমান রুশদী তার অমার্জনীয়, ঘৃণিত কর্মকাণ্ড “দি স্যাটানিক ভার্সেস”-এর জন্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। কোন মুসলমান দেশ এই ঘৃণ্য পাপীকে ক্ষমা করতে পারে না।

নবীর শানে অবমাননা রুখতে মুসলমানদেরকে রাসূলের সীরাত ভালোভাবে জানতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহকে প্রতিটি মুসলমানের জীবনে আঁকড়ে ধরতে হবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। হিকমতের সাথে ইসলাম বিদ্বেষীদের রুখতে হবে। মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অঙ্গনে পরিধি বাড়াতে হবে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রসার ঘটিয়ে তার  মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে মানুষকে ডাকতে হবে। মুসলিম যুবকদেরকে ফেসবুক, ব্লগ ও ইন্টারনেটে ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে। বাতিলের ভ্রান্ত প্রোপাগাণ্ডাকে সত্যের প্রচার দিয়ে মোকাবেলা করতে একদল মজবুত মুসলিম কলমসৈনিক সৃষ্টি করতে হবে। আর এ কাজগুলো করতে হবে রাসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে হবে, মুসলিমরা পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ, সবকিছুর চেয়ে তাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লামকে অধিক ভালোবাসে।



www.pathagar.com

# মহানবীর [সা] বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মিশন এবং আজকের মুসলিম উম্মাহ’র দায়িত্ব

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন এবং মহানবীর [সা] মিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্যও ছিল–সারা বিশ্বের মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা বা মানবতার কল্যাণ। তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য আল্লাহর রহমত :

“আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য আমার রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।”–[আল আম্বিয়া : ১০৭]

বিশ্বায়ন, বিশ্বরাষ্ট্র, বিশ্বশান্তি ইত্যাকার শব্দগুলো বর্তমানে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে অনেকটা চিত্ত-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে চলেছে। দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সংঘাত ও বিদ্বেষের প্রেক্ষিতে বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণা ক্রমান্বয়েই জোরালো হয়ে উঠছে। অথচ বিশ্বায়ন ও বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণা ও বাস্তব আদর্শ আজ থেকে বহু আগেই ইসলাম পেশ করেছে। আর ইসলাম যে বিশ্বায়ন ও বিশ্বশান্তির আদর্শ পেশ করে তা বর্তমানের বিশ্বায়নের নামে শোষণ ও আগ্রাসনের কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের নেতৃত্বে বিশ্বায়নবাদীরা New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নামে মূলত পুঁজিবাদ বা শোষণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তৎপর। পুঁজিবাদ যে বিশ্বে শান্তি দিতে পারে না তা দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমানেও অব্যাহত যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। আজ বিশ্বব্যাপী আমরা যে সন্ত্রাস ও অস্থিরতা লক্ষ করছি একে নানা কারণে একটি ধর্মীয় রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হলেও মূলত এসবই হচ্ছে তথাকথিত বিশ্বায়নবাদীদের অব্যাহত শোষণ ও জুলুমের অনিবার্য পরিণতি। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের স্বরূপ সম্পর্কে শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ বলেছেন : ‘তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বটাকে একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করা আর



www.pathagar.com

মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন পরিকল্পনার অধীনে New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন চলছে। গ্লোবালাইজেশন পরিকল্পনা অর্থ আর প্রযুক্তিতেই সীমিত থাকবে এমনটি আশা করা কঠিন। অবশ্য বস্তুগত জগতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে অর্থ আর প্রযুক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ফ্যাক্টর যা আর্থ-সামাজিক প্রভাব বলয় সৃষ্টির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র বা সমাজ দর্শনের ভাবকাঠামো। শুধু দার্শনিক ভাব কাঠামোই নয়, কৌশলগত কুটচালে প্রত্যক্ষভাবে পরনির্ভর এবং প্রকারান্তরে নিগৃহীত হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ও স্বাধীন রাষ্ট্রিক অস্তিত্বের অবকাঠামো। কারণ, অনিবার্যভাবেই প্রতিটি সবল রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে স্বার্থের ক্রীড়নক বানাবে। বিভিন্নভাবে আগ্রাসনের শিকার হবে। তথ্য আগ্রাসন আর অর্থনৈতিক আগ্রাসন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনে রূপ নেবে। প্রত্যক্ষ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা আর না হয় উপনিবেশ–এই হবে বাস্তবতা।' পুঁজিবাদী বিশ্বায়নবাদের বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে ধনী-গরীবের সীমাহীন বৈষম্য, শোষণ ও অসম ভোগের রাজত্ব কায়েম। এ প্রসঙ্গে কিব্রিয়াহ আরো বলেন : 'পুঁজিবাদের ধারকেরা পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীকে স্ব স্ব স্থানে বহাল রেখে গণবিপ্লবের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিকায়ন করতে চান। এ লক্ষ্য অর্জনে তারা তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে মিডিয়াকে প্রধান কার্যকর অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে। রেডিও-টিভি-ভিডিও, সিনেমা, নাটক, সংগীত, সংবাদপত্র, স্যাটেলাইট, বিজ্ঞাপন, মডেলিং, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, মেলা, জন্মনিরোধক, ড্রাগ, ভায়াগ্রা, ব্লু ফিল্ম, মানব ক্লোনিং, বিতর্ক-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, এনজিও ইত্যাদির সহযোগিতায় পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক বন্ধন লোপ, অনৈতিকতা, ধর্মরিপেক্ষতা, অশ্লীলতা, অবাধ ও অস্বাভাবিক অশ্লীল–লিভিং টুগেদার ইত্যাদির প্রচার, প্রসার ও চর্চার মাধ্যমে শুভকামী ঐতিহ্যিক ও শাশ্বত মূল্যবোধ ধ্বংসে লিপ্ত হয়। যেখানে এসবের দ্বারা সাফল্যের সম্ভাবনা কম, অনিশ্চিত কিম্বা সুদূর সেখানে পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রীড়নক জাতিসংঘের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন এবং ইরান, সিরিয়ায় আগ্রাসনের পাঁয়তারা এরই বাস্তবতা।' সুতরাং পুঁজিবাদ মূলত একটি অভিশাপ এবং বিশ্বশান্তির জন্য তা মোটেও কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে না। অন্যদিকে সমাজবাদ বা কমিউনিজম উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজার একচেটিয়া ভাবে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' এবং 'একদলীয়' স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকারকে গলা টিপে হত্যা এবং শিল্প-অর্থনীতির চরম দুর্দশা



www.pathagar.com

ঘটিয়ে ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্ব থেকে বিতাড়িত হয়েছে। মূলত পুঁজিবাদ বলি আর সমাজবাদ বলি এ সবই হচ্ছে মানবতার উপর শোষণ, আধিপত্য ও প্রভূত্বকে পাকাপোক্ত করার এক বিশেষ কৌশল। এর ফলে বুশ, ব্লেয়ার, কিংবা হিটলার, মুসোলিনী, লেনিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ মানুষ হয়েও দানবীয় রূপ ধারণ করার সুযোগ লাভ করে এবং পৃথিবীকে নরকে পরিণত করে।

অপরদিকে বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতাও ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী আমেরিকার একক ও অন্যায় আধিপত্য এবং ইউরোপ-আমেরিকার দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া, জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের ইরাক হামলা এবং দখল এবং এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের চরম ব্যর্থতা ও অসহায়ত্ব, একই কারণে ইউরোপ আমেরিকার চাপে পড়ে সম্পূর্ণ খোঁড়া অজুহাতে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে হামলা, যুদ্ধ ও অবশেষে দখল, ইরান, সিরিয়ার প্রতিও একইভাবে হুমকি এবং দখলের পায়তারা অথচ ইসরাইলের ব্যাপারে নিরব ভূমিকা, ফিলিস্তিন, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা-ক্রোয়েশিয়া, মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, আজারবাইজান সহ চীন, রাশিয়া, ভারতসহ দেশে দেশে মুসলিম নির্যাতন ও নির্মূল অভিযান, জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মানবাধিকার লংঘন, দেশে দেশে যুদ্ধ, হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি এবং লক্ষ লক্ষ বেসামরিক ও নিরীহ মানুষের উপর পরিচালিত গণহত্যা ইত্যাদি জাতিসংঘের শোচনীয় ব্যর্থতাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

বিশ্বজনীন আদর্শ ও মানবাধিকারকে সমুন্নত করার সাফল্যের কারণে একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মানবাধিকারের যোগ্য দাবিদার ও প্রকৃত আদর্শ। বিশ্বশান্তির জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি জনপদে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কায়েম করা। মানুষের মৌলিক অধিকার তথা ভাত, কাপড়, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার; স্বাধীনতা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তা, কথা বলা, ধর্ম-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের অধিকার এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা। ক্ষুধা-দারিদ্র, অশিক্ষা, পশ্চাৎপদতা, বেকারত্ব, বৈষম্য, জুলুম, স্বৈরশাসন নির্মূল করে সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয়, বিশ্বশান্তির জন্য মানুষের ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়েও হতাশা, অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মানুষ ও পরিবারের মধ্যে যদি শান্তি না থাকে কিংবা সমাজের মানুষের মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া-সহমর্মিতা ও সহনশীলতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকে, যদি তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ বা নৈতিকবোধ ও চরিত্র না থাকে, যদি তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর না হয়ে বিবেকহীন, অজ্ঞ, কুপমণ্ডুক, উগ্র গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন হয়, উদারতা ও সহমর্মিতার পরিবর্তে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যদি ধর্ম-বর্ণ-জাতি বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকে তাহলে বিশ্বশান্তি ব্যাহত হতে বাধ্য। কারণ ব্যক্তি মানুষের



www.pathagar.com

মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে, ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ের শান্তিই পর্যায়ক্রমে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তির ভিত রচনা করে থাকে।

আর এ কারণেই আত্মগঠন, পরিবার ও সমাজ সংস্কার এবং কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনকে ইসলাম সর্ব প্রথম বেশি গুরুত্ব দেয়। মানুষের এসব মৌলিক নূন্যতম অধিকার পূরণ করাই ইসলামী কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ। বলাবাহুল্য, মহানবীর [সা] জীবন মিশন প্রসঙ্গে আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সে সবেরই উদ্দেশ্য ছিল একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী সমাজ ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ। এরপর ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসমাজ গড়ার সব রকম উপকরণ-উপাদান ও দর্শন যেহেতু ইসলামের রয়েছে, সেহেতু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া।

## ইসলাম : বিশ্বজনীন আদর্শ

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ। ইসলামের আহবান শুধু মাত্র কোন বিশেষ বংশ, গোত্র কিংবা বিশেষ কোন ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। বরং ইসলামের আহবান বিশ্ব-মানবতার প্রতি। ইসলাম মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ বা হিংসা-বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয় না বরং ইসলামই ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বের সকল ধর্মের, সকল বর্ণের ও সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ এক আদমের সন্তান এবং তারা সকলে মূলত এক জাতি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে :

'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রভুক্ত করে দিয়েছি শুধু এজন্য, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে আল্লাহকে সবার থেকে বেশি ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি সকল বিষয়ে অবহিত।'–[আল হুজরাত : ১৩]

আর আল কুরআনও কোন বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চল বা বিশেষ কোন জাতি-গোষ্ঠীর জন্য নাযিল হয়নি। বরং আল কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই স্রষ্টা মনোনীত পথ-নির্দেশ। আল কুরআন সকল দেশের সকল মানুষের।

'বস্তুত, এটি [আল কুরআন] সব মানুষের জন্য একটি পয়গাম। এটি এজন্য পাঠানো হয়েছে, যেন এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং তারা জেনে নেয় যে, প্রকৃতপক্ষে প্রভূ শুধু একজন এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'–[ইব্রাহিম : ৫২]



www.pathagar.com

'তিনিই পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাহর উপর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন।'– [আল ফুরকান : ১]

হযরত মুহাম্মদও [সা] কোন আঞ্চলিক নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী বা মহানবী [সা]। তাঁর বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে আল কুরআনে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মোস্তফাকে সম্বোধন করে একাধিক স্থানে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ঘোষণা করেছেন, "আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য আমার রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।"–[আল আম্বিয়া ১০৭]

'আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই সে সম্পর্কে অবহিত নয়।'– [সাবা : ২৮]

"বল, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত নবী [সা], যিনি আসমান-জমিনের সাম্রাজ্যের মালিক, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং যিনি জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর উম্মি নবী ও রাসূলের [সা] প্রতি, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান পোষণ করেন। তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সোজা পথে চলতে পারো।" – [আল আরাফ : ১৫৮]

"হে লোকসকল! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এ নবী তোমাদের কাছে সত্য সহকারে এসেছেন, কাজেই তোমরা ঈমান পোষণ কর; এটা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি কুফরি করতে থাকো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহই আসমান ও জমিনের অধিপতি।"– [আন নিসা : ১৭০]

আর হযরত মুহাম্মদ [সা] আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দ্বীন বা আনুগত্যের বিধান এনেছেন তাও কোন অপূর্ণাঙ্গ ও খণ্ডিত দ্বীন নয় কিংবা এটি কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ অঞ্চল ভূখণ্ডের মানুষের জন্যও অবতীর্ণ হয়নি। বরং বলা হয়েছে আল কুরআন হচ্ছে বিশ্বমানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ-সম্পদকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।– [আল মায়েদা : ৩]

আবার মহাগ্রন্থ আল কোরআন কোন বিশেষ সময়কালের জন্যও সীমাবদ্ধ নয়। আল কুরআন সর্বশেষ ও অনন্ত এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত আসমানী কিতাব। এই গ্রন্থ ইসলামের চিরন্তন আদর্শের উৎস। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এই মহাগ্রন্থের ক্ষয় নাই, লয় নাই। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ [সা] হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল [সা] আর তাঁর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন হলো বিশ্বমানবতার জন্য সর্বশেষ আসমানি কিতাব তথা সর্বশেষ পথনির্দেশ; সেহেতু এ কিতাবের হেফাজতের দায়িত্বও নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন :



www.pathagar.com

"এ 'জিকরকে [কুরআন] আমরা নাযিল করেছি আর আমরাই একে হেফাযত করব।"– [আল-হিজর : ৯]

## বিশ্বনেতৃবৃন্দের নিকট মহানবীর দাওয়াত

হযরত মুহাম্মদ [সা] যে বিশ্বনবী ছিলেন এবং তাঁর আনীত আদর্শ যে ছিল বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একটি বিশ্বজনীন আদর্শ তাঁর প্রমাণ আমরা পাই হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ষষ্ট ও সপ্তম শতকের দিকে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে প্রেরিত রাসূল [সা]–এর প্রেরিত ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র থেকে। খ্রিস্টীয় ৬২৮ সনে মক্কার মুশরিকদের সাথে মহানবীর [সা] একটি দশ বছর মেয়াদী 'যুদ্ধনয়' চুক্তি, যা ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত; স্বাক্ষরিত হলে একটি স্থিতিশীলতা তৈরি হয়। হযরত মুহাম্মদ [সা] এই স্থিতিশীল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে মনযোগী হন। এ সময়ে তিনি তাঁর সম-সাময়িক বিশ্বের রাজা-বাদশাহ-সম্রাটদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌছানো শুরু করেন। ফলে তিনি যে কোন আঞ্চলিক নবী ছিলেন না, তা প্রমাণিত হয়।

## বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সমাজ

ইসলাম মানুষের মধ্যে কোন বংশ-বর্ণ-গোত্র-জাতি-গোষ্ঠীগত কারণে কিংবা কোন আঞ্চলিকতার কারণেও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, পার্থক্য ও বৈষম্য অনুমোদন করে না। বরং দেশ-কাল ভেদে প্রাকৃতিক কারণে বা ভৌগলিক প্রভাবে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা স্বাতন্ত্র্যকে বৈচিত্র হিসেবেই গ্রহণ করে যা আমরা একটু আগে আল কুরআনের একটি ভাষ্য থেকে জানতে পেরেছি। তবে এগুলোকে ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে বিভেদের দেয়াল দাঁড় করানো ইসলাম পছন্দ করে না। দেশ-কাল ভিত্তিক ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে যে অসংখ্য ভৌগলিক রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে এবং এসবকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ, হানাহানি চলছে, এই আঞ্চলিক জাতীয়তার নামে বাড়াবাড়ি ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম লৌকিক ঐতিহ্য বা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মিল বা ঐক্যকে স্বীকার করেও এ নিয়ে দলাদলি ও বিভেদ পছন্দ করে না। ইসলাম বরং বাহ্যিক মিলের চেয়ে মানুষের মনের মিল বা আদর্শের মিলকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এই আদর্শিক গুরুত্বের কারণে ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের চেয়ে আদর্শিক জাতীয়তাবাদকেই বেশি প্রাধান্য দেয় এবং বিশ্ববাসীকে একই আদর্শের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বসমাজ ও বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই বলে লৌকিক ঐতিহ্যকে যে ইসলাম স্বীকার করে না তা নয়, বরং লৌকিক ঐতিহ্য যদি আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে তাকে বিশ্বসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বা বৈচিত্র হিসেবেই সাদরে গ্রহণ করে। যার অনুমোদন আমরা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ থেকে পেতে পারি। তবে আদর্শকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। আদর্শকে মাইনাস করে কোন জাতীয়তা ইসলাম অনুমোদন করে না।



www.pathagar.com

বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসমাজ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে অভিহিত করা হয়েছে একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে। আমরা যদি ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব বাস্তবেও মুসলমানরা ছিল একটি অখণ্ড জাতি। আল্লাহর রাসূল [সা] শত-গোত্রে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও সংঘাতে লিপ্ত সমগ্র আরব ভূখণ্ডের লোকদেরকে দ্বীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছিলেন। আদর্শের জন্য মক্কার লোকেরা রাসূলের [সা] অনুসরণে তাঁদের প্রিয় মাতৃভূমি, বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেছিলেন। এবং মদিনার লোকেরাও, যারা ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল তারা মক্কার লোকদেরকে ভাই হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল এবং তাদের জন্য জন্য নিজেদের জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিল। শত গোত্র-ভিত্তিক সেই বিশৃংখল সমাজে, যেখানে সমন্বিত কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রশাসন ছিল না, ছিল না কোন একক নেতৃত্ব, সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাসূল [সা] সমগ্র আরবের বিশৃংখল ও বিভক্ত সমাজ ও মানুষকে আল কুরআনের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র-কাঠামো, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক শৃংখলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা গড়ে তুলেছিলেন। মদিনায় হিজরতের পূর্বে সেখানে শান্তি-শৃংখলা বলে কিছু ছিল না। ইহুদীদের চক্রান্তে মদিনায় আউস ও খাজরাজ গোত্র বছরের পর বছর 'বুয়াস' নামে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সহ অসংখ্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইসলামের সুমহান আদর্শের ছোঁয়ায় মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্র ভূলে গিয়েছিল তাদের চিরদিনের গোত্রীয় বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ওয়াট বলেছেন : 'হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে মদিনাবাসীরা ধর্মের দিক দিয়ে নবী এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের বিবাদমান গোত্রগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল।'

শুধু তাই নয়, মদিনার জনগণ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি জোরালো সমর্থন এবং আদর্শকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে তিনি মদিনার অস্থিতিশীল, বিশৃংখল ও হানাহানিতে লিপ্ত অকার্যকর ও ব্যর্থ সমাজ-রাষ্ট্রটিকে আদর্শের আলোকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সত্তেও তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেননি। বরং মদিনার সকল গোত্র ও ধর্মের লোকদেরকে এক মঞ্চে এনে সবাইকে কতগুলো সার্বজনীন স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং সকলের সম্মতির ভিত্তিতে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম একটি লিখিত সংবিধান রচনার মাধ্যমে সকল ধর্ম ও গোত্রের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন, যা মদিনা সনদ [Charter of Medina] হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে সম্মানজনক স্থান লাভ করেছে। মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনা সর্ব প্রথম একটি সুসংহত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপ লাভ করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুইরের মতে, 'মদিনা



www.pathagar.com

সনদ' শুধু সে যুগে কেন, বরং সর্বযুগে ও সর্বকালে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতার ঘোষণা করবে। এ সনদের ফলে মদিনার আদি পৌত্তলিক গোষ্ঠী সমূহ, ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ, প্রতিহিংসা ও সংঘাতের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান হয় এবং একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে অভূতপূর্ব সুশাসন, সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে শুধুমাত্র মদিনাকেই নয়, কিংবা শুধুমাত্র সমগ্র আরব ভূখণ্ডই নয়, তিনি যেহেতু ছিলেন বিশ্বনবী, সেহেতু তিনি আল কুরআনের বিশ্বজনীন আদর্শকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কলুষতা থেকে ছিলেন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কারণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র কোন সংকীর্ণ জাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। জাতীয় রাষ্ট্র যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখনই তা সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করে এবং পৃথিবীর জন্য অভিশাপ বয়ে আনে। পর সম্পদ লুণ্ঠন এবং অপর জাতির উপর অন্যায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের প্রধান লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদীদের ছোবলে অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন জাতিগুলো তাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীকার হারিয়ে গোলামে পরিণত হয়। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ অবশেষে মানবতার জন্য কেবল দু:খ ও অকল্যাণই বয়ে আনে।

মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত সংকীর্ণ অর্থে কোন ভৌগলিক জাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। সেটি সম্পূর্ণভাবেই ছিল একটি আদর্শ রাষ্ট্র। আর সে আদর্শ ছিল বিশ্বজনীন ও মানবতাবাদী আদর্শ। বিশ্ববাসীকে, সকল জাতি ও রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার সকল ক্ষমতা, সকল উপাদানই সেই বিশ্বজনীন আদর্শের মধ্যে বর্তমান ছিল। এ কারণে আমরা দেখি মদিনার সেই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটি এক সময় সমগ্র আরব ভূখণ্ড এবং পরবর্তীতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ সহ তৎকালীন বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে অধিকার করলেও সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করেনি। রাসূলের একক নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুসলমানদের অপ্রতিরোদ্ধ শক্তির সামনে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য নতজানু হতে বাধ্য হলেও মুসলমানদের এ বিজয় ছিল মূলত আদর্শিক বিজয়; জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মত অপর জাতির সম্পদ লুট ও তাদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যে কারণে অর্ধ জাহানের খলিফা, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুককে আমরা দেখেছি খেজুর তলার উন্মুক্ত চত্বরকে বিছানাতে বানাতে, অত্যন্ত দীন-হীন পরিবেশে সরল-সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আর মহানবীর [সা] কথা তো বলাই বাহুল্য। সারা জীবন কত কষ্টই না করে গেছেন। তারা যদি একটু আপোষও করতেন, স্বার্থবাদীতাকে একটুও প্রশ্রয় দিতেন কিংবা সাম্রাজ্যবাদের সামান্য চিন্তাও যদি তাদের থাকতো, তাহলে সম-সাময়িক দুনিয়া-



www.pathagar.com

পূজারী শাসকদের মত তারাও ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে জীবন কাটাতে পারতেন। অথচ ঐ সময়েই রোম-পারস্যের রাজা-বাদশাহদের ভোগ-বিলাসের কথা সর্বজন বিদিত। সুতরাং প্রভূত্ব বা আধিপত্য বিস্তার কখনো তাদের লক্ষ্য ছিল না। বরং মানুষের উপর মানুষের যে প্রভূত্ব ও আধিপত্য সে সময়ে বিভিন্ন জাতির উপর চেপে বসেছিল, তা থেকে বিশ্ব মানবতাকে মুক্ত করাই ছিল মহানবীর [সা] ইসলামী রাষ্ট্র এবং পরবর্তীতে ইসলামী খেলাফতের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী খেলাফত আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। সাম্রাজ্যবাদ যেখানে তাদের শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করার জন্য জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে মানব জাতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অসংখ্য বিভেদের দেয়াল আর জন্ম দিয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ আর অস্থিরতার, অন্যদিকে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা ও আঞ্চলিকতার নামে মানুষের মধ্যে যত কৃত্রিম বিভেদ তৈরি হয়েছে সে সব বিভেদ ঘুচিয়ে দেয়া এবং এসব বিভেদকে জিইয়ে রেখে মানুষের উপর যারা প্রভুত্ব কায়েম করার সুযোগ নিয়েছে, সে সব প্রভূদের সিংহাসন গুঁড়িয়ে দেয়াই ছিল ইসলামী খেলাফতের লক্ষ্য। একারণেই দেখা যায়, ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই সবাইকে আপন করে নিয়েছে এবং ঘুচিয়ে দিয়েছে বিভেদের সব দেয়াল। আরব-অনারব, সাদা-কালো সকল দেশের সকল মানুষ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে গড়ে তুলেছিল এক অখণ্ড উম্মাহ, মিল্লাত বা জাতি। এক আল্লাহ, এক রাসূল [সা], এক কেবলা এবং এক ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শের ভিত্তিতে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক বিশ্বসমাজ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, হিংসা-বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার যে অপরাজনীতি আজ মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল, মর্যাদাহীন করে রেখেছে, এসব বিভেদের বীজ উপড়ে ফেলেই আল্লাহর রাসূল সীসাঢালা প্রাচীরের মত গড়ে তুলেছিলেন শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ। যে জাতির শ্রেষ্ঠত্বের সনদ দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে:

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রেখে চলবে।' –[আলে ইমরান : ১১০]

শুধু জাতি নয়, বলা হচ্ছে মুসলমানরা হলো 'শ্রেষ্ঠজাতি' বা খাইরা উম্মাত। ইসলামের আদর্শকে, আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক অখণ্ড জাতিসত্তায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণেই সেদিন পৃথিবীতে মুসলমানরা আবির্ভূত হয়েছিল শ্রেষ্ঠজাতি আর মানবতার কাণ্ডারি হিসেবে। মানব জাতিকে সৎ পথে পরিচালনা এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখা তথা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়াও তখন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এটি সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, তখন মুসলমানরা সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র আল্লাহর কালাম বা ইসলামকেই প্রাধান্য দিয়েছিল এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও নেতৃত্বের মোহকে বিসর্জন দিয়ে একক নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।



www.pathagar.com

দ্বীনকে, আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে আল কুরআনে দেয়া হয়েছে বিশেষ তাগিদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহেলিয়াতের যুগের বিভেদ ও হানাহানির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মুসলমানদের হুশিয়ারী করে বলেছেন :

'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন, তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।' –[আলে ইমরান : ১০৩]

এই হুশিয়ারী করা হয়েছিল এজন্য যে, যাতে মুসলমানরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থাকে যারা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির কারণে বিচলিত এবং এই ঐক্যকে নস্যাত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঐ একই সূরায় এর আগে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও হুশিয়ারী করা হয়েছে এভাবে :

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি এই আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে কোন একটি দলেরও কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে আবার ঈমান থেকে কুফরির দিকে নিয়ে যাবে। এখন তোমাদের কুফরির দিকে ফিরে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বর্তমান রয়েছেন? বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে, সে নিশ্চিয়ই সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারবে।'–[আলে ইমরান : ১০০-১০১]

মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি জোর দিয়ে আল কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

'তোমরা সে সব লোকের মত হয়ো না যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।' [আলে ইমরান : ১০৫]

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির উপরই তাদের শক্তি ও সমৃদ্ধি এবং হকের উপর তাদের টিকে থাকা নির্ভর করে। এ কারণে ইসলাম শুধু যে মুসলমানদের ঐক্যের উপর গুরুত্বই প্রদান করেছে তাই নয়, ঐক্য বিনষ্টকারী সকল কারণগুলোও চিহ্নিত করে দিয়েছে। উম্মাহর ঐক্যকে বিপন্ন করতে পারে এমন কোন প্রবণতা ও ভেদনীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বংশ, গোত্র অথবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব বা আভিজাত্যের অহমিকাকে প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্যের উপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর ভয় তথা আদর্শনিষ্ঠতাকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও অখণ্ডত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] তাঁর উম্মতের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেছেন : 'অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার উপর কালোর কিংবা কালোর উপর সাদারও



www.pathagar.com

কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে। মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে শুধু তাক্বওয়া।' তিনি আরো বলেছেন : 'আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরটি যেমন পবিত্র, তোমাদের পরস্পরের রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদও তেমনি পবিত্র। মুসলমানরা পরস্পরের ভাই ভাই। সাবধান! আমার পর তোমরা একজন আরেকজনকে হত্যা করার মত কুফরি কাজে লিপ্ত হয়ো না। আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নাহ।'

## বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আদর্শের ভূমিকা

এভাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মাধ্যমে ইসলাম একটি বিশ্ব সমাজের গোড়াপত্তনের মাধ্যমেই তার দায়িত্ব শেষ করে দেয় না বরং বিশ্বশান্তির জন্য তাকে পালন করতে হয় মূল ও দায়িত্বশীল ভূমিকা। কারণ আল কোরআনে মুসলিম জাতিকে অভিহিত করা হয়েছে মানবতার কাণ্ডারী ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে। ইসলামী আদর্শের ধারকবাহী হিসেবে বিশ্বশান্তির নিয়ন্তা করা হয়েছে মুসলিম জাতিকে। উম্মতে মুসলিমার দায়িত্ব অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে এখানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] আমাদের জন্য কী নির্দেশনা রেখে গেছেন তাই আমরা দেখার চেষ্টা করব।

## মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা

বস্তুত বর্তমান বিশ্বের সেকুলার রাষ্ট্রসমূহ সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে যতটা বাগাড়ম্বর করছে সে তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যালঘুদেরকে তাদের ধর্মীয় অধিকার সহ সার্বিক মানবাধিকারের অনেক বেশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। একমাত্র ইসলামই যেহেতু মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে সর্বাধিক সমুন্নত করেছে, সেহেতু ইসলাম সংখ্যালঘুদের মানবিক অধিকারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। এ ব্যাপারে মহানবী এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনাদর্শের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক পাথেয়। আল্লাহর রাসূল মুসলমানদের জীবনে বা মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে পৌত্তলিকতাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু তাই বলে অমুসলিমদের ধর্মীয় ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। বরং অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের ব্যাপারটি যেহেতু অনেকটা স্পর্শকাতর বিষয়, সেহেতু এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। সংখ্যালঘুদের উপাসনার স্থান ও তাদের উপাস্যদের উপর হামলা করাসহ তাদের উপর কোন ধরনের বৈষম্যকে তিনি বরদাশত করতেন না। এমনকি যুদ্ধের সময়ও যাতে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্থানের উপর আঘাত করা না হয় সে ব্যাপারেও তিনি মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতেন। অমুসলিমদের উপাস্যদের নিয়ে কটূক্তি করতেও



www.pathagar.com

মহানবী নিষেধ করেছেন। তাদের উপর কোন ধরনের জুলুম করা তিনি পছন্দ করতেন না। এমনকি তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, কেউ যদি অমুসলিমদের উপর কোন জুলুম করে, তাহলে আমি নিজে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করব। এর কারণ হচ্ছে মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন। সেভাবেই তিনি তাদের সাথে মিশতেন, ওঠা-বসা করতেন, তাদের সুখ-দু:খের ভাগী হতেন। এ প্রসঙ্গে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। সুতরাং ইসলামের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার যে যথেষ্ট সুরক্ষিত, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী গণতন্ত্র বিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এটা ঠিক যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আর ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি মৌলিক পার্থক্য। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র গণমানুষের নিরংকুশ কর্তৃত্বের কথা বলে আর ইসলাম চূড়ান্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র স্রষ্টার হাতেই প্রদান করার পক্ষপাতী। কিন্তু পূর্বেই আমরা যেমন বলেছি যে, ইসলাম যেহেতু মানুষকে ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেছে, সে কারণে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কোন ধরনের জবরদস্তি, বাড়াবাড়ি কিংবা চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদকে ইসলাম অনুমোদন করে না। এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে,দ্বীন গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মানুষের রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, তবে কেউ যদি স্রষ্টার নিরংকুশ আনুগত্য করার ঘোষণা দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করে, তবে তাকে অবশ্যই বাস্ত ব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ কারণে ইসলামী আন্দোলনের চরিত্রে উগ্রবাদের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যই প্রধান হয়ে ওঠে এবং ইসলামী আন্দোলন চরমপন্থার পরিবর্তে গণতন্ত্রকেই তার স্বাভাবিক পথ হিসেবে বেছে নেয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলের জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। রাসূলের নবুয়তী জীবনকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এর একটি হল মাক্কী যুগ, অন্যটি মাদানী যুগ। আমরা দেখেছি মাক্কী যুগে আল্লাহর রাসূল [সা] দীর্ঘ তেরটি বছর মক্কাবাসীকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু মক্কার অধিকাংশ লোক ছিল রাসূলের দাওয়াতের ঘোর বিরোধী। তারা ইসলামের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করেনি। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও রাসূলের [সা] নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা আল্লাহর রাসূলকে [সা] মেরে রক্তাক্ত করেছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা মহানবীকে [সা] হত্যা করারও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার কারণে মক্কায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মদিনার লোকেরা ইসলামের আহবানে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। তারা মহানবীকে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায় এবং সাদরে বরণ করে নেয়। তাঁরা শুধু যে



www.pathagar.com

মহানবীর নেতৃত্বকে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করার শপথ [বায়াত] করেছিলেন তাই নয়, ঘোষণা করেছিলেন, 'হে রাসূল, [সা] আপনি যদি আমাদেরকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন তাহলে আমরা তাই করব।' যার কারণে মদিনায় গড়ে উঠেছিল ইসলামী সমাজ এবং কালক্রমে তা পরিণত হয় বিশাল ইসলামী খেলাফতের রাজধানীতে।

সুতরাং ইসলামী সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে জনমত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনমতকে উপেক্ষা করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ নেই। মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল জনমত ছিল না। কিন্তু তাই বলে আল্লাহর রাসূল [সা] কি মক্কাবাসীর উপর কোন জোর খাটিয়ে ছিলেন? গড়ে তুলেছিলেন কোন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন? মক্কাবাসীর বিরোধিতার জবাবে তিনি কি বলেছিলেন, কী, এত বড় সাহস, আমি আল্লাহর রাসূল [সা] আর ওরা আমার কথা শোনে না! না, এধরনের কোন কথা তিনি বলেননি! বরং আমরা দেখেছি, তায়েফের লোকেরা যখন আল্লাহর রাসূলকে [সা] মেরে রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে, তখন তিনি তাদের জন্য বদদোয়াটুকু পর্যন্ত করেননি, বরং পরম মমতায় তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করেছেন, তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন! সুবহানাল্লাহ! এই তো ইসলাম। অথচ এই ইসলামই আজ দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ আর চরমপন্থার অপবাদ, অপমান মাথায় নিয়ে বিশ্ব সভ্যতার কাঠগড়ায়! আমাদের রাজনৈতিক চৈতন্যহীনতা ও অজ্ঞানতা যে আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা ভাবতেও গা শিউড়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, মহানবী [সা] এবং সাহাবায়ে কেরাম তো যুদ্ধও করেছেন। একথা ঠিক, আল্লাহর রাসূল [সা] এবং তাঁর সাহাবীরাও যুদ্ধ করেছেন। তবে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন মাদানী যুগে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে, তাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা কোন জবরদস্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করেননি, বরং দাওয়াত ও motivation-এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক পন্থায়, ইসলামী আদর্শের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতেই তাঁরা ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইসলামের বিজয় এনেছিলেন। এক্ষেত্রে কোন ধরনের সন্ত্রাসী বা পৈশাচিক পন্থা তাঁরা অবলম্বন করেননি বরং দাওয়াত, হেকমত ও সত্যের সাক্ষ্য তথা আদর্শবাদীতার মাধ্যমে, যার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি; মহানবী এবং তাঁর সাহাবীগণ সত্যের সংগ্রাম করেছিলেন। বর্বরতা ও সহিংসতার কোন সুযোগও তাঁদের ছিল না। কারণ পবিত্র কোরআনের মক্কী যুগের সূরাতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সম্পর্কিত নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছিলেন :



www.pathagar.com

'এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী সকল মানুষকেই একসাথে বিশ্বাসী বানিয়ে ফেলতে পারতেন। সুতরাং [হে মুহাম্মদ]! তুমি কি তাহলে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য লোকদেরকে জবরদস্তি করতে চাও?'–[সূরা ইউনুস, আয়াত-৯৯]

এ প্রসঙ্গে মহানবীর যুদ্ধনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর যুদ্ধনীতি ছিল–'কখনও আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর না, নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর শরণাপন্ন হও।'

বলাবাহুল্য, মহানবীর যুদ্ধ ছিল একান্তভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রতিহিংসা বা পরসম্পদ লুট কিংবা দেশ দখল তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। পারতপক্ষে তিনি যুদ্ধে জড়াতে চাইতেন না, সন্ধি-সমঝোতাকেই সবসময় প্রাধান্য দিতেন। আর মহানবীর [সা] এ নীতি ছিল পবিত্র কোরআনের বিধানেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। অনর্থক রক্তক্ষয়ের উন্মাদনা থেকে তাঁর সমরনীতি ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেছেন :

'অতপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে তবে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তোমাদেরকে কোন পথ দেননি।'–[নিসা : ৯০]

মহানবী [সা] তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, 'শত্রুর শিবির থেকে ধৃত হলেও তারা যেন কোন নির্দোষ নারী, শিশু ও অক্ষম বৃদ্ধদেরকে হত্যা না করে।' এছাড়া তিনি আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা না করার জন্যও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। ফলন্ত বৃক্ষ, সম্পদ বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ করেছেন তিনি। এমনকি প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি কেউ ঈমানের ঘোষণা দেয় তাহলেও তাকে হত্যা না করার নির্দেশ দিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আ'লামীন। একবার এক যুদ্ধে প্রতিপক্ষের এক যোদ্ধা কলেমা উচ্চারণ করা সত্ত্বেও জনৈক মুসলিম সৈন্য তাকে হত্যা করে ফেলে। একথা রাসূলুল্লাহর [সা] কাছে উত্থাপিত হলে আল্লাহর রাসূল [সা] খুবই মর্মাহত হয়ে ঐ সাহাবী সৈনিককে কৈফিয়ত তলব করেন। সাহাবী আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল [সা], সে তো প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈমান এনেছে! তখন আল্লাহর রাসূল [সা] তাকে বলেন, তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ? আরেক যুদ্ধে কিছু শিশু মুসলমানদের হাতে নিহত হলে আল্লাহর রাসূল [সা] খুবই পেরেশান হয়ে ওঠেন। রাসূলের [সা] পেরেশানি দেখে মুসলিম সৈন্যরা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল [সা], এরা তো মুশরিকদের সন্তান। মহানবী [সা] অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এ শিশুরা তোমাদের চেয়েও উত্তম, কারণ এরা স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরা কি মুশরিকদের সন্তান নও? সাবধান, কখনও শিশুদের হত্যা করবে না।'



www.pathagar.com

অনুরূপ ভাবে নারী অধিকার প্রসঙ্গে যদি আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখব যে, এক সময় কন্যা শিশুর জন্মকে মনে করা হত অগৌরবের ও দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে। এমনকি আজও এ প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ইসলামে কন্যা সন্তানের জন্মকে দেখা হচ্ছে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে, রহমত হিসেবে। জাহেলি সমাজে নারীদের কোন ইজ্জত-সম্মান, অধিকার ও নিরাপত্তা না থাকার কারণে, শালীনতা ও নৈতিকতার অভাবের কারণে সে সমাজে মেয়েদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির কোন শেষ ছিল না। এ কারণে জাহেলি সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মকে কখনো স্বাগত জানানো হত না। বরং কন্যা সন্তানের জন্ম হলে কন্যা সন্তানের পিতা-মাতারা হতাশা-নিরাশার সাগরে হাবুডুবু খেত, তাকে একটি অবাঞ্ছিত ও লজ্জাজনক ঘটনা মনে করত। ফলে কন্যা সন্তানের জীবনে নেমে আসত অভিশাপ। পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি জাহেলী সমাজের একটি সাধারণ ঘটনা। এমনকি অনেক পাষণ্ড পিতা দারিদ্রের ভয়ে নিজ কন্যাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করত না। নারীর প্রতি এই অপমান ও অমর্যাদা আজও অব্যাহত রয়েছে। নারী আজ পরিণত হয়েছে ভোগের সামগ্রী আর পুরুষের স্বার্থের ক্রীড়নকে। এ অবস্থায় কেবলমাত্র ইসলামই নারী জাতিকে এই চরম দুর্গতি থেকে রক্ষা করে তাদেরকে যথার্থ ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছে। মহানবী [সা] নারীকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করে ঘোষণা করেছেন, 'কারো যদি কন্যা সন্তান থাকে আর সে যদি তাকে হত্যা না করে, তাকে অপমান ও লাঞ্ছিত না করে কিংবা তার তুলনায় পুত্র সন্তানদের অধিক গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।'

তিনি আরো বলেছেন, যদি একটি পরিবারে একের পর এক মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং পিতা-মাতা যদি মেয়েদের যত্ন ও স্নেহের সঙ্গে লালন-পালন করে, তাহলে মেয়েরা তাদের পিতা-মাতাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবে।'

ইসলাম নারীকে ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তার প্রতি কোন বৈষম্য করা হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন যে, নারী-পুরুষ উভয়ই একে অন্যের ভূষণ। আল্লাহ বলেন, 'নারীরা তোমাদের জন্য পোষাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোষাক।' –[বাকারা : ১৮৭]

'এও আল্লাহর অসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনিই তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি আন্তরিকতা সৃষ্টি করেছেন।' –[আর রূম :২১]

মহানবী [সা] ঘোষণা করেছেন, 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত।'

'তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।'

'নারীরা হল পুরুষদের একান্ত সাথী।'



www.pathagar.com

ইসলাম নারীদের জীবন ও ইজ্জতের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদেরকে দিয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। পিতা-মাতা ও স্বামী-সন্তানের পক্ষ থেকে ইসলাম নারীর জন্য যে অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা যদি যথাযথভাবে রক্ষা করা হয়, তাহলে নারীদেরকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী নির্দয় সমাজে জীবিকার জন্য নারীদেরকে পথে পথে ঘুরে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো না। আল কোরআন বর্ণিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই পাশ্চাত্য জগতে নারীরা পণ্য আর স্বার্থবাদী পুরুষদের স্বার্থের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান যাকাত, মীরাসী আইন আর পর্দা যে ইসলামী সমাজে নারীকে রাজ-রাণীতে পরিণত করে, আভিজাত্য আর সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে তা যে কোন ইসলামী সমাজে একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে। এ কারণেই ইসলাম সম্পর্কে যতই জানতে পারছে পাশ্চাত্যের দিশাহারা নারী সমাজ ততই ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। ইসলামী হিজাব বা পর্দার মধ্যেই তারা এখন আশ্রয় নিচ্ছে, পর্দার অধিকারের জন্য পাশ্চাত্যের প্রতিকূল পরিবেশেও নারীরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলছে।

**বিশ্ব সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার স্বাভাবিক পদ্ধতি**

কিন্তু আল্লাহর রাসূল [সা] বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন? এ ক্ষেত্রে আমরা দেখি মহানবী [সা] কোন অস্বাভাবিক ও উদ্ভট পন্থা অবলম্বন করেননি। বিশ্বের সামনে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মডেল স্থাপন না করে প্রথমেই তিনি বিশ্বরাষ্ট্রের দাবী তুলে তোড়জোড় শুরু করে দেননি কিংবা বিশ্বব্যাপী কোন আন্দোলন শুরু করেননি। বরং আমরা দেখি মদিনার অস্থিতিশীল ও বিশৃংখল সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করার জন্য তিনি সর্ব প্রথম মদিনা কেন্দ্রিক একটি ভৌগলিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেন। আর এ কাজকে সুসম্পাদিত করার জন্যই তিনি ঐতিহাসিক মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন, যার ফলে শুধু শত গোত্রে বিভক্ত মদিনা একটি শক্তিশালী জাতীয় ও কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে এবং এই জাতীয় ও কল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যেই একটি আদর্শিক বা বিশ্বরাষ্টের বীজ নিহিত ছিল। হিজরতের দু'বছর পর ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদ স্বাক্ষরিত হয়। আরবি ভাষায় লিখিত এ ঐতিহাসিক সনদের ধারা ছিল ৪৭টি। এটি শুরু হয়েছে আল্লাহর নামে। এর প্রধান প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. মদিনার ইহুদী, পৌত্তলিক, খৃস্টান ও মুসলিম সকলে একই জনগোষ্ঠী বা কওম বলে গণ্য হবে এবং তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হবে। তারা সবাই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

২. হযরত মুহাম্মদ [সা] নব-গঠিত সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন।



www.pathagar.com

৩. সকল ধর্মের লোকদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সকলেই বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম-পালন করতে পারবে এবং কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৪. মদিনা নগরী পবিত্র বলে গণ্য হবে, এ জন্য রক্তপাত, হত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হল।

৫. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায় সমূহ মদিনা শহরের মর্যাদা রক্ষা করবে। মদিনা সহসা আক্রান্ত হলে তারা সকলেই একত্রিত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং যখন তাদেরকে কোন যুদ্ধের অবসান করে সন্ধি করতে বলা হবে তখন তারা যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং সন্ধি মেনে চলবে।

৬. যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজের ব্যয়ভার বহন করবে।

৭. হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া মদিনাবাসীরা কারো বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

৮. কোন সম্প্রদায় বাইরের শত্রুর সাথে মদিনার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৯. কেউ কুরাইশদের কোন ধরনের সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না অথবা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

মদিনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যখন সর্ব প্রথম একটি জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, তখন মদিনার বাইরের অবশিষ্ট ভূখণ্ড ছিল ইসলামের বৈরী আর মদিনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ কারণে মদিনার ভৌগোলিক সীমাই ছিল তখনকার ইসলামী খেলাফতের সীমারেখা। কিন্তু এই ভৌগলিক রাষ্ট্রের মধ্যেই যেহেতু নিহিত ছিল বিশ্বরাষ্ট্রের চেতনা, কল্যাণমুখি সমাজ আর উদার বিশ্বভ্রাতৃত্বের মডেল, তাই মদিনার আদর্শ ইসলামী সমাজ শেষ পর্যন্ত মদিনার ভৌগলিক ভূ-খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বরাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। মদিনার সংকীর্ণ ভৌগলিক সীমাদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলামী খেলাফত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু স্থানীয়ভাবে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা না করে, বিশ্ববাসীর সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজের মডেল বা আদর্শ উপস্থাপনের সর্বাত্মক সংগ্রাম-সাধনা না করে শুধু বিশ্বব্যাপী সফর কিংবা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রাসূলের [সা] সুন্নত ও আদর্শের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ভেবে দেখা প্রয়োজন নয়কি? ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম জীবন বিমুখ কোন বৈরাগ্যবাদী ধর্ম নয়। দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখেরাতে সফলতার কোন পথও ইসলামে নেই। কাজেই যথার্থ ইসলামী দাওয়াত হচ্ছে জীবন সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করা। আর একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমেই কেবল এটি করা যেতে পারে। তাহলে আজকের পৃথিবীর আধুনিক



www.pathagar.com

মানুষও তাদের জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে ইসলামের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে পারবে। ইসলামী সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ দ্যুতি দেখে তারা বুঝতে পারবে সত্যিই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর জীবন সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পাওয়ার পর আম জনতা আর বাতিলের কাছে ধার করা আদর্শের জন্য হাত পাততে যাবে না। আর এর ফলে দ্বীনের ভাবমর্যাদাও অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। তখন দলে দলে লোকদের সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ার যে সুসংবাদ আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাও সত্যি সত্যিই আমরা দেখতে পাবো। আর একই সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলের বৈরী প্রচারণার যে ঝড় তথা মৌলবাদ, পশ্চাৎপদতা, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রবাদের যে অপবাদ আজ বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য মিডিয়া সমূহ মুসলমানদের উপর আরোপ করছে এবং ইসলামকে শান্তি, স্বাধীনতা, প্রগতিশীলতা ও মানবাধিকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করার যে জোর প্রচেষ্টা চলছে তাও মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হবে ইনশায়াল্লাহ। কিন্তু তার জন্য রাসূলের [সা] সুন্নতের আলোকে আমাদের কর্মসূচিকে সাজিয়ে নেয়া প্রয়োজন সবার আগে।

### মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব

আজ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] জীবিত নেই। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে সর্বশেষ নবী ও রাসূল [সা]। আল-কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুন নাবিয়্যিন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে অবহিত।"-[আল-আহযাব : ৪০]

তাহলে তাঁর অবর্তমানে তাঁর মিশন কি থেমে থাকবে? অনাগত আদম সন্তানের কাছে ইসলামের দাওয়াত, সত্যের আহবান কি আর পৌঁছুবে না? পৃথিবীতে কি খোদাদ্রোহী নাফরমান বেঈমানদের দানবীয় কর্তৃত্ব চলতেই থাকবে? পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম কি আর বুলন্দ হবে না? বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের আদর্শকে, সত্যের সুমহান সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করা আর তাদের সামনে সত্যের মডেল, নমুনা ও সাক্ষী হওয়ার দায়িত্ব কি কেউ পালন করবে না? তাহলে যে সব মানব সন্তানের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছুবে না, যারা সত্যের আলো ও হেদায়াতের সন্ধান পাবে না তাদের পরিণতি কী হবে? কাল-কিয়ামতে তাদের বিচার-ফায়সালাই বা হবে কীভাবে?

এর জবাব রয়েছে স্বয়ং আল-কুরআনেই। রিসালাতের জিম্মাদারীর ব্যাপারে উম্মাহর দায়িত্ব সম্পর্কে আল কুরআনের রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে শেষনবী ঘোষণা করেই শেষ করেননি, সেই সাথে তিনি মুসলিম মিল্লাতকে বলেছেন নবীর মিশনের জিম্মাদারীকে কাঁধে তুলে নিতে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সমগ্র মানব জাতির সামনে ইসলামের আদর্শকে তুলে ধরে তাদের সামনে নিজেদেরকে মডেল, নমুনা বা সত্যের সাক্ষী হওয়ার জন্য মুসলিম



www.pathagar.com

মিল্লাতের প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন। আর বলেছেন এ মডেল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রিয়নবীর আদর্শকে মডেল বা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে।

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যেমন বিশ্ব নবীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষী তথা মডেল বা আদর্শ হওয়ার জন্য ;

'হে নবী, আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে এবং খোদার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।'–[আল-আহযাব : ৪৫] তেমনি রাসূলের [সা] আদর্শে মুসলিম উম্মাহকেও তিনি বলেছেন সমগ্র মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষী হওয়ার জন্যে। যেমন : 'আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়।' –[বাকারা : ১৪৩]

অর্থাৎ আজকের GB global village-এর যুগ প্রতিবেশে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আল-কুরআন এবং আল-কুরআনেরই জীবন্ত মডেল মুহাম্মদ [সা]-এর উজ্জ্বল আদর্শের আলোকে মুসলিম মিল্লাতকে সমগ্র মানব জাতির সামনে ইসলামী আদর্শের জীবন্ত মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। তাদেরকে ইসলামের প্রচার করতে হবে এবং সত্যের সাক্ষী দিতে হবে কথায় এবং কাজে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই অনাগত আদম সন্তানের কাছে পৌঁছে যাবে ইসলামের যথার্থ পয়গাম। কিয়ামতের কঠিন ময়দানে তখন কেউ আর বলতে পারবে না যে 'হে প্রভু, আমরা তো বেখবর ছিলাম।' আর এভাবেই মহানবীর [সা] মিশন তাঁর উম্মতের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত।

আর মুসলিম মিল্লাত যদি এভাবে প্রিয়নবীর [সা] যথার্থ উম্মত হিসেবে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিতে পারে তাহলে তারাই হবে পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি বা 'খায়রা উম্মত'। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রেখে চলবে।' –[আলে ইমরান : ১১০]

অর্থাৎ মুসলিম মিল্লাত যদি তাদের নেতা বিশ্ব-মানবতার কাণ্ডারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আদর্শ তথা ইসলামকে নিজেদের জীবনে জীবন্ত করতে পারে এবং বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদেরকে ইসলামের যথার্থ আদর্শ হিসেবে পেশ করতে পারে, সারা পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত যদি একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হতে পারে, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-শক্তিতে তারাই হবে পৃথিবীর মধ্যে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য হবে ভারসাম্যপূর্ণ। বলা হয়েছে তারা হবে 'মধ্যমপন্থী', চরমপন্থী নয়। এর ফলে তারা হবে মানবতার বন্ধু। তারা পৃথিবীকে শাসন করবে, নেতৃত্ব দিবে, মানবজাতিকে সৎ পথে,



www.pathagar.com

কুরআনের পথে, আল্লাহর হুকুমের পথে চালিত করবে আর অসৎ পথ থেকে অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখবে। ফলে পথহারা মানবতা পাবে পথের দিশা, অশান্ত পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

## বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব

পৃথিবীকে পথ দেখানো বা নেতৃত্ব দিতে হলে মুসলমানদেরকে যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে তা নেতৃত্বের এই গুরু দায়িত্ব উম্মতে মুসলিমার হাতে অর্পণ করার সময়ই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রেখে চলবে।' –[আলে ইমরান : ১১০]

এখানে মানব জাতির কল্যাণ এবং তাদেরকে সৎ পথে চালিত করা এবং অসৎ পথ থেকে বিরত রাখার যে দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে, সেই দায়িত্বের কথা বলার আগে সবার আগে কিন্তু মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা যে চিন্তা করা যায় না তা বলাই বাহুল্য। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিই হচ্ছে সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে উন্নতির পূর্ব শর্ত। এ কারণে ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার উপর যে কত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন না পড়লে বুঝা যাবে না।

ইসলামী জীবনবোধের সন্ধান যে পেয়েছে সে একদিকে দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে যেতে যেমন পারে না; তেমনি আবার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গাফেল বা বেখবরও হতে পারে না। বরং বলা হয়েছে, যেহেতু মানুষ হচ্ছে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, সেহেতু তার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিকে জানা। কেননা এসব কিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন : 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এর মধ্যে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় নিদর্শন।' –[আল জাসিয়া : ১৩]

সুতরাং দুনিয়া সম্পর্কে গাফেল ও অজ্ঞ-মূর্খ ও দায়িত্বহীন থাকা ঈমানদারীর বৈশিষ্ট হতে পারে না। বরং ঈমানদারী ও আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবী হল আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জানা, চিন্তা-ভাবনা করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করা। কারণ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিকে যত বেশি জানতে পারবে, বিশ্ব-জগতের বিশালতাকে যত বেশি আবিষ্কার করতে পারবে, তত বেশি স্রষ্টার নিদর্শনকে উপলব্ধি করতে পারবে; বিশ্ব-প্রতিপালকের ক্ষমতা ও মাহাত্মকে তত বেশি বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে এবং ততই তাওহীদের তাৎপর্য তাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু সৃষ্টিকে না জানলে স্রষ্টাকে,



www.pathagar.com

তাঁর বিরাট ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানুষকে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে?' –[রা'দ : ১৬]

এক শ্রেণীর লোক এক হাতে কুরআন আর আরেক হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে ইসলাম সম্পর্কে বৈরী ধারণা প্রচার করতে চায়। তারা বুঝাতে চায়, ইসলাম এসেছে তলোয়ারের জোরে। কিন্তু কুরআন অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে আসলে মুসলমানরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন কিসের জোরে। মূলত মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে কুরআন আর বিজ্ঞানের আলোকে। কোরআন হল মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত। আর আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের উৎস। কুরআনে রয়েছে সেই পথ-নির্দেশ যা মানব সভ্যতার স্থিতি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য প্রাকৃতিক জগতের শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক আইন। আর এই নির্দেশনা মানুষ নিজে নিজে পেতে পারে না। মূলত তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইসলামের যে শিক্ষা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা মূলত এমন এক জ্ঞান যে সম্পর্কে মানুষ কিছু জানতো না। মূলত কুরআনে রয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান যার উৎস হচ্ছেন স্বয়ং বিশ্ব বিধাতা, যে জ্ঞান সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না। আবার কুরআনে আমরা স্রষ্টার যে পরিচয় সম্পর্কে অবগত হই, সৃষ্টি জগতের মধ্যে কিন্তু আমরা সেই মহান স্রষ্টার নিদর্শনই খুঁজে পাই। সৃষ্টি-নিদর্শনকে তাই বলা যায় কুরআনেরই উন্মুক্ত পাঠ। এ কারণে আল কুরআনে যুগপৎভাবে কুরআন এবং সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। স্রষ্টাকে ও সৃষ্টিকে যথার্থভাবে জানতে হলে এ দুয়ের মিলিত পাঠ অপরিহার্য। বলা যায় এ দুটি একে অপরের সম্পূরক। সৃষ্টিকে না জানলে কুরআন জানার হক আদায় হতে পারে না আবার কুরআন না জানলেও সৃষ্টিকে জানার মধ্যে অপূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কুরআন বা আল্লাহর কালাম সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার নির্দেশ যেমন দিয়েছেন, তেমনি আহবান করেছেন তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে, গবেষণা করতে। কেননা, সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে স্রষ্টার নিদর্শন।

আমাদের প্রিয়নবীর [সা] উপর মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছিল তা হল 'পড়'। আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর মাধ্যমে মূলত সমগ্র মানব জাতিকেই নির্দেশ দিচ্ছেন, 'পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়, কেননা তোমার প্রভু বড়ই মেহেরবান। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।'–[আলাক : ১-৫]



www.pathagar.com

পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জানা। আমরা যদি কোন গ্রন্থের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাহলে সে গ্রন্থের শিক্ষা জানার জন্যই আমরা তা পড়ে থাকি। গ্রন্থটি যদি এমন ভাষায় লিখিত হয়, যা আমরা জানি না, তাহলে আমরা গ্রন্থটির শিক্ষাকে অত্যন্ত জরুরী মনে করার কারণেই তার অনুবাদ জানার চেষ্টা করি। কারণ অর্থ না জানলে গ্রন্থাকার কী বলতে চান তা আমরা কিভাবে বুঝব? আর কোন একটি বই পড়ে তা থেকে কোন কিছু জানতে ও বুঝতে যদি আমরা নাই পারি তাহলে সে গ্রন্থ পড়াকে আমরা অর্থহীন বলে থাকি। কোন সুস্থ ব্যক্তিই নিশ্চয়ই এমন আচরণ করেন না। অর্থাৎ কেউ যদি সারাক্ষণ এমন একটি বই পড়তে থাকে যে বইটির ভাষা সে জানে না, গ্রন্থটি সে খুবই শুদ্ধ করে পড়তে পারে কিন্তু তার অর্থ কিছুই জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না অথচ সেই ব্যক্তি দাবী করে যে, সে ঐ গ্রন্থের লেখককে খুবই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে আর একই ভাবে তার গ্রন্থটিকেও সে তার জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে; তাহলে ঐ ব্যক্তির এহেন আচরণে আমরা নিশ্চয়ই সন্দিহান হয়ে পড়ব যে, সে আসলে সুস্থ আছে কিনা! অথবা তার এ সব আচরণকে আমরা পাগলামি ও হাস্যকর যে মনে করব তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর এই উদ্ভট ও হাস্যকর আচরণের মাধ্যমে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থ-প্রণেতার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা, ভালোবাসার দাবীও যে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তাও নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করে দেখতে চাইব।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সাথে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এ ধরণের উদ্ভট ও হাস্যকর আচরণই করে যাচ্ছি। আল্লাহর রাসূল [সা] তাঁর সাহাবীদেরকে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর জন্য অশেষ সওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছেন। কিন্তু আরবদের কাছে আল কুরআন তো কোন দুর্বোধ্য গ্রন্থ নয়। তারা তো কুরআন তেলাওয়াত করে এর অর্থ সহজেই বুঝতে পারতেন। যার কারণে বেশি বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে কুরআনের শিক্ষা তাদের হৃদয়পটে গাথা হয়ে যেত। আর ইসলামী জিন্দেগী যাপনের জন্য এর অপরিহার্য প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আমরা যারা আরবী ভাষা জানি না তারা যদি কুরআনের অর্থ জানার চেষ্টা না করে শুধু তেলাওয়াত করি তাহলে আমাদের কুরআন পড়ার হক কতটুকু আদায় হবে তা কি ভেবে দেখা উচিত নয়? আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কি কুরআনের শিক্ষাকে জানা ও বুঝার জন্য নয়? আমরা যদি কুরআনের শিক্ষাকে না জানি তাহলে কুরআন থেকে হেদায়াত নেয়া আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে? পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে জানা ও বুঝার কারণে দ্বীনের যে ধরনের বুঝ, যে ধরনের ঈমান ও উপলব্ধি তৈরি হওয়া সম্ভব তা কি অর্থ না জেনে তেলাওয়াতের মাধ্যমে, আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বেখবর থাকার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব? মোটেই সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনই এ প্রসঙ্গে



www.pathagar.com

স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, জ্ঞানী আর মূর্খের উপলব্ধি সমান নয়। আর জ্ঞানীরাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, তারাই হেদায়াত থেকে বেশি উপকৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসিহত কবুল করে থাকে।' –[যুমার : ৯]

'প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা শক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।' –[ফাতির : ২৮]

'আল্লাহ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। ফেরেশতা এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ ইলাহ হতে পারে না।'–[আলে ইমরান : ১৮]

'পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোখত লোক তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি, সবই আমাদের প্রভূর তরফ থেকে এসেছে। আর সত্য কথা হল, কোন জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে থাকে।' –[আলে ইমরান : ৭]

'এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, যে ব্যক্তি তোমার আল্লাহর এই কিতাবকে, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন, সত্য বলে জানে আর যে ব্যক্তি এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞ-অন্ধ তারা দুজনই সমান হতে পারে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই কবুল করে থাকে।' –[রা'দ : ১৯]

আর এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে মহানবী [সা] বলেছেন: 'একজন ফকিহ্ অর্থাৎ দ্বীনের গভীর বুৎপত্তিশালী ব্যক্তি শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান।' –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]; তিনি আরো বলেছেন: 'রাতের কিছু সময় জ্ঞান অর্জন করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা থেকে উত্তম।'

সুবহানাল্লাহ! কী দুর্ভাগ্য আমাদের! আল কুরআনের এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও আজ আমরা উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করেছি! আল্লাহর কথার চেয়ে আজ আমরা তথাকথিত বুযুর্গদের কথাকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়ে চলেছি। আল্লাহ বলছেন, জানো, জানতে চেষ্টা কর! আর বুযুর্গ রূপী আযাযিল ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলছে, খবরদার, কুরআনের অর্থ জানার চেষ্টা ক'রো না, শুধু তেলাওয়াত কর, শুধু তেলাওয়াত...! শুধুই তেলাওয়াত? আর কিছুর প্রয়োজন নেই? কুরআন কেন পাঠানো হয়েছে তা জানারও কোন প্রয়োজন নেই? চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন নেই? মহাগ্রন্থ আল কুরআন এসেছে কি শুধু না বুঝে তেলাওয়াতের জন্য? কিন্তু কোরআন যিনি পাঠিয়েছেন সেই পরওয়ার দিগার এ সম্পর্কে কী বলেন? আসুন একটু জানার চেষ্টা করি। কুরআনের যিনি মালিক তিনি বলছেন, '[হে নবী [সা] এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি



www.pathagar.com

নাযিল করেছি, যেন বুদ্ধিমানগণ একে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করে।' –[সোয়াদ : ২৯]

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমরা প্রতিদিন, প্রতি ওয়াক্তে অত্যন্ত তাযিমের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করি কিন্তু ভুলে একবারও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে না এই পবিত্র বাণীগুলোতে আল্লাহ কী বলেছেন। মানসিক এই বৈকল্যের কারণে আজ আমাদের চিন্তা-চেতনাও হয়ে গেছে পঙ্গু ও নিষ্প্রাণ। এ কারণেই আমাদের ঈমান আজ চেতনাহীন। আল্লাহর কালাম আজ ভুলুণ্ঠিত। আল্লাহর হুকুম আজ বিজয়ী বেশে নেই। আল্লাহর হুকুম আজ মানুষের হুকুমের অধীন। আল্লাহর আইন আজ সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়, ভুলুণ্ঠিত। আল্লাহর আইন আজ মানুষের আইনের অধীন। কুরআন এসেছে শাসন করার জন্য, শাসিত হওয়ার জন্য নয়। অথচ এ সম্পর্কে আজ আমাদের কোন চেতনাই নেই। আমাদের অন্তর আজ এতটাই মরে গেছে যে, এই কঠিন অন্তরের মধ্যে বোমা মারলেও যেন আর সম্বিত ফিরে আসবে না। অথচ আল্লাহ বলছেন, 'আমরা যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপরও নাযিল করতাম, তাহলেও তুমি দেখতে যে সে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে কেমন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! এই দৃষ্টান্তগুলো আমরা এ জন্য দেই, যেন লোকেরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।' –[আল হাশর : ২১]

আমাদের অন্তর ইহুদীদের মত এত কঠিন ও অভিশপ্ত হয়ে উঠল কীভাবে? আল্লাহ বলছেন এই পবিত্র কালামকে যদি তিনি মানুষের উপর নাযিল না করে কোন নিষ্প্রাণ পাহাড়ের উপরও নাযিল করতেন, তাহলে এই মহা নেয়ামতপূর্ণ কুরআনের ব্যাপারে দায়িত্বানুভূতি ও জবাবদিহির ভয়ে নিষ্প্রাণ পাহাড়ও ক্রন্দন করে উঠতো, আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গলে গলে পড়তো। অথচ আকল সম্পন্ন মানুষ তথা সৃষ্টির সেরা মানুষ হওয়া সত্তেও, আল্লাহর খলিফার পরিচয় ধারণ করা সত্তেও মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি আজ আমাদের যেন কোন দায়বদ্ধতা নেই, কোন দায়িত্বানুভূতি নেই। এর কারণ কী? কারণ আল্লাহ নয়, বুযুর্গই যে আজ আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছেন। খোদার আসন দখল করে নিয়েছেন আজ মুরুব্বি ও মূর্খতা! কাজেই আল্লাহর কালাম ভুলুণ্ঠিত হলে আমাদের কীইবা আসে যায়, মুরুব্বির আদেশ তো মাথায় করে রাখি! [নাউযুবিল্লাহ]। এসবই ইহুদীদের এবং পতন যুগের জাতি সমূহের লক্ষণ। কোন জাতির অধ:পতন যখন ঘনিয়ে আসতো, তখন সে জাতির কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী সমূহ আল্লাহর কালাম থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন ভাবে ফন্দি-ফিকির করত। যার কারণে সে জাতির জীবন-প্রণালীর সাথে আল্লাহর কালামের আর কোন যোগসূত্র থাকতো না এবং এক সময় আল্লাহ তাঁর কালামকে ঐ অভিশপ্ত জাতির কাছ থেকে উঠিয়ে নিতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে আল্লাহর কালাম এক



www.pathagar.com

সময়ে সে সব জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং নানামুখী বিকৃতি ও অবহেলার শিকার হয়ে অবশেষে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু আল কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সর্বশেষ কালাম হওয়ায় এটি কখনো বিকৃত ও বিলুপ্ত হবে না। কারণ সর্বশেষ কিতাব হওয়ার কারণে রাহমানির রাহিম নিজেই একে হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। যার কারণে আরবী ভাষা না জানা সত্তেও যে কোন অনারব এ মহাগ্রন্থটি অর্থ না বুঝে শুধু তেলাওয়াতের মাধ্যমেও অশেষ ফায়েয ও তৃপ্তি লাভ করে থাকেন, যা পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থ পাঠে সম্ভব হয় না। অর্থ না জেনে দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠাও কেউ ক্লান্তিহীন ভাবে পাঠ করতে সক্ষম নয়। কারণ কাজটি অর্থহীন হওয়ার কারণে অশেষ বিরক্তি ও ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরবে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কুরআনই এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ যার শাব্দিক অর্থ না জানা সত্বেও লক্ষ কোটি মানুষ পরম আবেগ, আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে প্রতিদিন তেলাওয়াত করছে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে অশেষ উপকৃত হচ্ছে। এটি মূলত বরকতপূর্ণ এই গ্রন্থের একটি মোজেজা, নতুবা শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে সওয়াব কামাইয়ের জন্যই এ মহাগ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়নি। বরং আল কুরআন এসেছে মানুষের জীবন ও সমাজ-সভ্যতার মধ্য থেকে সকল ধরনের কুফরিকে বাতিল করে দিয়ে তার স্থলে হককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মূর্খতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বোলিত করার জন্য। অজ্ঞতা ও নৈরাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর সভ্যতার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য। ইসলাম জীবনমুখী ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন বিধান। মূর্খতা ও বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং জ্ঞান চর্চা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের পাতায় পাতায় এ সম্পর্কে দেখা যায় ব্যাপক আলোচনা। আমরা এ সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করছি:

'তাদেরকে বল, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর।'- [ইউনুস : ১০১]

'তারা কি তাদের সামনে ও পেছনে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে না? আমরা চাইলে তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দিতে কিংবা আসমানের কিছু টুকরো তাদের উপর ফেলে দিতে পারি। আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি আজ্ঞাবহের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।' [সাবা :৯]

'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত-দিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযান সমূহ, উপর থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও তার সাহায্যে মৃত জমিনকে প্রাণবন্ত এবং এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার, বায়ূর গতিপ্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।' [বাকারা:১৬৪]



www.pathagar.com

"আল্লাহই মহাশূন্যে আকাশমণ্ডলী [মহাবিশ্ব] স্থাপন করেছেন কোন ধরনের স্তম্ভ ছাড়াই [ভাসমান অবস্থায়], তোমরা এ সবই দেখতে পাচ্ছো। অত:পর তিনি 'আরশে' আসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন। প্রত্যেকে [আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থিরকৃত) নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনগুলো বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করতে পার।' আল কুরআন, [রা'দ:২]

'আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে সেসব আমরা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।'[২১ : ১৬]

'তোমাদের উর্ধ্বে নির্মাণ করেছি বহু সদৃঢ় স্তর।' [আন-নাবা : ১২]

'[হে মানুষ] বল, তোমরা চিন্তা করে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে কি, যে তোমাদেরকে এনে দিতে পারে আলোকিত দিন? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে কি যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম, যাতে বিশ্রাম নিতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?' [২৮ : ৭২]

'দিন ও রাত্রির আবর্তনে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' [ইউনুস : ৬]

'তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।' [আল ফুরকান : ২]

'আল্লাহর বিধানে প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি আনুপাতিক পরিমাপ।' [আর রা'দ : ৮]

'দয়াময়ের সৃষ্টিতে অনুপাত ও সামঞ্জস্যের কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।' [আল মূলক : ৩]

'এত:পর নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সবকে তিনি তার পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। নি:সন্দেহে এতে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বহু নিদর্শন ও নির্দেশ।' [আল জাসিয়াহ : ১৩]

'[বল], আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেনি এক উপযুক্ত আবাস্থল হিসেবে?' [আল-মুরসালাত : ২৫]

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রয়েছে বহু নিদর্শন। তারা এসবই দেখে, কিন্তু অনুভব করে না।" [ইউসুফ : ১০৫]

"তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে পার।" [আর-রা'দ : ২]



www.pathagar.com

"জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন।" [ইউনুস : ৫]

"প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে বেশি ভয় করে।" [ফাতির : ২৮]

'যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী [সমগ্র মহাবিশ্বটি] মিশে ছিল একাকার হয়ে, অত:পর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিলাম [প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে] এবং প্রাণবন্ত সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?' [আল-আম্বিয়া : ৩০]

"বল, আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন এবং তিনিই এর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" [১০ : ৩৪]

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী [মহাবিশ্ব] এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই।" [আল-ফুরকান : ৫৯]

"আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দূর্গসদৃশ গ্যালাক্সিসমূহ। তাদেরকে সজ্জিত করেছি তাদের জন্য যারা সত্যিকার দর্শক।" [হিজর : ১৬]

"তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) সৃষ্টি করেছেন ছয়টি সময়কালে।" [৫৭ : ৪]

"আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা হওয়া সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কি?" [ইবরাহীম : ১০]

'তোমাদের প্রতিপালক স্রষ্টা সত্য, তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতএব হে মানুষ, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় ফিরে চলেছো?' [আল-মু'মিন : ৬২]

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে মহানবীও [সা] অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন– 'প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।' [ইবনে মাজাহ]

'যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয়, প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথেই থাকে।' [তিরমিযি, দারেমি]

'মুনাফিক বা প্রতারক ব্যক্তির মধ্যে দুটি চরিত্রের একত্র সমাবেশ হতে পারে না। এর একটি হল উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা এবং অন্যটি হল দ্বীনের সুষ্ঠূ জ্ঞান ও উপলব্ধি।' [তিরমিযি]

'যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে, তা তার পূর্বকৃত গুণাহের জন্য কাফফারা হয়।' [তিরমিযি, ইবনে মাযাহ]

'যে ব্যক্তি ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান অর্জনের সাধনায় নিয়োজিত থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, জান্নাতে তার ও নবীদের কেবল একটি ধাপই বাকি থাকে।' [দারেমি]

'জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সবার আগেই সে তা লুফে নিবে।' [তিরমিযি, ইবনে মাযাহ]



www.pathagar.com

এভাবে জ্ঞান অর্জন, চিন্তা-গবেষণা ও বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি যারা জ্ঞান-বিমুখ, যারা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবে না, চিন্তা-গবেষণা করে না, যারা কুপমণ্ডুক, যারা তাদের বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে উৎসাহী নয় তাদেরকে করা হয়েছে কঠোর ভাষায় তিরস্কার। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন :

'আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হলো সে সব লোক, যারা [বিবেক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও] জ্ঞান খাটায় না, যারা [সবাক হওয়া সত্ত্বেও] মূক এবং [শ্রুতি শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও] বধির।' [আল আনফাল : ২২]

'এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু-সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তার সাহায্যে চিন্তা-ভাবনা করে না; তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না; তাদের শ্রবনশক্তি আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন।' [আল-আরাফ : ১৭৯]

'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না। তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনলাম; কিন্তু আসলে তারা শোনে না।' –[আনফাল : ২০]

'এদের মধ্যে বহু লোকই তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শোনাবে তারা না বুঝতে চাইলেও? তাদের মধ্যে বহু লোক তোমাকে দেখে, কিন্তু তুমি কি সেসব অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা দেখতে না চাইলেও? আসল কথা হল, আল্লাহ লোকদের উপর জুলুম করেন না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে।' [ইউনুস : ৪২-৪৪]

সুতরাং তলোয়ারের জোরে নয়, ইসলামের উত্থান ঘটেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অসম্ভব সম্মান প্রদর্শনের কারণেই মুসলমানরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের উপরই গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। শুধু তাই নয়, হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আবির্ভাবের ফলে বিশ্ব সভ্যতার যে চরম বিকাশ ঘটে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং এর ফলে সভ্যতার যে মহীরুহ জন্ম লাভ করে; আজকের আধুনিক ইউরোপ, আমরিকা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের অর্জিত সেসব সফলতার ভিত্তিভূমির উপরই। এ প্রসঙ্গে চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়ার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাতে মহানবী সম্পর্কে বলা হয়েছে: It was the Prophet who laid the foundation-stone of that vast edifice of enlightment and civilization which has adorned the world since his time. The muslims were commanded by the Quran to say, `O God increase my knowledge; and heard



www.pathagar.com

muhammad tell them, 'knoledge is the birth-right of the Faithfull, take wherever you find it.' Such were the seeds which grew into trees whose branches spread to baghdad, Sicily, Egypt and Spaine, and whose fruits and enjoyed to this day by modern Europe. অর্থাৎ : হযরত মুহাম্মদ [সা] শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে সুবিশাল অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তা তাঁর সময় থেকেই পৃথিবীকে অলংকৃত করে আসছে। কুরআন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে এই মুনাজাত করতে : 'হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' এবং তাদের উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর বাণী হচ্ছে : 'জ্ঞান হচ্ছে মুমিনের জন্মগত অধিকার, যেখানেই তোমরা তার সন্ধান পাও তা গ্রহণ কর।' এমনিই ছিল [ইসলামী সভ্যতার] সেই বীজগুলো, যা পরবর্তীতে বিরাট বিরাট মহীরুহতে পরিণত হয় এবং যার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে বাগদাদ, সিসিলি, মিসর ও স্পেনে এবং আজকে যার ফলগুলো ভোগ করছে আধুনিক ইউরোপ।" Ñ[Chamber's Encyclopaedia, Miracle of Muhammad]

সুতরাং তলোয়ারের ভীতি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারলে সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা, সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্বও যে আপনা-আপনিই অর্জিত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তারা কি সামরিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে? তবে ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, ইসলামের সোনালী যুগে বিজ্ঞানের নেতিবাচক উন্নতির চেয়ে ইতিবাচক উন্নতিই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বর্তমান যুগে মানুষের চরম স্বেচ্ছাচারের কারণে একদিকে যেমন তৈরি হচ্ছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র, আরেক দিকে আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্য-নতুন চরম বিলাসী ভোগ্য পণ্য এবং এসবের আবিষ্কারের কারণে মানুষের জীবনে স্বস্তি ও শান্তির পরিবর্তে জন্ম দিচ্ছে নিত্য নতুন অভাব, চরম অশান্তি ও অস্থিরতা। ইসলামের গৌরবময় যুগ ছিল এসব অভিশাপ থেকে মুক্ত।

সুতরাং আজকের পৃথিবীকেও যদি আমরা নেতৃত্ব দিতে চাই তা হলে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব, হিংস্রতা, বর্বরতা, মূর্খতা আর চরম পন্থার মাধ্যমে নয়।

**আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা**

আল্লাহ বলেছেন 'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' অথচ মুসলমানরা এখন নানাভাবে বিভক্ত। কারণ তাদের নানা জনের নানা মত, নানা পথ। আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ মুসলমানদের এ অবস্থা। মুসলমানদের ঐক্যের মূল সূত্রই হচ্ছে আল্লাহর কালাম। কারণ তাদের জীবনবোধ, তাদের ধ্যান-জ্ঞান, তাদের চিন্তার মূল সূত্র এক ও অভিন্ন।



www.pathagar.com

কুরআনই হচ্ছে জ্ঞানের মূল সূত্র ও আসল উৎস। তারপরে হাদীস। তারপরে সাহাবীদের জীবনী এবং এর অনেক পরে পীর-মুরুব্বী বা অন্যান্য মানুষের কথা, জ্ঞান বা মতবাদ। কিন্তু আল্লাহর কালাম সবার উপরে। আল্লাহর কালাম হল নিশ্চিত জ্ঞান। আর আল্লাহর কালামের বিপরীতে মানব রচিত সকল মতবাদই অনুমান নির্ভর। কাজেই আল্লাহর কালামের পরিবর্তে মুসলমানরা যেদিন থেকে মানব রচিত মতবাদ বা চিন্ত াভাবনকেই নিজেদের জীবনবোধ ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করল, সেদিন থেকেই তাদের ঐক্যসূত্র ছিন্ন হল, নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা দেয়াল দাঁড়িয়ে গেল। কারণ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সকল মানুষের উপলব্ধি এক নয়। এ সম্পর্কে মানব রচিত জীবন-দর্শন যে ধারণাগুলো উপস্থাপন করে তা অনেকটা অন্ধের হাতী দেখার মতই অপরিণত ও বিক্ষিপ্ত। এর কারণ তাদের ধারণা কোন পূর্ণাঙ্গ ও নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি নয়। বরং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা তা অনেকটাই আন্দাজ ও অনুমান নির্ভর। এ কারণেই মানব রচিত জীবনদর্শনগুলো ত্রুটিমুক্ত ও যথার্থ নয়। মানবীয় দর্শনগুলো সম্পর্কে আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তা একেবারেই যথার্থ। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

"তারা যে বস্তুটির অনুসরণ করে তা নিছক অনুমান এবং প্রবৃত্তির লালসা বৈ কিছুই নয়। অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াত এসে গেছে।" [ আন নযম : ২৩ ]

"তাদের কাছে কোন সত্যিকার জ্ঞান নেই। তারা শুধু আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে। আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে – তা সত্যের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পূরণ করে না।" [ আন-নযম : ২৮]

এ কারণেই আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে মানব জাতি যখন নিজেদের মন মত চলা শুরু করল, তখনই তাদের মধ্যে নেমে এল বিপর্যয়। এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্যই আল কুরআন খোদায়ী বিধান অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং আল্লাহর নাফরমানির বিরুদ্ধে করা হয়েছে কঠোর হুশিয়ারী ।

"কিন্তু জালেমরা কোনরূপ জ্ঞান ছাড়াই তাদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করলো।" [আর-রূম : ২৯ ]

"তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হেদায়াতের পরিবর্তে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।" [আল-কাছাছ : ৫০]

অন্যদিকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত ইসলামী যে concept তা সেই সভ্যতার শুরু থেকেই চলে এসেছে একই ধারায়। এ concept চিরন্তন ও শাশ্বত। সময়ের ব্যাপক পরিবর্তনেও তাতে কোন অসংলগ্নতা খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে, বিভিন্ন সময়কালে এই একই আলোকবার্তা বহন করে এনেছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল



www.pathagar.com

[সা], যাঁদের সংখ্যা লক্ষেরও অধিক। কিন্তু স্থান-কালের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সকলের বক্তব্য ছিল এক ও অভিন্ন। কারণ তাঁরা সবাই এক আল্লাহর কাছ থেকেই আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, হেদায়াত পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ্ হলেন সেই সত্তা যিনি সমস্ত জ্ঞানের আধার, যার জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকেই আবৃত করে আছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

'হে মুহাম্মদ, বলে দাও–আকাশ ও পৃথিবীর সব রহস্য যিনি জানেন, এই গ্রন্থ তিনিই নাযিল করেছেন।' [আল ফোরকান : ৬]

'যা কিছু মাটিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয় আর যা কিছু আকাশমণ্ডল থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাতে উত্থিত হয় সবই তাঁর জানা আছে। তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাক। যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখছেন। তিনিই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মীমাংসা সাধনের জন্য সব ব্যাপার তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।' [হাদীদ : ৪-৫]

'এ গ্রন্থ মহাপরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। হে [মুহাম্মদ], এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। এতএব, তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী করতে থাক, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করে দিয়ে।' [আয-যুমার : ১-২]

'তারা কি জানে না যে তারা যা কিছুই গোপণ করে আর যা কিছুই প্রকাশ করে তার সব কিছুই আল্লাহর জানা আছে?' [আল-বাকারা :৭৭]

'আর [হে মুহাম্মদ], নি:সন্দেহে তুমি এই কুরআন এক বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞানী মহান সত্তার নিকট থেকেই লাভ করেছো।' [আন নামল : ৬]

সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্ এমনিভাবেই তোমার ও তোমার পূর্বের অতিক্রান্ত লোকদের নিকট ওহী পাঠিয়ে আসছেন। আকাশ-মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। তিনি সুউচ্চ মর্যাদাবান, বিরাট, মহান। [আশ-শূরা : ৩-৪]

'আল্লাহর তসবীহ্ করছে এমন প্রতিটি জিনিস–যা পৃথিবী ও আকাশলোকে রয়েছে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন তিনিই এবং সবকিছুর উপর তিনিই শক্তিমান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশমান ও প্রচ্ছন্ন। প্রতিটি বিষয়েই তিনি অবহিত।' [আল হাদীদ : ১-৩]

'ইয়া-সীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ, নি:সন্দেহে তুমি রাসূলগণের একজন। সরল-সঠিক পথের অনুসারী। [এই কুরআন] প্রবল-পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কিতাব।'



www.pathagar.com

'আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই আল্লাহর নিকট গোপন নয়। তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত তৈরী করেন। বাস্তবিকই এই প্রবল পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।' [আলে ইমরান : ৫]

'হে নবী, লোদের সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে, তা গোপন কর আর প্রকাশ কর, তার সব কিছুই জ্ঞানের আওতার বাইরে নয় এবং তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে আছে।' [আলে ইমরান : ২৯]

'এই গ্রন্থে কোন কথাই সন্দেহের ভিত্তিতে বলা হয়নি।' [বাকারা :২]

মূলত জীবন ও জগতের যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনই যেহেতু এই বিশ্ব জাহান এবং মানব-প্রকৃতি ও তাদের সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে বেশি জানেন, সেহেতু জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত যে খোদায়ী আলোক আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাতেই রয়েছে সত্যিকার জ্ঞান এবং জীবনবোধ। আমাদের উচিত সেই জান্নাতি আবেহায়াতের দিকেই ফিরে যাওয়া। এ কারণেই আমাদের প্রভু বার বার অত্যন্ত দরদের সাথে হেদায়াতের পথে ফিরে যাওয়ার জন্য, মরীচিকার গোলকধাঁধাঁ ছেড়ে সরল-সঠিক সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদের প্রতি আহবান করেছেন আমাদেরই মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য, আমাদেরই মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। কারণ তিনিই যে আমাদের মাবুদ, আমাদের অভিভাবক। তাঁর চেয়ে অতটা দরদ দিয়ে কে আর আমাদেরকে ভালোবাসে? পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 'হ্যা। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লালসার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা সত্যের পথ থেকে বিমুখ হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বহু দূর চলে যাও।' [নিসা : ২৭]

'অতএব আল্লাহর নাযিল করা আইন-বিধান অনুযায়ী লোকদের পারস্পারিক যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা কর আর যে মহান সত্য তোমার নিকট এসেছে তা থেকে বিরত থেকে তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না।' [মায়েদা : ৪৮]

'যারা আমাদের আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে এবং যারা অন্যকে নিজেদের রবের সমকক্ষ করে নিয়েছে; তোমরা কখনো তাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করে চলবে না।' [আনআ'ম : ১৫০]

অথচ অত্যন্ত স্বজ্ঞানে, সচেতনভাবে মুসলমানদেরকে কুরআনের চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। আমরা আল্লাহর কালামের পরিবর্তে 'মুরুব্বীদের'-কে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছি, জ্ঞানের উৎস বানিয়েছি। যেখানে নবীকেও আল্লাহর আসন দেয়া যায় না কিংবা হাদীসকে দেয়া যায় না কোরআনের মর্যাদা, হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচারে যেখানে চূড়ান্ত মাপ কাঠি হচ্ছে আল্লাহর কুরআন, সেখানে কুরআনের পরিবর্তে মুরুব্বীর কথাকে নির্ভুল মানদণ্ড হিসেবে কীভাবে গ্রহণ করা যায়? আমাদের মনে রাখতে হবে, মুরুব্বীর বেশ



www.pathagar.com

ধরে শয়তানও বিচরণ করতে পারে। আর শয়তানের কাজ হচ্ছে ইসলাম থেকে, কোরআন থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের বীজ বপন করা। নানা মুরুব্বীর নানা মত, একেক পীরের একেক দল। 'এক ঘর মে দো পীর' কখনো হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কালাম এক এবং অপরিবর্তনীয়। কুরআনের চেয়ে মুরুব্বী চর্চা বেশি হওয়ার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে আজ অনৈক্য ও বিভ্রান্তি। কুরআনের চর্চাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে, এরপর হাদীসকে এবং তারপর বিভিন্ন মুরুব্বীদের কথা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে চলছে সম্পূর্ণ উল্টোটা। কুরআনের চেয়ে হাদীসকে এবং হাদীসের চেয়ে মুরুব্বিকে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশিকেই আজ আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। মসজিদে মসজিদে প্রতিদিন কিতাবের তালিম হয়, দ্বীনের বয়ান হয়, কিন্তু সেই কিতাব আল্লাহর কিতাব নয়, এবং দ্বীনের বয়ানেও নেই দ্বীনের কথা, জ্ঞানের কথা। যা আছে তার বেশির ভাগই আন্দাজ ও অনুমান নির্ভর। কোরআন ভিত্তিক কোন আলোচনা সে সব বয়ানে পাওয়া যায় না।

এ ধরনের বিভ্রান্তির পথ ধরেই পূর্ববর্তী জাতি সমূহ ধ্বংস হয়েছিল, অভিশপ্ত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইহুদিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

'যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়, যারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং চায় যে এ পথ বাঁকা হয়ে যাক– এ লোকেরা গুমরাহিতে বহু দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। [ইব্রাহিম : ৩]

'তুমি কি তাদেরকে দেখেছো যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করেছে এবং তাকে অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তিত করেছে এবং নিজেদের জাতিকেও ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করেছে অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে–যেখানে তাদেরকে ঝলসানো হবে; যা খুবই খারাপ জায়গা? তারা আল্লাহর বিপরীতে কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে যেন তারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিভ্রান্ত করে দ্যায়।' [ইব্রাহিম : ২৮-৩০]

আল্লাহর কালামকে উচ্চকিত করাই ছিল মহানবীর মিশন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ঘোষণা করছেন, 'হে রাসূল [সা]! তোমার রবের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। তুমি যদি তা না কর তাহলে তো তুমি রিসালাতের হক আদায় করলে না! লোকদের ক্ষতি ও দুস্কৃতি থেকে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের সৎ পথ প্রদর্শন করেন না।'[মায়েদা : ৬৭]

আমরা পীর-বুযুর্গদের হেদায়াতের উৎস বানিয়ে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, কুরআন চর্চা কমিয়ে দিয়ে বুযুর্গ চর্চা বাড়িয়ে দিয়েছি, অথচ আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বর প্রতি নিজেদেরকে সঁপে দেয়ার, আল্লাহর দিকে, আল্লাহর কালামের দিকেই মানুষকে আহবান করা :



www.pathagar.com

'তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে আর বলে আমি মুসলিম।' [হা-মীম-আস সিজদা : ৩৩]
'হে আবৃত হয়ে শয্যা গ্রহণকারী, ওঠো, সাবধান কর, আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।' [মুদাস্‌সির : ১-৩]
কুরআন প্রচারের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়েই মহানবী [সা] তাঁর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে, 'আমার কাছ থেকে একটি আয়াতও যদি তোমরা শোন, তাহলে তাও লোকদের কাছে পৌঁছে দাও।' বুখারী। প্রিয়নবীর [সা] এ নির্দেশকে গুরুত্ব দিয়েই সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের সাথে দেখা হলে আল্লাহর আয়াত না শুনিয়ে একে অন্যের থেকে বিদায় নিতেন না।
বস্তুত, আল্লাহর কিতাবের প্রচার, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী মানুষের জীবনকে ঢেলে সাজানো এবং আল্লাহর কালামের ভিত্তিতে সমাজ-সভ্যতা গড়ে তোলাই ছিল পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের মূল কাজ। প্রিয়নবীও এ কাজই করে গেছেন। আর আমাদের উম্মতে মুসলিমার আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম [আ]ও যখন তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল [আ]-কে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবা ঘরের নির্মাণ শেষ করে উম্মতের জন্য দোয়া করছিলেন, তখন তিনিও বলেছিলেন, 'হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য থেকেই একজন রাসূল [সা] প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াত পড়ে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের জীবনকে [কিতাবের আলোকে] পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই তুমি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ।' [বাকারা : ১২৯]
কিতাব, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম আল কুরআনের প্রচার, সে আলোকে মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করাই যে মহানবীর [সা] জীবনের অন্যতম প্রধান মিশন ছিল সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি। তাই সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে আমরা শুধু এ সম্পর্কিত আল্লাহর আয়াতগুলোই আবার একটু শুনিয়ে দিতে চাই, হয়তো এর ফলে আমাদের সম্বিত ফিরে আসবে। আল্লাহ বলেছেন, 'যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল [সা] পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।' [বাকারা : ১৫১]
'তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল [সা] প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।' [জুমুয়া : ২]


www.pathagar.com

'প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্ এ বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরি করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। অথচ এর পূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।' [আলে ইমরান : ১৬৪]

'[নবী] তো এটাই বলবেন যে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, কেননা, তোমরা নিজেরা কিতাব শিখ ও অন্যদেরকে শিক্ষা দাও।'

'রাসূল [সা] তো তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত সমূহ শোনান, যা স্পষ্ট পথ-নির্দেশ দান করে, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পুঞ্জীভুত অন্ধকার থেকে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসে।' [তালাক : ১১]

কুরআন শিক্ষা সম্পর্কে মহানবী [সা] তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসেও মুসলমানদেরকে তাগিদ দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা ফরায়েজ ও কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও, কেননা আমাকে শীঘ্রই উঠিয়ে নেয়া হবে।' বিদায় হজ্বের ভাষণেও মহানবী [সা] উম্মতের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপের পর মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হল আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নাহ।'

সুতরাং আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিপর্যয়ের কারণ উপলব্ধি করতে হবে। অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলমানদেরকে তাদের মূল পথ থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কুরআন থেকে মুসলমানদেরকে সরিয়ে দেয়ার জন্য হামলা আসছে মূলত দু দিক থেকে। একটি হচ্ছে বাইরে থেকে, মুসলমানদের শত্রুদের পক্ষ থেকে। তারা কুরআনের শিক্ষা ও শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বললেই মুসলমানদেরকে পশ্চাৎপদ, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, বর্বর, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে মুসলমানদেরকে নিবৃত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্যুত করার সবচেয়ে বড় ও কার্যকরী আঘাতটি আসছে আমাদের মুসলমানদের ভিতর থেকে এবং লেবাসধারীদের কাছ থেকে। যার কারণে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানগণ সহজেই বিভ্রান্ত হচ্ছে।

এক সময় আধুনিক শিক্ষিতদের একটি বিরাট অংশ পাশ্চাত্য প্রভাবিত খোদাবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আল কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে পাশ্চাত্য বাহিত এসব বৈরী প্রচারণা দ্বারা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হত। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন যতই জোরদার হচ্ছে এবং আল কুরআনের শিক্ষা যতই সম্প্রসারিত হচ্ছে ইসলাম বিরোধীদের মিথ্যা প্রচারণার অসারতা ততই প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু লেবাসধারী মেহনতকারীদের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকাই মুসলমানদের জন্য এখন সবচেয়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। লেবাসধারীরাই বিভিন্ন কৌশলে মানুষকে কুরআন



www.pathagar.com

চর্চা থেকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। অথচ আল্লাহর নবী এ সম্পর্কে কতই না উৎসাহ প্রদান করেছেন। কুরআনের দরস বা আলোচনা সম্পর্কে মহানবী [সা] বলেছেন,
'যখন কোন একদল লোক আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তার উপর শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা করে, তখন তাদের উপর [আল্লাহর তরফ থেকে] এক মহা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। ফেরেশতারা তাদের মজলিশকে ঘিরে রাখে আর স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতাদের মজলিশে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।' মুসলিম।
অত্যন্ত দু:খজনক হলেও নিদারুণ বাস্তবতা হচ্ছে যে, আজকে যারা দাওয়াতের মেহনত করেন বলে মনে করছেন তারা নানা বাহানায় কুরআন চর্চা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত, আল কুরআনের তাফসীর পড়া থেকে তারা সেভাবে লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন, যেমন এক সময় ব্রাহ্মণগণ হিন্দু শাস্ত্র চর্চা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করত। অথচ রাসূলুল্লাহ [সা] এবং সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের সময়ে কুরআনকেই সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন। দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রেও কুরআনের আয়াতকেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতেন। কুরআনই ছিল মহানবীর [সা] সবচেয়ে বড় মোজেজা। কুরআনের দিকে মানুষকে আহবান করার জন্য কুরআনই সবচেয়ে সুন্দর করে মানুষকে ডাকতে সক্ষম। আর কুরআনের সমাজ গড়ার জন্য কুরআনের শিক্ষাকে যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। যার কারণে রাসূল [সা] যখনই মানুষকে দাওয়াত দিতেন তখনই তাদেরকে কুরআনের কোন অংশ শুনিয়ে দিতেন, কুরআনের মাধ্যমেই মানুষকে দাওয়াত দিতেন। এমনকি অনেক সময় অন্য কোন কথা না বলে শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত করেই শুনাতেন। প্রিয়নবীর [সা] জীবনী থেকে এ ব্যাপারে অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যায়, আমরা শুধু একটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করছি।
হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশ নেতা উতবা ইবনে রাবিয়া কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে হুজুর [সা]-এর সাথে আপোষ করার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে আসে। তার ধারণা এ প্রস্তাবগুলোর একটি না একটি মুহাম্মদ [সা] গ্রহণ করবেন। উতবা বলে, 'হে ভাতিজা, আমরা তোমাকে কতখানি মর্যাদা দিয়ে থাকি তাতো তুমি জানই। সমগ্র গোত্রের মধ্যে তুমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বংশগতভাবেও তুমি বিশিষ্টতার দাবীদার।' এরপর সে একটু অনুযোগের সাথে বলে, কিন্তু তুমি জাতিকে খুবই উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। তাদের ঐক্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছ। তাদের নেতৃবৃন্দকে বেকুফ ও নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছ। তাদের ধর্মের ও তাদের দেবদেবীদের খুঁত ধরেছ। তাদের অতীত পূর্ব-পুরুষদের বিধর্মী আখ্যায়িত করেছ। এবার আমার কথা শোন। আর আমি যে কয়টা প্রস্তাব দিচ্ছি, তা নিয়ে তুমি চিন্তা-ভাবনা



www.pathagar.com

কর। হয়তো তার কোন একটা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। রাসূল [সা] বললেন, ঠিক আছে, আপনি বলুন, আমি শুনবো। উতবা নিম্নোক্ত বিকল্প প্রস্তাবগুলো একে একে তুলে ধরলো :

'তোমার উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে দেব, যাতে তুমি আমাদের সবার চেয়ে ধনবান হয়ে যাবে। আর যদি তুমি এর দ্বারা নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হাতে পেতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা ও সরদার নিযুক্ত করতে প্রস্তুত আছি। আমরা কোন ব্যাপারেই তোমার মতামত না নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব না।

তুমি যদি দেশের রাজা হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানাতেও প্রস্তুত।

আর যদি এর কারণ এই হয়ে থাকে যে, তোমার ওপর কোন জ্বিন ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে এবং সে সব অশরীরী জীব তোমার উপর প্রবল হয়ে পড়েছে, তাহলে আমরা চাঁদা তুলে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এরপর তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে তো ভাল কথা, না হলে আমাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হবে।'

এভাবে সব ক'টা প্রস্তাব শোনার পর রাসূল [সা] বললেন, 'ওহে ওলীদের বাবা, আপনার কথা শেষ হয়েছে?' সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল [সা] বললেন এবার আমার বক্তব্য শুনুন। উতবা বলল, আচ্ছা বল, শুনি।'

রাসূল [সা] সবগুলো প্রস্তাব এক দিকে সরিয়ে রেখে সূরা হা-মীম সিজদার শুরু থেকে পড়তে শুরু করলেন :

'হা-মীম। এ হচেছ পরম দয়ালু ও করুণাময়ের প্রেরিত বাণী। এটি হচ্ছে একটি সুলিখিত গ্রন্থ, যার প্রতিটি আয়াত সুস্পষ্ট। এটি হচ্ছে আরবী ভাষায় রচিত কুরআন, বুদ্ধিমান মানুষের জন্য। এ গ্রন্থ বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা আর অবিশ্বাসীদের জন্য দু:সংবাদদাতা। কিন্তু ওদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা কর্ণপাতই করে না। তারা বলে যে, আমাদের মন এসব তত্ত্বের বিরোধী, যার দিকে তুমি আমাদের ডাকছো। আর আমাদের কানে রয়েছে ভারী ঢাকনা এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে একটা আড়াল। সুতরাং তুমি নিজের কাজ করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাব...'

এভাবে রাসূল [সা] তেলাওয়াত করতে থাকলেন আর উতবা দু হাত পিছনে নিয়ে তার উপর হেলান দিয়ে নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। সিজদার আয়াত এলে রাসূলুল্লাহ [সা] তেলাওয়াত বন্ধ করে দিয়ে সিজদা করলেন। তারপর বললেন, 'অলীদের বাবা, শুনলেন তো? এখন যা ভাল বুঝেন করুন।'

এরপর উতবা উঠে তার সংগীদের কাছে চলে গেল। তারা উতবার চেহারা দেখেই বলল, উতবার চেহারা বদলে গেছে। যাওয়ার সময় ওর চেহারা যেমন ছিল, এখন তেমন নেই। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তারা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী?'



www.pathagar.com

উতবা বলল : 'ব্যাপার হল, আমি এমন বাণী শুনে এলাম যা জীবনে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, ওটা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীর কথাও নয়। হে কোরেশ জনমণ্ডলী, আমার কথা শোন। আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি, মুহাম্মদকে [সা] তার বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দাও, তার পিছনে লেগো না।'

এভাবে শুধু কোরআন শুনেই যে বহু মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন পবিত্র কুরআনের বাণীতে প্রভাবিত হয়েই। কোরআন পুরো আরব সমাজেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আল কুরআনই ছিল মহানবীর [সা] সমস্ত কর্ম-তৎপরতার কেন্দ্রভূমি। আল্লাহর রাসূল [সা] আরবের বর্বর ও জাহেল মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন মূলত এই কুরআনের ছোঁয়াতেই। আর শত গোত্রে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃংখল সেই সমাজটিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিশাল ইসলামী খেলাফতেরও সূচনা করেছিলেন মূলত এই কুরআনের সাহায্যেই। কারণ আল কুরআনই মুক্তিকামী মানবতার সৌভাগ্যের পরশ পাথর এবং বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্যের মূল সূত্র। আর এই মূল সূত্র থেকে দূরে সরে যাওয়াই আজকের মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য ও বিভেদ-বিভক্তির মূল কারণ। আল্লাহ বলেন, এখন যে কেউ 'তাগুত'-কে প্রত্যাখান করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে এমন একটি মজবুত রজ্জু ধারণ করেছে যা কখনও ছিঁড়ে যাবে না।

**ঐক্যের পথে অন্তরায় দূর করার উপায়**

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই আজ বিপন্ন। বিশ্বে মুসলমানদের হাতে রয়েছে ৫৭ টির মত স্বাধীন রাষ্ট্র। রয়েছে মুসলিম দেশগুলোর আন্তর্জাতিক সংগঠন ওআইসি [Organisation of the Islamic Countries]। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম বিশ্বের এতগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে এখনও কোন কার্যকর ঐক্য গড়ে ওঠেনি। এর কারণ হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মধ্যে আজ সত্যিকার অর্থে কোন আদর্শিক বন্ধন অনুভব করছে না। আদর্শই নাই তার আবার বন্ধন থাকবে কোত্থেকে! যেহেতু ঐক্যের মূলসূত্র ইসলাম আজ আর মুসলমানদের কোন জাতীয় আদর্শ নয়; দু-একটি দেশ ছাড়া প্রায় সব মুসলিম দেশেরই জাতীয় আদর্শ হচ্ছে সেকুলারবাদ তথা পাশ্চাত্যবাদ, সেহেতু উম্মাহর ঐক্য আজ আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নয়। মুসলিম উম্মাহ আজ কোন আদর্শিক জাতি নয়। ইসলামী খেলাফত তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অখণ্ড আদর্শিক জাতীয়তাবাদ এবং একজন একক ও শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ধারনা আজ বিপজ্জনক চিন্তা হিসেবে চিহ্নিত। মুসলমানরা আজ বিভিন্ন ভৌগলিক জাতীয় রাষ্ট্রের আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অধীন একটি সম্প্রদায় মাত্র। এ কারণে মুসলিম জাতি আজ অসংখ্য ভৌগলিক জাতীয়তায় খণ্ডিত। এ কারণে মুসলমানদের কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি



www.pathagar.com

নেই। আর এই অসংখ্য খণ্ড খণ্ড মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় শুধু মার খাচ্ছে আর শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোর দয়ায় আশ্রিত হয়ে তাদের পদলেহন করে চলছে। অন্যদিকে পঞ্চাশেরও অধিক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বকে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ইহুদি-খ্রিস্টান সবাই আজ ঐক্যবদ্ধ। বিশ্বের সকল ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত কিংবা সহানুভূতি প্রবণ। একজন পোপের একক নেতৃত্বের অধীনে বিশ্বের সকল খ্রিস্টানরা আজ ঐক্যবদ্ধ। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সমস্ত সংগঠনই তো ইহুদি-খ্রিস্টানদের কব্জায়। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। আজ নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত শুধু মুসলমানরা। আর আজ পৃথিবীতে রক্ত ঝরছে মূলত মুসলমানদের। অন্যদিকে, যার কথা আমরা আগেও বলেছি; মুসলমানরা যতদিন ইসলামী খেলাফতের অধীনে অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ছিল, ততদিন তারা ছিল পৃথিবীতে অপ্রতিরোধ্য জাতি।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের মূলসূত্র আল কুরআনের আদর্শকে উচ্চকিত না করা পর্যন্ত যথার্থ ঐক্য গড়া সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে ওআইসি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে তার আগে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার যথার্থ মন-মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। মুসলিম দেশসমূহের নেতৃত্ব যদি ইসলামের প্রতি আন্তরিক তথা ইসলামী খেলাফতের পক্ষশক্তি হয়, তাহলে জাতিসংঘের বিপরীতে ওআইসি-ও মুসলিম স্বার্থের পক্ষে শুধু কার্যকর শক্তিতেই পরিণত হবে না, মুসলিম উম্মাহর যথার্থ পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবকের ভূমিকাও পালন করতে পারবে, যার অভাবে মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এক এতিম ও অসহায় জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ যদি ইসলামের পক্ষশক্তি না হয়, বরং নেতৃত্ব যদি ইসলাম বিদ্বেষী, হীনমন্যতায় আক্রান্ত ও সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের ধামাধরা হয়, তাহলে সে সব মুনাফেক নেতৃবৃন্দ ওআইসিতে ইসলাম বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট হয়েই কাজ করবে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পরিবর্তে উম্মাহর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির ইন্ধন যোগাতেই বেশি ব্যস্ত থাকবে।

মুসলিম বিশ্বের যথার্থ ঐক্যের প্রয়োজনে দেশে দেশে ইসলামের উত্থান যেমন প্রয়োজন, তেমনি ইসলামের উত্থানের জন্য দেশে দেশে মুসলমানদেরকে কাঠালের কোষের মত ঐক্যবদ্ধ হওয়াও অত্যন্ত জরুরী। কাঠালের কোষের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করলাম, কারণ আল্লাহর এই সৃষ্টিটির মধ্যেও আমাদের জন্য যথেষ্ট শেখার উপকরণ রয়েছে। কাঠালের কোষগুলো সকলে মিলে যেমন একটি মাত্র মোতা অর্থাৎ নেতৃত্বকে আঁকড়ে ধরে সংহত হয়ে থাকে তেমনি সুশৃংখল জাতি গঠনের জন্যও নেতার সংখ্যা যথাসম্ভব কমাতে হবে। যত নেতা, তত বিভেদ। যারা স্বার্থের রাজনীতি করে, নেতৃত্বের কোন্দল তাদের মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা। পদ নিয়ে টানাটানি, কাড়াকাড়ি তাদের মধ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক ও



www.pathagar.com

অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। কিন্তু যারা ইসলামের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে দলাদলি শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। ইসলামী রাজনীতি তো করতে হয় নি:স্বার্থভাবে, আল্লাহ'র ওয়াস্তে। অথচ একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা সত্তেও ইসলামপন্থীদের পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক ঈর্ষা ও বিভেদ দানা বেঁধে উঠছে। মূলত নেতৃত্ব ও পদের লোভই যে এর মূল কারণ তা সহজেই অনুমেয়। অথচ ইসলামে নেতৃত্ব ও পদের লোভ সুস্পষ্টভাবেই হারাম।

আসলে মুসলিম সমাজে আলেম তথা ইসলামপন্থীদের অনৈক্য ও দলাদলিই ইসলামের উত্থানের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ইসলামের নামে পরস্পর কাদা ছুঁড়াছুড়ি করে তারা আসলে ইসলামের কোন খেদমত না করে ইসলাম বিরোধীদের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করে মাত্র। এই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতে হলে ইহুদী আলেমদের দৃষ্টান্তকে সামনে রাখতে হবে। ইহুদী আলেমদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন লানত করেছেন। কারণ তারা জেনে শুনে সত্যের বিরোধিতা করেছিল। জাহেলী সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ ও নেতৃত্বকে অক্ষত রাখার কারণে এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জেনে-শুনে হকের দাওয়াতের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত। তাদের ব্যপারে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা সে সব লোকের মত হয়ো না যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।' [আলে ইমরান : ১০৫]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করার তাদের আর কোন কারণই ছিল না, শুধু মাত্র নিজেদের অহংবোধকে বজায় রাখা ছাড়া। শুধুমাত্র হিংসা ও আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই তারা মুহাম্মদ [সা]-কে সত্যনবী জেনেও তাঁর বিরোধিতা করেছিল। একই কারণে তারা পূর্ববর্তী বহু নবী-রাসূল ও সত্যপন্থী লোকদের হত্যা পর্যন্ত করেছিল। ঠিক একই ভাবে মুসলিম সমাজেও এক শ্রেণীর আলেম, পীর ও ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত কিছু দল ও গোষ্ঠী শুধুমাত্র পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তার, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার লোভের কারণেই রেষারেষি ও দলাদলিতে লিপ্ত রয়েছেন। যার কারণে আজকের মুসলিম সমাজও অতীতের ইহুদীদের মতই একই পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে।

### ভাষা-সাহিত্য এবং মিডিয়ার ব্যবহার

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মতো দাওয়াতী কাজ করাও একটি ফরজ ইবাদত। মূলত একজন মুসলমানের মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান মৌলিক কাজ হলো দাওয়াতী কাজ করা বা দ্বীনের দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। কিন্তু দ্বীনের এই মৌলিক কাজ সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলমানই গাফেল।



www.pathagar.com

অনেক মুসলমানই আছেন যারা ধর্ম-কর্ম বলতে শুধু নামাজ-রোজা, কুরআন তেলায়াত ও হজ্জ্ব করা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু যাকাত-ফেতরা ও দান-খয়রাত করাকেই মনে করেন। কিন্তু দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করাও যে একজন মুসলমানের একটি মৌলিক কাজ এ সম্পর্কে তেমন সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। অথচ আল কুরআনে এবং মহানবীর [সা] হাদীসে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং মুসলমানদের দাওয়াতী কাজে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী [সা] সারা জীবন এই দাওয়াতী কাজ করে গেছেন। সাহাবীগণও প্রিয়নবীর [সা] সাথে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর এ জন্য তাঁরা অসীম ত্যাগ ও কোরবানী স্বীকার করেছেন। তাঁদের সে ত্যাগ, কোরবানী ও দায়িত্ব পালনের কারণেই আজ আমরা দ্বীনের আলোর সন্ধান পেয়েছি। অথচ আজকের মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের এ মৌলিক কাজ আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ ও গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না। অথচ আল কুরআনে এবং রাসূলের [সা] জীবনে আমরা এ কাজটির প্রতি কত গুরুত্বই না দেখতে পাই যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে ভাষাশৈলী তথা সাহিত্যের ব্যবহার যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আল কুরআনের ভাষাশৈলীর দিকে তাকালেই বুঝা যায়। জাহেলিয়াতের যুগে আরবের ভাষাশৈলী কিন্তু ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আরবরা তাদের কাব্যভাষার জন্য গর্ব করতো। বাস্তব কারণেও আসলে তাদের সে অধিকার ছিল। কিন্তু কুরআনের ভাষাশৈলী দেখে তারা বিস্মিত হল। কুরআনের ভাষার সম্মোহনী শক্তির সামনে সে যুগের বড় বড় কবিরা পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। বস্তুত এটিও ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আল কুরআনের একটি মোজেজা এবং সমকালীন ভাষার সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের উপস্থাপনার জন্য আরো উন্নত ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বস্তুত সমকালীন ভাষা ও সাহিত্যের বিপরীতে এটি ইসলামের একটি চ্যালেঞ্জও বটে।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বোত্তম উপহার। আর দামী উপহার দামী পাত্রের মাধ্যমেই উপস্থাপন করতে হবে এটাই দুনিয়ার সাধারণ রীতি। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনও সৌজন্যবোধের এ রীতিকে পছন্দ করেন। আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। তাই তিনি সুন্দরকে অর্থাৎ আল কুরআনকে উপস্থাপন করেছেন অনুপম ভাষাশৈলীর মাধ্যমে। এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনের ভঙ্গিও শিক্ষা দিচ্ছেন।

ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারের দিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সত্যের দাওয়াত দিতে হবে সুন্দর ভাষাশৈলীর মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ কারণেই আমরা দেখি আল্লাহর রাসূল [সা] সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি



www.pathagar.com

সাহিত্য-শিল্প ও কবি-সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। তিনি নিজে যদিও কবি ছিলেন না, এবং তাঁর জন্য তা শোভনও ছিল না, কিন্তু তিনি শিল্প-সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক ছিলেন। জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ইমরাউল কায়েস। আল্লাহর রাসূল [সা] কায়েসের কবিতার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অশ্লিলতার কঠোর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু পাশাপাশি তিনি তার ভাষার কারুকার্যের ও কাব্যশৈলীরও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় তার ভাষায় রয়েছে সম্মোহনী শক্তি এবং কাব্যকর্মে রয়েছে বর্ণনার পরিপাটি।' রাসূলের [সা] সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কবি সাহাবা লবিদ, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কাব ইবনে মালিক, হাস্‌সান ইবনে সাবিত ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি লবি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ সাত কবিদের অন্যতম, যাদের কবিতা জাহেলিয়াতের যুগে সোনার হরফে লিখে পবিত্র কাবা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল [সা] ইসলাম বিরোধী কবিতার জবাব দেয়ার জন্যও তাঁর দলের কবিদের উৎসাহিত করতেন এবং এজন্য তাদেরকে পুরস্কারেও ভূষিত করতেন। আল্লাহর রাসূল [সা] নিজেও সব সময় চমৎকার ও আকর্ষণীয় ভাষায় কথা বলতেন, মার্জিত ও মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় ভাষণ দিতেন। তিনি বলেছেন, 'আমাকে অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের যোগ্যতা দেয়া হয়েছে।' তিনি ইসলামী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য সাহিত্য আসরের আয়োজন করাতেন এবং সাহাবীদের নিয়ে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি তিনি ওকাজ মেলার কবির লড়াই দেখতে যেতেন। তিনি এমনকি মসজিদে নববীতে কবিতা পাঠের জন্য একটি স্বতন্ত্র মিম্বর নির্মাণ করিয়েছিলেন। কবি সাহাবা হাস্‌সান বিন সাবিত সেখানে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবিদেরকে তিনি নানাভাবে সম্মানিতও করতেন। কবি সাহাবী কাব ইবনে মালিক রাসূলের [সা] শানে অমর কাব্যগ্রন্থ 'বানাত সুয়াদ' রচনা করে তো রাসূলের [সা] নিজের গায়ের চাদর উপহার পেয়েছিলেন। এরকম আরো বহু ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

রাসূল [সা] তাঁর সাহাবীদের উৎসাহিত করতেন যেন তারা নিজেদের বাচ্চাদেরকে কবিতা শেখায়। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে কবিতা শেখাও, তাহলে তাদের জিহ্বা রসালো হবে। অর্থাৎ তাদের ভাষা মিষ্টি হবে। এ থেকেই বুঝা যায়, আল্লাহর নবী মুসলমানদের ভাষাকে উন্নত ও মাধুর্যমণ্ডিত করতে কত যত্নবান ছিলেন, ভাষাশৈলী তথা সাহিত্য-শিল্পকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন।

অথচ আজ আমরা যারা দাওয়াতের মেহনত করছি বলে দাবী করছি তারা এসব ব্যাপারে কতই না গাফেল। কারণ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা ইসলামকে দেখেছি অন্ধদের হাতী দেখার মত। একবার কয়েক অন্ধ হাত দিয়ে স্পর্শ করে করে হাতী দেখেছিল। এক অন্ধ শুধু হাতীর পা স্পর্শ করেছিল, এ কারণে সে মনে



www.pathagar.com

করল হাতী হল গাছের গুড়ির মত। আরেক অন্ধ হাতীর পেট স্পর্শ করেই ভাবল হাতী হল দেয়ালের মত। আরেকজন শুধু হাতীর কান স্পর্শ করল আর ভাবল হাতী হল মূলত একটি কুলার মত। এভাবে হাতীকে একেক জন একেক ভাবে দেখল কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হাতীকে কেউ দেখল না। যার কারণে একেক অন্ধের কাছে হাতী একেক রকম। আমাদের দেশের বেশিরভাগ দ্বীনের মেহনতকারীদের অবস্থা হচ্ছে একই রকম। যেই সিরাতুল মুস্তাকিমের সুস্পষ্ট নির্দশন দিয়ে পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন, যে কুরআনেই রয়েছে ইসলামের সত্যিকার পরিচয়, সেই কুরআনকে নিজের চোখে আমরা কেউ দেখতে চাই না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই আসমানী পয়গামে আমাদের জন্য কী উপহার পাঠিয়েছেন তা আমরা বুঝতে চাই না। আমরা চাই পরের রুখে ঝাল খেতে। তথাকথিত মুরুব্বিরা আমাদের সামনে দ্বীনের যে আংশিক শিক্ষা উপস্থাপন করেন তা নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট। যার কারণে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ থেকে আমরা অন্ধের হাতী দেখার মতই বঞ্চিত থেকে যাই।

যাই হোক দ্বীনের দাওয়াতে শিল্প-সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে গাফেল থাকার কারণেই আমাদের দেশের বেশিরভাগ ইসলামী দলগুলোর অধিকাংশ বক্তার ভাষা অত্যন্ত নিম্ন মানের শুধু নয়, অমার্জিত, অশ্রাব্য ও অশালীন। আর এই অমার্জিত অশালীন ভাষাতেই তারা ইসলামের মত মহান আদর্শের দাওয়াত উপস্থাপন করে থাকেন। ঠিক একই কারণে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মিডিয়ার সর্বস্তরে ইসলামপন্থীরা আজ সবচেয়ে অনগ্রসর ও কোনঠাসা। আর এর দু:খজনক ফলও আজ তারাই ভোগ করছেন।

ইসলামের কথা আমরা যত মুখে, যত শক্তিতে কিংবা যত জায়গায় ও যতটা না বলতে পারছি, তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি ব্যপ্তি ও শক্তি নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে মিডিয়ার কল্যাণে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন আজ এক ভয়াবহ দানবের মুখোমুখী। বিশেষ করে বাংলাদেশে এ দানবের শক্তিমত্তার সামনে আমরা যেন কেমন অসহায় লিলিপুট। এই দানবের নাম মিডিয়া। এ দানব যেন একচোখা দাজ্জাল। দানবীয় শক্তির অধিকারী অথচ বিবেকহীন মিডিয়ার কাছে যেন জিম্মি হয়ে পড়েছে পুরো জাতি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাদেরকে দানবের কাছে আত্মসমর্পন করতে হচ্ছে। মিডিয়া যেন দাজ্জালের মুখ। কেমন অবলীলায় তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে চলেছে।

অথচ এই মিডিয়াকে জয় করে একে সত্যের পক্ষে কাজে লাগানোর কোন চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে নেই। আমি বুঝতে পারছি না যে, মুসলমানরা কেন আজ মিডিয়াতে এত পিছিয়ে! অথচ একটি মিশনারী জাতি হিসেবে, রাসূলের [সা] মিশনকে এগিয়ে নেয়ার এবং আল্লাহর কালামকে দুনিয়ার মানুষের সামনে বুলন্দ করার ব্যাপারে, সত্যের সাক্ষী দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে এক্ষেত্রে আমাদেরই



www.pathagar.com

তো সবচেয়ে বেশি এগিয়ে থাকার কথা ছিল। সত্যের দাওয়াতদানকারী জাতি হিসেবে মুসলমানদের হাতেই তো থাকা উচিত ছিল মিডিয়ার নেতৃত্ব। আল্লাহ তো মুসলমানদের ঘোষণা করেছেন শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কিভাবে সম্ভব? আমাদের পূর্বসূরীরা কি আমাদের মত এমন সর্বক্ষেত্রের পশ্চাৎপদতা নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন?

www.pathagar.com

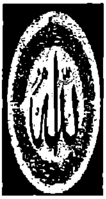

# আলোকিত আলো

**নাজিব ওয়াদুদ**

উত্তরমুখো চলেছিলো ওরা, মক্কার একটি ব্যবসায়ী কাফেলা। গরমে, ক্লান্তিতে বেহুঁশপ্রায় অবস্থা। উট আর ঘোড়াগুলোও দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেন পা আর চলে না।

যেদিকে চোখ যায় কেবল ধু ধু বালু আর বালু, কখনো উঁচু এতোটাই উঁচু- যে, দেখে মনে হয় টিলা, বালুর পাহাড়, আবার কখনো ঢালু-ঢালু হতে হতে কোথাও কোথাও তা অগভীর পুকুরের মতো, কিন্তু তলায় পানির বদলে শুধুই বালু, খচখচে বালু। আরবের এই মরুভূমির আকাশ ঘোলাটে শাদা, সূর্যটা মাথার ওপর ধিকিধিকি জ্বলছে, তার তাপ এতোটাই তীব্র ও অসহনীয় মনে হয় যেন নিচে মাথার একহাত ওপরে নেমে এসেছে সেটা। মাঝে-মাঝে দমকা বাতাসে বালুর ঝড় ওঠে। তখন হাঁটু গেড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা গুঁজে দিতে হয় বালুর মধ্যে।

হঠাৎ একটা ছোট-খাট মরুদ্যান ওদের চোখে পড়লো। মরুদ্যান মানে কিছু গাছপালা, তার মানে ছায়া, আর সবচেয়ে বড়ো কথা পানি, হ্যাঁ, পানি। পানির অপর নাম জীবন তা এই মরুভূমির লোকদের চেয়ে কে আর বেশি বোঝে? ওরা ছুটে চললো মরুদ্যানের দিকে।

শুধু মরুদ্যান নয় এটা। বেশ কিছু লোকেরও বসবাস এখানে। লোকগুলো ভালো। ওদের বিশ্রাম করতে বাধা দিলো না। পিপাসা মিটিয়ে নিজেরা পানি পান করলো কাফেলার সবাই, ওদের উট আর ঘোড়াগুলোকেও পানি খাইয়ে তাজা করে তুললো। বিদায়ের মুহূর্তে কথায় কথায় ওরা জানতে পারলো সেখানে এক দরবেশ বাস করেন। তিনি হযরত ঈসার আসমানীগ্রন্থ ইঞ্জিলের অনুসারী। হযরত মুসার তাওরাত সম্পর্কেও অনেক জানেন তিনি। এ কথা শুনে কারো কারো কৌতুহল জাগলো। দরবেশরা জ্ঞানের আধার। সৎ পরামর্শ পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। সুযোগ যখন এসেছে দেখা করা যাক না তার সঙ্গে। যদি কিছু উপদেশ পাওয়া যায় মন্দ কী! সবাই রাজি না হলেও কয়েকজন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না।



www.pathagar.com

দরবেশ বটে। চেহারায় সংযমের মালিন্য, কিন্তু ওর মধ্য থেকেই ভেসে উঠেছে এক রকম সৌম্য, উজ্জ্বল আভা। প্রত্যয়দীপ্ত চোখ, হাস্যময় মুখ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, 'আমাদের বাড়ি মক্কায়।'

–'আহ! কী সৌভাগ্য তোমাদের!' ওদের সৌভাগ্যে নিজেকেও যেন সৌভাগ্যবান মনে করলেন তিনি, তৃপ্তিতে চোখ বুঁজলেন।

মক্কার লোকেরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কিছু বুঝতে পারছে না ওরা।

চোখ খুললেন দরবেশ, তাকালেন আগন্তুকদের দিকে। ওদের অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন না। বললেন, 'আল্লাহ শিগগিরই একজন নবী পাঠাবেন। তার জন্ম হবে মক্কায়, তোমাদেরই মাঝে।'

নবী মানে আল্লাহর মনোনীত মানুষ, আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া তার কাজ। মানুষকে অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের দিকে, ধ্বংস থেকে উন্নতির দিকে, দোযখ থেকে বেহেস্তের দিকে পথ দেখানো তার দায়িত্ব। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে খতম করে সকলকে আল্লাহর আইনের অধীনে এনে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি মানুষকে সংগঠিত করেন। এসব কথা তারা জানে, তারা অনেক শুনেছে। দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ওদের কেউ কেউ আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাকে আমরা চিনবো কী করে?'

–'তার নাম হবে মুহাম্মদ। তিনি তোমাদের এক নতুন জীবনের সন্ধান দিবেন। সেই জীবন যাপন করলে দুনিয়াতে মিলবে শান্তি, আখেরাতে পাবে মুক্তি।'

ওরা মক্কায় ফিরে এসে দরবেশের এই ভবিষ্যদ্বাণীর গল্প শোনালো। কেউ তা বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। কবে সে মুহাম্মদের জন্ম হবে, কার ঘরে, কার গর্ভে, কে জানে! কালক্রমে লোকজন ভুলেই গেলো সে কথা।

বেশ কিছু কাল পর।

বিষণ্ন মনে বসে আছেন আমিনা। মক্কার কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের প্রধান আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রবধূ তিনি। ভাবছিলেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। বিয়ের মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী মারা যাবেন সে কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন! স্বামী আব্দুল্লাহ শুধু যে তারই প্রিয়জন ছিলেন তা-ই নয়, মক্কার সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আদর ও সম্মানের পাত্র। ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন তিনি। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াছরিব [মদিনা] শহরে পৌঁছে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমিনা ভাবছিলেন, এখন তার গর্ভে প্রিয় শিশু বেড়ে উঠছে। এতিম হয়েই সে জন্ম নিবে এই পৃথিবীর বুকে। এতো বড়ো দু:খ তিনি সইবেন কী করে! এইসব সাত-পাঁচ ভাবনার মাঝে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো তার পেটের মধ্যে থেকে যেন এক রাশ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। ইদানীং অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নও দেখছেন তিনি।



www.pathagar.com

কোনটা যে স্বপ্ন আর কোনটা যে বাস্তব তা-ও যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একদিন যেন তিনি শুনলেন, স্বপ্নের ভেতরে কেউ তাকে বলছে–'তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে। তার নাম হবে মুহাম্মদ।' এসব অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার তাকে অবাক করে, কিছু ভয়ও পান, কিন্তু কাউকে বলতে পারেন না।

কিছুদিন আগে হস্তিযুদ্ধ হয়ে গেছে। এ তো যুদ্ধ নয়, আল্লাহর কেরামতি। আল্লাহর ঘর কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিলো আফ্রিকার আবিসিনিয়ার বাদশা আবরাহা। সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলো। সে এক অদ্ভুত কাহিনী, রূপকথাকেও হার মানায়।

দুর্ধর্ষ বাদশা ছিল আবরাহা। একবার সে ইয়েমেন দখল করে নিলো। সে দেখলো প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে গোটা আরব জাহান থেকে লোকেরা মক্কায় যায়।

–'কী ব্যাপার? চারিদিক থেকে এতো সব লোক মক্কায় যায় কেন? কী আছে সেখানে?' বাদশা জানতে চাইলো।

খোঁজ নিয়ে তার সভাসদরা জানালো, মক্কায় একটা ঘর আছে, তার নাম কা'বা। সেটা আল্লাহর ঘর। নবী ইবরাহীম আর তার ছেলে নবী ইসমাইল এই ঘর তৈরি করেছেন। সেই থেকে গোটা আরব জাহানের লোকেরা পুণ্য লাভের আশায় তীর্থ করতে যায় সেখানে।

এ কথা শুনে আবরাহার খুব রাগ হলো। তার নিজের শহরের তুলনায় মক্কা লোকদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাবে এ তার সহ্য হলো না। সে সোনা, রুপা, মূল্যবান মার্বেল পাথর দিয়ে একটা উপাসনালয় বানালো। তারপর রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলো, এখন থেকে আর মক্কায় নয়, এখানে আসবে তীর্থ করতে।

কিন্তু কেউ শুনলো না তার কথা।

ভীষণ ক্ষেপে গেলো আবরাহা। সভাসদদের ডেকে বললো, 'বোঝা যাচ্ছে কা'বা অটুট থাকা পর্যন্ত আমার এখানে আসবে না কেউ।'

একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় জোগালো সভাসদরা, 'ঠিক বটে। কা'বা থাকতে এখানে কেউ আসবে না তা বোঝা গিয়েছে।'

–'তাহলে ধ্বংস করো কা'বা ঘর, গুঁড়িয়ে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও।'

সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো। বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে আবরাহা রওনা করলো মক্কা অভিমুখে।

আবরাহার অভিযানের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলো মক্কার লোকেরা। তারা যোদ্ধা জাতি হলে কী হবে, এ রকম বিশাল বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াবে কী করে! তাছাড়া আবরাহার সঙ্গে রয়েছে বিশাল হস্তিবাহিনী। হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েই তারা মারা যাবে। তারা ছুটলো তাদের প্রধান আব্দুল মুত্তালিবের কাছে।

হস্তীবাহিনী মক্কার অদূরে পৌঁছলে আব্দুল মুত্তালিব গেলেন বাদশার কাছে।

–'কী চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ, দম্ভভরা প্রশ্ন আবরাহার।



www.pathagar.com

আব্দুল মুত্তালিবের একপাল উট মাঠে চরছিলো, আবরাহার লোকেরা সেগুলো ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সে কথা বাদশাকে জানালেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমার উট আমি ফেরত চাই।'

এ কথা শুনে আবরাহা তো ভীষণ অবাক। সে বললো, 'আমি এসেছি কা'বা ধ্বংস করতে, যাকে তোমরা, তোমাদের পূর্বপুরুষরা, পবিত্র মনে করো, তার কথা না বলে তুমি কিনা বলছো কিছু উটের কথা!'

আব্দুল মুত্তালিব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'দেখ, এই উটগুলো আমার, আর এই কা'বার মালিক হলো গিয়ে আল্লাহ্, তার ঘর তিনিই রক্ষা করবেন। তুমি আমার উট আমাকে ফেরত দাও।' বাড়ি ফিরে তিনি লোকজনকে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বললেন।

পরদিন সকালে আবরাহা তার বাহিনীকে মক্কা আক্রমণের নির্দেশ দিলো। কিন্তু তার হাতির দল হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, কিছুতেই সামনে এগোয় না। অন্য যে কোনো দিকে তারা ঠিকই যায়, কিন্তু মক্কার দিকে এক পা-ও তোলে না। পিটিয়েও হাতিগুলোকে মক্কার দিকে নেয়া সম্ভব হলো না। তারপর কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আবাবিল পাখি ছুটে এলো, তাদের ঠোঁটে পাথরের টুকরা। সেই পাথর তারা ছুঁড়ে মারতে লাগলো আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর। এমনিতেই হাতির আচরণে তারা হত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো, পাখির পাথর-আক্রমণে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। যারা বাঁচলো তারা যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো। এভাবে আল্লাহ্ কা'বা ঘরকে রক্ষা করলেন।

খ্রীষ্টাব্দের ৫৭০ সালে এই ঘটনা ঘটে। সেই বছরই স্বামীকে হারালেন আমিনা। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মন খারাপ হলেও তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, গর্ভ ধারণ করা সত্ত্বেও তার শরীর যথেষ্ট সবল ও সতেজ, কী এক শক্তি যেন তিনি তার ভেতরে অনুভব করেন, তাতে পুলকিতও হন তিনি। তার এই অনুভবের কথা, অদ্ভুত সব স্বপ্নের কথা তিনি কাউকে বলতে পারেন না।

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার। ইয়াসরিবে এক ইহুদী ধর্মবেত্তা আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে অভিভূত হলেন। এর আগে এটিকে কখনো দেখেননি তিনি। নক্ষত্রটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণের পর তিনি নিশ্চিত হলেন, ধর্মগ্রন্থে যে মহামানবের শুভাগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এ তারই ইঙ্গিত। তাওরাত তাদের ধর্মগ্রন্থ। তিনি লোকদের ডেকে নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবীর জন্ম হয়েছে।'

ওই একই দিন কা'বা শরীফের পাশ দিয়ে এক ইহুদী ধর্মবেত্তা যাচ্ছিলেন। সেখানে বসে গল্প-গুজব করছিলো কুরাইশ নেতারা। তিনি তাদেরকে বললেন, 'একটু আগে কি কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনিই আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবী।'

সারা আরব জুড়ে এ-রকম অবাক-করা সব কাণ্ড ঘটলো সেদিন, যেদিন আমিনা এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের কাছে খবর গেলো, তার প্রিয় পুত্রবধূর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে এক পুত্রধন। কিছুদিন আগে ইহধাম ত্যাগ করা তার



www.pathagar.com

প্রিয়তম পুত্র আব্দুল্লাহর বংশধর। তিনি তখন কা'বা ঘরে বসে ছিলেন। পৌত্রের জন্মের খবরে ভীষণ খুশি হলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ ভাবতে লাগলেন কী নাম রাখা যায়। একের পর এক নানান নাম তার সামনে আসে, কিন্তু পছন্দ হয় না। এই ভাবে ছয়দিন পেরিয়ে গেলো। সপ্তম দিনে, কা'বা ঘরে শুয়ে ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব, স্বপ্নে দেখলেন, তাকে বলা হচ্ছে শিশুটির নাম হলো মুহাম্মদ। জেগে উঠে ভারি আশ্চর্য হলেন তিনি। যে-রকম নাম রাখতে তারা অভ্যস্ত এ নাম তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর অর্থ হলো 'প্রশংসিত', মানে সবাই যার প্রশংসা করে। চমৎকার নাম। পছন্দ হলো তার। এ নাম রাখায় আমিনাও খুব খুশি হলেন। তিনিও যে স্বপ্নে অনেক আগে থেকেই এই নামটাই শুনে আসছেন!

কুরাইশরা ভারি অবাক হলো। এ আবার কী ধরনের নাম! আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'চমৎকার নাম। আমি চাই দুনিয়ার মালিক আল্লাহ আর দুনিয়ার তাবৎ লোকের প্রশংসার পাত্র হোক আমার প্রিয় বংশধর।'

**পরের কথা**

আবদুল মুত্তালিবের প্রত্যাশা সর্বাংশে পূরণ হয়েছে। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে, আল্লাহর জীবনবিধান মানুষকে শিক্ষা দিয়ে ও তা প্রতিষ্ঠা করে, ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির পথ দেখিয়ে, তার বংশধর সবার প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন, ফেরেস্তারা, আর দুনিয়ার সকল মুসলমান অহরহ তাঁর নামে দরুদ পাঠ করে, তাঁর নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গে বলে–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর যে-সব অমুসলমান তাঁর সম্পর্কে জানে, তারাও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে। সত্যিই তিনি 'প্রশংসিত', আলোকিত আলো, যথার্থই তিনি মুহাম্মদ।

www.pathagar.com

# সাগর তলে মানিক জ্বলে

## মালিক ইমতিয়াজ

দিন যায়। মাস যায়। বছরও কেটে যায়। এমনি করে কেটে যায় কতটি কাল! রয়ে যায় কেবল স্মৃতির চিহ্ন। যে স্মৃতি মোছে না কখনও। হারায় না কখনও। বরং জ্বলতে থাকে সূর্যের কিরণের মতো।

হযরত আনাসও [রা] তেমনি এক ব্যক্তি। শুধু ব্যক্তি নন, ব্যক্তিরও অধিক–একজন মহান সাহাবী।

একবার এক দর্জি রাসূলকে [সা] খাবারের দাওয়াত দিল। আনাসও [রা] সাথে গেলেন। যবের রুটি এবং শুকনো গোশত ও লাউ-এর তরকারি উপস্থিত করা হলো।

আনাস [রা] দেখলেন, রাসূল [সা] বেছে বেছে লাউ খাচ্ছেন।

সেইদিন থেকে তিনিও লাউ খেতে শুরু করলেন। সেও বড় তৃপ্তির সাথে। ভালোবেসে।

আনাস [রা] বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে [সা] জিজ্ঞেস করলো: কিয়ামত কখন হবে?

তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন: তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?

লোকটি বললো: কিছুই না। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করি।

রাসূল [সা] বললেন: তুমি যাদের ভালোবাস তাদের সাথেই থাকবে।

আনাস [রা] বলেন: সেদিন থেকে আবু বকর [রা] ও উমার [রা]কে বেশি বেশি ভালোবাসি এবং আশা করি এই ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাঁদের সাথেই থাকবো।

কালিমা তাওহীদের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো নামায।

হযরত রাসূলে কারীম [সা] যে খুশু-খুজু ও আদবের সাথে নামায আদায় করতেন সাহাবীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করতেন।

বহু সাহাবীর নামায তো ছিল প্রায় রাসূলে [সা] পাকের নামাযের কাছাকাছি।

তবে রাসূলুল্লাহর [সা] নামাযের সাথে আনাসের [রা] নামাযের সাদৃশ্য ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

একবার তো হযরত আবু হুরাইরা [রা] আনাস [রা] কে নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন, আমি ইবন উম্মে সুলাইমের নামায অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর [সা] নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ আর কারও নামায দেখিনি।

নামায ছাড়াও রাসূলুল্লাহর [সা] প্রতিটি কথা ও কাজ সাহাবায়ে কিরামের সামনে ছিল।



www.pathagar.com

হযরত আনাস [রা] দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর [সা] সার্বক্ষণিক খাদেম ছিলেন।
এই সময়কালে রাসূলুল্লাহর [সা] কোন কাজ আনাসের নিকট গোপন থাকতে পারে না।
রাসূল [সা] যা কিছু বলতেন অথবা আমলের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত করতেন তার সবই আনাস স্মৃতিতে ধরে রাখতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করতেন।
একবার খলিফার আমন্ত্রণে তিনি দামেশকে গেলেন। ফেরার পথে আইনুত তামার নামক স্থানে যাত্রা বিরতির ইচ্ছা করলেন। ছাত্র ও ভক্তদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেল।
তারা নির্ধারিত দিনে উক্ত স্থানে সমবেত হলো, লোকালয়ের বাইরে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্য দিয়ে তাঁর উট এগিয়ে আসছিল।
তখন ছিল নামাযের সময়। লোকেরা দেখলো, তিনি উটের পিঠে নামাযরত; কিন্তু উটটি কিবলামুখী নয়।
ছাত্ররা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন: আপনি এ কেমনভাবে নামায আদায় করছিলেন?
হযরত আনাস [রা] বললেন: আমি যদি রাসূলুল্লাহকে [সা] এভাবে নামায আদায় করতে না দেখতাম, তাহলে কক্ষণও আমি এভাবে আদায় করতাম না।
একবার ইবরাহীম ইবন রাবীয়া হযরত আনাসের [রা] নিকট আসলেন। হযরত আনাস [রা] একখানা কাপড়ের একপাশ পরে অন্য পাশ গায়ে জড়িয়ে নামাযে মশগুল ছিলেন।
নামায শেষ হলে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন: আপনি এভাবে এক কাপড়ে নামায পড়েন?
আনাস [রা] বললেন: হাঁ, আমি এভাবে রাসূলকে [সা] নামায পড়তে দেখেছিলাম।
উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে কারীম [সা] জীবনের সর্বশেষ নামায– যে নামায হযরত আবু বকরের [রা] পিছনে পড়েছিলেন, তা এক কাপড়েই ছিল।
হযরত রাসূলে কারীমের [সা] পবিত্র জীবনের প্রতিটি আচরণ ও পদক্ষেপ ছিল হযরত আনাসের [রা] জীবন পথের দিশারী।
ফরজ ছাড়াও ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহেও রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি ছোট-বড় সকলকে সালাম করতেন। সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলতেন, আমাকে রাসূল [সা] বলেছেন: আনাস তুমি যখন ঘর থেকে বের হবে, তারপর যার সাথে দেখা হবে, সকলকে সালাম করবে। কারণ, তুমি জান না তোমার মৃত্যু কখন আসবে।
প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানি প্রয়োজন। হযরত আনাস [রা] ছিলেন একজন বিত্তশালী রয়িস বা নেতা। যতগুলি পশু ইচ্ছা, কুরবানি করতে পারতেন।
কিন্তু খায়রুল কুরূন–সর্বোত্তম যুগের লোকদের নিকট নাম-কামের চেয়ে রাসূলের [সা] অনুসরণ করা ছিল সব কিছুর উর্ধ্বে। সে যুগের লোকেরা খ্যাতির জন্য নয়; বরং সওয়াবের জন্যই কুরবানি করতেন। হযরত রাসূলে কারীম [সা] দুইটি পশু কুরবানি করতেন, এই জন্য হযরত আনাসও [রা] দুইটিই করতেন।
উমাইয়্যা শাসন আমলে হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয [রা] যুবরাজ থাকাকালে একবার মদিনায় গভর্ণর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।
যুবরাজ যেহেতু শাহী খান্দানের সদস্য ছিলেন, এ কারণে সাধারণ মানুষের জীবনের অনেক কিছুই তাঁর জানা ছিল না। সে যুগের প্রচলন অনুযায়ী নিজেই নামাযের ইমামতি করতেন এবং মাঝে মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটিও হয়ে যেত। হযরত আনাস [রা] প্রায়ই তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন।



www.pathagar.com

তিনি একবার হযরত আনাসকে [রা] বললেন, আপনি এভাবে আমার বিরোধিতা করেন কেন?

হযরত আনাস [রা] বললেন: আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে [সা] নামায পড়তে দেখেছি আপনি যদি সেইভাবে নামায পড়ান তাহলে আমি সন্তুষ্ট হবো। অন্যথায় আপনার পিছনে নামায আদায় করবো না।

হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয ছিলেন বুদ্ধিমান ও সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরত আনাসের কথায় তিনি প্রভাবিত হলেন। তিনি আনাস [রা]কে উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি এমন সুন্দর নামায পড়াতে লাগলেন যে, খোদ আনাসই [রা] বলতে লাগলেন, এই ছেলের নামাযের চেয়ে আর কারও নামায রাসূলুল্লাহর [সা] নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

একবার খলীফা আবদুল মালিক হযরত আনাসসহ আরও চল্লিশজন আনসারী ব্যক্তিকে দামেশ্‌কে ডেকে পাঠান।

সেখান থেকে ফেরার পথে ফাজ্জুন নামক স্থানে পৌঁছলে আসর নামাযের সময় হয়ে যায়। যেহেতু সফর তখনও শেষ হয়নি, এই করাণে হযরত আনাস [রা] দুই রাকায়াত নামায পড়ান। তবে কিছু লোক আরও দুই রাকায়াত পড়ে চার রাকায়াত পুরো করেন।

একথা হযরত আনাস [রা] জানতে পেরে দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আল্লাহ যখন কসরের অনুমতি দিয়েছেন তখন এ সুবিধা গ্রহণ করবে না কেন?

আমি রাসূলকে [সা] বলতে শুনেছি, এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ দীনের ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে। আসলে তারা দীনের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে থাকবে গাফিল।

সত্যকথা বলা এবং সত্যকে পছন্দ করা ছিল হযরত আনাসের চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

খিলাফতে রাশেদার প্রথম দুই খলীফার পর এমন অনেক যুবক সরকারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হণ যারা ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। এজন্য তাদের অনেক কাজই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হতো। যে সাহাবায়ে কিরাম জীবনের বিনিময়ে ইসলাম খরীদ করেছিলেন তাঁরা এটা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা ভয়–ভীতির উর্ধ্বে উঠে সব সময় সত্য কথাটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন।

হযরত আনাস [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] ওফাতের পর দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু স্বৈরাচারী শাসকের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন যাদের তিনি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে তাদের সতর্ক করে দিতেন।

ইয়াযীদের সময়ে আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন ইরাকের গভর্ণর। তাঁর নির্দেশে হযরত ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা সামনে আনা হলে তিনি হাতের ছড়িটি দিয়ে হযরত হুসাইনের চোখে টোকা দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অশালীন কটাক্ষ করেন। হযরত



www.pathagar.com

আনাস [রা] নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন: এই চেহারা রাসূলুল্লাহর [সা] চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উমাইয়্যা রাজবংশের বিখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস–সাকাফী নিজের ছেলেকে বসরার কাজী নিয়োগ করতে চায়। হাদীস শরীফে বিচারক অথবা আমীরের পদের আকাঙ্ক্ষী হবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

হযরত আনাস [রা] হাজ্জাজের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বলেন: এমনটি করতে রাসূল [সা] নিষেধ করেছেন।

উমাইয়্যা শাসকদের আর এক আমীর হাকাম ইবন আইউব। তাঁর নৃশংসতা মানুষের সীমা অতিক্রম করে জীব-জন্তু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

একবার হযরত আনাস [রা] তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, মুরগীর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হচ্ছে। তীর লাগলে মুরগীটি ছটফট করছে। হযরত আনাস [রা] এ দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং মানুষকে তাদের এ কাজের জন্য ধিক্কার দিলেন।

একবার কিছু লোক জোহরের নামায আদায় করে হযরত আনাসের সাক্ষাতের জন্য আসে। তিনি তখন চাকরের নিকট অজুর পানি চাইলেন। লোকেরা জানতে চাইলো, এ কোন নামাযের প্রস্তুতি? বললেন: আসর নামাযের। এক ব্যক্তি বললো : আমরা তো এখনই জোহর পড়ে এলাম।

হযরত আনাস [রা] আমীর উমরাহের দীনের প্রতি উদাসীনতা এবং জনগণের দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন।

তিনি বললেন: এ তো হবে মুনাফিকদের নামায।

মানুষ বেকার বসে থাকবে, তবুও নামাযের জন্য উঠবে না। যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকবে তখন খুব তাড়াতাড়ি মোরগের মত চারটি ঠোকর মেরে দেবে। সেই ঠোকরে আল্লাহর স্মরণ থাকবে অতি অল্পই।

প্রকৃত দীনদারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ দান করা। আর এজন্যই কুরআন মজীদে উম্মাতে মুসলিমাকে সর্বোত্তম উম্মাত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আনাসের মধ্যে এই গুণটির বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল।

একবার উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের একটি মজলিসে হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। উবাইদুল্লাহ এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। একথা হযরত আনাসের [রা] কানে গেল। তিনি সরাসরি উবাইদুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন: তোমার এখানে কি হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল? বললেন: হাঁ। কেন, রাসূল [সা] কি এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

হযরত আনাস [রা] হাউজে কাওসার সম্পর্কে রাসূলের [সা] হাদীস তাঁকে শুনিয়ে ফিরে আসেন। হযরত মুসয়াব ইবন উমাইর [রা] একজন আনসারী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট পেলেন।

এই অপরাধের জন্য তিনি লোকটিকে পাকড়াও করার চিন্তা করলেন।

লোকেরা হযরত আনাসকে কথাটি জানালেন।



www.pathagar.com

তিনি সোজা মুসয়াবের কাছে গিয়ে বললেন: রাসূলুল্লাহ [সা] আনসারদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্য আমীরদের অসীয়াত করেছেন।

এই হাদীস শুনামাত্র মুসয়াব ইবন উমাইর [রা] খাট থেকে নিচে নেমে এসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলেন: রাসূলুল্লাহর [সা] আদেশের স্থান আমার চোখের ওপর। আমি লোকটিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

সাবিত আন–নাবানী বলেন: একদিন আমি বসরার যাবিয়া নামক স্থানে আনাসের সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় আজান শোনা গেল। সাথে সাথে আনাস [রা] মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলেন এবং এভাবে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: নামাযের জন্য আমার পদক্ষেপ যাতে বেশী হয়, সেই জন্য।

হযরত আনাস [রা] ইলম হাসিলের চেয়ে অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমলের ওপর বেশি জোর দিতেন। তিনি বলতেন: যত ইচ্ছা জ্ঞান হাসিল কর। তবে আল্লাহর কসম, আমল না করলে সে সব জ্ঞানের প্রতিদান দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলতেন: প্রকৃত আলেমের কাজ বুঝা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আর মূর্খদের কাজ শুধু বর্ণনা করা।

তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাতের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন।

এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল [সা] বলেছেন: যে আমার সুন্নাত ছেড়ে দেবে সে আমার উম্মাতের কেউ নয়।

তিনি আরও বলেছেন: যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত।

হযরত আনাস [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলেন, যেমন: জুতো, একটি চাদর, একটি পিয়ালা, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি ইত্যাদি।

আনাস [রা] বলতেন: আমার মা উম্মু সুলাইম মৃত্যুকালে আমার জন্য রেখে যান রাসূলুল্লাহর [সা] একটি চাদর, একটি পিয়ালা যাতে তিনি পানি পান করতেন, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি এবং একটি শীলা যার ওপর আমার মা রাসূলুল্লাহর [সা] ঘাম মিশিয়ে সুগন্ধি পিষতেন।

এভাবে হযরত আনাস ইবন মালিক [রা] সম্পর্কে টুকরো টুকরো তথ্য হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা খুবই চমকপ্রদ এবং মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকর। শুধু কল্যাণকরই নয়, শিক্ষনীয় বটে।

হযরত আনাস [রা] মূলত ছিলেন একজন বড়ো মাপের সাহাবী। তিনি ছিলেন রাসূলের [সা] আদর্শ ও ভালোবাসায় উজ্জীবিত। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো উদ্ভাসিত। যেন নক্ষত্র নয়, প্লাবিত জোসনা। কিংবা তার চেয়েও অধিক কিছু। যে আলো ছড়িয়ে পড়তো জমিনে। যে আলো পৌঁছে যেত সাগরের তলদেশ। যেন সাগর তলে মানিক জ্বলে!

রাসূলের [সা] প্রত্যক্ষ সান্বিধ্যে থেকে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। রাসূলের [সা] আদর্শই ছিল তাঁর আদর্শ। সেই আদর্শের অনুকরণে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। কালে কালে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন এক অনুকরণীয় সাহাবী।



www.pathagar.com

# চাঁদ হাসে ঐ আকাশে

## রিয়াজ পারভেজ

নবী মুহাম্মদ [সা]!

কী ভীষণ এক আলোর জ্যোতি! আলোর ওপরে আলো! যে আলোয় আলোকিত মহাবিশ্ব! আলোকিত প্রতিটি মুমিনের হৃদয়! আর আলোর আবাবিল অর্থাৎ সাহাবীগণ! তাঁরা ছিলেন প্রদীপ্ত সূর্যকে ঘিরে। যেমন থাকে সূর্যের চারপাশে অগণিত নক্ষত্র। তেমনি এক নক্ষত্রের নাম–মুয়াজ [রা]।

হিজরী নবম সনে হযরত রাসূলে কারীম [সা] তাবুক অভিযান শেষ করে সবে মাত্র ফিরেছেন। এমন সময় রমজান মাসে ইয়ামনের হিমযার গোত্রের শাসকের দূত মদিনায় খবর নিয়ে আসে যে, ইয়ামনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ খবর পেয়ে রাসূল [সা] সেখানকার আমীর হিসাবে মুয়াজ ইবন জাবালকে মনোনীত করেন।

আমীর মনোনীত হওয়ার পূর্বে হযরত মুয়াজের [রা] সকল সহায় সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো। হযরত জাবির ইবন আবদিল্লাহ্ বলেন : চেহারা-সুরত, স্বভাব-চরিত্র ও দানশীলতার দিক দিয়ে মুয়াজ [রা] ছিলেন সর্বোত্তম লোকদের অন্যতম।

দরায হস্তের কারণে তিনি প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাওনাদাররা তাগাদা দিতে শুরু করলে কিছুদিন তিনি বাড়িতে লুকিয়ে থাকেন।

তারা তাদের পাওনা আদায় করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করলো।

রাসূল [সা] মুয়াজকে [রা] ডাকলেন। পাওনাদার হাজির হলো। তাঁরা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুয়াজের [রা] নিকট থেকে আমাদের পাওনা আদায় করে দিন। রাসূল [সা] মুয়াজের [রা] দুর্দশা দেখে পাওনাদারদের বললেন : যে তার পাওনা মাফ করে দেবে আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। রাসূলুল্লাহর [সা] এ কথার পর কিছু পাওনাদার তাদের দাবী ছেড়ে দেয়। তবে অনেকে দাবী ছাড়তে নারাজি প্রকাশ করে।

তখন রাসূল [সা] বললেন : মুয়াজ, তুমি ধৈর্য ধর।

তারপর তিনি মুয়াজের [রা] সকল সম্পদ পাওনাদারদের বললেন : এর অতিরিক্ত তোমরা পাবে না, এই গুলিই নিয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহ [সা] দরবার থেকে হযরত মুয়াজ [রা] রিক্ত হস্তে বনু সালামার দিকে ফিরে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি বললো : আবু আবদির রহমান, তুমি রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট কিছু সাহায্য চাইলে না কেন?



www.pathagar.com

আজ তো তুমি একেবারে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছ।
মুয়াজ [রা] বললেন : চাওয়া আমার স্বভাব নয়।
মুয়াজের [রা] কথা রাসূলুল্লাহর [সা] স্মরণ ছিল।
একদিন পর তিনি মুয়াজকে [রা] ডাকলেন এবং তাঁকে ইয়ামনে আমীর হিসাবে নিযুক্তির কথা জানিয়ে বললেন : আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।
যদিও হযরত মুয়াজের [রা] আমীর হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর [সা] পূর্ণ আস্থা ছিল, তবুও তাঁকে ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে একটি পরীক্ষা নেওয়া উচিত মনে করলেন। তিনি মুয়াজকে [রা] ডেকে প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, তুমি ফায়সালা করবে কিভাবে?
–কুরআনের দ্বারা।
–যদি এমন কোন বিষয় আসে যার সমাধান কুরআনে না পাও, তখন কি করবে?
–আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের দ্বারা ফায়সালা করবো।
–যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হও যার সমাধান কুরআন অথবা সুন্নাতে পাচ্ছ না, তখন কি করবে?
–আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো।
হযরত মুয়াজ [রা] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর জবাবে রাসূল [সা] সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের উম্মতকে এমন জিনিসের তাওফীক বা ক্ষমতা দান করেছেন যা তাঁর রাসূলের পছন্দ।
মুয়াজের [রা] পরীক্ষা শেষ করে রাসূল [সা] ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্য একটি পত্র লেখেন। তাতে হযরত মুয়াজের [রা] স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লেখেন : ইন্নি বায়াস্তু লাকুম খায়রা আহলী–আমি আমার সর্বোত্তম আহল বা পরিজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম।
তিনি আরও লিখলেন, তোমরা মুয়াজ [রা] ও অন্য লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাদাকা ও জিযিয়ার অর্থ তার নিকট জমা করবে। আমি মুয়াজ ইবন জাবালকে ইয়ামনে বসবাসরত সকলের ওপর আমীর নিয়োগ করছি।
তাকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং এমন যেন না হয়, সে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।
সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হযরত মুয়াজ [রা] গেলেন রাসূলুল্লাহর [সা] খিদমতে। সেখানে আরও লোক ছিল। হযরত রাসূলে কারীম [সা] তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন।
মুয়াজ [রা] উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন, আর তাঁর পাশে রাসূল [সা] পায়ে হেঁটে চলছিলেন। দুই জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছিল। রাসূল [সা] বললেন : মুয়াজ তোমার দায়িত্ব অনেক। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছি।
বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রাসূল [সা] বললেন : সম্ভবত তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না।এরপর তুমি মদিনায় ফিরে আমার স্থলে আমার কবর ও মসজিদ যিয়ারত করবে।



www.pathagar.com

সাথে সাথে মুয়াজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূল [সা] বললেনঃ কেঁদো না। কান্না শয়তানী কাজ। যাও আল্লাহ্ তোমাকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন : একথা বলে রাসূল [সা] মুয়াজকে [রা] ছেড়ে দেন।

মুয়াজ অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মদিনার দিকে তাকিয়ে বলেন :

মুত্তাকীরাই আমার নিকটতম মানুষ–তা তারা যে কেউ হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন।

হযরত মুয়াজ [রা] ইয়ামনে মাত্র দুই বছর ছিলেন।

হিজরী নবম সনে আমীরের দায়িত্ব নিয়ে ইয়ামনে যান এবং হিজরী একাদশ সনে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় মদিনায় ফিরে আসেন।

হযরত মুয়াজের [রা] প্রতি রাসূলুল্লাহর [সা] স্নেহের এত আধিক্য ছিল যে, তিনি নিজে কোন প্রশ্ন না করলে রাসূল [সা] বলতেন, তুমি একাকী পেয়েও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?

একবার মুয়াজ [রা] রাসূলুল্লাহ [সা] সাথে খচ্চরের ওপর সাওয়ার ছিলেন। রাসূল [সা] চাবুক দিয়ে খচ্চরের পিঠে মৃদু আঘাত করে বলেন : তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি?

মুয়াজ [রা] বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

রাসূল [সা] বললেন : বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং শিরক থেকে বিরত থাকবে।

কিছুদূর যাওয়ার পর আবার জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা বলতে পার, আল্লাহর নিকট বান্দার হক বা অধিকার কি?

মুয়াজ [রা] বললেন : এ ব্যাপারে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। রাসূল [সা] বললেন :

তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এভাবে হযরত মুয়াজ [রা] সর্বদা রাসূলুল্লাহর [সা] স্নেহ ও আদর লাভে ধন্য হয়েছেন। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ রাসূলাল্লাহর [সা] নিকট শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছেন।

একবার তো দরজায় অপেক্ষমান দেখতে পেয়ে রাসূল [সা] তাঁকে একটি জিনিস শিখিয়ে দিলেন। আর একবার বললেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজার কথা বলে দেব?

তিনি বললেন : হাঁ।

ইরশাদ হল : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করবে।

একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] সঙ্গী ছিলেন। একদিন সকালে যখন সৈন্যরা লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহ [সা] কাছে বসা। তিনি আবদার জানালেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে।

রাসূল [সা] বললেন : তুমি একটা কঠিন বিষয় জানতে চেয়েছ। তবে আল্লাহ যাকে তাওফীক বা সমার্থ দান করেন তার জন্য সহজ।

শিরক করবে না, ইবাদাত করবে, নামায আদায় করবে, যাকাত দান করবে, রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং হজ্জ আদায় করবে।



www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন : কল্যাণের কয়েকটি দ্বার আছে। আমি তোমাকে বলছি, শোন সাওম– যা ঢালের কাজ করে, সাদাকা–যা পাপের আগুনকে পানির মত নিভিয়ে দেয় এবং যে নামায রাতের বিভিন্ন অংশে আদায় করা যায়।
এরপর তিনি নীচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।
তিনি আরও বলেন : ইসলামের মাথা, খুঁটি ও চূড়ার কথা বলছি। মাথা ও খুঁটি হচ্ছে নামায এবং চূড়া হচ্ছে জিহাদ।
তারপর বললেন : এইসব জিনিসের মূল স্পর্শ করে বলেন, একে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।
মুয়াজ [রা] প্রশ্ন করলেন : এই যে আমরা যা কিছু বলি, তার সব কিছুরই কি জবাবদিহি করতে হবে?
বললেন : মুয়াজ রাসূল তোমার মার সর্বনাশ হোক!
অনেকে শুধু এর জন্য জাহান্নামে যাবে।
একবার তো রাসূল [সা] মুয়াজকে [রা] দশটি বিষয়ের অসীয়াত করলেন এগুলো হল:
১. শিরক করবে না। তার জন্য কেউ যদি তোমাকে হত্যা করে অথবা আগুনে পুড়িয়েও মারে, তবুও না।
২. মাতা–পিতাকে কষ্ট দেবে না। তারা যদি তোমাকে তোমার সন্তান–সন্ততি ও বিষয়-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তবুও।
৩. ফরজ নামায ইচ্ছাকৃতভাবে কক্ষণও তরক করবে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে আল্লাহ তার জিম্মাদারী থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন।
৪. মদ পান করবে না। কারণ, এ কাজটি সকল অশ্লীলতার মূল।
৫. পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। পাপাচারে লিপ্ত হবে না। পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ বৈধ হয়ে যায়।
৬. জিহাদের ময়দান থেকে পালাবে না। যদি সকল সৈন্য রক্তরঞ্জিত ও ধুলিমলিন হয়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তবুও না।
৭. মহামারি আকারে কোন রোগ–ব্যাধি দেখা দিলে অটল থাকবে।
৮. নিজের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।
৯. তাদেরকে সর্বদা আদাব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে।
১০. তাদেরকে খাওফে খোদা শিক্ষা দেবে।
আল্লাহর প্রতি গভীর মুহাব্বত ও ভালোবাসা, তাঁর ইতায়াত ও আনুগত্য, ইবাদাত ও বন্দেগী এবং তাঁর ওপর তাওয়াককুল ও নির্ভরতা হচ্ছে একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট ও পরিচয়।
হযরত মুয়াজের [রা] মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপ লাভ করে। গভীর রাতে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন: হে আল্লাহ! এখন সকল চক্ষু নিদ্রিত। কিন্তু তুমি চিরজাগ্রত, চিরঞ্জীব।



www.pathagar.com

হে আল্লাহ!

জান্নাতের দিকে আমার যাত্রা বড় মন্থর এবং জাহান্নাম থেকে পলায়ন বড় দুর্বল।

তুমি আমার জন্য তোমার কাছে একটি হিদায়াত নির্দিষ্ট রাখ যা কিয়ামতের দিন আমি লাভ করতে পারি।

তিনি যে কত বড় আল্লাহনির্ভর লোক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমওয়াসের মহামারির সময়।

হযরত আমর ইবনুল আস যখন সৈন্যদের স্থান ত্যাগের পরামর্শ দেন তখন তাঁর পরামর্শকে তাওককুলের পরিপন্থী মনে করে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান।

শেষ পর্যন্ত তাওয়াককুলের ওপর অটল থেকেই সেই মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন।

একদিন হযরত উমার [রা] দেখলেন, মুয়াজ কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন! তুমি কাঁদছো কেন?

মুয়াজ [রা] বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি বিন্দুমাত্র রিয়াও এক ধরণের শিরক। আর আত্মগোপনকারী–মুত্তাকীরাই হচ্ছে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা।

তাঁরা অদৃশ্য হলে হারায় না এবং দৃশ্যমান হলে চেনা যায় না।

তাঁরাই হলেন হিদায়াতের ইমাম ও ইলমের মশাল বা প্রদীপ।

হযরত মুয়াজ [রা]!

তিনি ধন্য হয়েছিলেন রাসূলের [সা] ভালোবাসা পেয়ে। তিনিও রাসূলকে [সা] ভালো বাসতেন প্রাণ দিয়ে।রাসূলের [সা] আদর্শে গড়েছিলেন নিজের এক আলোকিত জীবন।

আলো তো নয় শুধু, যেন পূর্ণিমার চাঁদের হাসি। যে হাসি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে।

যে চাঁদ শুধু পৃথিবীতেই নয় হাসতে থাকে অবিরত আকাশের সীমাহীন-সীমানায়।

আমরা সেই চাঁদের হাসি যেন দেখতে পাই পৃথিবী এবং আকাশে। আমাদেরও তেমনি আলোকিত জীবন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

চেষ্টা করলে আমরাও ইনশাআল্লাহ পেরে উঠবো। সেটাই আমাদের জন্য একান্ত জরুরী। একান্ত কাম্য।



www.pathagar.com

# ইসলামী চলচ্চিত্র আন্দোলন

## শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

১৬৪৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী 'অ্যাথানাসিউস্ কিরখের' আবিষ্কার করেছিলেন 'ম্যাজিক লণ্ঠন'। স্বচ্ছ একটা মাধ্যমের ওপর ছবি এঁকে সেটাকে লেন্সের ভিতর দিয়ে পর্দায় প্রতিফলিত করাই এই ছবি প্রদর্শনের আসল কায়দা। ক্যামেরা বা ফিল্ম আবিষ্কার করার আগে এভাবেই প্রজেক্টর মেশিনের আদি সংস্করণ শুরু হয়। এরপর সমগ্র ইউরোপ জুড়ে নানাভাবে গবেষণা হয়। সে ইতিহাসের অবতারণা এখানে অবান্তর। শেষাবধি ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে ফরাসি দু'ভাই অগুস্ত লুমিয়ের [১৮৬২-১৯৫৪] এবং লুই লুমিয়ের [১৮৬৪-১৯৪৮] আর্কল্যাম্প প্রজেক্টর দিয়ে প্যারিসেই প্রথম নিজেদের তৈরি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এরপর একে একে বৃটেন, রাশিয়া ও আমেরিকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর প্রায় ছয় মাস পরে ১৮৯৬ সালের ১৭ মে মুম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে লুমিয়ের গ্রুপের উদ্যোগে উপমহাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ১৮৯৬ সালে ১৪ জুলাই মুম্বাইয়ের নভেলটি থিয়েটারে নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখানো শুরু হয়।

এই হলো উপমহাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। চলচ্চিত্র আবিষ্কার এবং প্রদর্শনীর সময়টাতে উপমহাদেশে [সমগ্র বিশ্বেও] মুসলিম জনগোষ্ঠির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। খ্রিষ্টান ও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের শাসন, হিন্দুদের উপর খ্রিষ্টান শাসকের পক্ষপাতিত্ব এবং সর্বস্তরে শোষণ, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। মুসলিম জাতি তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আত্মসমৃদ্ধির দরজায় তার কোনোভাবে উঁকি দেবার সুযোগ ছিল না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার গবেষণা থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠি সরে গিয়ে বিভিন্ন পীর সাহেবের খানকায় গিয়ে শিষ্যত্বের চাদরে আত্মগোপন করে। তখন যত পীর ততভাগে মুসলিম জনগোষ্ঠি বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অথচ এই সময়টিতে উপমহাদেশের হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি তাদের বৈষয়িক এবং মানসিক সংস্কৃতির ব্যাপক উত্তরণ ঘটায়।



www.pathagar.com

চলচ্চিত্র ১৯২৭ সাল অবধি ছিল নির্বাক। ১৯২৭ সাল থেকে চলচ্চিত্রে প্রথম শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতির শুরু হয়। নতুন মাত্রা পেয়ে চলচ্চিত্র একক, বৃহত্তম বাণিজ্যিক বিনোদন মাধ্যম হিসেবে উপমহাদেশে ঠাঁই করে নেয় এবং দর্শকদের সামনে বিনোদনের বিপুল উপাদান নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হাজির হতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজা, রাজপুত্র এবং জমিদার শ্রেণী চলচ্চিত্র ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করতে থাকে। তারা গড়ে তোলে স্টুডিও, ল্যাবরেটোরি, স্যুটিং স্পট। নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয় উপমহাদেশের প্রায় সব শহরে।

অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত, দলছাড়া, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত অথচ প্রতিভাদীপ্ত মুসলিম সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, পরিচালক এবং অভিনয় শিল্পীরাও তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য, মেধা, প্রতিভা, চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে অনৈসলামিক পন্থায় এবং শিরক ও জাহেলিয়াতের চূড়ান্ত সব সৃজনশীলতার জোগান দিতে থাকে, সমৃদ্ধ করতে থাকে জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী উপমহাদেশের একমাত্র বিনোদন মাধ্যম চলচ্চিত্র শিল্পকে। এক পর্যায়ে মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগত গড়ে ওঠে–এম, বশির মাহমুদ সাহিত্যরত্ন, রাজা মেহেদী আলী খাঁন, জানেসার আখতার, রফিক গজনবী, শাকিল বাদাউনি, নৌশাদ, ইসমাত চুগতাই, আনোয়ার কামাল পাশা, আখতার শিরানী, মেহবুব খান, কে আসিফ, খাজা আহম্মদ আব্বাস, কামাল আমরোহীদের মত মুসলিমদের অমুসলিমপন্থায় জ্ঞানের ব্যবহারে এবং সহযোগিতায়।

মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতিভাদীপ্ত কবি-সাহিত্যিকরা তাদের নিজস্ব জীবন বিধান তথা পবিত্র কোরআন, হাদিস, সুন্নাহ্ এবং তাদের আপন সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে জাহেলিয়াত এবং শিরকবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। ভুলে গেছে জাতি হিসেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে।

অন্যদিকে পীর সাহেবরা একজনের মুরীদ হলে আর এক পীরের মুরীদ হওয়া জায়েজ নয় এই ফতোয়া জারী করে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠিকে বিভক্ত করে বিভিন্ন পীরের দলে এবং তাদের খানকায় আবদ্ধ করে রেখেছে। এই ফাঁকে ওই সব মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা অসংগঠিত অবস্থায় তাদের প্রতিভা উজাড় করে দিয়ে শক্ত করেছে শিরক ও জাহেলিয়াতের শিকড়। শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনু, হাতেম-তাঈ, সোহরাব-রুস্তম–এর গায়ে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার অবৈধ-অশ্লীল প্রেমের রঙ ছড়িয়ে সে সব কাহিনীকে বিভিন্ন শাখায় বিচিত্র সব উপাদানে ভরপুর করে একের পর এক সব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে সংগীত। যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে অবৈধ প্রেম উদ্বুদ্ধকরণে এবং অবৈধ সম্পর্ক উৎসাহিতকরণে।

উক্ত দুটি মূল লক্ষ্যকে পুঁজি করে হাজার হাজার চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গান তৈরি হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান। সব চলচ্চিত্র ও সংগীত উৎসাহিত ও সমর্থন করেছে হিন্দু পৌরাণিক প্রেম-কাহিনীর মূল বিষয় অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্ক।



www.pathagar.com

সমগ্র মুসলিম জাতি তাদের মন-মস্তিষ্কে এবং চিন্তায়-চরিত্রে ঐ একই ভাবধারার প্রলেপ মেখে বিভ্রান্ত হয়েছে। এইভাবে মুসলিম তরুণদের ও প্রতিভাবানদের চিন্তা-চেতনা থেকে সৃজনশীলতা লুপ্ত হয়েছে। আর চলচ্চিত্র নামক আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানকে এবং তার বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম সিংহদরজাটি চিরতরে তালাবদ্ধ করে রেখেছে।

এমতাবস্থায় একটা বিশাল মিথ্যার পাথর চাপা দেবার প্রচেষ্টা চলেছে যা আজও চলছে, তাহলো এই যে, ইসলাম মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটতে দেয় না বরং নানান বাধ্যবাধকতা আরোপ করে ইসলাম মুসলিম জাতির মননশীলতা, চিন্তা-ভাবনা এবং চেতনাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। এই অপবাদ আরোপের আরো কারণ হলো, চলচ্চিত্রের সেই উৎকর্ষের যুগে, পৃথিবীর বেশ কিছু উন্নত দেশে চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক ব্যাপক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং সফল হলো। কিন্তু সেখানে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বলে দাবি করে তারা অর্থাৎ মুসলিমরাই অনুপস্থিত।

চলচ্চিত্র যে রীতিতে চলে আসছিল সেই রীতি সমাজ বিধ্বংসী ছিল বলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে ফ্রান্সেই। ১৯২৩ সালে সেই নির্বাক যুগে। আন্দোলনটি ১৯৩২ সাল অবধি চলে। এই আন্দোলনটির নাম ছিল "আভা গার্দ" আন্দোলন। এই আন্দোলনের দুটি দিক ছিল–এক. চলচ্চিত্রের প্রথাগত রীতি থেকে বেরিয়ে আসা। দুই. ফটোগ্রাফির দৃষ্টিকোণে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা। অর্থাৎ যে ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্রের কাহিনী তৈরি করা হয় তাকে বদলে দিয়ে সমাজ হিতৈষী বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করা এবং সঙ্গত কারণেই তখন ক্যামেরার ফ্রেমিং–কম্পোজিশান পরিবর্তন করা দরকার, সেটা করা। আর আসলেই এতে চলচ্চিত্রে নতুন বিষয় ও ভাবধারার সৃষ্টি হলো। ১৯৩২ সালের পর চলচ্চিত্রে আরো পরিবর্তন সূচিত করার জন্য "নিও-রিয়ালিজম"-এর উদ্ভব হয়। এই আন্দোলনকারীদের শ্লোগান ছিল, "Take the camera out into the streets." এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কট্টর বাস্তবতাকে সেলুলয়েডে তুলে ধরা। মানুষের প্রাত্যহিক উত্থান-পতন, মানবিক মূল্যবোধ, মানুষের চেতনার জাগ্রত প্রকাশ ইত্যাদি।

এরপর বৃটেনে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। "ফ্রি সিনেমা"। তাদের বক্তব্য ছিল, 'আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের বস্তুপুঞ্জের অবিকল অনড় প্রতিচ্ছবিটাই বড় কথা নয়, তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রয়োজন মতো জীবনের সত্য খুঁজে বের করতে হবে। ১৯৫৬ সালে এই 'ফ্রি সিনেমা' আন্দোলন শুরু হয়। ততদিনে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামের মুসলিম দেশ স্বাধীন হয়েছে। এরও আগে সাদাকালো ছবিতে রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৫০-এ চওড়া পর্দার [Wide screen] আবির্ভাব হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তান আমলে প্রচলিত রীতির বাইরে ইসলামী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অথবা বিকল্পধারার চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক কোন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠা তো দূরের কথা, কোনো আন্দোলনের সূচনাও হয়নি। যদিও ১৯২৩ সাল থেকে যেসব আন্দোলন



www.pathagar.com

ইউরোপে গড়ে ওঠে তার ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিখ্যাত সব নতুন ধারার চলচ্চিত্র, পরিচালক এবং নতুন টেকনিক বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে।

চল্লিশ দশকের শেষে ফ্রান্সে 'অথর থিওরী'র যুগ শুরু হয়। এদের বক্তব্য ছিল, 'শুধু লেখকের চিন্তার উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র তৈরি না করে ঔপন্যাসিক, কবি, গল্পকার, নাট্যকারের মতোই চলচ্চিত্র পরিচালকেরও নিজস্ব বলার কিছু ব্যাপার আছে।' এই 'অথার থিওরী' পরবর্তীতে বিখ্যাত সব পরিচালক ও চলচ্চিত্রের জন্ম দিয়েছে।

এরপর ১৯৫৮-৫৯-এ 'নুভেল ভাগ্' আন্দোলন শুরু হয় ফ্রান্সেই। পাঁচজন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটা গোষ্ঠী এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং নেতৃত্ব দেন। 'নুভেল ভাগ্' আন্দোলন ফরাসী চরচ্চিত্রকে পরিবর্তন করে দেয়। বিশ্ববিখ্যাত অনেক পরিচালক এবং চলচ্চিত্র তৈরি হয় ঐ সময়ে। এইভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে সূচিত পরিবর্তন চলচ্চিত্রকে একটা বিশেষ পর্যায়ে উপনীত করেছে।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্র, আমাদের দেশজ চলচ্চিত্র এবং হংকং, হলিউডের উদোম চলচ্চিত্র দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে চলচ্চিত্রও মানবিক হয়ে উঠতে পারে, সর্বজনীন এবং কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে।

উল্লেখিত আন্দোলনগুলির অবতারণার কারণ এই যে, উপমহাদেশে যেসব চলচ্চিত্র তৈরি হয় এবং সরকারি অনুমোদনে যেসব চলচ্চিত্র আমদানী করা হয়–তার সমস্ত অবয়ব জুড়ে থাকে হিংস্রতা, বিবাহ বহির্ভূত অশ্লীল প্রেম এবং অবৈধ সম্পর্ক। বিশেষ করে যে বয়সটাতে সৃজনশীলতার ঝোঁক আসে, চিন্তার ব্যাপকতা আসে এবং চিন্তার বিকাশের একটা প্রবণতা জন্মায়, ঠিক সেই সময়টার সামনে বিচিত্র উপাদান, নানান সুর ও ছন্দের এবং নানান রঙের যে মিশ্রণ চলচ্চিত্রে দেয়া হয় তার বক্তব্য মাত্র একটাই, "অস্বাস্থ্যকর অনৈতিক আনন্দ"। এতে লিপ্ত করিয়ে তরুণশ্রেণীর মানসিক বৈকল্য ঘটিয়ে তাদের চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করা হয়। বিপরীত দিকে ইসলামী সংস্কৃতির যে ব্যাপকতা, বিশালত্ব, তার সাহিত্য, সংগীত, কাব্য এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিস ভান্ডারে যে চিন্তার মহাসমুদ্র উপস্থিত তা থেকে ভুল বুঝিয়ে, অজ্ঞ রেখে, সংকীর্ণতার অপবাদ দিয়ে সমগ্র মুসলিম তরুণদের মন-মস্তিস্ক থেকে মহান আল্লাহপাক ঘোষিত 'শ্রেষ্ঠ জাতি'–এই তত্ত্বটার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে এবং আজো নানা প্রকার মাধ্যমে বিলুপ্তি ঘটানোর চেষ্টা চলছে। তাই এই একশ বছর পরেও সিনেমাকে ইসলামী সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করার কোনো প্রবণতা এবং আন্দোলনের সূচনা হয়নি। আর তাই বিজ্ঞানের এই কল্যাণময় আবিষ্কারকে মুসলিম প্রতিভার বিশাল একটা অংশ জাহেলিয়াতের সেবায় উৎসর্গ করেছে। ইসলামী কোনো জ্ঞান ছাড়াই মুসলিম নামধারীরা এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেছে এবং করছে অমুসলিমদের অকল্যাণকর গতিধারায়। মাধ্যমটিকে মুসলিম জাতি এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করার অবদান এবং সাক্ষর রাখতে পারেনি। বরং দারুণভাবে অবজ্ঞায় অবহেলায় এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।



www.pathagar.com

চলচ্চিত্রিক ক্ষেত্রে মুসলিমরা তাদের আদর্শ, তাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহারের প্রকাশভঙ্গি অমুসলিমদের মত হয়ে গেছে, মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য নেই বললেই চলে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিমরা তাই আজ 'মুসলিম' শব্দটাকে বাঁকা চোখে দেখে এবং সার্বজনীন নৈতিকতাকে ডিঙিয়ে অমুসলিমদের মতো অমানবিক, স্বার্থপর, মিথ্যাশ্রয়ী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে একজন মুসলিম হবে দরিদ্র, তার বিশেষ পোশাক থাকবে, সে ইঞ্জিনিয়ার হবে না, নেতা হবে না, বিচারক, গবেষক, ডাক্তার কিছুই হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ তার ধর্ম তার জীবন ও চিন্তা-ভাবনাকে মসজিদ ও মাদ্রাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছে। বিয়ে পড়ানো, আরবী শেখানো, মিলাদ পড়ানো এবং মৃতের জানাজা পড়ানোই তার কাজ।

যদিও ইসলাম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ, ভুল, মিথ্যে এবং জঘন্য ইমেজ চলচ্চিত্রের সৃষ্ট নয় বরং চলচ্চিত্র মুসলিমদেরকে এমন রূপেই চিত্রায়িত করে। যা জাহেলিয়াতের চিন্তাকে সমর্থন এবং শক্তিশালী করে। কিন্তু মুসলিমদের এই ইমেজ সৃষ্টির জন্য দায়ী কে! এক কথায় এর উত্তর- প্রতিষ্ঠিত মুসলিম নামধারী শাসকরা এবং তাদের শাসকসত্ত্বাকে দীর্ঘস্থায়ী করে থাকে তথাকথিত পীরদের খানকা ও তথাকথিত মাদরাসা শিক্ষা। এদের শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের সর্বজনীন আইনগত পন্থা পালনে আর্থিক উন্নয়নকে বাতিল করে সীমাবদ্ধ কিছু মৌখিক কর্মপন্থায় আর্থিক অনুশীলন। অর্থাৎ ধুলা-বালি, ময়লা পরিস্কারকে প্রাধান্য দেয়া, কিন্তু ওসবের উৎসমূল চিরতরে ধ্বংস করার পথে তারা ধাবিত হয় না। এই কারণে মুসলিম নামধারী ইসলাম বিরোধী শাসকশ্রেণী, পীর সাহেব ও সেইসব মাদরাসা শিক্ষিতদেরকে হাতিয়ার করে মনের মত করে ধূলা-বালি ও ময়লা উৎপাদনে অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী বিধান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করার সুযোগ পায়। আর চলচ্চিত্র এই ভাবধারা ও ইমেজকে সমর্থন করে এবং পুষ্ট করে। কায়েমী স্বার্থপুজারী শাসকশ্রেণী তাই ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গে মনস্তত্বিকভাবে উক্ত বিষয়গুলো নানাপ্রকার মাল-মশলা দিয়ে সাজানো থাকে। সাধারণ মানুষের মনে তা গেঁথে যায় এবং তারাও ঐ একই পথে পরিচালিত হয়, তাদের কাছে ইসলামী বিধান কঠিন মনে হয়। আর এখানেই চলচ্চিত্রের বিপুল ক্ষমতা। অথচ সবারই জানা যে, ইসলামী বিধানকে যথাযথ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় জুলুমকে সমূলে উৎপাটন সম্ভব হয়ে ওঠে। আর রাস্তায় হাটলে ধুলো-ময়লা পরিস্কার করা যেমন সহজ হয় তেমনি তা সাহসও সঞ্চার করে, না হেঁটে শুধু মনে জিকির করলে সারা জীবনেও ইসলামী বিধানের রাস্তায় হাঁটার সাহস সঞ্চয় হবে না। শেখ শাদীর [র.] : যথার্থই বলেছেন, 'যে তরবারী দিয়ে ঘাস কাটে সে জীবনেও যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহসী হয় না'। বাস্তবক্ষেত্রেও এটা প্রতীয়মান যে, আমাদের দেশে লক্ষ-কোটি মানুষ তবলীগের বয়ানে বা আখেরী মোনাজাতে অংশগ্রহণ করলেও আল্লাহর বিধানের বিরোধীতাকারীদের বিরুদ্ধে টু'শব্দ করার হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে।



www.pathagar.com

মনে রাখা দরকার, চলচ্চিত্র মানুষের মনে নতুন কোনো প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে না। চলচ্চিত্র দেখার পর কেউ মন পরিবর্তন করে না। এ পর্যন্ত এমন হয়নি যে চলচ্চিত্র দেখে একজন অহিন্দু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। অথবা একজন মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বা একজন পুঁজিবাদী কমুনিষ্ট হয়েছে। আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, চলচ্চিত্র নিজে কোনো সংস্কৃতি তৈরি করে না। তাহলে চলচ্চিত্রের কাজ কি! চলচ্চিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, সে সংস্কৃতির জোগান দেয়। তার লক্ষ্য হলো সে দর্শকের মনের রাজ্যে প্রভাব তৈরি করে। সে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন জোগায়, তার চিন্তাকে বলিষ্ঠ ও বলবান করে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারগুলিকে জোরদার করে তোলে। যে কোনো অপ্রচলিত বিষয়ের প্রচলন ঘটায় অথবা অপছন্দের বিষয়কে সহনীয় করে তোলে এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ছাড়াও প্রায় প্রতিটি আইন-বিধানের জায়গায় এখন জাহেলিয়াত স্থান করে নিয়েছে, এখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে আমরা মানুষের কাছে প্রথমে সহনীয় এবং পর্যায়ক্রমে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি।

মহানবী [সা] যা বলেছেন তার অর্থ এরকম যে, 'মানুষ তার স্বভাব ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতামাতা বা পরিবেশ তাকে কুফরীর পথে ঠেলে দেয়।' তা হলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের কুফরী চিন্তা-চেতনাকে জাহেলী চলচ্চিত্র শক্তিশালী করছে। অথচ মহানবী [সা] যে চিন্তা নিয়ে উক্ত কথা বলেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের অনুসারীদের জন্য চলচ্চিত্র একটা বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সব মানুষই আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হয়ে জন্মে। কিন্তু নানা মতবাদ, নানা সংস্কৃতি সেটা ঢেকে ফেলে, যার নাম কুফর। চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ মনের নিভৃতে লুকিয়ে থাকা সেই একত্ববাদকে উসকে দেয়া এবং তাকে তাজা ও জীবন্ত করে তোলা। যাতে 'কুফর' নামক সেই ঢাকনী সরে যায়, মানুষ সঠিক জ্ঞান ফিরে পায় এবং বুঝতে পারে তাকে একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। মহানবী [সা] সেই শাশ্বত বাণী নিয়েই এসেছিলেন। অর্থাৎ তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাতের সত্যতা ঘোষণা করাই হবে চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর মানে এই নয় যে, প্রতিটি চলচ্চিত্রে শুধু এই ঘোষণাই দিতে হবে। 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে তাতে সওয়াব হয়'। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ঘটনাপঞ্জিতে যা থাকবে তা হবে সবই মানব কল্যাণের জন্য। একটা চলচ্চিত্রে হয়তো কোথাও তাওহীদ, আখেরাত কিংবা রিসালাত সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতি, মানুষের অমানবিক আচরণ অথবা কোন মন্দ বিষয়ের প্রতিবাদও ইসলাম বলে গণ্য হতে পারে। কারণ ইসলামের সকল আদেশ-নিষেধই কল্যাণকর। শুধু শর্ত হলো, সকল কাজই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তাঁরই আদেশ-নিষেধের আওতাধীনে।

অতএব এখনই সময় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রকৃত মুসলিম, প্রতিভাবান, আগ্রহী, মেধাবী ও পরিশ্রমী তরুণদের সংগঠিত করে চলচ্চিত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা।



www.pathagar.com

উপমহাদেশের বাঙালী মুসলিমদের সৌভাগ্য আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনের তফসীর বিশ্ববিখ্যাত 'তাফহীমুল কোরআন', 'ফি জিলালিল কোরআন', সিয়াহ সাত্তাহ'র হাদীসগ্রন্থাবলী, মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস, অমুসলিম ইতিহাসবিদদের অনুবাদকৃত মুসলমানদেরকে নিয়ে মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাসের প্রমাণিত গ্রন্থ 'চেপে রাখা ইতিহাস', ইতিহাসের ইতিহাস', ছাড়াও ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপুল সম্ভার এখন হাতের কাছে। ঈমান, ইসলাম, নামাজ-রোজা, যাকাত, হজ্ব, জিহাদ, তৌহিদ, রিসালাত, অখেরাত, সমাজ-রাষ্ট্রগঠন, ইসলামী সংবিধান, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, মোট কথা জীবন ও আধুনিক পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে ইসলামের জ্ঞান, আদর্শ ও নীতি-বিধান সম্বলিত বই-পুস্তক পড়ে ইসলামের সঠিক রূপরেখা জানবার ও বুঝবার সুযোগ বর্তমান। তদুপরি ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক গ্রন্থ 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' চলচ্চিত্র আন্দোলনকারীদের নতুন পথের দিশা দিবে।

যতই পৃথিবী আধুনিক হচ্ছে ততই প্রমাণিত হচ্ছে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত মত ও পথ সংকীর্ণ, ভ্রান্ত এবং অমানবিক। ইসলাম বিরোধী সমস্ত মত ও পথের অঙ্গজুড়ে আত্মস্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, আত্মরম্ভিতা, অবৈধ স্বার্থগত পশুসুলভ প্রেম এবং অবৈধ যৌনাচার ভোগ। ইসলাম বিরোধী সমস্ত জ্ঞান, তত্ত্ব এবং অর্জন মিশে যায় ঐ কলঙ্কিত অকল্যাণকর, মনুষ্যত্বহীন শিকড়ে। যার থেকে উৎপন্ন জাহেলিয়াতের গাছের ছায়ায় শীতলতা নেই, আছে অস্থির অমানবিক স্বার্থগত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

এখন সময়ের তরঙ্গে নিত্য নতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে একমাত্র ইসলামেই রয়েছে চিন্তারাজ্যের বিশাল ব্যাপকতা এবং চিন্তার সঠিক ও সর্বোত্তম বিকাশের মাধ্যমই ইসলাম। অথচ যে চলচ্চিত্র মানুষের দৈনন্দিন আচরণের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়গুলি তুলে ধরে সেই বাস্তবতাকে মুসলমানেরা এতবছর ধরে অস্বীকার করে এসেছে। সেই সুযোগে প্রবল শক্তিমত্তা নিয়ে অগ্রগামী হয়েছে এমন সব চলচ্চিত্র যা ইসলামের আদর্শকে দুর্বল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকায় কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ইরাণী চলচ্চিত্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করার কাজে ব্রত।

যাই হোক, এখনই প্রয়োজন চলচ্চিত্র শিক্ষার। সময় অনেক পার হয়ে গেছে। তাই প্রয়োজন চলচ্চিত্র আন্দোলনের। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা যথার্থ সুষ্ঠু নিয়মের অধীনে চলচ্চিত্র-শিক্ষালাভ করতে পারলে একটা শক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সে আন্দোলন শুধু বাংলাদেশে নয়, উপমহাদেশে এবং সমস্ত পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কল্যাণময় চিন্তার ব্যাপক বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু সেখানে মুসলিমরা অনুপস্থিত। কেন অনুপস্থিত তার নানান কারণ ছিল। এই প্রবন্ধের একপর্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবার উপমহাদেশে চলচ্চিত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি।



www.pathagar.com

প্রথাগত ধারার বিপরীতে অর্থাৎ বিপরীত স্রোতে চলতে গেলে অবশ্যই মেধা, শ্রম এবং ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে হবে। হতে হবে সাহসী। সঠিক পথে চলার জন্য সমষ্টিগতভাবে একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। শিল্পের আলোচনায় বেরিয়ে আসবে আমাদের কি করণীয় এবং পথের রূপরেখা কি।

তথাকথিত সেক্স, ভায়োলেন্স এবং অশ্লিল ছবির বিরুদ্ধে নতুন ধারার ছবি নির্মাণ এবং প্রদর্শনের জন্য ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয় কলকাতায় ১৯৪৭ সালে। নাম ছিল,'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। প্রতিষ্ঠা করেন সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমূখ। আমাদের দেশে প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে ১৯৬৩ সালে। সমাজ সচেতন কিছু তরুণ চলচ্চিত্র প্রেমীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই চলচ্চিত্র সংসদের নাম ছিল, 'পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি'। স্বাধীনতার পর এর নাম হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটি'।

চলচ্চিত্র আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত কিছু বোদ্ধা চলচ্চিত্র কর্মীকে দলবদ্ধ হওয়া এবং একটি গোষ্ঠি গঠন করা। যেটা সংসদ হিসেবে পরিচিত। এধরণের কিছু তরুণ ১৯৬৯ সালে আর একটি চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে তোলে যার নাম 'ঢাকা সিনে ক্লাব'। এরপর বহু চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। এইসব চলচ্চিত্র সংসদ শিক্ষিত তরুণ শ্রেণীকে চলতি নিম্নরুচির চলচ্চিত্রের বিপরীতে বিকল্পধারার বক্তব্যধর্মী নান্দনিক চলচ্চিত্র দেখতে ও বুঝতে উৎসাহিত করে এবং সেই ধরণের মানসিকতা গঠনে ভূমিকা রাখে। এটা মূলত একরকম দাওয়াতী কার্যক্রম।

সংসদগুলোর কার্যক্রম ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বক্তব্যধর্মী ক্লাসিক চলচ্চিত্রগুলো সংগ্রহ করা, সেইসব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমাজ সচেতন দর্শক গড়ে তোলা এবং সদস্যদেরকে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্রনাট্য লিখন পদ্ধতি এবং সংলাপ রচনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা। চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ করাও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মফ:স্বল শহরেও তারা তাদের শাখা সংগঠন তৈরি করে এবং মফ:স্বলের তরুণদেরকে তাদের ভাষায় সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে। সেই প্রক্রিয়া আজো অব্যাহত। [প্রবন্ধ লেখক ছাত্রজীবনে এই ধরণের একটি সংসদের শিক্ষার্থী হয়ে সুস্থ চলচ্চিত্র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, যদিও বাস্তবের নির্মমতায় প্রচলিত ও প্রথাগত চলচ্চিত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন।]

চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকর্মীরা যে অগ্রগতি সাধন করেছে তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে তারাই স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ এবং পরবর্তীতে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি, প্রচারধর্মী, বিজ্ঞাপন-চিত্র, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করেছে এবং করছে। চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের দাবির মুখে বাংলাদেশ সরকার 'ফিল্ম আর্কাইভ' গঠন করে। তাদেরই অনুরোধে পুণা ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুর এই প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। সেখানে অনিয়মিত হলেও ফিল্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজও হয়েছে।



www.pathagar.com

এসবের বিপরীতে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাদের অনুসারী তরুণদের সমাজ সচেনতার পাশাপাশি চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত না করে বা কোনো সুযোগ সৃষ্টি না করে তাদেরকে প্রতিক্রিয়া দেখানোতে পারদর্শী করে তুলেছেন। এতে সেইসব তরুণদের সৃজনশীলতার উৎসমুখ যেমন মরে গেছে তেমনি তারা পরিশ্রম বিমুখ হয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য যেখানে অনুচ্চ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদই যথেষ্ট সেখানে সৃজনশীলতার দাবি মিটাতে কঠিন পরিশ্রম কে করতে চায়!
১৯৬৮ সালে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠা করেন 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি'। সেই সময়ের বিভিন্ন শিল্পী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি ও চলচ্চিত্র সংসদ কমিউনিজমের ভাবধারায় পরিচালিত হয়। বেশির ভাগই ছিল সক্রিয় কমিউনিষ্ট নতুবা কমিউনিষ্ট মতবাদে তাড়িত। 'উদীচী' ছিল তাদের সকল কর্মকান্ডের মূল প্রেরণা। পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ বিদেশের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ফিল্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন চিত্র, টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির পাতা এবং বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রকে এরা দখল করে রাখে। আজো অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত কমিউনিজম ভাবধারার ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নামে মুসলিম হলেও ইসলাম তাদের কাছে অজানা। বরং মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, ডারউইন তারা যেভাবে আত্মস্থ করেছে, চর্চা করেছে এবং মন-মস্তিস্কে গেঁথে নিয়েছে সেভাবে তারা কখনো কোরআন পড়েনি, রাসূল [সা]-এর কর্মজীবন পড়েনি বা পড়তে চেষ্টাও করেনি। কমিউনিজম এবং ডারউইনবাদ প্রত্যাখ্যাত হলেও বাংলাদেশের কমিউনিষ্টরা এখনো সেই ব্যর্থ মতবাদে অটল। করণ এই হতে পারে যে, মানুষের সৃজনশীলতা অদম্য, অটল। তা যখন বন্যার পানির মত বাঁধ ভেঙ্গে প্রবাহিত হয় তখন পিছন দিকে তার আর দেখা হয় না, যতক্ষণ না সে সব কিছু ডুবিয়ে ছাড়ে।
মুসলিম নেতৃবর্গ প্রতিভাধর মেধাবী সৃজনশীলদের কোন পথ করে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ইসলামী নাটক, চলচ্চিত্র বা সামগ্রিক অর্থে সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়নি। ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন পাঠ শিখানো বা ইমামতি করাটাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজকে পেশা হিসেবে নেয়াটার বিষয়ে কোন উৎসাহী নির্দেশনা পাওয়া যায়নি বরং পেশাগতভাবে গ্রহণে হতাশ করা হয়।
এদিকে বামধারার সাংস্কৃতিক কর্মীরা যখন নাটক বা চলচ্চিত্র তৈরি করছে তখন তারা তাদের চলচ্চিত্রে কোথাও কোথাও ইসলামকে এমনভাবে পেশ করছে যা আদৌ ইসলাম নয় বা কোথাও কোথাও জেনে বুঝে হেয় করছে এবং অপমান করছে। তাদের নাটক চলচ্চিত্রে মার্কসীয় ভাবধারা ও আদর্শ প্রকট যা সহজ-সরল মুসলিম তরুণদেরকে মানসিক বিভ্রান্তিতে সহসা লিপ্ত করতে পারে। ওদের মানসিক চিন্তাগত ভিত তৈরি হয়েছে অনৈসলামিকতার উপর। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাহেলিয়াতের রসে সিক্ত এবং জাহেলিয়াতের স্পর্শে পালিত ও লালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই তাদের



www.pathagar.com

নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তাদের আদর্শের প্রকাশ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত এবং কোথাও কোথাও বা মুশরিকি ভাবধারায় উজ্জীবিত।

যেহেতু আমাদের দেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিক্ষা দেয়া হয় না, তাই যারা হাতে-কলমে চলচ্চিত্র শিখতে চান তারা চলচ্চিত্রের মূলধারা হোক অথবা বিকল্পধারা হোক তাকে পরিচালকের অধীনে থেকে চলচ্চিত্র শিখতে হয়। [সরকারী এবং ব্যক্তি উদ্যোগে অল্প দু'একটা চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চলছে]। যাদের মানসিক ভিত্তি, নৈতিক ভিত্তি এবং যাদের কর্মজগতটাই সম্পূর্ণ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত তাদের সঙ্গে শিক্ষানবিশি করার কোন প্রকার পরিবেশ পাবে না সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শের ঈমানীশক্তিতে বলিয়ান একজন তরুণ মুসলিম। বরং হয় সে পথভ্রষ্ট হবে নতুবা বিরক্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করে চলে আসবে এবং আর শিখতে চাইবে না।

পূর্বে যেসব চলচ্চিত্র আন্দোলনের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাতে চলচ্চিত্র শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উপায় ছিল না। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজে চলচ্চিত্রকে পাঠ্যক্রম করা হয়েছে।

ফ্রান্সে চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৯৫০-এ দু'বছরের পাঠ্যক্রম চালু হয়। ইংল্যান্ডে ১৯৬০ সালে ৭০০ স্কুলে ফিল্ম ও টেলিভিশন শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে চলচ্চিত্র শিক্ষকদের সমিতিও আছে।

আমেরিকায় ক্লাস প্রোজেক্ট হিসেবে ক্লাস সেভেনেই সিনেমা তৈরি করার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রায় ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ইংল্যান্ডে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১০০। সংস্কৃতির সকল দিকই সন্নিবেশিত হয় ফিল্মে আর ফিল্ম তাই ব্যাপক শক্তিশালী মাধ্যম। ফিল্ম সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে, বলিয়ান করে এবং সর্বোতভাবে সমর্থন জোগায়।

যেহেতু ফিল্ম একটি মাধ্যম- গণমাধ্যম, তাই গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে তরুণদের সম্যক ধারণা না থাকলে ফিল্মের বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করা তরুণদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য যে সমাজে তরুণরা বাস করে তার কাঠামো, তার প্রকৃতি, তার চরিত্র সম্পর্কে তরুণদের সন্ধানী প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার। তার উত্তর পাওয়াও জরুরী। অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনো কার্যকরী চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রকল্প এবং তাতে সক্রিয় হওয়ার অর্থ হলো তরুণদের সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল প্রবেশের একটা মহান উদ্যোগের অংশবিশেষ।

যাদের মানসিক ভিত্তি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শাস্ত্র এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য চর্চায় যারা নিবিষ্ট তারাই কেবল চলচ্চিত্র শিক্ষার উপযুক্ত। তাদেরকে প্রথমেই এই সবক নিয়ে আত্মস্ত করা দরকার যে, পৃথিবীর সব মানবিক কল্যাণকে অবজ্ঞা করে শুধু নিজেদেরকে পূজনীয় করে তুলবার জন্য কোন লেখক, কবি, পরিচালক, শিল্পী চলচ্চিত্র শিক্ষা করবে না। নিজেদেরকে পূজা পাবার উপযোগী করে তুলবার জন্য সার্বজনীন মানবিক কল্যাণকে তারা ছুঁড়ে ফেলবে না। ইসলাম যে মানব



www.pathagar.com

কল্যাণের দিশা দিয়েছে সেই নীতি ও নৈতিকতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে দায়িত্বশীল ও যত্নবান হতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিপূজা নয়, আদর্শ প্রতিষ্ঠাই হবে একজন চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীর মূল বিষয়। নিজেকে প্রিয় হিসেবে নয় বরং সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

চলচ্চিত্র শিক্ষার দুটি ধরণ আছে। ১. চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা। ২. চলচ্চিত্রের কাছ থেকে শিক্ষা।

এই দুই ধরণের ব্যবস্থা করাই একটি চলচ্চিত্র সংগঠনের প্রাথমিক কাজ। একটি কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শিবিরের অধীনে ছোট ছোট শিবির করে ইসলামী আদর্শের এবং ইসলামী আদর্শের নয় আবার ইসলামী নীতির বিরোধীও নয়, এমন সব ছবি প্রদর্শনী করে তা অনুশীলন করতে পারে। সাহিত্যের পাঠ যেমন ধ্রুপদী সাহিত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি চলচ্চিত্রের পাঠক্রম মূলত ক্লাসিক ছবিগুলোকে কেন্দ্র করে। তাই এই ধরণের ক্লাসিক ছবি সংগ্রহ করে তা দেখা, শোনা, ভাবনা ও অনুভবের এক বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এবং পোর্টেবল প্রজেক্টরের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। এতে চলচ্চিত্রের শিক্ষার দুটি প্রাথমিক দিকই কার্যকরী করার সূচনা হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলচ্চিত্র শিক্ষার এই পদ্ধতিই স্বীকৃত।

চলচ্চিত্র সমাজের স্বীকৃত ভাবনা ও মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়েই তাকে বেগবান করে নতুবা বাধার সৃষ্টি করে কিন্তু সে দ্রুত কিছু পাল্টে দেবার ক্ষমতা রাখে না বরং যা গ্রহণযোগ্য ছিল না চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষমতা রাখে। যেমন আমাদের মুসলিম সমাজে বহুকিছু গ্রহণযোগ্য ছিল না, যথা মেয়েদের হাতাকাটা ব্লাউজ, ওড়না বিহীন মহিলা অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খাওয়া, যুবক-যুবতীর প্রেমলীলা এরকম বহুকিছু। চলচ্চিত্র এইসব বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা নিতান্তই ইসলামের মৌলিক বিষয় সেগুলোকে প্রচলনের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। যেমন হাদিসের বাণীকে বাঁধাগ্রস্ত করে মনীষীদের বাণীর প্রচলন। নামাজ রোজা ছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে চেপে বা ঢেকে রেখে [যাকে কুফর বলা হয়] মানব রচিত বিধানের জয়গান গাওয়া ইত্যাদি। অথচ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিধি-বিধানের সর্বজনীন মানবীয় কল্যাণকে নিজেদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। তা না করে বরং মুসলিম চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম বিষয়গুলিকে বিকৃত করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যা আজ ইরান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করছে।

তথাকথিত আধুনিকতা এবং আমেরিকা ইউরোপীয় সংস্কৃতি একটা নিরেট জাহেলি মন-মস্তিস্ক তৈরি করতে সচেষ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও। ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবন-ব্যবস্থার আলোকে চিরন্তন মানবীয় অথবা চির আধুনিক ইসলামী মূল্যবোধকে



www.pathagar.com

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ওইসব জাহেলি মন-মস্তিস্কের অধিকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। যেমন সম্ভব হয়েছিল অতীতের মুসলিম শাসনের সময়।

অল্পবয়সীরা চলচ্চিত্র, টিভি, নাটক এবং বিজ্ঞাপনচিত্রের অভিনয় শিল্পীদের ও সংগীত শিল্পীদেরকে যে সব কারণে অনুকরণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসরণের মানসিকতা গঠন করে, সে কারণগুলির অনুসন্ধান না করেও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সে সমস্ত অল্পবয়সীরা যেমন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হচ্ছে তেমনি ওইসব অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ তথা নিজস্ব ব্যক্তি ইমেজ তৈরি করার ক্ষেত্রে অল্পবয়সীদের চিন্তা জগতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। প্রকৃত অর্থে তারা ইসলাম তথা শান্তি বিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার এবং অর্থ-সম্পদ অর্জনের কাজে লিপ্ত। আর তাই তারা শান্তিকামী সমাজ ও মানব কল্যাণের জন্য উপকারী নয়। ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকারী কখনো সার্বজনীন মানবকল্যাণের জন্য উপকারী হতে পারে না। তাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে বিশেষ করে অল্পবয়সীদের মধ্যে জাহেলিয়াতের শিকড় বিস্তার হচ্ছে এবং সেটা ব্যাপক হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাদের কর্মপন্থার বিপরীতে যৌক্তিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র মৌখিক বিরুদ্ধাচারণ করার ফলে তারা তাদের বিরোধীতাকারীদেরকে অসামাজিক, অসংস্কৃত, অনাধুনিক, প্রগতির অন্তরায়, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে প্রকটভাবে শত্রুতা করে মুসলিম সমাজকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলেছে।

অতএব ইসলামী দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী এবং আন্দোলনকারীদের সদা-সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থ না দেখে মানবতার স্বার্থকে ইসলামী আদর্শের পথে নির্ণয় করতে হবে এবং প্রাধান্য দিতে হবে।

চলচ্চিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথমে যা দরকার তা হলো উন্নতমানের ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট ছবিকে সহজলভ্য করা। যেমন দি ম্যাসেজ, ওমর মুখতার, বা ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি ছবি, অথবা ইসলামী ভাবধারার নয় কিন্তু ইসলাম বিরোধীও নয় এমন সব ছবি, যেমন অক্টোবর, ব্যাটেলশীপ পোটেমকিন, পথের পাঁচালী, হীরক রাজার দেশে, একদিন প্রতিদিন, বাইসাইকেল থিভ, চিলড্রেন হ্যাভেন বা ফাদার ইত্যাদি। এই সমস্ত ছবির প্রদর্শনী ও অনুশীলন দরকার।

প্রতিটি চলচ্চিত্র শিবিরকে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এবং নির্মিত ছবিগুলির মান উন্নয়নে চলচ্চিত্র শিবিরের ভূমিকা থাকবে নেতৃস্থানীয়। কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শিবির চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশ করে জনসাধারণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। তারা বাৎসরিক ইসলামী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে পারে, পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও করতে পারে। উন্নত ভিডিও ছবি তৈরির আনুসঙ্গিক টেকনোলজির ব্যবস্থা করতে পারে যাতে কম খরচে চলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।



www.pathagar.com

ভিডিও ক্যামেরা, প্রজেক্টর মেশিন, পর্দা, লাইট, ট্রলি, ক্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইভাবে একটা চলচ্চিত্র শিক্ষা এবং চলচ্চিত্র আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব।

চলচ্চিত্র একটা বিরাট ও ব্যাপক গণমাধ্যম, সেহেতু রেডিও, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ও টিভি'র মতো চলচ্চিত্র ও শিক্ষার একটা মাধ্যম। এগুলি সবই প্রযুক্তি নির্ভর। একদিকে নির্মাতা অন্যদিকে দর্শক, মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। অতএব মাধ্যম শিক্ষার যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র সব সময় সমাজের ভাষায় কথা বলে। কারণ এটি একটি মাধ্যম। উন্নত দেশে মাধ্যম বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। সেখানে মাধ্যম বিষয়ের শিক্ষা প্রাধান্য পায়। বর্তমান পৃথিবীতে 'মাধ্যমের' মাধ্যমে জনগণ তার মানসিক চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। আমেরিকায় মাধ্যমকে রূপ দেয় ভোগপণ্যবাদ। অর্থ ও সংযোগের মধ্যে এই মিলন সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে নিষ্পন্ন হয় ক্লাস ঘরের মাধ্যম যন্ত্রের ব্যবহার থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সংযোগ উপগ্রহের সাহায্য গ্রহণ [টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ধর্মী শিক্ষানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার] পর্যন্ত।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রকে বিভিন্ন রূপে দেখা হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র একটি পণ্যদ্রব্য, একটা ভোগ্যবস্তু, যা কোনো দেশের এক অন্যতম বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা উৎপাদিত।

দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র হলো আবেগময় অভিজ্ঞতা। একজন নির্মাতার দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র একটি সৃষ্টি যা মানুষের চেতনাকে নাড়া দেয়। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রকে বিভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে। তবে চলচ্চিত্র সব সময় শিল্প নয়, কিন্তু সব সময় তা একটি পণ্যদ্রব্য, একটা অভিজ্ঞতা, একটা পরিবেশ, এটাও মনে রাখতে হবে।

তরুণ জীবনে চলচ্চিত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাদের মন-মস্তিস্ক, চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতাকে চলচ্চিত্র হয় সমর্থন করে, শক্তিশালী করে এবং বেগবান করে নতুবা বাঁধাগ্রস্ত করে। তাই চলচ্চিত্রকে সেই সব বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে শিক্ষালাভ করতে হবে যা ইসলাম সমর্থন করে। কারণ প্রমাণিত সত্য হিসেবে ইসলামই নৈতিকতার এবং জ্ঞান বিকাশের একমাত্র মানদন্ড।

চলচ্চিত্রকে অবজ্ঞা করা এবং উপেক্ষা করা মানে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। পৃথিবীর বৃহত্তর আদর্শিক জনগোষ্ঠি হিসেবে মুসলমানদেরকে তাদেরই আদর্শিক পথে চলচ্চিত্রকে গতিশীল করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে তাদের কল্যাণকামী চিন্তা-চিন্তন, সমাজ ও পৃথিবীর পথে তাদের মিশনের স্বরূপ এবং সর্বোপরি তাদের আলোকময় অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ অবহিত হতে পারে।



www.pathagar.com

# কবির জন্য নবীর প্রেম

## আসাদ বিন হাফিজ

কবি ও কবিতার প্রতি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের [সা] ভালবাসা কত গভীর ও সুতীব্র ছিল তা কল্পনা করলেও বিস্মিত হতে হয়। ভেবে দেখুন, একজন কবি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের [সা] কতটা প্রিয় হলে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা [রা]-এর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মত মারাত্মক অপরাধ করার পরও তাঁকে কেবল ক্ষমাই করা হয়নি বরং কবিতা রচনার কারণে তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের মাধ্যমে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে তাঁর চিত্তকে শান্ত করেছিলেন।

হাদীসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বুখারী, মুসলিমসহ সকল সহীহ হাদীসগ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা [রা]-এর বরাত দিয়ে অপবাদের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ঘটনাটি ছিল এরকম : রাসূল [সা] কোন সফরে গেলে তিনি বিবিদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে কোন একজনকে বাছাই করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একবার লটারীতে হযরত আয়েশা [রা]-এর নাম উঠলে তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে সফরে গেলেন। ফেরার পথে এক রাতে বিশ্রাম শেষে কাফেলা যখন যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন হযরত আয়েশা [রা] প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে হঠাৎ গলায় হাত দিয়ে দেখেন তাঁর গলার হারটি নেই। তিনি হারটি খোঁজার জন্য আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলেন এবং যখন খুঁজে পেয়ে পূর্বের জায়গায় ফিরে এলেন তখন দেখেন কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। তিনি তখন ওখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কারণ তিনি ধারনা করলেন, যখন কাফেলায় তিনি নেই জানাজানি হবে তখন তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে লোকজন আবার ওখানেই ফিরে আসবে। অপেক্ষা করতে করতে তিনি একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

বনি সুলাম গোত্রের সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল [রা]কে রাসূল [সা] নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাফেলায় ফেলে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে তিনি যেন সবার শেষে আসেন। তাই তিনি সেখানেই ভোর হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। সকালে তিনি দ্রব্যসামগ্রী খুঁজতে গিয়ে একসময় হযরত আয়েশা [রা]-এর কাছে পৌছে গেলেন এবং তাঁকে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে



www.pathagar.com

'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠলেন। এই শব্দে হযরত আয়েশা [রা]-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং তিনি তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। সাহাবী সাফওয়ান [রা] তখন সওয়ারীকে টেনে নিয়ে গিয়ে দুপুরের সময় কাফেলার সাথে শরীক হলেন।

এ ঘটনায় হযরত আয়েশা [রা] সম্পর্কে একদল সাহাবী জঘন্যরকম অপবাদ ছড়িয়ে দিল। এই অপবাদকারীদের অন্যতম ছিলেন হযরত হাসসান বিন সাবিত [রা]। মদিনায় পৌঁছুলে এ রটনা এ মুখ থেকে ও মুখ করতে করতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। রাসূল [সা]-ও শুনলেন রটনার কথা। লোকজনের মধ্যে কানাঘুষার চর্চা বেড়ে গেলে তিনি এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন। অসহনীয় হৃদয় যন্ত্রণা নিয়ে এ পরিস্থিতিতে তিনি স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটাবেন কিনা তাই নিয়ে পরামর্শ করলেন হযরত আলী [রা] ও উসামা [রা]-এর সাথে। উসামা [রা]-এ ঘটনাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব, অবাস্তব ও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেও হযরত আলী [রা] বললেন, আপনার মনে যদি তাঁর চরিত্র নিয়ে কোন সন্দেহ জন্ম নিয়ে থাকে তবে বিষয়টি নিয়ে আপনার দাসী বারীরার সাথে আলাপ করতে পারেন। নবীজী বারীরাকে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি কি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহজনক আচরণ দেখেছো? বারীরা [রা] বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষণীয় ব্যাপার দেখিনি। তখন নবীজী মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই অপবাদ রটনাকারীদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাহায্য চাইলেন।

হাদীসটি অনেক দীর্ঘ। এরপর এ নিয়ে কিভাবে সাহাবীদের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়, কিভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয় এসব আলোচনা করা হয়েছে।

অপবাদের এ ঘটনা শোনার পর মা আয়েশা [রা]-এর অবস্থা কি হয়েছিল তা তাঁর মা উম্মে রুমান থেকে শোনা যাক। বোখারী শরীফের ৩৮৩১ হাদীসে তিনি বলেন, 'এ কথা শুনে আয়েশা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। তখন আমি চাদর দিয়ে তার সারা শরীর ঢেকে দিলাম। নবী করীম [সা] এসে তার এ অবস্থা দেখে বললেন, এর অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। নবীজী বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনার কথা জেনে ফেলেছে।'

প্রথম দিকে অপবাদের ঘটনা হযরত আয়েশা [রা]কে বলার কেউ সাহসই করেনি। কিন্তু লোকজনের কানাঘুষা দেখে এবং রাসূলের [সা] সাম্প্রতিক আচরণে তাঁর সন্দেহ হয় যে, লোকজন তাঁর কাছ থেকে মারাত্মক কিছু লুকাচ্ছে। বোখারীর ৪৩৮৯ নম্বর হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি বিষয়টি জানার জন্য পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং রাসূল [সা]কে বললেন, 'আপনি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?' আয়েশা [রা] বলেন, 'তখন আমি তাদের কাছ থেকে এ খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূল [সা] আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি পিতামাতার কাছে চলে গেলাম এবং মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আম্মা, লোকজন কি নিয়ে এতো আলোচনা ও কানাঘুষা করছে? মা বললেন, বেটি, এ বিষয়টি নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করো না। কারণ সতীন আছে



www.pathagar.com

এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী যুবতী নারীকে নিয়ে তার সতীনরা বদনাম করবে না এমনটি খুব কমই হয়ে থাকে। আমি বললাম, সোবহানাল্লাহ, লোকজন এমন জঘন্য বিষয় রটিয়েছে? এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

আয়েশা [রা] বলেন, 'আমার ক্রন্দনরত অবস্থায় সেই রাত কেটে সকাল হলো। এর মধ্যে আমার অশ্রু বন্ধ হলো না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। সকালবেলাও আমি কাঁদছিলাম। সেদিন আমি দিনভর কাঁদতেই থাকলাম। না আমার চোখের কান্না থামলো, না আমি নিদ্রা যেতে পারলাম।' পরের রাতটিও তাঁর এভাবেই কান্নার ভেতর দিয়ে কেটে গেল। তিনি বলেন, 'ভোরে আমার পিতামাতা ও যারা আমার কাছে ছিলেন, তারা ভাবলেন, দু'রাত ও দুদিন একনাগাড়ে কোন ঘুম-নিদ্রা ছাড়া যেভাবে কাঁদছি এভাবে কাঁদতে থাকলে আমার কলজে ফেটে যাবে।' এভাবে তখনো তিনি কাঁদতেই ছিলেন এমন সময় এক আনসারী মহিলা তাঁর সাক্ষাৎ চাইলো। তিনি বলেন, 'আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম এবং সে এসেই আমার সাথে কান্না জুড়ে দিল।'

এখানে উম্মুল মুমিনীনের যে অসহনীয় কষ্টের ছবি ফুটে উঠেছে তা কি ভাষায় বর্ণনা করার মত? চিন্তা করে দেখুন কার বিরুদ্ধে এ মিথ্যা অপবাদ। স্বয়ং রাসূল [সা] আল্লাহর কসম করে যাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে তাঁরই উপস্থিতিতে তাঁরই সাহাবীগণ এ অপবাদ দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে রাসূল [সা] আল্লাহর কসম করে বলেছেন, 'আমার স্ত্রীদের মধ্যে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না, এবং সে কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরেও আসেনি।'

যে অপবাদ রাসূলের [সা] সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং ৪০টি দিন সীমাহীন কষ্টে জ্বলে-পুড়ে মরেছিলেন আল্লাহর রাসূল, যে অপবাদের কারণে ঘর ভাঙার উপক্রম হয়েছিল স্বয়ং নবীর, যে অপবাদ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা [রা]-এর ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এবং তাঁর কলজে ফাটার উপক্রম হয়েছিল এবং অবশেষে যে অপবাদ অনোদনের জন্য আল্লাহকে অহী নাজিল করতে হয়েছিল সেটা কত বড় জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ তা উপলব্ধি করাও আমাদের সাধ্যের অতীত।

আল্লাহ যখন এ সম্পর্কে আয়াত নাজিল করে বলেন, 'যে লোক এ ব্যাপারে যতোটা অংশগ্রহণ করেছে সে ততোটাই গুণাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে' তখন আমরা জানতে পারি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে ফেলেছে। এ অপবাদ রটনায় কবি হাসসান বিন সাবিত [রা] যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। স্বাভাবিকভাবেই এ কবি কঠিন শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কবিদের প্রতি আল্লাহর অপার দয়া ও মেহেরবাণী দেখে আমরা অবাক ও বিস্মিত হয়ে যাই। রাসূলের [সা] পক্ষে কবিতা লেখার কারণে আল্লাহ এ কবিকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাঁকে এ ক্ষমার কথা জানিয়ে দিলেন, যাতে কবি নিশ্চিত মনে কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পারেন।



www.pathagar.com

আল্লাহ্ মহামহিম। তিনি তার কোন বান্দাকে ক্ষমা করতেই পারেন। এতে অবাক বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। মহানবী [সা] রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন, সুতরাং তিনিও রহমদীল হতে পারেন, কারণ সে গুণের কথা আল্লাহ্ই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা [রা] যে বিস্ময়কর ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বকে চমকিত করে দিলেন তা কি কল্পনা করা যায়? বোখারী শরীফের হাদীস থেকে জানা যায়, সাহাবীগণ হযরত আয়েশা [রা]-এর এ অনুপম ঔদার্যে বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন! জবাবে হযরত আয়েশা [রা]-এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'সে রাসূল [সা]-এর পক্ষ থেকে কাফেরদের নিন্দা কাব্যের জবাব দিয়েছে।' কবিতার ভাষায় ইসলাম বিরোধী শক্তির কবিতার প্রতিবাদ করেছে।

এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত ও ব্যতিক্রমী শিক্ষার বিষয়। চরম অপরাধের পরও কবি হাসান বিন সাবিত [রা] কবিতা লেখার কারণে আল্লাহ্‌র সীমাহীন কৃপা ও অনুকম্পা পেয়েছেন, পেয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদ। ব্যক্তিগতভাবে কবির দ্বারা অপবাদের শিকার হওয়ার পরও রাসূল [সা] শুধুমাত্র কবিতা লেখার খাতিরে হাসসান বিন সাবিত [রা]কে শুধু ক্ষমাই করেননি, তার কবিতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কেয়ামত পর্যন্ত সেই কবিতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাঁকে 'শায়েরুন্নবী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং এভাবে কাব্যচর্চাকে শরয়ী মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের পর কবিদের সাথে সাধারণ মুসলমানদের আচরণ ও ভূমিকা কেমন হবে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন হযরত আয়েশা [রা] তাঁর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরও হাসসান [রা]কে ক্ষমা করে দিয়ে। সর্বত্র ক্ষমা, দয়া, মহত্ত্ব, মমত্ব, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার যে নজির, আমরা তার কতটুকু ধারণ করতে পেরেছি? কবিদের ব্যাপারে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল [সা] ও মা আয়েশা [রা]-এর এ ভালবাসা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। এ ঘটনা এবং এরকম আরো বহু ঘটনা আছে যে কারণে কবিদেরকে ভালবাসা সুন্নতে রাসূলের [সা] অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে আছে।

আমাদের সমাজে কবিদের ছোটখাট দোষত্রুটি নিয়ে হাসাহাসি ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেও একশ্রেণীর মানুষের বাঁধে না। এটা যে মস্ত বড় অন্যায় সে কথাও আমরা বেমালুম ভুলে যাই। অথচ ইসলাম কবিদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর চোখে তাকানোর জন্য বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগেই বলেছি, কবি হাসসান বিন সাবিত [রা] মা আয়েশা [রা]-এর ওপর যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিলেন তার জন্য কঠিন শাস্তি তাঁর প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটলো? আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল [সা] তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন, এমনকি যে আয়েশা [রা] এ ঘটনায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র ফয়সালা আসার পর তিনিও কবিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কবিদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেয়ার এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। ইসলামের ইতিহাসে এ রকম আরো অসংখ্য ঘটনা আছে যার মধ্য দিয়ে কবিদের প্রতি ক্ষমা ও মমত্ব



www.pathagar.com

প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এ ব্যাপারে আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই।

কবি কাব ইবনে যুহায়র ছিলেন প্রসিদ্ধ 'সাবা মুয়াল্লাকার' [ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক] অন্যতম কবি যুহায়র-এর সুযোগ্য সন্তান। কাব [রা] পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুতার ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা, ওজস্বিতা ও উত্তরাধিকার ছিল এমনি এক মারাত্মক পর্যায়ের যে, মক্কা বিজয়ের পর যে দশজন কুখ্যাত কাফিরের প্রাণদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল, যুহায়রের পুত্র কাব ছিলেন তাদের অন্যতম। তখনও তিনি ইরাকে অবস্থান করে আল্লাহর নবী [সা] ও ইসলামের বিপক্ষে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। কিছুদিন পর তাঁর মধ্যে এলো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁর মনোরাজ্যে বিপ্লব ঘটে গেল এবং তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি জানেন তাঁর ওপর ঝুলছে মৃত্যুদণ্ডের খড়গ। মুসলমানরা তাঁকে হাতে পাওয়া মাত্র তাঁর ভাগ্যে নেমে আসবে চরমতম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাই তিনি ছদ্মবেশ নিয়ে ইরাক থেকে মদিনায় এসে উপস্থিত হলেন। মদিনায় এসে রাসূলের দরবারে গিয়ে তিনি বানাত সুআদ নামে একটি কবিতা পেশ করলেন। কবিতাটি এতই চমৎকার ছিল যে মহানবী [সা] সেই কবিতা শুনে খুশি হয়ে নিজের গায়ের চাদর খুলে কবিকে তা উপহার হিসাবে প্রদান করলেন। এরপর তিনি ছদ্মবেশ খুলে নিজের পরিচয় দিলেন এবং রাসূলের হাতে ইসলাম কবুল করলেন।

বানাত সুআদ নামের সেই অসাধারণ কবিতাটির যাদুকরী প্রভাবের কথা স্মরণ করুন। একটি কবিতার ক্ষমতার কথা চিন্তা করুন। একটি কবিতা কি না করতে পারে? একটি কবিতা বিচারকের ঘোষিত রায় পাল্টে দিতে পারে। একটি কবিতা একজন কবিকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়েও যে ভালবাসা ক্রয় করা যায় না একজন কবি একটিমাত্র কবিতা পাঠ করে রাসূলের [সা] কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন সেই ভালবাসা। কবি ও কবিতার প্রতি কতটা মহব্বত ও ভালবাসা থাকলে নিজের শরীর থেকে চাদর খুলে সেই চাদর দিয়ে নিজেই যার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন সেই কবিকে নবী বরণ করে নেন তা উপলব্ধি করার মত হৃদয় কি আমরা তৈরী করতে পেরেছি? কবি ও কবিতার জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের [সা] এই ভালবাসার কি কোন তুলনা আছে? আমরা যারা নিজেকে আল্লাহর বান্দা ও নবীর অনুসারী বলে দাবী করি, নবীর এই সুন্নত অনুসরণ করার মানসিকতা কি আমরা নিজেদের মধ্যে আদৌ তৈরী করতে পেরেছি?



www.pathagar.com

# মহানবীর [সা] সাহিত্যপ্রেম ও আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা

**ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ**

কাব্যচর্চা কোন নবীর কাজ নয়, তিনি মহাসত্যের প্রচারের জন্য সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ [স] সর্বযুগের, সর্বকালের সেরা নবী হিসেবে তিনিও পরিচালিত হয়েছেন সরাসরি আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে এবং তাঁকে দেয়া হয়েছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিজা পবিত্র আলকুরআনুল কারিম। সমকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চেয়েও অনেক বেশি উঁচুমানের সাহিত্যিক মূল্যবোধ দিয়ে সাজানো হয়েছে এ পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বাহক হিসেবে মহানবীকে [সা] দেয়া হয়েছে উন্নত ভাষাজ্ঞান এবং অসাধারণ কাব্যময়তা। অন্যান্য কবিদের মতো নিজে কবিতা রচনা না করেও কবি ও কবিতার প্রতি তাঁর অভাবনীয় ভালোবাসা সাহিত্য পরিমণ্ডলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে বৈকি। তাইতো তিনি মহানবী হয়েও ভাষা ও সাহিত্যেরও মহানায়ক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত হয়ে আসছেন।

মহানবীর আগমন ঘটেছে খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে। সে সময় আরব সমাজে নৈতিক অধ:পতনের চুড়ান্তরূপ পরিলক্ষিত হয়েছিলো। মানুষের মধ্যে মানবতাবোধের অভাব তৈরি হয়েছিলো ব্যাপকভাবে। হত্যা-খুন, অপহরণ-ধর্ষণ, লুটতরাজ-ছিনতাই প্রভৃতি অমানবিক আচরণ ছিলো নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। 'নারীরা মানুষ নয়; এরা ভোগের পণ্য' এমন অরুচিকর ধারণাও প্রচলিত ছিল। মদ্যপান এবং যুদ্ধবাজনীতি সম্ভ্রান্ত ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক। 'জোর যার মুলুক তার' ক্ষমতার অপব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘিত হয়েছিল। এমন সংকটকালেও ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতায় তারা ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে শীর্ষে। তাই মহানবীকে [সা] যে বিধান দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার সাহিত্যিক মানও ছিলো সমকালকে চ্যালেঞ্জ করার মতো। মূলত এটা ছিল মহানবীকে [সা] দেয়া একটি সর্ববৃহৎ মু'জিজা। কেননা প্রত্যেক নবীকে সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো মু'জিজা দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছিলো। যেমন মুসার [আ] সময় যাদুর প্রভাব এবং গোত্র ইগো ছিলো সবচেয়ে বেশি; আর তাই তাকে একটি লাঠি মু'জিজা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো যা দিয়ে তিনি যাদুকরদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিতে



www.pathagar.com

পেরেছিলেন এবং ফেরাউনের আক্রমণ থেকে তার উম্মতকে বাঁচানোর জন্যে নীলনদে লাঠি দ্বারা আঘাত করে বারোটি গোত্রের জন্যে বারোটি রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন নদপার হবার জন্যে। তেমনি হযরত ঈসার [আ] সমকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো বলে তাঁকে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের মতো অলৌকিকত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনের সাহিত্যভাবকে পুরোপুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যেই মহনাবীকে [সা] মক্কার কুরাইশদের পাশাপাশি আরবের শুদ্ধভাষাভাষী সায়াদ ইবনে বকর গোত্রে মা হালিমার [রা] তত্ত্বাবধানে শৈশব কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মহানবী [স] নিজেই বলেছেন, 'আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী ; তারপরেও আমি কুরাইশদের অর্ন্তভূক্ত, আর আমি সায়াদ ইবনে বকর গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছি।' সুতরাং ভাষার দক্ষতা এবং বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে তিনি সুসাহিত্যিক হবার মতো একজন যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

মহানবী [সা] কাব্যচর্চা করেননি। কিন্তু তাঁর বর্ণিত নির্দেশনার [হাদিস] ভাষা কাব্যভাষার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়; যদিও তা সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য। 'মুমিন তার ভাইয়ের আয়না স্বরূপ' 'আত্মার ধনাঢ্য সর্বোত্তম ধনাঢ্য' 'মানুষেরা চিরুনীর দাঁততুল্য' 'প্রথম ধাক্কায় অটল থাকাই হচ্ছে সবর বা ধৈর্য' 'একই গুহা থেকে মুমিন কখনো দু'বার দংশিত হয় না' এমন অসংখ্য হাদিসের বাণী উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এসব বাণীর মধ্যে অসাধরণ সাহিত্যিক উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং ইঙ্গিতময়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ এর রেক্টর মুহাম্মদ আররাহী নদভী তাঁর 'তারিখ-আল আদাবিল আরাবী, আল আছরিল ইসলামী' গ্রন্থে উলেখ করেন, মহানবীর [সা] সাহিত্য হচ্ছে সাবলিল গদ্য, নতুনত্বে পরিপূর্ণ; যা হজম করা সহজ। এর উৎসস্থল সুপেয়। এটি স্বল্পকথায় অধিক অর্থ প্রকাশ করে। এটি স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি যেখানে সংক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন সেখানে সংক্ষিপ্ত আর যেখানে বিস্তৃত হওয়া জরুরী সেখানে বিস্তৃত। তার ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নেই বরং এটি তাঁর অন্তর থেকে নিসৃত। তিনি দুর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু শব্দ, আর সাহিত্যরসহীন বাক্য পরিহার করেছেন। একইভাবে আল-আদাব আন-নূছুচ ফিল আছরাইন, আল জাহিলী ওয়া সাদরুল ইসলাম গ্রন্থে ড. মুহাম্মদ খলীফা উল্লেখ করেন, 'মহানবীর [সা] শব্দাবলী নতুন, সুক্ষ্ম অর্থবহনকারী। তাঁর বাক্যবিন্যাস বিশুদ্ধতার শীর্ষে। উপমার প্রয়োগ, বাক্যের অলংকার, পরোক্ষার্থে শব্দের ব্যবহার খুবই চমৎকার।'

মহানবীর [সা] সাহিত্যপ্রেম অস্থিমজ্জার সাথে মিশে ছিলো। পবিত্র কুরআনের বাহক হিসেবে নিজেকে আপাদমস্তক সাজিয়ে নিলেও কবিতা রচনা এবং আবৃত্তি করাকে ছাড়তে পারেননি তিনি। আনন্দ-বেদনা, পাওয়া-না পাওয়া, জয়-পরাজয়সহ জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁকে কবিতা আওড়াতে দেখা গেছে। বুখারী শরীফে হযরত বারা ইবনে আযিব [রা] থেকে বর্ণিত, হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াজিন গোত্র অর্থাৎ শত্রুপক্ষের তীরের



www.pathagar.com

আঘাতে কতিপয় মুসলিম সেনা পিছু হটে গিয়েছিলো, তখন মহানবী [সা] একটি সাদা খচ্চরের উপরে আরোহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং আবৃত্তির ভঙ্গিকে উচ্চারণ করছিলেন:

আমি কিন্তু আল্লা'র নবী মিথ্যাবাদী নই
আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধরও হই।

অনুরূপভাবে হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ [সা] আহযাবের যুদ্ধের জন্য নির্মাণাধীন পরিখার নিকট আসলেন। তখন মুহাজির ও আনসারগণ প্রচণ্ড শীতের সকালে পরিখা খনন করছিলেন। এ কাজের জন্যে তাঁদের কোন পারিশ্রমিক ছিল না। [তারা ভীষণ ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্তও ছিলেন।] মহানবী [সা] তাঁদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শীতকাতরতা দেখে আবৃত্তি করলেন–

পরকালেই আসল জীবন, দুনিয়ারটা শূন্য
মুহাজির আর আনসারে দাও গো রহম-পূণ্য!

মহানবীর [সা] কণ্ঠে এ ধরনের আর্শিবাদ বাণী শুনে সাহাবীগণ উচ্ছ্বসিত হলেন এবং তাঁর প্রতিত্তোরে তাঁরাও আবৃত্তি করলেন:

শপথ নিলাম আজকে সবাই মুহাম্মদের হাতে
সারা জীবন করবো জিহাদ থাকবো তাহার সাথে।

সাহাবীগণের আবৃত্তি শুনে মহানবী [সা] আবেগে আপুত হয়ে আবারো আবৃত্তি করলেন:

সব রকমের ভালাই খোদা রাখছো জমা আখিরাতে
মুহাজির ও আনসারদের ঢাকো তোমার বারাকাতে।

মহানবী [সা] কর্তৃক এমন কবিতা আবৃত্তি এবং আসহাবে রাসূল কর্তৃক তার জবাব এভাবে কবিতার মাধ্যমে দেয়া সত্যিই বিস্ময়কর। হযরত আবু বকর [রা], হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব [রা], হযরত উসমান ইবনে আফফান [রা] এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিবসহ [রা] শীর্ষস্থানীয় সাহাবী এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শাসহ [রা] অনেক বড়মাপের মহিলা সাহাবীগণও নিজেদেরকে বড়কবিদের কাতারে শামিল হবার মতো কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে মহানবীর [সা] আন্তরিক প্রেরণা এবং অসাধারণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান মূল ভূমিকা পালন করেছে। তিনি কাব্যচর্চাকে শুধু অনুমোদনই করেননি বরং কবিদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে, বিভিন্ন উপলক্ষে পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে, সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নেয়া সত্ত্বেও গণিমতের মালের সমান ভাগ এমনকি কখনো বেশিভাগ প্রদান করে এবং এমনকি কবিতার আড্ডার জন্যে মসজিদে নববীতে আলাদা মিম্বার তৈরি করে দিয়ে নজীর বিহীন পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন সময়ে কবিকুল শিরোমণি হযরত হাসসান বিন সাবিত [রা] উক্ত মিম্বারে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। মহানবীর [সা] উপস্থিতিতে মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির জলসা বর্তমান সময়ের মসজিদসমূহের পরিবেশ দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে



www.pathagar.com

বৈকি। মহানবী [সা] কবিদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করাকে পিতামাতাকে সাহায্য করার সাথে তুলনা করেছেন। তাই কবি আসাদ বিন হাফিজ মন্তব্য করেছেন, 'সন্তানের কাছে পিতামাতার যে মূল্য, সভ্যতার কাছে কবির মূল্য তেমনি। সন্তান পিতা-মাতার কাছে ঋণী আর জাতি ঋণী কবির কাছে। এ বাণীর মাধ্যমে মহানবী [সা] বলতে চেয়েছেন, জাতি যেনো সে ঋণ পরিশোধ করে।'

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে, মহানবী [সা] কোন মানসিকতার কবি ও কবিতার জন্য এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন? তাঁর জবাবে এক কথায় বলা যায়, যে কবিরা নিজে বিশ্বাসে অটল থেকে তার বিজয়ে নিজেকে যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে মহানবীর [সা] আদেশ-নির্দেশের দিকে চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে থাকতেন; যে কবিতার পংক্তি বিশ্বাসকে তরান্বিত করেছে; জীবনকে দীন বিজয়ের জন্যে নিবেদিত করতে আহ্বান জানায়। কবিতার আর্ট হিসেবে জাহিলিয়াতের অশ্লীলতাকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে যারা সভ্যতার সুনির্মল আবহে কবিতার কাব্যময়তা বির্নিমাণে সফল হয়েছেন সে সব কবিই পেয়েছেন মহানবীর [সা] পৃষ্ঠপোষকতা এবং যে কবিতার পংক্তি বিশ্বাসকে প্রভূ প্রেমের মণিকোঠায় পৌছে দিতে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, উজ্জীবিত করে জীবনবোধ-মননশীলতা ও সত্যিকার মানুষের প্রতিকৃতি সে কবিতাই এনে দিয়েছে জান্নাত পাবার ঘোষণা। আজ আমাদেরও আত্মসমালোচনা প্রয়োজন, আমরা কি আধুনিক জাহিলিয়াতের অশ্লীলতাকে পরিহার করে সেই কবি ও কবিতার প্রতিচ্ছবি আঁকতে সমর্থ হয়েছি কিংবা যারা সেই প্রতিচ্ছবি আঁকতে পুরোপুরি খুলুসিয়াতসহ নিজেকে সমর্পিত করে কিছুটা হলেও সফলতার চেষ্টায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছেন আমরা তাঁদেরকে মহানবীর [সা] দেখানো আদর্শ মোতাবেক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে কি এগিয়ে এসেছি? যদি না পেরে থাকি তবে এখনি সময় আত্মসমালোচনার, এখনি সময় আত্মবিশেষণ এবং আত্মশুদ্ধির।



www.pathagar.com

# মহানবী [সা]-এর মৌলিক দর্শন প্রসঙ্গ কবিতা

**এ কে আজাদ**

পবিত্র কুরআন ও হাদীস মতে ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান যেমন ইসলাম দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনি দিয়েছে দিক নির্দেশনা। আলোচ্য কবিতা বিশ্বসাহিত্য তথা সমগ্র জ্ঞানের রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সুতরাং এমন একটি বিষয়ে কুরআন বা হাদীস কিছুই বলবে না তা হয় না। তাই তো কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ‘কবিগণ’ [আশশুয়ারা] নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা-ই নাজিল করা হয়েছে। আর মহা নবী [সা] তো পবিত্র কুরআনেরই প্রতিভূ। ফলে বাস্তবে কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত পথ প্রদর্শন করেছেন মহানবী [সা]। আর সেটিই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত কাব্য সমালোচক স্যার ফিলিপ সিডনী তার ‘অ্যান অ্যাপোলোজি ফর পোয়েট্রি’ গ্রন্থে লিখেছেন-Poetry is the mother of all knowledge [কবিতা হলো সকল জ্ঞানের মা]। অর্থাৎ পৃথিবীর যত জ্ঞান তাকে শৈল্পিক রূপে প্রকাশ করাই হলো মূলত: কবিতা। এই কবিতা মানুষের চিরকালীন নান্দনিকতার পরিচায়ক। আদিকাল থেকে চলে আসা মানুষের সুচারু প্রকাশভঙ্গিই হলো কবিতা। আবার আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোটামুটি প্রায় সব ভাষার সাহিত্যেরই আদিরূপ হলো কবিতা। ইসলাম যেহেতু সর্বাধুনিক জীবন বিধান, সেহেতু ইসলাম কী করে এই কবিতার বিষয়ে নীরব থাকতে পারে? আরও একটি বিষয় হলো এই যে, কবিতা লিখেন যে সমস্ত কবি, তারা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রভাবশালী বলতে অর্থ-বিত্তের দিক থেকে নয়, জ্ঞান গরিমার দিক থেকে, পান্ডিত্বের দিক থেকে। তাদের জ্ঞানের দ্বারা তারা সমাজে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। তারা সমাজকে আলোড়িত করতে পারেন, আলোকিত করতে পারেন এবং পুলকিত করতে পারেন। সুতরাং সমাজ বদলের ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে সীমাহীন ভূমিকা। সুতরাং এই কবি-সমাজ কিংবা কবিতা প্রসংগে ইসলামের মত এমন একটি



www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কিছু বলবে না তা কেমন করে হয়? হ্যাঁ, ইসলাম বলেছে। ভাল করেই বলেছে। যে ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, কবিতা প্রসঙ্গেও সে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। ইসলামের থিওরিটিক্যাল বা তাত্ত্বিক জ্ঞান হলো সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আর প্র্যাক্টিক্যাল বা বাস্তব প্রদর্শন হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় হাবীব, সর্বকালেরর শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ [সা]। হাদীস শরীফে এসেছে একবার নবী-পত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা]কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– রাসূলের জীবনাচার কেমন? উত্তরে হযরত আয়েশা [রা] পাল্টা প্রশ্ন করে বলেছিলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের হুবহু প্রদর্শনই ছিল রাসূলের জীবন। সুতরাং কবিতা সম্বন্ধে রাসূল [সা] তাঁর মন্তব্য ও মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শুধু মতামতই ব্যক্ত করেননি, তাঁর সাহাবীদের মাধ্যমে কবিতার মডেলও উপস্থাপন করেছেন মহানবী [সা]। কবিতা বিষয়ে তাঁর যে মৌলিক দর্শন তাও তিনি ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। তাঁর সেই দর্শনের দিকেই এবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কবিতা কি–এই প্রসংগে কিঞ্চিত আলোকপাত করার দরকার আছে বৈকি। মানব জীবনের সুখ দু:খ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, পাপ-পূণ্য, ধর্ম, অর্থ-প্রতিপত্তি, মোহ-মুক্তি, প্রেম-বিরহ, প্রকৃতির নানান উপাদান–এসব নিয়েই কবিতা লেখা হয়। এই কবিতার পুঁথিগত সংজ্ঞাও আছে। কবিতার কথা বলতে গিয়ে জনাব মাহবুবুল আলম তার 'বাংলা ছন্দের রূপরেখা' বইতে লিখেছেন–"প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবি-মনে সৃষ্ট বিচিত্র ভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করে ছন্দবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কবিতা বলা চলে"। শ্রীশ চন্দ্র দাশ তার "সাহিত্য সন্দর্শন" বইতে লিখেছেন- "মানব মনের ভাব কল্পনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমা মণ্ডিত চিত্রাত্মক রূপ লাভ করে তখন উহার নাম কবিতা"। কবি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা [রা] বলেন, "কবিতা এমন এক বিষয় যা আমার [কবির] অন্তরে উদিত হয়, অত:পর তাই আমার মুখ দিয়ে প্রকাশ করি।" রোমান্টিক যুগের কবিদের ভাষায় যাকে বলা হয়–সেল্ফ এক্সপ্রেশন [Self Expression]। ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন–Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, it takes it origin from emotions recollected in tranquility.... . S. T. Coleridge লিখেছেন- [Poetry is the] Best words in the best orders. Mathew Arnold লিখেছেন–Poetry is, at bottom, a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty.



www.pathagar.com

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কবিতা হলো জীবনের প্রতিচ্ছবি [Piture of life reflected in the mirror]। কবিতা জীবনের কথা বলে, সমাজের কথা বলে, সময় এবং প্রকৃতির কথা বলে।

এখন, আরব দেশের কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাদের কবিতায় তাদের জীবনাচার উঠে এসেছে বহুলাংশে। প্রাচীন আরবী সাহিত্যের সিংহভাগই হলো কবিতা। শুধু ভাষা ও সাহিত্যই নয়, আরবদের প্রাচীন অবস্থা তথা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অবস্থা জানতে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হয়-আরবদের কবিতার উপর। কবিতা হলো– 'Public Register of the Arabs' [পাবলিক রেজিস্টার অব দ্যা আরাবস্]। এ প্রসংগে বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সিরে কুরআন মুফাস্সির সম্রাট হযরত ইবনে আব্বাস [রা] বলেন–"যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোন অংশ পাঠ করে তার অর্থ বুঝতে না পার, তখন তার অর্থ তোমরা আরবদের কবিতার মধ্যে অনুসন্ধান করবে। কারণ কবিতা হলো আরবদের জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাদের জীবনালেখ্য।" আবার হযরত উমর [রা] বলেছেন–"তোমরা [আরবরা] তোমাদের দীওয়ান তথা জাহেলী যুগের কবিতা সমগ্র সংরক্ষণ করে রাখবে, তাহলে তোমরা গোমরাহ হবে না। কারণ, তাতে তোমাদের কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যা রয়েছে এবং রয়েছে তোমাদের ব্যবহৃত বাক্য সমূহের অর্থ।"

কিন্তু এই কবিতা চর্চাকে অনেকেই ভাল চোখে দেখেন না। এমন কি ইমাম শাফিঈ [রহ] তো বলেই ফেলেছেন–'কবিতা চর্চা আলিমদের জন্য দোষণীয় না হলে, আমি লবীদ এর চেয়েও বড় দরের কবি হতাম।' কবিতার প্রতি এহেন বিরূপ ধারণা কেন? কেনই বা এর প্রতি পলায়নপর মনোবৃত্তি। সেই উত্তর খুঁজতেই কবিতা সম্বন্ধে রাসূল [সা] এর দর্শন কি–তা জানা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ।

ইতিহাস বলে, আল কুরআনের তাত্ত্বিক জ্ঞানেরই সম্মিলন ঘটেছে মহনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর জীবনে। কোন বিষয়ে মহানবী [সা]-এর যে দর্শন তার মূল সূত্র রয়েছে আল কুরআনেই। জীবন ও জগত সম্বন্ধে আল কুরআনের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তারই সফল বাস্তবায়ন হলো রাসূলের জীবন। সুতরাং কবিতা সম্বন্ধে রাসূল [সা]-এর মৌলিক দর্শন কি তা জানার পূর্বে পবিত্র কুরআন শরীফ কবিতা সম্পর্কে কি বলে তা একবার জেনে নেয়া যাক।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন শরীফে 'কবিগণ' [আশশুয়ারা] নামে একটি সুরাই নাজিল করেছেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এই সূরাটির ২২৪ থেকে ২২৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক কবিদের বৈশিষ্ট এবং দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেই সাথে নির্যাতন ও জুলুমের বিপরীতে সর্বাত্মক আন্দোলনের অংশ যে কবিতাও হতে পারে সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–"[২২৪] এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। [২২৫] [হে রাসূল] আপনি কি দেখেন না, ওরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে উপত্যকায় উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? [২২৬]



www.pathagar.com

এবং তারা যা করে না, তা বলে। [২২৭] কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে। আর তারা অত্যাচারিত হবার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শিঘ্রই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?”

পবিত্র কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা কবিদের সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাই তা হলোঃ

যারা শুধুমাত্র ছন্দ মিলকারী এবং উদ্ভ্রান্ত রূপে ভ্রমণকারী তারাই কেবল নিন্দিত এবং নিরুৎসাহিত। আর তাদেরকে অনুসরণ করাও নিষিদ্ধ।

শুধু মুখে বলা কিন্তু কাজ না করা নিন্দিত ও নিষিদ্ধ।

শুধু কবিতা লিখলেই হবে না, ঈমানদার হতে হবে এবং সৎকর্ম করতে হবে।

সকল কাজে আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে হবে।

অত্যাচারিত হলে অবশ্যই সে অন্যায় ও জুলুমের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করতে হবে।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ জগতের সকল অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হবে।

উক্ত আয়াতগুলোতে কোন্ কবিদেরকে অনুসরণ করা যাবে না এবং কোন কবিদেরকে অনুসরণ করতে হবে তা বলা হয়েছে। সেই সাথে অন্যায়, অবিচার এবং সকল প্রকার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে কবিতা লেখার ব্যপারে মহান আল্লাহ পাকের পরোক্ষ নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। কবিতা লেখার ব্যপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরোক্ষ নির্দেশ থাকলেও তাঁর রাসূল [সা] কিন্তু সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন–“যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সা]কে সাহায্য করেছে, কথা [কবিতা] দ্বারা সে সাহায্য করতে তাদেরকে কিসে বাধা দিয়েছে” [ইবনে হিশামঃ আস্‌সিরাতুন নাবিয়া]। অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল [সা]কে সাহায্য করতে তিনি সরাসরি সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তারা কবিতা লিখে সে কাজটি কেন করছে না এবং কোন্ জিনিস্ সেই কবিতা লেখা থেকে ঈমানদাদেরকে বিরত রেখেছে তা জানতেও তিনি প্রশ্ন রেখেছেন। তার মানে–ন্যায় ও নীতির পক্ষে কবিতা না লিখলেই তিনি বরং অখুশী হতেন। তাহলে এ থেকে বুঝা যায় যে, আহ্বানের মাধ্যমে মহানবী [সা] কবিতা সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণাঙ্গ এবং সুস্পষ্ট মনোভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করেছেন। কবিতা সম্বন্ধে মহানবী [সা]-এর মৌলিক দর্শনও এই এখানেই নিহিত। এই বিষয়টিকে আমরা আর একটু বিস্তারিত করতে চাই। কবিতা বিষয়ক বিভিন্ন হাদীস ও তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলে কবিতা সম্বন্ধে মহানবী [সা]-এর নিম্নোক্ত পয়েন্ট ভিত্তিক দর্শন আমরা খুঁজে পাই।

**১। সত্য ও সুবচন**

রাসূল [সা] বলেছেন–“কবিতা হলো সুসামঞ্জস্য কথামালা।” চয়নকৃত সুন্দর শব্দগুলোকে পুঁতির মত সাজিয়েই একজন কবি কবিতা তৈরী করেন। ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি এস টি কোলরিজের “বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া” গ্রন্থে আমরা রাসূলের



www.pathagar.com

সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তিনি লিখেছেন কবিতা হলো–"Best words in the best orders".
রাসূল [সা] আরও বলেছেন–"যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ, সে কবিতা সুন্দর; আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে সে কবিতায় কোন মঙ্গল নেই।" [ইবনে রাশিক, আল কায়রাওয়ানী, কিতাবুল উমাদা] অর্থাৎ কবিতা যদি সত্যাশ্রয়ী হয় এবং তা যদি দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য লিখিত হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ তো নেই-ই, বরং তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

**২। কবিতা আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী এবং অশ্লীল হবে না**

কোন কোন কবিতা হয় আল্লাহ ও রাসূল [সা] বিরোধী, আবার কোন কোন কবিতা হয় অশ্লীল। ফলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। মানুষের নৈতিক স্খলন দেখা দেয়। সে কারণেই রাসূল [সা] বলেছেন–"তোমাদের কারো পেটে মন্দ কবিতা থাকার চেয়ে সে পেটে পুঁজ জমে তা পঁচে যাওয়া অনেক উত্তম" [বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফ]। হাদীসটি শুনে হযরত আয়েশা [রা] বলেছিলেন, রাসূল [সা] কবিতা দ্বারা ঐ সমস্ত কবিতা বুঝিয়েছেন যাতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে। [জাবী যাদাহ, আলী ফাহমী, হুনুস-সাহাবা]।

**৩। ভাল কবিতা ভাল**

রাসূল [সা]-এর মতে কবিতা হলো এক ধরণের কথামালা। আর কথার মধ্যে যেগুলো উত্তম এবং সুন্দর, কবিতার মধ্যেও সেগুলো উত্তম এবং সুন্দর। আর কথার মধ্যে যেগুলো খারাপ ও ঘৃণিত, কবিতার মধ্যেও সেগুলো খারাপ ও ঘৃণিত। ইমাম বুখারী [রহ] তাঁর আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে এই মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে–"রাসূল [সা] বলেছেন–কবিতা কথার মতই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর। আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।" অর্থাৎ খারাপ কবিতায় পাপ থাকলেও ভাল কবিতায় কোন পাপ নেই। বরং ভাল কবিতায় সওয়াব নিহিত আছে।

**৪। কবিতার বর্ণনা ভঙ্গি হবে যাদুময়**

মহানবী [সা] বলেছেন–কবিতা তো বাক্য, আর বাক্যের মধ্যে খারাপও থাকে, ভালও থাকে। আবু দাউদ শরীফের অপর এক হাদীসে আছে, ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক বেদূইন রাসূল [সা]-এর কাছে এসে [কবিতার ভাষায়] আলাপ করতে লাগলো। তার আলাপে বিমোহিত হয়ে রাসূল [সা] বললেন, কোন কোন বর্ণনায় যাদু আছে, আর কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের কথা।" অর্থাৎ কবিতায় যে যাদুময় বর্ণনা ভঙ্গি, তার প্রশংসা করেছেন মহানবী [সা]। সেই সাথে যে কবিতায় জ্ঞানের কথা আছে, সেই ধরনের কবিতা লেখার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন মহানবী [সা]। তাঁর মতে অযথা অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কবিতার থেকে অর্থবহ জ্ঞানপূর্ণ কবিতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি।


www.pathagar.com

**৫। কবিতা হলো এক প্রকার জিহাদ এবং মসজিদের ভেতরে কবিতা**

সাধারণত দুই ধরনের যুদ্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করি। যথা- ১. সামরিক যুদ্ধ এবং ২. স্নায়ু যুদ্ধ বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ। সব সময়ই সামরিক যুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে না, এবং প্রায় সময়ই তা সংঘটিত হয়ও না। কিন্তু বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে স্নায়ু-যুদ্ধ বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ প্রায়শই লেগে থাকে। সেই যুদ্ধে কবিতা হতে পারে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। প্রাচীন যুগে এমন অনেক দেশেই গোত্র সমূহের মাঝে এমন কবিতার যুদ্ধ লেগে থাকত। বিশেষ করে আরব দেশে গোত্র সমূহের মধ্যে কোন্ গোত্র শ্রেষ্ঠ তা নির্ধারিত হত সংশ্লিষ্ট গোত্র সমূহের মধ্যে কবিতার লড়াইয়ে। যে গোত্রের কবি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করত, সেই গোত্রই হত শ্রেষ্ঠ গোত্র। এ রকম বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে কবিদেরকে ভূমিকা পালন করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল [সা]। তিরমীজী শরীফের এক হাদীসে হযরত আনাস [রা] বর্ণনা করেন যে, রাসূল [সা] উমরাতুল কাজার সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। [কবি] আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাঁর সামনে সামনে চলছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করছিলেন–"কাফির গোষ্ঠিকে তদের পথ থেকে ছেড়ে দাও/আজ তাদেরকে এমন মার দেব যে, দলকে তাদের সর্দার এবং নেতাকে তার আরাম করার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেব/ এবং বন্ধুকে ভুলিয়ে দেব তার বন্ধুকে।"

তখন হযরত উমর [রা] তাকে বললেন–"হে ইবনে রাওয়াহা, রাসূলের সামনে এবং আল্লাহর হারাম শরীফের মধ্যে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছ? রাসূল [সা] তাকে বলেলেন– "উমর থামো, এটা নিশ্চয়ই তাদের [কাফেরদেরকে] তীর নিক্ষেপের চেয়ে দ্রুত বিদ্ধ করবে।" উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা [রা] বলেন– মহানবী [সা] বললেন– "তোমরা কাফির মুশরিকদের নিন্দা করে কাব্য লড়াইয়ে নেমে পড়। কেননা তীরের ফলার চেয়ে তা আরও বেশী আহত করবে তাদের।"

এ প্রসংগে কবি সাহাবী হযরত কাব বিন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–রাসূল [সা] আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন–"যাও তোমরা মুশরিকদের প্রতিপক্ষে কবিতার লড়াইয়ে লেগে যাও। কারণ মুমিন জিহাদ করে জান ও মাল দিয়ে। মুহাম্মদের আত্মা যার হাতের মুঠোয় তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতা তীরের ফলা হয়ে তাদের কল্‌জে ঝাঁঝড়া করে দেবে।"

মসজিদের ভেতরে অনেকে কবিতা পড়া হারাম মনে করেন। রাসূল [সা] কিন্তু তা করেননি, উল্টো উৎসাহ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় কবি হাস্‌সান বিন সাবিতকে তো মসজিদে নববীর ভেতরে কবিতা আওরানোর জন্য মেম্বারই তৈরী করে দিয়েছিলেন।

**৬। রাষ্ট্রীয়ভাবে কবিকে নিয়োগ প্রদান**

ইতিহাস থেকে জানা যায়- বিভিন্ন সময়ে রাজ দরবারে কবিদেরকে রাজার পাশে রাখা হতো। তাদের কাছে বুদ্ধি পরামর্শ নেয়া হত। আল্লাহর রাসূল [সা]ও সে রকম মনোভাব পোষণ করতেন এবং কবিদেরকে তাঁর বৈঠকসমূহে উপস্থিত রাখতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির ইবনে সামুরা [রা] বলেন–"আমি রাসূল [সা]-এর সাথে প্রায় একশতটিরও অধিক



www.pathagar.com

বৈঠকে বসেছি। বৈঠকে তাঁর কবি সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন [এবং ঠাট্টা করতেন] আর রাসূল [সা] তখন চুপ থাকতেন, আবার তাদের সাথে হাসিতে যোগ দিতেন এবং মুচকী হাসতেন।" [জামে আত তিরমিযী]। এ থেকে বুঝা যায় যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কবিদেরকে রাসূল [সা] সাথে রাখতেন, বুদ্ধি পরামর্শ করতেন, কবিতা শুনতেন এবং আনন্দ বোধও করতেন।

৭। **শ্রান্ত মনে কবিতা শ্রবণ**

শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বৈঠকাদিতেই কবিদেরকে সঙ্গে নিতেন না মহানবী [সা], বরং ক্লান্তি ও শ্রান্তিতেও কবিতা শুনেছেন এবং প্রশান্তি বোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে জাবী যাদাহ গ্রন্থে একটি হাদিসের আলোকপাত করা হয়েছে। হাদিসটিতে বর্ণিত হয়েছে যে–আয়েশা [রা] বলেন–একদা রাসূল [সা] জুতা সেলাই করছিলেন। আর আমি বসে গজল আবৃত্তি করছিলাম। অত:পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাঁর কপাল ঘামছে এবং ঘামের বিন্দু থেকে নূর পয়দা হচ্ছে। তখন আমি অকস্মাৎ থেমে গেলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন, বললেন–কি হল, থামলে কেন? আমি বললাম–ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দেখলাম আপনার কপাল ঘামছে আর সে ঘাম থেকে নূর পয়দা হচ্ছে। আবু কাবীর আল হুযালী [কবি] যদি আপনাকে দেখত তাহলে সে অবশ্যই বুঝত যে আপনিই তার কবিতার [বিষয়বস্তু হিসেবে] বিশী উপযুক্ত। তিনি বললেন, হে আয়শা! আবু কাবীর-আল হুযালী কি বলেছে? আমি বললাম কবিতার দু'টি শ্লোক–"........./ আর তুমি যখন তার মুখ মন্ডলের দিকে তাকাবে/ তখন দেখতে পাবে তা যেন মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় চমকাচ্ছে।" আয়শা বললেন–অত:পর রাসূল [সা] তাঁর হাতের কাজ রেখে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার দু'চোখের মাঝখানে চুমু খেতে খেতে বললেন, আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমি তোমার উপর যেরূপ সন্তুষ্ট আছি আমার উপর সেরূপ তোমার সন্তুষ্টির কারণে।"

৮। **কবিতার সরল ভাব ও ভাষা**

রাসূল [সা]-এর মতে কবিতা হবে সরল ভাব-সম্পন্ন এবং সহজবোধ্য ভাষায়, যাতে জনগণ সহজে কবিতার মর্মার্থ বুঝতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ আমরা নিতে পারি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিন কুরায়শ কবি আবদুল্লাহ ইবনে আজ্ জিবারা, আবু সুফিয়ান আল হারিছ এবং আমর ইবনুল আস্ রাসূল [সা]কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখত। এক সময় এর মাত্রা বহুলাংশে বেড়ে গেল। এটা দেখে রাসূল্লাহর [সা]-এর এক সাহাবী হযরত আলী [রা]কে এসে ধরলেন বিদ্রুপাত্মক কবিতার মাধ্যমে এর জবাব দেয়ার জন্য। হযরত আলী [রা] বললেন, জবাব তো দেয়া যায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন মহানবী [সা]-এর অনুমতি। সেই সাহাবী চলে গেলেন রাসূল্লাহ্র কাছে। হযরত আলীর জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মহানবী [সা] বললেন, এই কাজের জন্য আলী যথোপযুক্ত নয়। [কারণ আলীর কবিতার ভাষা উচ্চাঙ্গের এবং ভাবের গভীরতা বুঝা সর্বসাধারণের



www.pathagar.com

জন্য বেশ কঠিন। চলমান কাব্যধারায় আঘাত আসছিল সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায়। এর জবাবও সেভাবেই দেয়া প্রয়োজন।] তখন হাসসান বিন সাবিতকে এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়।

**৯। সঠিকভাবে জেনে শুনে মন্দের কটাক্ষ করা**

কাফির মুশরিকদের মন্দ কাজকে কটাক্ষ করে কবিতা লিখতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল [সা]। তার মানে এই নয় যে, না জেনে না শুনে ইচ্ছে মত যা খুশী তাই বলা যাবে বা লেখা যাবে। পাপকে ঘৃণা করতে হবে, পাপীকে নয়। পাপীকে বুঝিয়ে সৎ পথে আনাই একজন মুমিনের দায়িত্ব। শুধুমাত্র মন্দকেই তিরষ্কার করতে হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। যখন কুরায়শরা রাসূল [সা]-এর কৎসা রটাতে লাগলো তখন কবি হাস্‌সান বিন সবিতকে রাসূল [সা] নির্দেশ দিলেন, "তুমি আবু বকরের কাছে যাও, তিনি তোমাকে কুরায়শদের দোষ ক্রুটি জানিয়ে দেবেন।" [তিরমীযী]। আর তুমি তাদেরকে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করবে। আবার তিনি হাসান বিন সবিতকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমি তো কুরায়শ। তুমি কিভাবে কুরায়শদেরকে নিন্দা করবে?" উত্তরে তিনি বললেন, "মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করা হয়, আমি তো সেভাবে আপনাকে বের করে আনবো।" [ড: শওকী দায়ক; তারিখুল আদাবিল আরাবী]।

**১০ ।সুন্দরের চর্চা**

কবিতা যদি সুন্দরের চর্চা হয়, তাহলে সে কবিতায় তো সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষের আগ্রহ থাকবেই। তাই তো রাসূল [সা] বহু কবিতা হৃদয় ভরে শুনেছেন, আরও অধিক শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সাহাবী শারীদ আছ ছাকাফী [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি একবার রাসূল [সা]-এর পেছনে [সম্ভবত উটের পিঠে] আরোহী ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি বললেন- তোমার কি উমাইয়া ইবনে সালতের কবিতা জানা আছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন- আবৃত্তি কর। আমি একটা আবৃত্তি করলে, তিনি বললেন আরও শুনাও। এমনি করে আমি একশ'টি কবিতা/শ্লোক আবৃত্তি করলাম।" [সহীহ মুসলিম শরীফ] অপর এক বর্ণনায় আছে যে, "কবিতা শুনে রাসূল [সা] বলেছিলেন- এ ব্যক্তির জিহবা ঈমান এনেছে কিন্তু তার অন্তর কুফরী করছে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, উমাইয়া ইবনে সালতের মত একজন মুশরিকের কবিতা শুনতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। কারণ তার কবিতার বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা ভঙ্গী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।

**১১। নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরে কবিতা**

নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে কবিতা লেখার প্রতি নির্দেশ ছিল মহানবীর [সা]। একবার তামীম গোত্রের একদল প্রতিনিধি রাসূল [সা]-এর দরবারে সাক্ষাত করতে এলো। তাদের মধ্যে কবি যিবরিকান ইবনে বদর ছিলেন। রাসূলের সামনে তিনি স্বীয় গোত্রের গর্বমূলক কবিতা দম্ভ ভরে আবৃত্তি করলেন। রাসূল [সা] হযরত হাস্‌সান [রা]কে তার জবাব দেয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে কবিতা রচনার



www.pathagar.com

নির্দেশ দিলেন। হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত [রা] তামীম গোত্রের দোষক্রুটি তুলে ধরে এবং মুসলিম ঐতিহ্যের আলোকে কবিতা শোনালেন। তারা মুগ্ধ হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

**১২। ভাল কাজের প্রশংসা করে কবিতা**

খারাপ কাজের নিন্দা করে বা কটাক্ষ করে যেমন কবিতা রচনার নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী [সা], তেমনি ভাল কাজের প্রশংসা করে কবিতা রচনারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একবার কবি হাস্‌সান বিন সাবিত [রা]কে মহানবী [সা] জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবু বকর [রা]কে নিয়ে কোন কবিতা কি এ পর্যন্ত লিখেছো? কবি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূল [সা] বললেন, শোনাও তো দেখি। কবি শোনালেন, "সুউচ্চ সওর গুহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনি/ [যখন] রক্তলোলুপ শৃগালেরা শুঁকে শুঁকে শিখরে এলো/ রাসূলের সঙ্গে ছিলেন সদা এক ছায়া তরু/ সবাই জানে নবীর পরে তিনিই সৃষ্টির মাঝে সবার সেরা।" রাসূল হেসে বললেন, "ঠিক বলেছ হাস্‌সান। যা বলেছ তার যোগ্য তিনিই"।

**১৩। আবেগ কল্পনার সাথে চাই কবি জীবনের বাস্তবতা**

একজন প্রকৃত মানুষের কাজ হবে তাই যা সে অন্তরে বিশ্বাস করে। প্রকৃত কবি তো তিনিই, যিনি নিজের অন্তরের বিশ্বাসকে কাজে রূপদান করেন এবং তিনি যে কাজ করেন তা একাগ্র নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথেই করেন। এজন্য কবিদেরকে বড় ভালবাসতেন মহানবী [সা]। কবিদের প্রতি তাঁর আস্থাও ছিল সুগভীর। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। রাসূল [সা] বিভিন্ন সময় তার উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতেন। এই কবি যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন রাসূলের নির্দেশে। আল্লাহর রাসূল [সা] তার উপর এতটাই আস্থা রাখতেন যে, একবার ইসলামী রাষ্ট্রের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেন তিনি। সৌভাগ্যবান এই কবি যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করে মহানবীর আস্থার যথার্থতাই প্রমাণ করেন।

এছাড়াও কবিতা প্রসঙ্গে মহানবী [সা]-এর যে দর্শন তার অন্তর্ভূক্ত ছিল: সত্য ও সুন্দরের চর্চা, নিজ বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা, মানুষের কল্যাণে ও মার্জিত ঢঙে কবিতা চর্চা, সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যকে জয়ী হিসেবে প্রকাশ করা সৎ সাহসের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, সঠিক মত ও পথে কবিতা চর্চার মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ইত্যাদি

**কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী [সা]**

কবি ও কবিতা সম্বন্ধে মহানবী [সা]-এর দর্শনের একটা অংশ জুড়ে আছে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা। মহানবী [সা] কবিদেরকে শুধুমাত্র দিক নির্দেশনাই দেননি, কবিদেরকে নানাভাবে পুরষ্কৃতও করেছেন। কবিদেরকে গণিমতের মালের অংশ দিয়েছেন, ফলের বাগান দিয়েছেন, সুন্দরী রমণীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, গায়ের চাদর খুলে দিয়েছেন। এমন কি শুধুমাত্র সুন্দর



www.pathagar.com

কবিতা রচনার জন্য কাব বিন যুহায়র নামক একজন কবির মৃত্যুদন্ডও মাফ করে দিয়েছেন মহানবী [সা]। 'রাসূলের কবি' নামে খ্যাত কবি হাস্‌সান বিন সাবিতের জন্য তিনি মসজিদের মিম্বারে কবিতা চর্চার ব্যবস্থা করেছেন। সেই সাথে তার জন্য দোয়াও করেছেন যে, তার মুখ যেন বিনষ্ট না হয় এবং সত্যি সত্যি ১৩০ বছর বয়সে তার মৃত্যু পর্যন্ত তার মুখের সম্মুখ ভাগের দাঁত অক্ষত ছিল। এর চেয়েও বড় কথা যে, মহানবী [সা] কবি হাস্‌সান বিন সবিতকে জিবরাইল ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন- "আল্লাহুম্মা আইদিহি বিরুহিল কুদুস"। ইহকাল ও পরকালের সবচেয়ে বড় পুরস্কার- 'জান্নাত' এর সুসংবাদও তিনি আশারায় মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভূক্ত কবি হাস্‌সান বিন সবিতকে দিয়েছিলেন- "হে হাসান, তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হলো জান্নাত - জাযাউকা ইন্দাল্লাহিল জান্নাতা, ইয়া হাস্‌সান।"

মহানবীর এ দর্শন কি শুধুই কবিতার ক্ষেত্রে ?

সাহিত্য বলতে তো শুধুমাত্র কবিতা বুঝায় না। সাহিত্যের অনেক শাখা প্রশাখা আছে। তাহলে সেগুলো বিষয়ে কি রাসূল [সা]-এর কোন বক্তব্য নেই? না, ব্যপারটা তা নয়। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে। একটা বিষয় এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূল [সা]-এর যুগে যখন কুরআরন শরীফ নাজিল হয়, তখন এবং তৎপূর্ব যুগে সাহিত্য বলতে কেবল কবিতাকেই বুঝানো হত- তা সে জ্ঞানের সাহিত্যই হোক, আর ভাবের সাহিত্যই হোক। তখন সাহিত্যকে এখনকার মত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে ভাগ করা হত না। বরং সে সবের ঘটনা, অর্থ এবং তাৎপর্য যাই হোক না কেন তার প্রকাশ হত কাব্যে। এমনকি অতীত ঘটনা তথা ইতিহাসও বর্ণনা করা হতো কবিতায়। সুতরাং সাহিত্য বলতে ঐ একটা শাখাকেই বুঝানো হতো, আর তা হলো কবিতা। সুতরাং কবিতা সম্বন্ধে রাসূল [সা]-এর যে দর্শন তা সকল সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মের জন্যই প্রযোজ্য, জ্ঞানের সকল বিভাগের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কবিতা বিষয়ে পবিত্র কুরআন শরীফের যে দিক নির্দেশনা এবং মহানবী [সা] এর যে দর্শন, তা বর্তমান সময়ের কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, প্রবন্ধকারসহ জ্ঞানের সকল সেক্টরের সৃষ্টিশীল লেখকদের জন্যই অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কবিতা বিষয়ে মহানবী [সা]-এর দর্শন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। কবিতা একটি আর্ট। এ আর্ট অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্ক প্রসূত হবে। এ আর্ট হবে জীবনের কল্যাণে সুন্দরের চর্চা। মিথ্যার বিপরীতে সত্যের জয়গানই হবে কবিতার মূল লক্ষ্য। কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দের যে নান্দনিকতা তা হবে কেবলই সত্য, সুন্দর ও সভ্য জগত বিনির্মাণে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা কখনোই সুন্দর হতে পারে না। কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে মহানবী [সা]-এর যে দিক নির্দেশনা তার বাস্তব প্রয়োগই কবিতা সহ সৃষ্টিশীল সাহিত্যের জগতকে করতে পারে পরিশুদ্ধ। কবিতা বিষয়ে রসূলের যে শিক্ষা, তাঁর যে দর্শন, তা চিরকালই সাহিত্য-প্রেমিকদের পথের পাথেয় হয়ে থাকবে



www.pathagar.com

এবং তার অনুসরণই সাহিত্যাঙ্গনকে করতে পারে পূত-পবিত্র, কবিতাকে করতে পারে মানব জীবনের প্রকৃত দর্পণ।

## তথ্য সহায়িকা


১. তাফসীরে মারেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী- অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. তাফহীমুল কুরআন - সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী [রহ] অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম
৩. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস - ড.আ.ত.ম. মছলেহউদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৪. কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল [সা] ও সাহাবীদের মনোভাব - ড.আব্দুল জলিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৫. কবিদের জন্য রাসূলের দিক নির্দেশনা [প্রবন্ধ] আসাদ বিন হাফিজ–সাহিত্য সংস্কৃতি [২০১০], সম্পাদনা–কবি মোশাররফ হোসেন খান- প্রকাশনায় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।
৬. বাংলা ছন্দের রূপরেখা - ড. মাহবুবুল আলম
৭. সাহিত্য সন্দর্শন - শ্রীশ চন্দ্র দাশ
৮. Biographia Lieteraria - S.T.Coleridge
৯. Apology for Poetry – Sir Philip Sidney
১০. সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী [সা] - সম্পাদনায় মুকুল চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
১১. The Study of Poetry – Mathew Arnold
১২. Preface to the Lyrical Ballads – William Wordsworth

www.pathagar.com

# কাব্য-সাহিত্য চর্চায় রাসূলের [সা] প্রণোদনা

**মুস্তাফা মনজুর**

**এক.**

রাসূল [সা]। তিনি ছিলেন তুলনারহিত এক অসাধারণ মহামানব। ছিলেন মানুষ ও মানবতার শিক্ষক। তিনি ছিলেন শিক্ষকের শিক্ষক। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রয়াসে তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধ এক নতুন আলোকিত মাত্রা পেয়েছিল। তিনি শুধু সমাজ-সংস্কারই করেননি, বরং সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি রাসূল [সা] একই সাথে শাসক, সমরবিদ, সেনাপতি, সমাজ-সংস্কারকসহ সকল দিকে তাঁর ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এমনই একজন মহামানব তিনি, যিনি শিল্প-সাহিত্য ও আসহাবে রাসূলের [সা] কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেও রেখে গেছেন অতুলনীয় ভূমিকা। রাসূলের [সা] প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় সাহাবী-কবিগণ তাঁদের কাব্যচর্চার ধারা বেগবান করে তুলেছিলেন। তাঁদের রচিত সেইসব কাব্যসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত বলেই আজও সেসব নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়।

রাসূলের [সা] সাহায্য, সহযোগিতা, প্রেরণা ও উৎসাহে যেসকল সাহাবী-কবির উত্থান ঘটেছিল, এবং যাঁরা কাব্যসাহিত্যে অমরতার সাক্ষর রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী [রা] অন্যতম। তাঁর কাব্যসাহিত্য নিয়েই আজকের এই যৎকিঞ্চিত পর্যালোচনা।

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সাইয়িদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবীয়্যীন. বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী–হযরত আলী [রা] ইবনে আবূ তালিব। সুবিচারের জন্য তিনি 'শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। বিভিন্ন সশস্ত্র জিহাদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র রচনা, নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদের সাথে চুক্তিপত্র রচনা, কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলনে হযরত আলীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিল। কৃষক-শ্রমিক তথা সকল শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি। অনন্য মগ্নতায় তিনি নামায সম্পন্ন করতেন এবং আল্লাহর প্রেমে কখনো কখনো



www.pathagar.com

সংজ্ঞা হারাতেন। তিনি নাযিলকৃত আয়াত লিখে রাখতেন এবং রাসূলাল্লাহ [সা]-এর সাথে আলোচনা করতেন। আল কুরআনের ভাষ্যে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। অনন্য জ্ঞান প্রজ্ঞার পাশাপাশি রাসূলাল্লাহ [সা]-এর বিশেষ নৈকট্যে থেকে সূরা নাযিলের প্রেক্ষিতসহ আয়াতসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ লাভ করেন তিনি।

মহান সাহাবী ও খলীফা হযরত আলী [রা] আরবী সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। সশস্ত্র জিহাদসমূহে তাঁর ভূমিকা কিংবদন্তীতুল্য। তিরাশিটি সশস্ত্র জিহাদে বিজয়ী হন তিনি। বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ [সা] নবুওয়াত লাভ করেন সোমবারে এবং হযরত আলী [রা] ইসলাম গ্রহণ করেন পরদিন মঙ্গলবার। ইসলাম গ্রহণের পর সত্য অবলম্বন করে থাকা ও প্রচারের কাজে তিনি নানাভাবে নির্যাতিত হন। হিজরতের সময় রাসূলাল্লাহ [সা] প্রতিনিধিরূপে আমানতকারীদের কাছে আমানত ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করে তাঁর নিজের বিছানায় তাঁকে রেখে যান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সেখানে থেকে মারাত্মক বিরূপ পরিস্থিতি মুকাবিলা করে আমানতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দিয়ে সপরিবারে মদিনায় হিযরত করেন।

ইসলামের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ জিহাদ–বদরে তিনি বিপুল সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবীর জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। বিধর্মীরা তাঁকে ঘিরে ফেললো। তিনি নিজ অবস্থান থেকে ছুটে এসে তাদের ব্যূহ ভেদ করে নবীজীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। খন্দকের সশস্ত্র জিহাদে আমির ইবন আবদে উদ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালে তিনি এগিয়ে যান ও সবাইকে অবাক করে তাঁর জুলফিকারে ইবনে আবদে উদকে হত্যা করেন।

খায়বারের জিহাদে কঠিন ভাগ্য পরীক্ষা। মুসলিম বাহিনীর কোনো সেনাপতি জয়ী হতে পারছিলেন না। রাসূলাল্লাহ [সা] বলেন, 'আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেবো, যিনি আল্লাহ ও রাসূলকে অত্যধিক ভালবাসেন এবং আল্লাহ তাঁর দ্বারা বিজয় লাভ করাবেন। তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবেন না।' হযরত আলীর চোখের রোগ রাসূলাল্লাহ [সা]-এর দোয়ায় মুহূর্তে নিরাময় হলো। রাসূলাল্লাহ [সা] তাঁকে পতাকা প্রদান করে বললেন, 'হে আলী! পতাকা গ্রহণ করো এবং তা নিয়ে অগ্রসর হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করেন।' যুদ্ধে ঢাল হাতছাড়া হয়ে গেলে তিনি দুর্গের কপাট খুলে ঢালরূপে ব্যবহার করেন এবং যুদ্ধ শেষে তা দূরে নিক্ষেপ করেন। একমাত্র তাবুক অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, রাসূলাল্লাহ [সা] তাঁকে মদিনা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

তিনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখেন ও প্রথম তিন খলীফার শাসনকালের পঁচিশ বছর সহযোগিতা দান করেন। তিনি হযরত উমর [রা]-কে হিযরত হতে মুসলিম সন গণনার পরামর্শ দান করেন। হযরত উমর [রা] বলেন, 'আলী না হলে উমর ধ্বংস হতো।' হিজরীর শেষ দিক থেকে ৪০ হিজরীর ১৭ রমযান



www.pathagar.com

পর্যন্ত খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পরিচালনা করেন তিনি। ২১ রমযান রাতে ৬৩ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। রবিবার রাতে তাঁকে কুফায় দাফন করা হয়।

হযরত আলীর [রা] অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা ছিল। অধ্যাপক পি.কে হিট্টি হযরত আলীকে [রা] 'মুসলিম সাহিত্য ও শৌর্যবীর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মূল্যায়ন করেন।' ঐতিহাসিক গীবন বলেন, 'জন্ম, আত্মীয়তার বন্ধন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলীকে [রা] এত বেশি মহিমান্বিত করেছিল যে, আরবের শূন্য সিংহাসনের দাবি করা তাঁর জন্য অযৌক্তিক ছিল না। একজন কবি, একজন দরবেশ ও একজন সৈনিকের সমন্বিত গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তাঁর বাগ্মিতা ও সাহসিকতার কাছে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীই হার মানতো। মহানবী [সা] তাঁর কর্তব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর এই বন্ধুর কথা মনে রেখেছিলেন। তাঁকে তিনি নিজের ভাই, প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় মূসার বিশ্বস্ত হারুন হিসাবে আখ্যায়িত করে গেছেন।'

অনন্য বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন হযরত আলী [রা]। জনগণের উদ্দেশে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন, তার সংকলন গ্রন্থ বিখ্যাত 'নাহযুল বালাগা।' এতে তাঁর ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, জীবনবোধ ও আল্লাহর কাছে আত্ম-নিবেদনের আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সেই ভাষণাবলী প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন ও ভাষার লালিত্যে এক অতুলনীয় সাহিত্য-কর্মে রূপ গ্রহণ করেছে। আরবী ভাষার অমূল্য সম্পদ হিসাবে এ গ্রন্থ স্বীকৃত ও সম্মানিত। আরবী গদ্য ধারায় মাকামা সাহিত্যের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। শাশ্বত সর্বজনীন বাণীর ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন, কালোত্তীর্ণ ভাব ও অলংকরণ, গদ্য ধারায় ছান্দিক কুশলতা ও শিল্প-শোভনতা নাহযুল বালাগার মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে।

হযরত আলী [রা]-কে আরবী ব্যাকারণের জনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ দুয়েলী প্রথম আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন। হযরত আলী [রা] লিখেছেন অনেক কবিতা। পবিত্র হাদীস ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতে তাঁর অনেক কবিতা পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার বিভিন্ন সংকলনও হয়েছে। দীওয়ান-ই-আলী [রা] তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্য সংকলন। মুসলিম বিশ্বে তো বটেই, এর বাইরেও এ গ্রন্থের সমাদর ব্যাপক-বিশাল। সার্বজনীন কালোত্তীর্ণ বাণী ও শিল্প সৌন্দর্যে এ গ্রন্থ কালজয়ীর ভূমিকা পালন করছে। দীওয়ান শব্দের অর্থ কাব্যগ্রন্থ, কবিতা সংকলন। বিচারালয়ও এর অর্থ হয়। এককভাবে কোন কবির কাব্য-সমষ্টিকে বা একই গোত্রের কয়েকজনের কাব্যসংগ্রহকে দীওয়ান বলা হয়। দীওয়ান-ই-আলী [রা] মানে আলী [রা]-এর কাব্য সংকলন। আল্লামা শিবলী নুমানী এ গ্রন্থের মর্যাদা ও খ্যাতির ওপর মূল্যবান এক অভিমতে বলেন, 'আরবী কাব্য সাহিত্যে মুআল্লাকা, লামিয়াত ও আধুনিক আরবীয় গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের সুবিশাল জগতের মধ্যে দীওয়ান-ই-আলীর তুলনামূলক মূল্যায়নে এটা স্বচ্ছ হয় যে, ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়, মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতায়, নশ্বর পার্থিবতার মোহের বলয় ভেঙে চিরন্তন জীবনের আহ্বান কুশলতায়, সর্বোপরি মাবুদ ও বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্যের জন্য অনুপম



www.pathagar.com

আকৃতি-সমৃদ্ধ দীওয়ান-ই আলী [রা] একই সাথে তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্পান্বেষী মানুষের জন্য এক মূল্যবান উপহার এবং এর গতিময়তা কাল থেকে কালান্তরে, শতকের পর শতক পেরিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। দুর্ভাগ্যশত দৃষ্টিকোণগত সংকীর্ণতার যূপকাষ্ঠে দীওয়ান-ই-আলী [রা]-এর মত সার্বজনীন মানবতাবাদী বিশ্বসাহিত্যে যথাযোগ্য মূল্যায়ন ঘটেনি। খিলাফতের প্রতি বৈরী আঘাত থেকে এ সাহিতকর্মও রেহাই পায়নি। কারণ, এর কবি হযরত আলী [রা], খুলাফায়ে রাশেদীনের শেষ খলীফা ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ফলে, মযলুম মানুষের মুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য-কর্ম হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় এর আহ্বান উপস্থাপিত হয়নি। মানবিক মহিমার সর্বোচ্চ ঘোষণায় দীওয়ান-ই-আলী [রা] শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ছিল সেদিন, রয়েছে আজো এবং এর আবেদন আগামীর আবহমান মানুষের মিছিলেও শামিল থাকবে।'

হযরত আলী [রা]-এর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সুধীমহল কম-বেশি অবহিত আছেন। আরবী কাব্যক্ষেত্রে হযরত আলী [রা]-এর অমর অবদানের মধ্যে রয়েছে আনওয়ার আল-উকূল মিন আশআরী ওয়াসিইয়ী আর-রাসূল [রাসূল প্রতিনিধির কবিতাবলী জ্ঞানপ্রদীপ]। হি. ৮৯৭,/খৃ. ১৪৯২ সনে সাদী ইবন তাজী সঙ্কলিত এ গ্রন্থ বৃটিশ মিউজিয়াম [প্রথম] ৮/৫৭৭; আয়া সূফিয়া ৪২/৩৯৩৭; পাটনা ১: ৭৪৯, ১৯৫; লীডন ৫৮০; প্যারিস [প্রথম] ৩/৩০৮২; বৃটিশ মিউজিয়াম [দ্বিতীয়] ২/১২২৪; মিউনিখ [প্রথম] ২/৪৪১; ভ্যাটিক্যান [তৃতীয়] ৩৬৫; আলীগড় ৭,১৩৪ ও অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। হি. ৮৯০/খৃ. ১৭৮৫ সনে হুসাইন ইবন মুঈন আল-দীন-আল-মাইবুযী কর্তৃক ফারসী ভাষায়কৃত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লীডন ৫৭৯; বৃটিশ মিউজিয়াম [প্রথম] ৫৭৯/১৬৬৫; বৃটিশ মিউজিয়াম [দ্বিতীয়] ১: ১৯,২০; তেহরান ২: ৪/৪১৩ ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তিত্বকৃত এর ফারসী অনুবাদ হামবুর্গ [১,১৯১]-সংরক্ষিত রয়েছে।

মূলত হযরত আলীর [রা] কাব্য ও সাহিত্যকর্ম বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

## দুই.

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও আবারও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হযরত আলী [রা] ছিলেন একজন সুবক্তা ও বিখ্যাত কবি। তাঁর কবিতার একটি 'দীওয়ান' আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অনেকগুলি কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলি কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবী কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল ছিলেন এতে পণ্ডিতগণের কোন সংশয় নেই। 'নাহজুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

হযরত আলীর [রা] কবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্রধর্মী। বংশ অহমিকা, মূর্খের সাহচর্য, যুগের বিশ্বাসঘাতকতা, যুগ-যন্ত্রণা, দুনিয়ার মোহ, দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা, সহিষ্ণুতার মর্যাদা,



www.pathagar.com

বিপদে ধৈর্য্য ধারণ, দু:খের পর সুখ, অল্পে তুষ্টি, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য ইত্যাদি বিষয় যেমন তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, তেমনিভাবে সমকালীন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধের বর্ণনা, প্রিয় নবীর [সা] সাহচর্য, তাকদীর, আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস, খোদাভীতিসহ নানা বিষয় তাতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তিনি মৃত্যুর অনিবার্যতা, যৌবনের উন্মাদনা, বন্ধুত্বের রীতি-নীতি, ভ্রমণের উপকারিতা, জ্ঞানের মহত্ব ও অজ্ঞতার নীচতা, মানুষের অভ্যন্তরের পশুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের কথা যেমন বলেছেন, তেমনিভাবে প্রিয় নবীর [সা] ও প্রিয়তমা স্ত্রী ফাতিমার [রা] মৃত্যুতে শোকগাঁথাও রচনা করেছেন।

বংশ অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সেকথা হযরত আলী [রা] বলেছেন এভাবে :

'আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান।
তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া।
মায়েরা ধারণের পাত্রস্বরূপ, আর পিতারা বংশের জন্য।
সুতরাং মানুষের গর্ব ও অহঙ্কারের যদি কিছু থেকে থাকে
তাহলো কাদা ও পানি।'

পুত্র হুসায়নকে [রা] তিনি উপদেশ দান করেছেন এভাবে :

'হে হুসায়ন! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি,
তোমাকে আদব শিখাচ্ছি; মন দিয়ে শোন।
কারণ, বুদ্ধিমান সেই যে শিষ্টাচারী হয়।
তোমার স্নেহশীল পিতার উপদেশ স্মরণ রাখবে,
যিনি তোমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।
যাতে তোমার পদস্খলন না হয়।
আমার প্রিয় ছেলে!
জেনে রাখ, তোমার রুযী-রিযিক নির্ধারিত আছে।
সুতরাং উপার্জন যাই কর, সৎভাবে করবে।
অর্থ-সম্পদ উপার্জনকে তোমার পেশা বানাবে না।
বরং আল্লাহ-ভীতিকেই তোমার উপার্জনের লক্ষ্য বানাবে।'

বুদ্ধি, জ্ঞানের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি বলেছেন এভাবে :

'মানুষের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হলো তার বোধ ও বুদ্ধি।
তার সমতুল্য অন্য কোন ভালো জিনিস আর নেই।
দয়াময় আল্লাহ যদি মানুষের বৃদ্ধিপূর্ণ করে দেন
তাহলে তার নীতি-নৈতিকতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।
একজন যুবক মানুষের মাঝে বুদ্ধির দ্বারাই বেঁচে থাকে।
আর বুদ্ধির ওপরই তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।
সুস্থ্য-সঠিক বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে সৌন্দর্যময় করে-
যদিও তার আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়।



www.pathagar.com

আর স্বল্প বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে গ্লানিময় করে-
যদিও বংশ মর্যাদায় সে হয় অভিজাত।'

তিনি পৃথিবীর নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেছেন :

'নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর।
এর কোন স্থায়িত্ব নেই।
এ দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরি করা ঘর।
হে দুনিয়ার অন্বেষণকারী!
দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট।
আর আমার জীবনের শপথ!
খুব শিগগীর এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে,
সবাই মারা যাবে।'

তিনি দুনিয়াকে সাপের সাথে তুলনা করেছেন এভাবে :

'দুনিয়া হলো সেই সাপের মত যে বিষ ছড়ায়-
যদিও তার দেহ নরম ও কৃশকায়।'

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ:দু:খে ধৈর্যহারা না হবার কথা বলেছেন এভাবে :

'যুগ বা কাল যদি আমাকে দু:খ দেয়
তা হলে আমি সংকল্প করেছি ধৈর্য ধরার।
আর যে বিপদ চিরস্থায়ী নয় তা খুবই সহজ ব্যাপার।
আর যুগ যদি আনন্দ দেয় তাহলে উল্লাসে আমি মাতি না।
আর যে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী তা একান্ত তুচ্ছ ব্যাপার।'

খায়বার যুদ্ধের দিন মারহাব ইহুদী তরবারি কোষমুক্ত করে নিম্নের এই শ্লোকটি আওড়াতে আওড়াতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায় :

'খায়বার ময়দান জানে যে, আমি মারহাব।
আমি অস্ত্রধাণকারী,
অভিজ্ঞ বীর-যখন যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে।'

এক পর্যায়ে হযরত আলী [রা] এই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে অসীম সাহসিকতার সাথে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন :

'আমি সেই ব্যক্তি যার মা তাকে 'হায়দার" নাম রেখেছে।
আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ।
আমি শত্রু বাহিনীকে সানদারাড় পরিমাপে পরিমাপ করি।
অর্থাৎ তাদেরকে পুর্ণরূপে হত্যা করি।'

উহুদ যুদ্ধের পর হযরত আলী [রা] হযরত ফাতিমার [রা] কাছে এসে বললেন, ফাতিমা! তরবারিটি রাখ। আজ এটি দিয়ে খুব যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি এই দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করলেন:



www.pathagar.com

'হে ফাতিমা!
এই তরবারিটি রাখ যা কখনো কলঙ্কিত হয়নি।
আর আমিও বীরু কাপুরুষ নই এবং নই নীচ।
আমার জীবনের কসম!
নবী আহমাদের সাহায্যার্থে এবং বান্দার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত
প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আমি এটাকে ব্যবহার করে
পুরনো করে ফেলেছি।'

কবিতা সম্পর্কে হযরত আলীর [রা] মনোভাব তাঁর একটি মূল্যবান উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন :

'কবিতা হলো একটি জাতির দাঁড়িপাল্লা [অথবা তিনি বলেছেন] কথার দাঁড়িপাল্লা।'

অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেমন জিনসপত্রের পরিমাপ করা হয় তেমনি কোন জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা, নৈতিকতা ও আদর্শের পরিমাপ করা যায় তাদের কবিতা দ্বারা।

তিনি নিজে একজন উঁচু মানের কবি ছিলেন শুধু তাই নয়, বরং অন্য কবিদেরকেও তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তাদের কবিতার যথাযথ মূল্যায়নও করতেন।

যেমন, একবার এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে কিছু সাহায্য চাইলো। তিনি তাকে একটি চাদর দান করলেন। লোকটি যাওয়ার সময় তার নিজের একটি কবিতা শোনালো। এবার হযরত আলী [রা] তাকে আরো পঞ্চাশটি দীনার দিয়ে বললেন, শোন, চাদর হলো তোমার চাওয়ার জন্য, আর দীনারগুলো হলো তোমার কবিতার জন্য। আমি রাসূলকে [সা] বলতে শুনেছি যে, তোমরা প্রত্যেক লোককে তার যোগ্য আসনে সমাসীন করবে।'

**তিন.**

রাসূল [সা] কবি ও কবিতাকে ভালোবাসতেন। কবিকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন। পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সহযোগিতা করতেন। অনুপ্রেরণা দান করতেন। রাসূলের [সা] এই কর্মধারায় সাহাবীগণও অভিষিক্ত ছিলেন। হযরত আলীও [রা] কবি ও কবিতাকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি তার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতাও করতেন। রাসূলের [সা] প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও শিক্ষায় উদ্ভাসিত ছিলেন তাঁরা। যে কারণে সমরে কিংবা শান্তি তে, শাসকের দায়িত্ব পালন কালে, নেতৃত্ব প্রদান কালে–অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় তাঁরা কবি ও কবিতাকে যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে গেছেন। যা আজ এবং আগামীর জন্য এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সুতরাং কবি ও কবিতার যথাযোগ্য মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া সুন্নতেরই একটি বড় অধ্যায়। বেদনার বিষয় বটে, আজকে যারা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের কাছে কবি ও কবিতার বিশেষ কোনো মূল্য বা মর্যাদা আছে বলে মনে হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে



www.pathagar.com

কবিরাই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত। এটা কোনো ক্রমেই শুভ লক্ষণ নয়। কাম্যতো নয়-ই।

স্মরণ রাখা উচিত যে, বিশ্বাসী কবিদের কবিতা ইসলামী সমাজ গঠনে, আদর্শিক সংস্কৃতি বিকাশে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং যাদের এতোটা অবদান সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে, সেই সকল কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিও ইসলামের নেতৃবৃন্দসহ সকলের সুদৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন কবি ও কবিতার যথাযথ মর্যাদা ও মূল্য দেয়ার। তাঁদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করার। তাহলেই বিশ্বাসী কবিতার ধারা আরও বেগবান হয়ে উঠবে। আর তাতে করে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সবুজ চত্বর আরও বেশি সম্প্রসারিত হবে।

একটি সবুজ-সুন্দর পৃথিবী ও সমাজ বিনির্মাণের জন্য কবি ও কবিতার ভূমিকা অনি:শেষ। বিষয়টির প্রতি সকলের সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

www.pathagar.com

# সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব ও তার উৎস গ্রন্থাবলী

**মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**

মানুষকে সার্বিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ [সা] কে 'খতামুন্নাবিঈন' তথা সর্বশেষ নবী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁর নবুওয়তী আমন্ত্রণ যেমন বিশ্বজনীন, সার্বিক ও চিরন্তন, তেমনি তাঁর জীবনাদর্শ বা আমলী জীবন সর্বকালের, সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য অনুকরণীয়। তাই তাঁর জীবন ও বাণীকে যথাযথ প্রয়োজনে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য ছিলো। সমগ্র মানব জগত এ বিষয়ে একমত যে, মুসলিমগণ তাদের নবীর জীবন ও বাণীকে যেভাবে সতর্কতার সাথে, যে অনন্য পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেছেন, সত্যিই তা এক অচিন্ত্যপূর্ব বিস্ময়কর বিষয়। এমন সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জগতের আর কোনো মহাপুরুষের জীবন ও বাণীকে সংরক্ষণ করা হয়নি।

জন ডিভান পোর্ট তাঁর Apology for Muhammad [Sm] and the Quran গ্রন্থের প্রারম্ভেই এ মত প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন:

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল ধর্ম প্রবর্তক এবং বিজয়ীদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যাঁর জীবনের ঘটনাবলী মুহাম্মদ [সা]-এর জীবনের ঘটনাবলী অপেক্ষা সুবিস্তৃত, সুস্পষ্ট এবং সার্বিক।"[১]

সাধারণ অর্থে রাসূল [সা]-এর জীবন চরিতকে 'সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর জীবনী পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় লেখা হয়েছে। তবে বক্ষ্যমান

---

১. মুহাম্মদ নাসরুল হক, মহানবী (সা:) এর জীবনী সংরক্ষণ সূত্র, *মাসিক মদিনা পত্রিকা,* নভেম্বর ২০১১ সংখ্যা, পৃ. ৩১



www.pathagar.com

প্রবন্ধে 'সীরাতুন্নবী [সা]-এর উৎসগ্রন্থ' বলতে রাসূল [সা]-এর জীবনী নির্ভর আরবি ভাষায় রচিত প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থাবলীকে বুঝানো হয়েছে।

## সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্যের পরিচয়

সীরাত শব্দটি প্রাথমিকভাবে রাসূল [সা]-এর গায্‌ওয়াহ [অভিযান] অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে এটি 'সীরাতুন্নবী' [নবী চরিত] অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। রাসূল [সা]-এর জীবনী অর্থে সীরাত শব্দটি ইব্‌ন হিশাম [মৃ. ২১৮ হি.] এর পূর্বেই মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমার আল ওয়াকিদী [মৃ. ২০৭/২০৯ হি.] এবং তাঁর শিষ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ [মৃ. ২৩০ হি.] ব্যবহার করেছেন। আবার ঐ যুগেই সীরাত শব্দটি রাসূল [সা]-এর জীবন চরিত অর্থ ছাড়াও সাধারণ্যের জীবন বৃত্তান্ত অর্থেও ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন, আল কালবী [মৃ. ১৪৭/১৫৮ হি] আমীর মু'আবিয়া [মৃ. ৬৮০ খ্রি] ও বনূ উমাইয়া'র জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করে এর শিরোনাম ধার্য করেন 'সীরাতু মু'আবিয়াহ ওয়া বনী উমাইয়াহ'।

মূলত: সীরাত শব্দটি 'সাইর' [ভ্রমণ ও চলা] থেকে এসেছে। প্রথম দিকে এর দ্বারা রাসূল [সা] ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যে পথে চলেছেন তা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। রাসূলের তিরোধানের পর শব্দটি তাঁর জীবন পদ্ধতি ও মাগাযী বা গায্‌ওয়াহ [অভিযান] অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে শব্দটির অর্থ আরো সম্প্রসারিত হয়ে রাসূল [সা]–এর জীবন-চরিত, সামরিক অভিযান ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি অন্যান্য সকল অর্থের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে।[২]

তবে ব্যবহারিক অর্থে সীরাত বলতে জীবনের ঘটনা ও তার ইতিহাসকে বুঝানো হয়। একজন ব্যক্তি জীবনব্যাপী যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন সেটাই তার 'সীরাত'। আর সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য বলতে নবী [সা]-এর জীবনের ঘটনা প্রবাহ যা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার সম্মিলিত রূপকে বুঝায়।[৩]

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেন: "সীরাত বলতে মহানবী [সা]-এর জীবনের সামগ্রিক ঘটনাবলী, চারিত্রিক ও সৃষ্টিগত গুণাবলীসহ তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ ও অভিযানকে বুঝায়।"

## সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব

---

২. শেখ মুহাম্মদ ওয়ায়িয যাদাহ আল খুরাসানী, *আস্ সীরাহ ওয়ান্ নাবুওয়াহ ওয়া মাসদারুহুমা*, রিসালাতুত্ তাকরীব [ইরানী পত্রিকা], ১৮ তম সংখ্যা, ১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৪৮-৪৯

৩. জাসিম সুলতান, *যাদখাল ইলা দিরাসাতিস্ সীরাহ*, দেখুন: http://www.islamtoday.net



www.pathagar.com

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ যে বিধি-বিধান জারি করেছেন মহানবী [সা] তারই ছবি এঁকেছেন তাঁর জীবন পাতায়। তাই আল কুরআনে আল্লাহ কি বলেছেন তা যথার্থ উপলব্ধি করতে হলে দ্বারস্থ হতে হবে সীরাত সাহিত্যের। অধিকন্তু আল কুরআনের বক্তব্য উপলব্ধিতে একজন মানুষ কতখানি সফল তার মাপকাঠিও সীরাত সাহিত্য চর্চা। ইসলামি শিক্ষা, নীতি ও পয়গামের ব্যবহারিক ছক হলো সীরাতুন্নবী [সা]। এর ভেতর থেকেই গ্রহণ করতে হয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কর্মপন্থা। সুতরাং যে কোনো মুসলিমের জন্য সীরাত চর্চা, গবেষণা ও অবিরাম অধ্যয়নের অপরিহার্যতা ভাষাতীতভাবে স্বীকৃত ও অত্যাবশ্যকীয়।

সীরাত গবেষকগণ সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্যের বহুবিধ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
১. সীরাতুন্নবীর জ্ঞানার্জন করা একটি ইবাদত। এ মর্মে আলী ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাণী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,
"আমরা যেরূপ আল কুরআনের সূরাহ শিখতাম, তদরূপ রাসূল [সা]-এর মাগাযী ও সারায়াও [যুদ্ধাভিযানের কৌশল] শিখতাম।"[৪]

২. সীরাতুন্নবী হালো দাওয়াহ ইল্লাল্লাহর বাস্তব নমূনা। কেননা, সীরাত অধ্যয়নের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে দা'ওয়াত দানের বাস্তব পদ্ধতি এবং 'ইলাউ কালিমাতুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর কালিমা সুউচ্চকরণ' এর প্রকৃত পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

৩. সীরাতুন্নাবীতে রয়েছে আল কুরআনের তাফসীর। কেননা, আল কুরআনে বদর, উহুদ, তাবূকসহ বিভিন্ন গাযওয়াহ বা অভিযানের কথা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে। আর সীরাতুন্নাবীতে শানে নুযূলসহ এসবের বর্ণনা ব্যাপক ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৪. সীরাতুন্নাবী হলো প্রকৃত জীবন পদ্ধতি। রাসূল [সা] কে পৃথিবীতে প্রেরিত করা হয়েছিলো সকল মানুষের পথ-প্রদর্শক ও মুক্তির দিশারী হিসেবে। শীর্ষ নেতা, সফল ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের জন্য তিনি হলেন উত্তম আদর্শ। আল্লাহ বলেন: "তোমাদের জন্যে অবশ্যই রাসূলের [জীবনের] মাঝে [অনুকরণযোগ্য] উত্তম আদর্শ রয়েছে। [আদর্শ রয়েছে] এমন ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের [মুক্তির] আশা করে, [সর্বোপরি] সে বেশি পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করে।"[৫]

---

৪. দেখুন: ***সফটওয়্যার 'আল মাকতাবাহ আশ্ শামিলাহ'***, গ্রন্থ: মাওসু'আহ খুতাবুল মিম্বার, ২য় খ-, পৃ. ৪৫৩৬

৫. ***আল্ কুরআন,*** সূরাহ: আল্ আহযাব, আয়াত: ২১



www.pathagar.com

রাসূল [সা]-এর আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর কর্মপন্থায়, পিতা হিসেবে কন্যাদের সাথে তাঁর ব্যবহারে, স্বামী হিসেবে স্ত্রীগণের সাথে তাঁর আচরণে, শাসক হিসেবে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে; এভাবে জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাঁর কোনো আদর্শ নেই।

৫. বর্তমানের সাথে অতীতের সেতুবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম হলো সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য। অতীতের অবস্থা, পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে বর্তমানে করণীয় কী এ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবমুখী সূত্র পাওয়া যায় এ সাহিত্যে। শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে? কখন আল্লাহ্ সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করেন? ইত্যাদি বিষয়াবলী আমরা সীরাত চর্চার মাধ্যমে জানতে পারি এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের করণীয় ঠিক করে নিতে পারি।

৬. উত্তম আদর্শ গ্রহণের অন্যতম উৎস হলো সীরাতুন্নবী। মানুষ আদর্শের মুখাপেক্ষী। কোনো না কোনো আদর্শ গ্রহণ করেই সে তার জীবন পরিচালনা করে থাকে। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের জন্য মুহাম্মদ [সা] হচ্ছেন একমাত্র গ্রহণীয় উত্তম আদর্শের বাস্তব নমুনা। তাই রাসূলের উম্মাত হিসেবে তাঁর আদর্শ গ্রহণের জন্য প্রধান উৎস ও উপাদান হলো তাঁর সীরাত চর্চা।

৭. সীরাত চর্চায় রয়েছে একজন মু'মিনের জন্য আত্মিক প্রশান্তি ও রূহের খোরাক। সর্বোপরি বলা যায়, যেহেতু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্যে,[৬] সেহেতু রাসূলে আকরাম [সা]-এর সীরাত অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে দীন বিজয়ের সঠিক পদ্ধতি জানার জন্যে সীরাত অধ্যয়ন ও চর্চা করা সবার জন্যে আবশ্যকীয়।

## সীরাতুন্নাবী [সা] সাহিত্য চর্চার উৎস গ্রন্থসমূহ

রাসূল [সা]-এর সীরাতের দু'টি অধ্যায় রয়েছে। একটি হলো ১৩ বছরের মাক্কী জীবন। অপরটি হলো ১০ বছরের মাদানী জীবন। এছাড়াও নবুওয়াতের বাইরে ৪০টি বছর কেটেছে মাতৃভূমি মক্কায়। মোট এ তেষট্টি বছরের জীবন ইতিহাস পৃথিবীর মানুষের সামনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর এর মূলে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "ওয়া রাফা'না- লাকা যিকরাক" অর্থাৎ "আমি কি তোমার আলোচনা উচ্চতর করে দেই নি?[৭]

তবে এখানে অবাক হওয়ার বিষয় যে, প্রাচ্যবিদ, ইয়াহুদী, খৃস্টান, অমুসলিম ও ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত সুকৌশলে রাসূলের সীরাত ও

---

৬. দেখুন: ***আল কুরআন,*** সূরাহ: আত্ তাওবা, আয়াত: ৩৩; সূরাহ: আস্ সাফ, আয়াত: ৯

৭. ***আল্ কুরআন,*** সূরাহ: আন্ নাশরাহ, আয়াত: ৪



www.pathagar.com

তাঁর আলোচনাকে বিকৃত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে এবং অদ্যাবধি তা অব্যাহত রয়েছে। আবার মুসলিমদের মধ্যেও অনেকেই অজ্ঞতা কিংবা অতি উৎসাহী হয়ে রাসূলের সীরাত বর্ণনায় নিজস্ব মতামত, অতিরঞ্জিত আলোচনা ও ভ্রান্ত তথ্য তুলে ধরেছেন। ফলে রাসূলের সীরাতকে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে–নিরূপণ করার লক্ষ্যে সীরাত সাহিত্যের আরবি গ্রন্থাবলী সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

একথা সর্বজন বিদিত যে, প্রাথম দিকে সীরাতুন্নবী [সা] সাহিত্য ছিলো সম্পূর্ণ মৌখিক। আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে রাসূলের সীরাতের বিশেষ দিক মাগাযী [যুদ্ধাভিযান] সম্পর্কে বর্ণনা করতেন।[৮]

এরপর আহলি ইলমগণ সীরাতুন্নাবীর লিখিত রূপ দেন। হিজরি ১ম শতকে শুরু হয়ে ৩য় শতকের মধ্যে সংকলকগণ রাসূলের হাদীস, ইসলামের বিধি-বিধান ও ইতিহাস-ঐহিহ্যের ওপর সুবিখ্যাত গ্রন্থ সংকলন করেন। এসব সংকলনে রাসূলের সীরাত সংক্রান্ত নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে আবী জা'ফর ইবন্ আত্ তাবারী [মৃ. ৩১০হি.] এর 'তারীখুত্ তাবারী', মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ [মৃ.৭৮৪-৮৪৫] এর 'আত্ তাবাকাত' ও বিখ্যাত হাদীস সংকলকগণ রচিত হাদীসগ্রন্থসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে রাসূলের জীবন ভিত্তিক গ্রন্থ সংকলন করেন। যেমনঃ ইবন্ ইসহাক [মৃ. ১৫২ হি.] এর 'মাগাযীর রাসূল [সা] ', ইবন্ হিশাম [মৃ. ২১৮ হি.] এর 'সীরাতুর রাসূল [সা]'।

এরপর আলিমগণ রাসূলের জীবনের বিশেষ দিক ও বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ সংকলন করেন। যেমনঃ আল্ ইস্পাহানী [মৃ.১২৭৭-১৩২৯] এর 'দালায়িলুন নাবুওয়াহ', ইমাম বায়হাকী'র 'দালায়িলুন নাবী', ইমাম আত্ তিরমিযী'র 'আশ্ শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ', ইবনুল কাইয়্যিম আল্ জাওযী [১২৯২-১৩৪৯] এর 'যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ী খাইরিল ইবাদ'।

মাসিক উর্দু দা'ওয়াত পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে–এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, মুহাম্মদ [সা]-এর জীবনী, ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বার ওপর যত পুস্তিকা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখা হয়েছে, তা অন্য কোনো মানুষকে নিয়ে লিখা হয় নি। তবে অধিকাংশ অমুসলিম ও প্রাচ্যবিদ রাসূলের সীরাতকে বিকৃতভাবে উপস্থান করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। আবার অনেকেই রাসূলের সত্য ও বিশুদ্ধ সীরাত লিখেছেন এমনকি কেউ কেউ তাঁর সীরাতে মুগ্ধ হয়ে ঈমানের অমীয় সূধা পান করে মুসলিম হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছেন।[৯]

---

৮. ইবন সা'দ, ***আত্ তাবাকাত***, ১ম খ-, পৃ. ৩৬৮

৯. পরওয়াজ রহমানী, ***মাসায়েলে হাযেরাহ আওর সীরাতে রাসূল***, দা'ওয়াত [উর্দু পত্রিকা], ৫-৭ মার্চ, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৫



www.pathagar.com

তবে দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, মুসলিম সীরাতকারকদের মধ্যেও অনেকে রাসূলের সীরাত বর্ণনায় ও সীরাত রচনায় যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। অনেক ভুল ও দুর্বল তথ্য উপস্থাপন করেছেন। পাশ্চত্য ও প্রতীচ্যদের ধ্যাণ-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও লিখনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েও অনেক মুসলিম লেখক রাসূলের বিকৃত সীরাত রচনা করেছেন, যা সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের দাবি রাখে।

গবেষণায় দেখা গেছে, রাসূলের জীবনী নির্ভর সীরাত সাহিত্যের উৎস গ্রন্থাবলী প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত।

**প্রথমত: মৌলিক গ্রন্থাবলী:** আধুনিক যুগের সীরাত সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকগণ সীরাত সাহিত্যের মৌলিক উৎসকে নিন্মোক্ত উৎসসমূহে বিভক্ত করেছেন:

**এক: আল কুরআনুল কারীম:** আল কুরআন হলো রাসূল [সা]-এর সীরাত বর্ণনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য ও অতিসত্য গ্রন্থ বা উৎস। রাসূলের জীবনীর সর্বাধিক প্রামাণ্য এ উৎসে তাঁর জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: তাঁর ইয়াতীম হওয়া, দারিদ্র, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেকার জীবন, সত্যের অনুসন্ধান, নবুওয়াত প্রাপ্তি, অহী, দায়িত্বের ঘোষণা প্রচার, মিরাজ, বিরোধীদের শত্রুতা, হিযরত, জিহাদ ও তাঁর আখলাক-চরিত্র। সঙ্গত করণেই সীরাতের এ মৌল উৎসকে বাদ দিয়ে কোনো সীরাত রচয়িতা বা সীরাত সমালোচক সামনের দিকে এগুতে পারেন না এবং আল্ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় বা ঘটনা সীরাতের অংশ হিসেবে চালাতে পারেন না।

**দুই: আল্ হাদীস আন্ নববী:** সীরাত অধ্যয়ন করার দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীস। জামি', মুসনাদ, সুনান হাদীস গ্রন্থসমূহে মহানবী [সা]-এর জীবনী, বাণী, কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়াবলী সাহাবীগণের সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগ্রন্থসমূহে হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি রাসূলের সীরাত বর্ণনার ক্ষেত্রেও এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো যে, কোনো ঘটনার বর্ণনা এমন সব বর্ণনাকারীর মুখ থেকে শোনা হতো, যাঁরা স্বয়ং ঐ ঘটনার সাথে জড়িত থাকতেন। যদি স্বয়ং জড়িত না থাকতেন তবে যিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁর নাম এবং বর্ণনাকারীর মধ্যে সমস্ত মাধ্যমিক বর্ণনাকারীদের নাম-ঠিকানা পরস্পর ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হতো। আরও যাচাই করা হতো যে, বর্ণনা সূত্রের সাথে যাঁরা মাধ্যম হিসেবে আছেন তাঁরা কে? কেমন ছিলেন? তাঁদের সাধনা কি ছিলো? তাঁদের চাল-চলন, তাকওয়াহ কিরূপ ছিলো? জীবনে কখনো তাঁরা মিথ্যা বলেছেন কিনা? তাঁদের জ্ঞান-বিবেচনা, বিচক্ষণতা ও অনুধাবন ক্ষমতা কি পরিমাণ ছিলো? তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য কিনা? তাঁদের স্মৃতি শক্তি, মুখস্ত রাখার ক্ষমতা কেমন ছিলো? তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিলো? তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন না মূর্খ?



www.pathagar.com

এমন সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, রাসূল [সা]-এর জীবনী যেনো সর্বপ্রকার কলুষ মুক্ত হয়ে সঠিক, নিঁখুত ও সুস্পষ্টভাবে জগতের বুকে মানুষের নিকট প্রতিষ্ঠিত থাকে। নবী জীবনের এটিও একটি মু'জিযা যে, তাঁর জন্মের আগ থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত এমন কোনো ঘটনা নেই, তা যত ছোট-ই হোক না কেনো হাদীসে লিপিবদ্ধ নেই। এতো বড় লিখিত তথ্য-উপাত্ত [Written Documents] আর কোনো বিশ্বব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে নেই।[১০]

'আস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ আস্ সাহীহাহ' গ্রন্থের লেখক আকরাম আল 'উমরী বলেন, "হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সীরাতের বিষয়াবলী নির্ভরযোগ্য হওয়ায় এর উপর আস্থা রাখা, সাধারণ ইতিহাস ও মাগাযী গ্রন্থসমূহের রিওয়াত এর উপর প্রাধান্য দেয়া আবাশ্যক। বিশেষ করে যখন তা সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়।"[১১]

**তিন: আত্ তাফসীর:** আল কুরআনুল কারীমে রাসূলের জীবনের নানা বিষয় ও ঘটনাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যার বিশদ বর্ণনা আল্ কুরআনের তাফসীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১২] যেমন: সূরা মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সিরে অহী নাযিল পরবর্তী রাসূলের অবস্থা, পালকপুত্র যায়িদ ইবনু হারিছার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে তাঁর বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনা, সূরা আনফালে বদর যুদ্ধ, আলে ইমরানে উহুদ যুদ্ধ, আল আহযাবে খন্দকের যুদ্ধ ও আল্ ফাত্হ'তে হুদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনাসহ রাসূলের জীবনের নানা দিক বর্ণনা সম্বলিত আয়াত ও সূরার শানে নুযূল, প্রেক্ষাপট ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে তাফসীর গ্রন্থসমূহে।

এখানে অবাক হওয়ার বিষয় যে, অনেক প্রাচ্যবিদ রাসূলের সীরাত কেন্দ্রিক আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহর বাণী- "হুয়াল্লাযী বাআছা ফিল্ উম্মিয়ীনা রাসূলাম মিনহুম" অর্থাৎ তিনি 'উম্মি'দের মধ্য হতে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।"[১৩] এ আয়াতে বর্ণিত 'উম্মি' শব্দের ব্যাখ্যায় অনেক প্রাচ্যবিদ বলেছেন যে, উম্মি হলো- 'যিনি দীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, লেখা-লেখির বিষয়ে নয়।' অথচ প্রকৃত সত্য হলো- 'যিনি লিখতে-পড়তে জানেন না, তিনিই উম্মি।' এ অর্থ বুঝাতেই আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল [সা] কে 'আন্ নাবি আল্ উম্মী' খেতাবে ভূষিত করেছেন।[১৪]

---

১০. আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, *সিরাতুন্নবী (সা) অধ্যয়ন গুরুত্ব ও পদ্ধতি*, মাসিক ছাত্র সংবাদ, ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা, পৃ. ৬৩

১১. আকরাম আল্ 'উমরী, *আস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ আস্ সাহীহাহ*, (সৌদি আরব: প্রকাবি, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খ-, পৃ. ৫০

১২. ড. মুসত্ফা আল সিবায়ী, *আস সীরাহ আন নবুবিয়্যাহ দুরূস ওয়া ইবার*, পৃ. ১৪

১৩. *আল কুরআন*, সূরাহ জুম'আ, আয়াত: ২

১৪. দেখুন: *আল কুরআন*, সূরাহ আল আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭-১৫৮



www.pathagar.com

**চারঃ আল্ মাগাযীঃ** সীরাত সাহিত্য অধ্যয়ন করার তৃতীয় উৎস 'কুতুবুল মাগাযী'। রাসূল [সা]-এর জিহাদ ও যুদ্ধসমূহের ঘটনাবলী সম্বলিত রচনাকে বলা হয় মাগাযী। সীরাত সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিগণিত এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে যেসব পন্ডিতগণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন[১৫]

০১. মূসা ইবনু উকবাহ [মৃ. ১৪০ হি.]
০২. আবূ মা'শার আস্ সানাদী [মৃ. ১৮১ হি.]
০৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবী বাকর আল্ মাদানী [মৃ. ১৮৬ হি.]
০৪. আল্ ওয়াকিদী [মৃ. ২০৭ হি.]
০৫. মুহাম্মদ ইবনু আয়িয আদ্ দামিশকী [মৃ. ২৩৪ হি.]
০৬. সালিহ ইবনু ইসহাক আল জুরমী আন্ নাহবী [মৃ. ২৩৫ হি.]
০৭. সা'দ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সা'দ আল উমাবী [মৃ. ২৪৭ হি.]
০৮. আব্দুল মালিক ইবনু মুহাম্মদ আল্ বুকাশী [মৃ. ২৭৬ হি.]
০৯. ইসমাঈল ইবনু জা'মী [মৃ. ২৭৭ হি.]
১০. ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল আল্ আম্বারী [মৃ. ২৮০ হি.]
১১. ইসমাঈল ইবনু ইসহাক আল্ কাযী [মৃ. ২৮২ হি.]
১২. আহমাদ ইবনুল হারিছ ইবনুল খাযরায [মৃ. ২৮৫ হি.]
১৩. আবুল কাসিম আস্ সুহাইলী [মৃ. ৪৮১ হি.] প্রমূখ।

**পাঁচঃ আদ্ দালায়িলঃ** মহানবী [সা]-এর আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক কার্যাবলী তথা মু'জিযা সম্পর্কিত পৃথক প্রামাণ্য গ্রন্থাদিকে বলা হয় দালায়িল। দালায়িল গ্রন্থ সীরাতের অন্যতম উৎস। রাসূলের সীরাত বিষয়ক বিশেষ দালায়িল গ্রন্থগুলো হলো'

০১. মুহাম্মদ ইবনু ইউসূফ ইবনু ওয়াকিদ আল্ ফারয়াবী [মৃ. ২১২ হি.] রচিত 'দালায়িলুন নাবুওয়াহ';
০২. আলী ইবনু মুহাম্মদ আল্ মাদায়িনী [মৃ. ২২৫ হি.] রচিত 'আয়াতুন্নাবী';
০৩. দাউদ ইবনু আলী ইস্পাহানী [মৃ. ২৭০ হি.] রচিত 'আ'লামুন্ নাবুওয়াহ';
০৪. ইবনু কুতায়বা [মৃ. ২৭৬ হি.] রচিত 'আ'লামু রাসূল [সা];
০৫. ইবনু আবী হাতিম [মৃ. ৩২৭ হি.] রচিত 'আ'লামুন্ নাবুওয়াহ';
০৬. কাযী আব্দুল জাব্বার আল্ মু'তাযিলী [মৃ. ৪১৫ হি.] 'তাছবীতু দালায়িলুন্ নাবুওয়াহ';
০৭. আবূ নাঈম আহমাদ আল ইস্পাহানী [মৃ. ৪৩০ হি.] রচিত দালায়িলুন্ নাবওয়াহ';
০৮. আবুল আব্বাস জা'ফর আল্ মুসতাগফিরী [মৃ. ৪৩২ হি.] রচিত দালায়িলুন্ নাবওয়াহ';
০৯. আবুল কাসিম ইসমাঈল আল ইস্পাহানী [মৃ. ৫৩৫ হি.] 'দালায়িলুন্ নাবুওয়াহ';

১৫. ড. যায়ফুল্লাহ ইবন ইয়াহইয়া আয্ যাহরানী, *মাসাদিরুস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ*, পৃ. ১৬-১৭



www.pathagar.com

১০. আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মদ আল্ মাওয়ারদী [মৃ. ৪৫০ হি.] রচিত 'আ'লামুন্ নাবুওয়াহ';
১১. আবূ বাকর আহমাদ আল বায়হাকী [মৃ. ৪৫৮ হি.] রচিত 'দালায়িলুন্ নাবওয়াহ'।[১৬]

**ছয়ঃ আশ্ শামায়িলঃ** শামায়িল গ্রন্থসমূহে নবী [সা]-এর শারীরিক আকার-আকৃতি, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, খানা-পিনা, হাসি-কান্না, লেন-দেন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদিসহ তাঁর দৈনন্দিন জীবন প্রণালী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সীরাত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শামায়িল গ্রন্থ হলোঃ

০১. আবুল বুখতারী ওয়াহাব আল্ আসাদী [মৃ. ২০০ হি.] রচিত 'সিফাতুন্নাবী [সা]';
০২. আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মদ আল্ মাদায়িনী [মৃ. ২২৪ হি.] রচিত 'সিফাতুন্নাবী' [সা];
০৩. দাউদ ইবনু আলী আল্ ইস্পাহানী [মৃ. ২৭০ হি.] রচিত 'সিফাতু আখলাকুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম';
০৪. ইমাম হাফিয আত্ তিরমিযী [মৃ. ২৭৯ হি.] রচিত আশ্ শামায়িলুন্ নাবুবিয়্যাহ ওয়াল খাসায়িসুল মুসতাফাবিয়্যাহ';
০৫. শেখ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাইয়্যান আল ইস্পাহী [মৃ. ৩২৯ হি.] রচিত 'আখলাকুন্ নাবী ওয়া আদাবুহু';
০৬. আবূ সাঈদ আব্দুল মালিক ইবনু মুহাম্মদ আন্ নিসাবূরী [মৃ. ৪০৬ হি.] রচিত 'শারফুল মুসতাফা';
০৭. আবূল আব্বাস আল মুসতাগফিরী [মৃ. ৪৩২ হি.] রচিত 'শামায়িলুন্ নাবী';
০৮. কাযী আয়ায [মৃ. ৫৪৪ হি.] রচিত 'আশ্ শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা'।[১৭]

**সাতঃ আত্ তাওয়ারীখঃ** ইসলামের সোনালী যুগের ঐতিহাসিকগণ সত্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে তারীখ বা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তাঁরা ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সত্যগুলোকে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি নবী [সা]-এর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো ইতিহাসও গোপন করেন নি। এ ধরনের গ্রন্থসমূহকে বলা হয় 'কিতাবুত্ তাওয়ারীখ'। ইবনু সা'দ, ইমাম আত্ তাবারী, ইমাম বুখারী, ইবনু হিব্বান এ সব গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃত পর্যায়ভূক্ত। পরবর্তীকালে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে দেদারসে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য লেখক বুদ্ধিজীবী

---

১৬. আকরাম উমরী, *আস্ সীরাহ আস্ সাহীহাহ,* প্রাগুক্ত, ১ম খ-, পৃ. ৫১-৫২; সা'দ আল্ মুরসাফী, *মানাহিজুল মায়ালিস্বফীন ফিস্ সীরাহ আন্ নাবওয়াহ ওয়া খাসায়িসুল মানহাজ আস্ সাহীহ ফিদ্ দিরাসাহ,* (কুয়েতঃ মাকতাবাতু ইবন কাছীর, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬২-৬৩

১৭. ড. যায়ফুলস্নাহ ইবন ইয়াহইয়া আয্ যাহরানী, *মাসাদিরুস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ,* পৃ. ৫২-৫৩



www.pathagar.com

সম্প্রদায় যে বিকৃত ইতিহাস রচনা করেছেন তা আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে। এরপরও ইতিহাসের সত্য উৎসগুলোকে রাসূলের সীরাতের একটি অন্যতম দলিল ও উৎস হিসেবে গণ্য করা যায়।

**দ্বিতীয়ত: পরিপূরক উৎস:** সমালোচকগণ সীরাত সাহিত্য অধ্যয়ন, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার বেশ কিছু অমৌলিক উৎস রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এসব উৎস নিম্নরূপ:

**এক: আল্ আখবার:** মক্কা-মদিনার ঘটনাবলী সম্পর্কে রচিত গ্রন্থকে সাধারণত আখবার বলা হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থে মক্কা-মদিনার ইতিহাসসহ রাসূল ও সাহাবীগণের জীবনের নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে। এ ধারার সবচেয়ে প্রাচীন ও গ্রহণীয় গ্রন্থগুলো হলো–

০১. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনু যুবালাহ [মৃ. ১৯৯ হি.] রচিত 'তারীখুল মাদীনাহ আল মুনাওয়ারাহ';

০২. আবুল ওয়ালীদ আল আযরাকী [মৃ. ২৫০ হি.] রচিত 'আখবারু মাক্কাতুল মুকার্‌রামাহ';

০৩. উমার ইবনু শিবাহ [মৃ. ২৬২ হি.] রচিত 'তারীখুল মাদীনাহ আল্ মুনাওয়ারাহ';

০৪. মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক আল ফাকিহী [মৃ. ২৭২ হি.] রচিত 'আখবারু মাক্কাহ ফী কাদীমিদ্ দাহর ওয়া হাদীসুহু';[১৮]

০৫. ইমাম হাফিয মুহাম্মদ ইবনু মাহমূদ আন নাজ্জার [মৃ. ৬৪৩ হি.] রচিত 'আখবারু মাদীনাতুর রাসূল [সা]। গ্রন্থটি 'আদ্ দুররাহ আছ ছামীনাহ' নামে সমধিক পরিচিত।

**দুই: কুতুবুল আদাব ওয়াশ শি'র:** আরবি সাহিত্য ও কবিতাগ্রন্থকে বলা হয় কুতুবুল আদাব ওয়াশ্ শি'র। ইসলামী, উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগে রচিত এসব গ্রন্থে গদ্য ও পদ্য আকারে রাসূলের সীরাতের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো–

০১. বিখ্যাত সাহিত্যিক আল জাহিয [মৃ. ২৫৫ হি.] রচিত 'আল্ বায়ান ওয়াত্ তিব্ইয়ান';

০২. ইবনু কুতায়বা [মৃ. ২৭৬ হি.] বিরচিত 'আল্ মা'আরিফ', 'আদাবুল কাতিব' এবং 'আশ্ শি'র ওয়াশ্ শু'আরা';

০৩. আল মুবাররিদ রচিত 'আল কামিল ফিল্ লুগাহ';

০৪. আল্ আম্বারী লিখিত 'ইযাহুল ওয়াক্ফ ওয়াল ইবতিদা'।[১৯]

---

১৮. গ্রন্থটির সংকলিত পা-লিপি ১৪১৭ হিজরি সনে উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি প্রকাশ করেছে। দেখুন: প্রাগুক্ত



www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে-ই আরবি কবিতাকে সীরাতের অন্যতম দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। ইবনু ইসহাকের 'মাগাযী', ইবনু হিশামের 'আস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ'তে রাসূলের সীরাত বর্ণনা সম্বলিত অনেক দিওয়ান [কবিতামালা] এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হাস্সান ইবনু সাবিত, কা'ব ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ'র দিওয়ান রাসূলের সীরাতের অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।[২০]

**তিন: কুতুবুত্ তারাজিম:** ব্যক্তি জীবনচরিত গ্রন্থকে কুতুবুত্ তারাজিম বলা হলেও এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবাগণের জীবন চরিত গ্রন্থ। কুতুবুত তারাজিমে সাহাবীদের জীবনী আলোচনাসহ রাসূল [সা]-এর সীরাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। এ জাতীয় বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থ হলো–

০১. ইবনু সা'দ [মৃ. ২৩০ হি.] লিখিত 'আত্ তাবাকাত আল্ কুবরা';
০২. ইমাম বুখারী [মৃ. ২৫৬ হি.] রচিত 'তারীখুস্ সাহাবাহ';
০৩. ইমাম আত্ তিরমিযী [মৃ. ২৭৯ হি.] বিরচিত 'তাসমিয়াতু আসহাবু রাসূল [সা];
০৪. আয্ যাহাবী [মৃ. ৭৪৮ হি.] লিখিত 'সিয়ারু আ'লামুন নুবালা';
০৫. আবু নাঈম আল ইসবাহানী'র 'মা'রিফাতুস্ সাহাবাহ';
০৬. ইবনু হাজার আল আসকালানী'র 'আল ইসাবাহ ফী তাময়িযীস সাহাবাহ'
০৭. ইজ্জুদ্ দীন ইবনুল আছীর এর 'উসদুল গাবাহ' প্রভৃতি।

**চার: কুতুবুল বুলদান:** দেশ পরিচিতিমূলক গ্রন্থাবলীকে বলা হয় 'কুতুবুল বুলদান'। আব্বাসী যুগে রচিত এসব গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এতে রাসূলের সীরাতের বিশেষ দিকসহ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহের বর্ণনাও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ হলো:

০১. ইবনু খারদাযাবাহ' [মৃ. ২৭২ হি.] লিখিত 'আল্ মাসালিক ওয়াল মামালিক';
০২. ইবনু রিসতাহ [মৃ. ২৯০ হি.] রচিত 'আ'লাক আননাফীসাহ';
০৩. ইবনু হাওকাল [মৃ. ৩৬৭ হি.] বিরচিত 'সূরাতুল আরদ';
০৪. আল মাকদাসী [ম. ৩৯০ হি.] রচিত 'আত্ তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম'।

**উপসংহার:** পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যক্তি জীবন চরিতের লিখিত রূপ-ই হলো সীরাত সাহিত্য। আর ব্যক্তি রাসূলের লিখিত জীবন চরিতকে বলা হয় 'সীরাতুন্নবী [সা]

---

১৯. মাহদী রিযকুল্লাহ আহমাদ, *আস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ ফী দুয়িল মাসাদির আল আসলিয়্যাহ,* [রিয়াদ: মারকাযুল মালিক ফায়সাল লিল্ বুহুস ওয়াদ দিরাসাত আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি], পৃ. ৪৪

২০. ড. আকরাম আল 'উমরী, *আস্ সীরাহ আন্ নাবুবিয়্যাহ আস্ সাহীহাহ,* পৃ. ৭১



www.pathagar.com

সাহিত্য। আরব মণীষী ও পন্ডিতগণ রাসূলের সীরাতকে তাঁদের খুরধার কলমের ছোঁয়ায় অভিনব পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সীরাত চর্চা করতে হলে উপর্যুক্ত মৌলিক ও পরিপূরক উৎসের শরণাপন্ন হতে হয়। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেখানে রাসূলের সীরাতের কোন না কোন আলোচনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যেঃ মুহাম্মদ ইবনু সা'দ [মৃ. ২৩০ হি.] এর 'আত্ তাবাকাতুল কুবরা', খলীফাহ্ ইবনু খাইয়াত [মৃ. ২৪০ হি.] এর 'আত্ তারীখ, আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল বালাযুরী [মৃ. ২৭৯ হি.] এর 'ফুতূহুল বুলদান' ও 'আনসাবুল আশরাফ', আবূ বাকর আহমাদ ইবনু আবী খায়ছামাহ [মৃ. ২৯৯ হি.] এর 'আত্ তারীখ আল কাবীর', আবূ জা'ফর ইবনু জারীর আত্ তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] এর 'তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক], আরবের হিরোডটাস খ্যাত আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন আল মাস'উদী [মৃ. ৩৪৬ হি.] এর মুরূজুজ্ যাহাব ও মা'আদিনুল জাওহার', ইয্যুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবুল কারীম ইবনুল আছীর [মৃ. ৬৩০ হি.] এর 'আল কামিল ফিত্ তারীখ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২১]

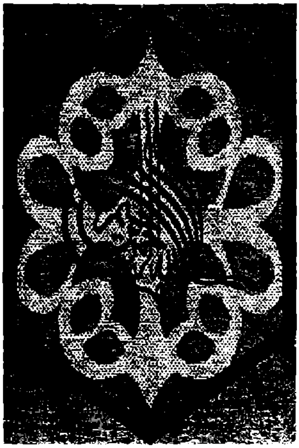

২১. ড. যায়ফুল্লাহ ইবন ইয়াহইয়া আয্ যাহরানী, *মাসাদিরুস্ সীরাহ আন নাবুবিয়্যাহ*, পৃ. ৫৪-৫৬



www.pathagar.com

# বিভিন্ন বাদশার নিকট রাসূলের [সা] দাওয়াতী পত্র

## হেলাল আনওয়ার

রাসূল [সা] দ্বীনের দাওয়াত দেয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তাই মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি বিভিন্ন দেশে পত্র মারফত দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ দাওয়াত ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল [সা] যে দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করেন তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগই তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি পত্র তুলে ধরেছেন, যা তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ১ম, খসরু পারভেজ, মুকাওকিস ও নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। রাসূল [সা] এর সেই ঐতিহাসিক পত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পাঠ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

**হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র**

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর শাসন কাল ছিল ৬১০ থেকে ৬৪১ খ্রিঃ। তিনি কাপুডেশিয়ার এক গ্রীক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কুতাজেনার নিকট তিনি লালিত পালিত হয়। তিনি ছিলেন আফ্রিকার এক শাসকের পুত্র। হিরাক্লিয়াস ৬৪১ খৃঃ কনস্টান্টি পোলে মৃত্যবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

**পত্র**

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদের পক্ষ থেকে, যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এই পত্র রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে প্রেরিত হচ্ছে। হেদায়েতের অনুসারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অত:পর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর আপনি যদি না মানেন, এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার প্রজাবর্গের গুণাহ আপনার কাঁধে চাপবে। হে আহলে কিতাবধারীগণ, এমন একটি কথার দিকে



www.pathagar.com

আসুন যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করব না। আর আমাদের কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে "রব" তথা প্রভূ-প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করবো না। আর যদি আপনি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।

**খসরু পারভেজ**

তিনি ছিলেন হরমুজের চতুর্থ পুত্র এবং নওশেরওয়া [যিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক] এর পৌত্র। তাঁর শাসন কাল ছিল ৫৯০ থেকে ৬২৮ খৃ: পর্যন্ত। ৫৯০ খৃ: যখন তাঁর পিতা নিহত হন তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত:পর বাহরাম চুবীন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে পরাজিত করে। পরবর্তীতে বায়জান্টাইন অধিপতি মরিস কর্তৃক তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়েছিল।

**পত্র**

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর উদ্দেশ্যে। তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়েতের অনুসারী, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী এবং যে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি সমগ্র মানব মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে রাসূল হিসাবে প্রেরীত হয়েছি যাতে প্রত্যেক জীবিত মানুষকে সতর্ক করতে পারি, করতে পারি ভীতি প্রদর্শন। ইসলাম কবুল করুন শান্তি পাবেন। অন্যথায় অগ্নি উপাসক প্রজাবর্গের সকল পাপ আপনার কাঁধে চাপবে।

**মুকাওকিস**

জুরায়জ ইবনে সীনা আল মুকাওকিস। কেউ কেউ বলেন তিনি আল মুকাওকিস আর রুমী। মুকাওকিস তাঁর উপনাম। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার গর্ভনর ছিলেন।[১]

**পত্র**

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে কিবতী অধিপতি মুকাওকিসের নামে। হেদায়েত অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অত:পর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত জানাচ্ছি। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আর যদি আপনি না আসেন তাহলে আপনার দেশবাসীর গোণাহও আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব ! একটি বিষয়ের দিকে আসেন যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবো না। তাঁর নামে কোন শরীক করবো না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপরও যদি একথা স্বীকার না করেন তাহলে সাক্ষী থাকুন, আমরা তো অনুগত মুসলিম।



www.pathagar.com

**নাজ্জাশী [৫২৫-৫৭৫]**

তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ থাকলেও তিনি নাজ্জাশী নামেই অধিক পরিচিত। মূলত: আবিসিনিয়ার বাদশাকে সেকালে নাজ্জাশী বলা হতো। এই আবিসিনিয়ার পূর্ব নাম ছিল হাবশা। যার বর্তমান নাম হলো ইথিওপিয়া। দেশটি পূর্ব আফ্রিকার অংশ। যেটা লোহিত সাগরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

নাজ্জাশী পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন। এমনকি তার জন্য রাসূল [সা] দোয়াও করেছেন বলে অনেকে ধারণা করেন।

**পত্র**

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদের পক্ষ থেকে যিনি আল্লাহর রাসূল, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশীর প্রতি। হেদায়েত অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অত:পর আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি সম্রাট, পবিত্র, শান্তি দাতা এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা ইবন মরিয়ম [আ] আল্লাহর রূহ ও তাঁর বাক্য যা তিনি পবিত্র মাতা ও সতী স্বাধবী মরিয়মের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন। অনন্তর তাঁর রূহও তাঁর ফুঁৎকারে ঈসা [আ] তাঁর গর্ভে স্থিতি লাভ করেন, হযরত আদম [আ]কে যেমন তিনি তাঁর কুদরতী হাতে বানিয়েছিলেন। আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের, যার কোনো শরীক নেই, তার প্রভুত্বের আনুগত্যের। আর আপনি আমার আনুগত্য কবুল করুন এবং ওহী হিসাবে আমার ওপর যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ করুন। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। আর আমি আপনাকে ও আপনার সেনাবাহিনীকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। আমি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং আমার নসীহত পূর্ণ করেছি। অতএব আমার নসীহত কবুল করুন। যারা হেদায়াতের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম।

আল্লাহর রাসূলের এই পত্রগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সকল যুগেই আল্লাহর রাসূলের এই পবিত্র পত্রগুলো ইকামাতে দীনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ভূমিকাও অসীম।

www.pathagar.com

# শিল্প ভাবনা

**ইব্রাহীম মন্ডল**

শিল্প নিয়ে গবেষকদের গবেষণার অন্ত নেই। তাত্ত্বিকগণ বিভিন্নভাবে শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সহজভাবে বলা যায় শিল্প হলো- আনন্দ, দু:খ-বেদনার কোনো কিছু দেখা বা অনুধাবন করে মনে যে আবেগ অনুভূতির সৃষ্টি হয় তার নান্দনিক প্রকাশ। মহান আল্লাহ্‌ মানুষের উপকারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন বিনোদনের জন্যে সুন্দর নৈসর্গ, পাহাড়, সাগর, ঝরণা, ফুল, ফল, নদী, অসংখ্য বৃক্ষরাজি। এই সৃষ্টি সৌন্দর্য দেখে অথবা দু:খজনক, বেদনার কিছু অনুধাবন করে হৃদয় মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার প্রকাশই হলো 'শিল্প'। এ জন্য শিল্পীদের দেখা আর সাধারণ মানুষের দেখা এক নয়। সাধারণ মানুষ কোন জিনিসের প্রতি যখন তাকান, সেটাকে বলা যেতে পারে তাকানো। আর শিল্পীরা যখন তাকান তখন তা হয় অবলোকন। অর্থাৎ তারা তা অনুধাবন করে হৃদয়ঙ্গম করেন। তা হৃদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। শিল্পীদের থাকে আবেগপ্রবণ মন। যার মনে আবেগ যতো বেশি, তার অনুধাবন ক্ষমতা তত বেশি। আবেগহীন ব্যক্তি কোনো দিন শিল্পী হতে পারে না। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, পূর্ণিমার রাতে হঠাৎ ড্যাফোডিল ফুলের সৌন্দর্য দেখে, অনুধাবন করে আবেগপ্রবণ হয়ে তা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, যা বিখ্যাত কবিতা 'ড্যাফোডিল'।

শিল্পীদের হৃদয়ঙ্গম ক্ষমতা, ধারণ-অনুধাবন ক্ষমতা অনেক তীব্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, যোগ সাধন করতে হলে শুনেছি করতে হয় চোখ বন্ধ করে, কিন্তু শিল্প সাধনা অন্যরকম চোখকে সর্বদা খোলা রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর খোলা পাখির ন্যায় মুক্তি দিতে হয়। তারা আকাশের ভাসমান মেঘমালার ভাষা বোঝেন, উত্তাল সাগরের তরঙ্গমালা অথবা শান্ত সাগরের ঢেউ, পূবালী, দক্ষিণা হাওয়া, ঝিরিঝিরি বাতাসে গাছে সবুজ পত্র-পল্লবের কম্পন এ সবের ভাষা বুঝেন, তাদের মনের যে অপ্রকাশিত আকাঙ্ক্ষা অথবা হৃদয়ের গভীরের ক্রন্দন প্রকাশ করাই 'শিল্প'।

প্রকাশের মাধ্যমের ভিন্নতার জন্যে শিল্পের মাধ্যমের ভিন্নতা হয়। যেমন রং রেখা, ফর্মের মাধ্যমে প্রকাশই চিত্রশিল্প। শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ-কাব্য বা কবিতা, সুরের মাধ্যমে প্রকাশ গান, বা সুর শিল্প, [বডিলেঙ্গুয়েজ]-অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ নৃত্য শিল্প,



www.pathagar.com

ইমিটেলের মাধ্যমে প্রকাশ নাট্য শিল্প এবং তার উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে শুধুমাত্র প্রকাশের ভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

শিল্প কি? এর উত্তর বিভিন্ন মনীষী ও আর্ট ক্রিটিকগণ নানাভাবে দিয়েছেন। শিল্প সমালোচক দার্শনিকরা বিভিন্ন মতও প্রকাশ করেছেন। কারো কারো মতে শিল্প হচ্ছে অপ্রকাশিত রহস্যময় জীবনের প্রকাশ। বিখ্যাত মনীষী টলস্টয় বলেন, শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত অনুভূতি, রং, রেখা, বা শব্দের সাহায্যে অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। তার মতে, শিল্পের উদ্দেশ্য শুধু অনুভূতির সঞ্চার।

শিল্পের উদ্ভব হয়েছে মানুষের সহজাত সৃজনশীল স্বভাব থেকেই। এর অন্যতম টার্গেট আমাদের জীবনে পূর্ণতা ও বিস্তৃতি যোগ করা। শিল্পকে বলা যেতে পারে আনন্দময় কোন আকার বা রূপ সৃষ্টির চেষ্টা। কিন্তু শিল্পের উদ্দেশ্য সব সময় শুধুমাত্র আনন্দ দেয়া নয়। পৃথিবীর সব কিছুই শিল্পের উপকরণ হতে পারে, ধ্বনি, রং, মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু সব। মানুষ এই উপকরণ নিয়ে নিজের চাহিদা বা ইচ্ছামত এমন একটি রূপ তৈরি করে যা তার বোধকে তৃপ্ত করে। এ জন্য সরলভাবে শিল্পকে বলতে পারি শিল্পীর কোনো অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার এক বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গী যা আমাদের মনেও গভীরভাবে সংক্রমিত হয় বা আমরাও কোনোভাবে সেই অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসি। অথবা বলা যায় শিল্প মানুষের কল্পনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার রূপ দান করার এক বিশেষ চেষ্টা। মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রতিফলন।

শিল্প নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে যথার্থ শিল্পের স্বরূপ উদঘাটনের লক্ষ্যে। ভালো শিল্প, মন্দ শিল্প, সার্থক শিল্প, অসার্থক শিল্পের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে শিল্পী এবং দর্শক সমাজকে তারা প্রতিনিয়তই সচেতন করে চলেছেন। শিল্পের ফর্ম [Form], সৌন্দর্য [Beauty], অনুকরণ [Imitation], পরিপ্রেক্ষিত [Perspective], অনুপাত [Proportion], ঐক্যতান [Harmony], ভারসাম্য [Balance], ঐক্য [Unity] প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত এবং সার্থক শিল্পের ব্যাখ্যাদানে এগিয়ে এসেছেন প্লেটো, এরিস্টোটল, ক্রোচে, হেগেল, রঁমারলা, অস্কারওয়াইল্ড, অবনীন্দ্রনাথসহ বিশ্বখ্যাত অগণিত দার্শনিক এবং শিল্পতাত্ত্বিকগণ।

দার্শনিক প্লেটোর মতে, আর্ট হচ্ছে অনুভূতির প্রকাশ, অনুকরণ নয়। যে অনুকরণে শিল্পী মনের স্পর্শ নেই তা যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র। অনুসৃত শিল্পকে মানুষ যখন নিজের মনের মতো করে মূর্ত করে তখনি সেটা আর্ট বা চিত্রকলা হয়ে ওঠে। সক্রেটিস বলেছেন 'আর্ট সত্য এবং বাস্তব থেকে আলাদা।' সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন 'আর্ট হচ্ছে আবিষ্কার অনুকরণ নয়।' কান্ট বলেছেন 'শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সর্ব বাধাহীন এবং যে কোন বিশেষ জাগতিক উদ্দেশ্য বিরহিত।' সুতরাং শিল্পতাত্ত্বিক অস্কারওয়াইল্ড এবং অন্য তাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত শিল্পী কখনোই বাস্তবে দেখা বিষয়বস্তুর স্বরূপ বা হুবহু আঙ্গিকে ক্যানভাসে তুলে ধরেন না। যারা এ বিষয়ে ততটা সচেতন নন কিংবা আদৌ সচেতন নন তারা ততোটা সার্থক কিংবা একেবারেই সার্থক শিল্পী নন। যারা এ বিষয়টি সম্পর্কে যত বেশি সচেতন, যারা এই নিয়মনীতি মেনে যত বেশি সার্থকরূপে শিল্প নির্মাণ করেন তারা তত বড় শিল্পী, তত বেশি সার্থক শিল্পী এবং তাদের সৃষ্ট শিল্প তত বেশি সার্থক এবং যথার্থ শিল্প, প্রকৃত শিল্প।



www.pathagar.com

অতএব আমরা বলতে পারি, যে দৃশ্য-অদৃশ্যকে শিল্পীর চিত্তরসে রসায়িত করে বা স্থিতিশীল রূপ ও মহিমা দান করে তখনি সেটা শিল্পকর্ম হয় এবং যিনি এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তাকেই শিল্পী বলে।

শিল্প সম্পর্কে শিল্পতাত্ত্বিক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'শিল্প হচ্ছে সময়, স্থান এবং অন্তরবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার একটি প্রতীক। শিল্পী যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন, অবিকল সে দৃষ্টি আমার না থাকতে পারে কিন্তু আমি যদি অনুভব না করতে পারি শিল্পী কি দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন, তাহলে শিল্পীর সৃষ্টিকে আমি প্রশংসা করতে পারবো না। এটা সম্ভবপর নয়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার দৃষ্টির বৈভব। আমাদের চোখ আছে, আমরা চেয়ে দেখি, কিন্তু জন্মসূত্রেই আমরা দৃষ্টিকে পাই না। যেমন জন্মসূত্রেই আমরা ভাষাকে পাই না। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে ভাষার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তেমনি সে দৃষ্টির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ তার ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা থাকে এবং দেখবার ক্ষমতা থাকে। কথা বলার ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে সে যখন বড় হয়, বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসে, মানুষের উচ্চারণ শোনে, সেগুলো অনুকরণ করে। ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তি যখন তার সজীব হয় তখন সে যথার্থ যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতে শেখে। তেমনি দৃষ্টির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। প্রথমে শিশু যা দেখে সে দেখার অর্থ হচ্ছে-বস্তুকে চিহ্নিতকরণ। এটা ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করে। শিশু প্রথমে তার মাকে চিনতে শেখে, যে একান্ত ভাবে তার ঘনিষ্ঠ, সে পিতাকে চিনতে শেখে এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে মাতার সঙ্গে অন্য মহিলার পার্থক্যও সে নির্ণয় করতে শেখে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে মাকে চিনে ফেলেছে তা নয় কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঐ দৃষ্টির অধিকারটা সে লাভ করতে থাকে। এভাবে দৃষ্টির অধিকার লাভ করে সে মানুষ দেখতে শেখে। অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে একজন যখন শিল্পী হবে, তখন শিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে, শুধু দৃষ্টির অধিকার নিয়েই নয়, দেখার ক্ষমতা নিয়েই নয়, দেখার বস্তুকে নির্ণয় করা এবং অবশেষে যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে দেখা, এটাই হলো শিল্পীর প্রধান কর্ম।

শিল্প হচ্ছে দৃষ্টিগোচরতায় পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল। এছাড়া আরও নানাবিধভাবে পৃথিবীকে অনুভব করা যায়। যেমন ভূতত্ত্বের সংজ্ঞায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে, গাণিতিক বিবেচনায়, আপেক্ষিকতায়, কল্প-কাহিনী তৈরি করে অথবা দার্শনিক বিভাবনে বা চিন্তায়। কিন্তু শিল্প হচ্ছে ভিন্নতর একটি চৈতন্যভিত্তিক সিদ্ধি, দৃষ্টির সহায়তায় যাকে আমরা ব্যাখ্যা করি এবং দৃষ্টিগত তাৎপর্য যাকে আমরা মূর্তিমান করি। শিল্পী বিশেষ কৌশলে তাঁর দৃষ্টিনির্ভর অনুভূত সত্যকে রং ও রেখার সাহায্যে চিত্ররূপ দান করেন অথবা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূর্তিময়তায় পর্যবসিত করেন। মানুষ যে কত চিত্ররূপে পৃথিবীতে দেখেছে তার প্রমাণ পাই শিল্প সত্তার বিকাশের ইতিহাসে। দৃষ্টিগত অনুভূতির যে কত বিচিত্র স্বরগ্রাম আছে, আছে বিচিত্র প্রয়াস পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী লক্ষ্য করলে তা প্রমাণিত হয়। বস্তুসত্তায় উপকরণ বা বাস্তবতা শিল্পীর লক্ষ্য নয়, শিল্পীর লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ অনুভূতি যা প্রতিস্পন্দিত হয় তার শিল্পকর্মে।'

'হারবার্ট রীড' শিল্পবোধের ক্ষেত্রে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে দুটো শব্দ হচ্ছে 'পার্সেপশন [Perception] এবং 'এক্সপ্রেশন' [Expression]। দৃষ্টির ক্ষেত্রে এ দুটি



www.pathagar.com

শব্দের একান্ত প্রয়োজন। আমরা 'পারসিভ' করি একটি বস্তুকে, অর্থাৎ একটি বস্তুকে অনুভব করি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে অনুভব করতে না শিখি তাহলে আমি কিছুই দেখলাম না। সুতরাং আমি বস্তুকে দেখবো, বস্তুকে নির্ণয় করবো। একজন মানুষ বহু পাখি উড়ে যাচ্ছে দেখেন, বহু নদী দেখেন ও বাঁক দেখেন, নদীর স্রোতের উদ্যামতা দেখেন। কিন্তু সব কিছুকে তিনি প্রকাশ করেন না। হঠাৎ এর মধ্য থেকে তাকে নির্বাচন করতে হয়। এই যে চৈতন্য এই চৈতন্যকে 'হারবার্ট রীড' বলেছেন, 'পার্সেপশন'। পার্সেপশন যে পর্যন্ত না আসছে একজন শিল্পীর মধ্যে সে পর্যন্ত কিন্তু 'এক্সপ্রেশন' যাকে বলা হচ্ছে, সে প্রকাশ করার ক্ষমতা তিনি পাচ্ছেন না। শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক রূপে ছবি আঁকা শিখলেই একজন যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠে না। যাকে আমি দৃষ্টির বৈভব বলছি, সেই দৃষ্টি বৈভব তাকে অর্জন করতে হয়। যথার্থ দৃষ্টির বৈভব অর্জন করলে পরে একজন শিল্পী যথার্থ রূপে শিল্পী হতে পারবেন। মানুষ যখন দেখে, তখন কিভাবে দেখে? এই দেখা নিয়ে বহু শিল্পী, বহু সমালোচক বহু কথা বলেছেন। একটা দৃষ্টি আছে, তাকে বলা হয় 'অপটিক্যাল' দৃষ্টি। অর্থাৎ চোখের যে ক্ষমতাটুকু, সে ক্ষমতা নিয়ে যে, সেই অপটিক্যাল দৃষ্টি আমাদের সকলেরই আছে। আমি দেখছি, আপনি দেখছেন, দূরের একজন মানুষ দেখছে, সকলেই দেখছে। সেই অপটিক্যাল দৃষ্টি কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টি নয়। শিল্পীর দৃষ্টি ভিন্নতর।

লিওনার্দো তার সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব দিকেই এক অসীম সম্ভাবনাময় জগত দেখতে পান; তাঁর দৃষ্টিতে বিরাজমান ছিল সর্বত্রই এক অপূর্ব সুন্দর, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভুবন। এই কথাগুলোর সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে নজরুলের কথায়: 'এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।' মাঝে মাঝে চিন্তার জগতে মগ্ন থাকার তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ তাই আপনমনে বসে আছে কুসুম বনেতে।' লিওনার্দোর চিন্তায় বিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতা সহবস্থান করে এবং পরস্পরকে অনুপ্রাণীত ও শক্তিশালী করে। তাই এখানে অযৌক্তিকতার উল্লেখ কিঞ্চিৎ আশ্চর্যজনক, হয়ত এই ধরনের অযৌক্তিকতার কিছু যুক্তি রয়েছে। লিওনার্দোর অবস্থানের মৌলিকত্ব, যেটাতে চিত্রাঙ্কন একটি সমগ্র অথবা সর্বগুণান্বিত শিল্পকলার স্বরূপ কল্পনা করা যায় সেটার পরিণাম হয় এক ধরনের বস্তুনিষ্ঠতা, যা সাধিত হয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে, এটা একটি শিল্পকর্মকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় যেখানে সেটা নির্বোধ ধাঁধাঁ বা বোঝাসমূহ থেকে মুক্ত। এই অবিরাম অভ্যন্তরীণ বিতর্কের মাধ্যমে, শিল্পী ক্রমশ তাঁর সংবেদনশীলতা ও অনুভব শক্তিকে উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে পারে। কোনো আবেগ প্রবলভাবে প্রকাশ করার জন্য নয়, যা সাধারণত স্থূলরুচি সম্পন্ন হয়, বরঞ্চ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।'

লিওনার্দো প্রবল আবেগ প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন না; অন্যান্য শিল্পীদের মতো, যাদের কর্মে রয়েছে সংযম, পুসাঁ থেকে মাটিস পর্যন্ত। এই ধরনের প্রবল আবেগকে একটি 'ভাবঘনিষ্ঠ সাধারণত্ব'র পরিণাম বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে, এই 'অভ্যন্তরীণ বিতর্ককে অভূতপূর্ব সুযোগ দেয়া উচিত। অর্থাৎ বিতর্ক ও চিন্তা অত পরিমাণ হওয়া উচিত না যে, ছবি আঁকা সেটা থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, লিওনার্দো বেশ কয়েকটি ছবি অসমাপ্ত রেখে যান।



www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মহান ও প্রভাবশালী স্বাধীন শিল্পী হলেন পিকাসো, যিনি [জর্জ ব্রাকের সাথে] 'কিউবিজম্' সৃষ্টি করেন। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধ [SPANISH CIVIL WAR] দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে তার বিখ্যাত ছবি গুয়ের্নিকা [GUERNICA] আঁকেন, যেটাকে মহান ও পীড়াদায়ক রচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অবশেষে ফ্যাসিবাদিরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন একটি প্রদর্শনীতে, যেটাতে পিকাসো উপস্থিত ছিলেন, গুয়ের্নিকা ছবিটি অন্ত র্ভুক্ত করা হয়। ছবিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত হয়েছে। পিকাসো যখন ছবিটির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন একজন সামরিক কর্মকর্তা পিকাসোকে জিজ্ঞেস করলেন: 'ছবিটি আপনি করেছেন?' জবাবে পিকাসো যা বলেছিলেন সেটা চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে; 'না, আপনি করেছেন।' ছবিটি New york এর MUSEUM OF MODERN ART এ সংরক্ষিত রয়েছে। এই ঘটনাটি থেকে শিল্পীদের যে অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেটা প্রতীয়মান হয়।

শিল্প নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সেই যে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০০ সাল থেকে ম্যাগডেলিয়ন মানুষদের অঙ্কিত গুহা গাত্রের চিত্র থেকে বিতর্কের শুরু হয়েছে আজও তার শেষ হয়নি। বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিল্পের যত মত, পথ ও ধারার আবির্ভাব ঘটেছে বিতর্ক যেন ততই জটিল থেকে জটিলতার হচ্ছে। আর এমনিভাবেই বিভিন্ন দার্শনিক ও শিল্পতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মতবাদে পূর্ণ হয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করছে। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পরীতিতে শিল্পশাস্ত্রকার পণ্ডিত যশোধর আবিষ্কৃত 'ষড়ঙ্গ'-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে এই ষড়ঙ্গকে ভারতীয় শিল্পের প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি বেঙ্গল স্কুলের প্রধান পুরুষ তিনি এই ষড়ঙ্গকে অগ্রাহ্য করলেন। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, ষড়ঙ্গ-এর এই ছয়টি বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পচর্চার যে প্রচলন ছিল তিনি তার বিরোধিতা করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পের জন্যে যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সেই স্বাধীনতার কথা পৃথিবীর সকল শিল্পবোদ্ধা পণ্ডিত এবং তাত্ত্বিকেরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রায় সকলেই শিল্পীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছেন, শিল্পী কোনো বাঁধাধরা শাস্ত্রবিধি মানবেন না, কোনো কিছু দেখে অনুকরণ করবেন না, শিল্পী তার নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন করে তাতে মনের মাধুরী মিশিয়ে নান্দনিক রসসিক্ত শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে চমৎকৃত করবেন। নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর শিল্প ভাণ্ডারকে করবেন পরিপূর্ণ। এই সৃষ্টিধর্মী শিল্প সম্পর্কে তাই Plato বলেছেন, 'The real artist does not imitate, he creates something now.' Socretes বলেছেন Art is removed from the actuality something new.' Sent. Augustine বলেছেন, Art is invention not imitation. সুতরাং উল্লেখিত তথ্যসমূহে সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত শিল্প হবে শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টি। দৃশ্যমান জগতের চেনা-জানা কোনো বিষয়ের হুবহু অনুকরণ নয়।



www.pathagar.com

অধরার ও অদেখার পিছনে ছুটে চলেছেন শিল্পী। তাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, শিল্প হচ্ছে অতৃপ্ততা, একটা তৃষ্ণা অর্থাৎ খুঁজে বেড়ানো। শিল্পীর অন্তরলোক উদ্ভাসিত হয় উৎসারিত হয় কল্পনায়। তবু সুন্দর ধরা দেয় না। আকাঙ্ক্ষিত পরম সুন্দরকে কখনই শিল্পী পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। তাই শিল্পীর শিল্পও কখনো পূর্ণতা পায় না।

তিনি বলেছেন, বর্তমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সমস্যা সত্ত্বেও কোন শিল্পীরই নিজ দেশের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, যেমনটি হননি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ। তার মতে কামরুল হাসানের 'তিন কন্যা' ছবিতে কিউবিজমের ভাংচুর থাকলেও রঙ এবং মেয়েদের শরীরী আদল একেবারেই বাঙালি।

শিল্পী দা-ভিঞ্চি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কবিতা এবং সঙ্গীতের চেয়ে চিত্রকলা অনেক বেশি উচ্চমান সম্পন্ন। তিনি বলেন, সঙ্গীতের চেয়ে চিত্রকলা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। তার মতে, একজন কবির চেয়ে একজন চিত্রশিল্পী প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়বস্তুর ফর্মকে যথাযথভাবে চিত্রে তুলে ধরতে সক্ষম এবং এ কারণেই একজন চিত্রশিল্পীর সম্মান সবার চেয়ে উচ্চে। দা-ভিঞ্চি যে শুধু চিত্রকলা বিষয়েই দক্ষ ছিলেন তা নয়, তিনি অন্যান্য বিষয়েও ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

চিত্রকলা বিভিন্ন বিষয়কে যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ কিংবা প্রকাশ করতে সক্ষম। বিভিন্ন বিষয়ের গতি-প্রকৃতি, জীবজন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও তার দ্রুত গতি প্রকাশ করে। চিত্রকলা গাণিতিক। কারণ চিত্রকলার আলোছায়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সঠিক মাপজোক এবং অনুপাত সঠিকভাবে নির্ধারণ করে। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির রেখে যাওয়া ম্যানসক্রিপ্টই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠার পুঁথিতে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করে গেছেন। যার এক স্থানে লিখেছেন যে, সূর্য স্থির। তার গতি নেই। অর্থাৎ কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওর বহু পূর্বেই তিনি এটা অনুমান করেছিলেন।

চিত্রকলা হচ্ছে গবেষণামূলক বিজ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্নধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল। নিওনার্দো দা-ভিঞ্চি এ সকল বিষয়ে শুধু অভিমতই ব্যক্ত করেননি, তিনি নিজে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। মানুষের দেহের গঠন, অনুপাত ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক মাপজোকের প্রয়োজনে প্রায় ত্রিশটি মৃতদেহ নিজ হাতে কেটে-চিরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

শিল্প সম্পর্কে মতামতের অন্ত নেই। শিল্পী, সমালোচক, ঐতিহাসিক এবং ফিলোসফারদের মতে শিল্প হচ্ছে: অপ্রকাশিত রহস্যময় জীবনের প্রকাশ। জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা সমালোচনা, বস্তুর বাহ্যিক আনন্দ, একমাত্র বৈধ সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্ম, নিছক খেলা, আদর্শবাদের বাহ্যিক রূপ, বাধ্যবাধকতামুক্ত, অবান্তরের আবিষ্কার [বাস্তব সুন্দর নয় এই অর্থে], নিজ অভিব্যক্তি, মানবতার প্রকাশ ইত্যাদি। শিল্পে মানবতা এবং শিল্পী মনের একান্ত অনুভূতির প্রকাশ শিল্পে-সাহিত্যে আমরা নানাভাবে মূর্ত হতে



www.pathagar.com

দেখেছি। এক্সপ্রেশনিজম বা প্রকাশবাদ হচ্ছে সকল শিল্পের মধ্যে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের একটি মৌলিক বিষয়। লুৎরেক, গগিন, ভ্যানগগ এরা ইমপ্রেশনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তাদের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতিকে ইচ্ছে মতো গড়েছেন। এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা এবং শিল্পকর্মে তা অন্ত:প্রবিষ্ট করা। শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে মানবিক ধ্যান-ধারণা ও তার রীতি-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বহু পূর্ব থেকেই। মানবতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্পী সচেতনভাবে তার হৃদয়ের মানবিক চেতনার বিভিন্ন দিকগুলো কাজে প্রক্ষিপ্ত করে থাকেন।

গ্রীক দার্শনিক এবং গণিতবেত্তা পিথাগোরাসের মতবাদ অনুযায়ী সঙ্গীত মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে। চরিত্র সংশোধনেও মানব হৃদয়ে সুন্দর প্রভাব ফেলতে সাহায্য করে। পিথাগোরাসের পর দার্শনিক প্লেটো এই তত্ত্বের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন, যা পরবর্তী পর্যায়ে ঈষৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে দার্শনিক অ্যারিস্টটল গ্রহণ করেন। এরও পরে দার্শনিক স্টইক এ তত্ত্বের অনুসারী হন। তিনি অবশ্য কবিতার প্রতিও আগ্রহী ছিলেন এবং সৌন্দর্য বিষয়ক তত্ত্বের প্রতিও ছিলেন সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। সর্বোচ্চ সত্যের বাহন হিসেবে, অপ্রস্তুত প্রশংসার দ্বারা মানব জীবনকে অলংকৃত করার বাসনায় তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কবিতা শিক্ষাদানের প্রতি জোর দিয়েছিলেন অথচ দার্শনিক এপিকিউরাস সঙ্গীতকে প্রশ্রয় দেননি, তিনি ছিলেন সঙ্গীত বিরোধী। তাঁর মতে, সঙ্গীত থেকে কিছু গ্রহণ করার নেই। সঙ্গীত যে সুখানুভূতি এবং প্রশান্তিদানে সক্ষম তিনি তা বিশ্বাস করতেন না।

ডোনাটেলো, মাইকেল ,েঞ্জলো এবং ভ্যানগগ- এরাঁ সকলেই মানবতাবাদী শিল্পী। ভ্যানগগ বলতেন, 'আমি আঁকতে চাই মানবতা, মানবতা আবার মানবতা।' ১৯৪২-৪৩-এ সমগ্র বাংলাজুড়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা ছিল মানুষেরই সৃষ্ট। এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানবতার যে চরম অবমাননা জয়নুল লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ তুলি ও কালির মাধ্যমে। আমাদের সমাজের দু:খ এবং ক্ষত চিহ্ন অবলোকন করে জয়নুল সে সমস্ত দু:খ-বেদনা এবং প্রবঞ্চনার দহন থেকে মানবসত্তাকে, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধকে বাঁচাতে সদা তৎপর ছিলেন। তাঁর আজীবন প্রচেষ্টাই ছিল দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি এ দেশের মানুষকে, দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে দেশের ছোট-বড় সকলে দেশকে, দেশের মানুষকে আপন করে নেয়ার গোপন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

শিল্পশাস্ত্রে অনুকরণ বা ইমিটেশন বলে একটি কথা আছে। ইংরেজি ইমিটেশনের আভিধানিক অর্থ হলো অনুকৃতি, অনুক্রিয়া, অনুবর্তন, অনুকরণ, নকল, মেকি, কৃত্রিম প্রভৃতি। অর্থাৎ কোনো মূল বিষয়বস্তু নয়। মূল বিষয়বস্তুর অনুরূপ কিংবা হুবহু রূপ। যেমন অলঙ্কার পাওয়া যায় যার বাহ্যরূপ হুবহু স্বর্ণের মতো অথচ স্বর্ণের নয়। হুবহু রূপোর মতো অথচ রূপোর নয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনো কোনো চিত্র



www.pathagar.com

দেখতে হুবহু পিকাসোর চিত্রের অনুরূপ কিন্তু পিকাসোর নয়। হুবহু কামরুল হাসানের চিত্রের মতো অথচ কামরুল হাসানের নয়। অর্থাৎ এগুলো সবই নকল। নকল বা ইমিটেশন অলঙ্কারের যেমন কোনো মূল্য নেই, মূল্য নেই তেমনি নকল শিল্পকলার। এ সকল শিল্প বিষয়ের মূল্য যে একেবারে নেই, তা অবশ্য নয়। মূল্য আছে। তবে তা সোনার কিংবা রূপোর মূল্যের সমান নয়। কিংবা মূল চিত্রের সমান নয়। এ মূল্য নগণ্য। এ মূল্যের পার্থক্য মূল চিত্র এবং চিত্রের ছাপানো পোস্টারের মধ্যে সেই পার্থক্য। সুতরাং ইমিটেশনের মূল্য যে অতি নগণ্য সেটা স্পষ্ট।

একজন লেখক কিংবা সমালোচক, সব বিষয়ে একজন শিল্পীর সমানধর্মী হতে হয়। অর্থাৎ শিল্প নৈপুণ্য ও শিল্প কুশলতা এবং শিল্প বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে একজন শিল্পীকে তত্ত্বীয় বিষয়ে যেমন অভিজ্ঞ হতে হয় তেমনি অভিজ্ঞ হতে হয় একজন লেখক কিংবা সমালোচককেও। অন্যথায় বিভ্রান্তি অনিবার্য। একজন লেখক সহজেই পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারেন তার ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। বিভ্রান্ত যে শুধু পাঠকদেরই করেন তাই নয়, সাথে সাথে লেখক নিজের অজ্ঞতাকেও প্রকাশ করেন। একই সাথে সার্থক শিল্পী, শিল্প এবং শিল্প রসিক দর্শকদের মাঝে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেন। যা শিল্পীর জন্যে, শিল্পের জন্য এবং দেশের জন্যে ক্ষতিকর। লেখক ভুলে যান যে, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহকে চিত্রে স্থান দেয়া শিল্পীর কাজ নয়। শিল্পীর কাজ তথা দায়িত্ব প্রকৃত বিষয়ের সারবস্তুর গূঢ়সত্ত্বা আবিষ্কার করা এবং তার বিশেষ গুণগুলো ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিজস্ব অর্থপূর্ণ ফর্ম বা সিগনিফিকেন্ট ফর্ম সৃষ্টি করা। বাস্তবে ঘটে যাওয়া বিষয়ের অনুকরণে রচিত শিল্পকর্ম আর সেই ঘটনার ফটোগ্রাফিতে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। এই সহজ কথাটি শিল্পী যেমন ভুলে যান, তেমনি ভুলে যান লেখকও। ফলে শিল্প এবং সমালোচনা উভয়ই নিম্নমানসম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের প্রবক্তা শিল্পী জয়নুল আবেদীন বলেছেন, আমি ছবি আঁকি মহৎ শিল্পী হওয়ার জন্যে নয়, জীবনকে সুন্দর করার জন্য জীবনকে সুন্দর করতে যে শক্তি বিরোধিতা করে তাকে চিহ্নিত করার জন্য। যে শিল্প জীবনকে সুন্দর করতে দিক-নির্দেশনা দেয় তাই মহৎ শিল্প। যে শিল্পী তা সৃষ্টি করেন তিনিই মহৎ শিল্পী।

বস্তুত শিল্পের জন্য এ ধারণার পরিবর্তে শিল্প জীবনের জন্য এ তথ্য এখন সাধারণভাবেই গৃহীত। শিল্পী জয়নুল আবেদীনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মনে করি, শিল্প সত্যের জন্য, শিল্প সুন্দরের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

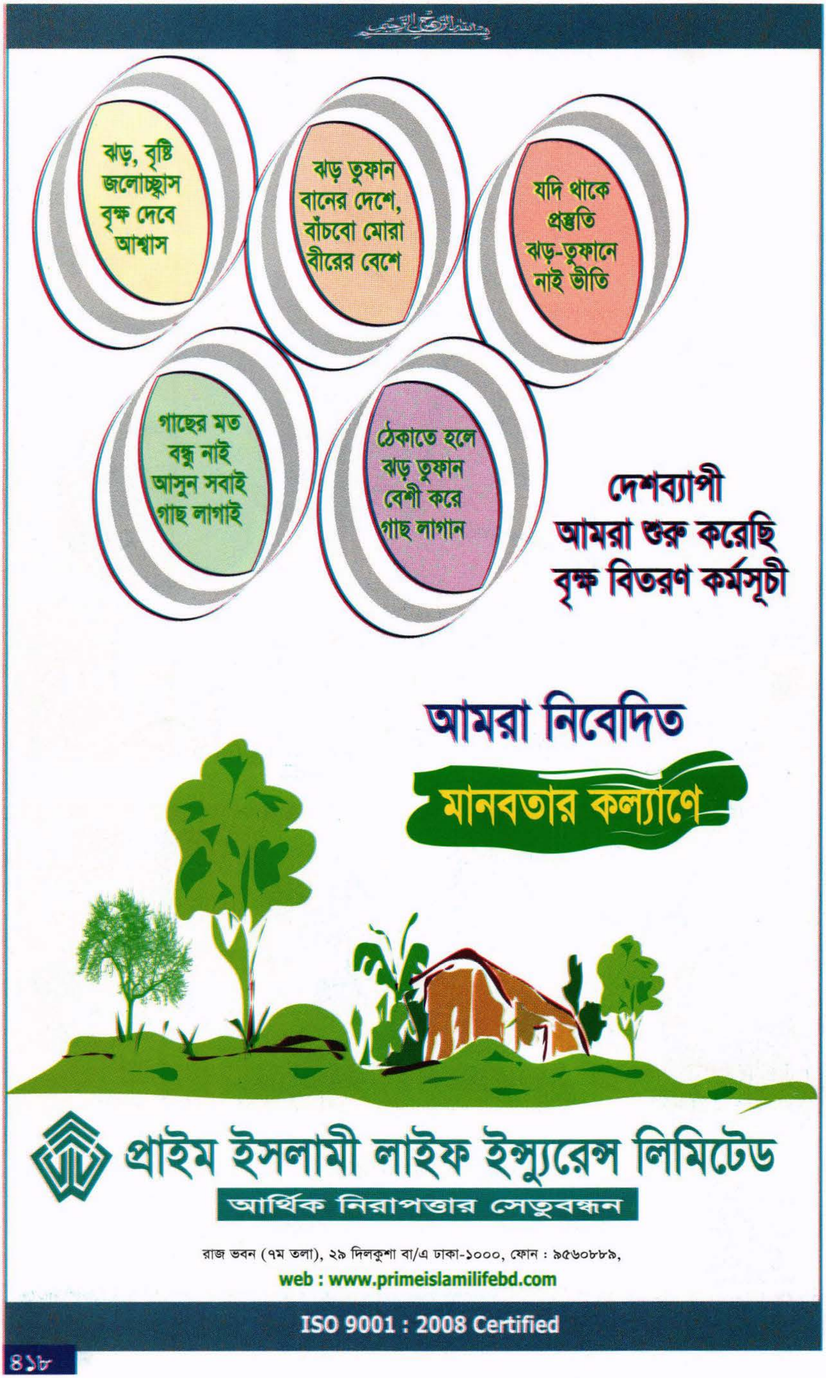




www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স

১১, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: ৭১২৪০২৮,০১৭৭৮-১৪০৩০২

আমাদের প্রকাশিত কতগুলো প্রয়োজনীয় ইসলামী বই

১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
২. আল কুরআন কথা বলে
৩. ইসলামের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দু'আর ভাণ্ডার
৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন [নামাযের প্রামাণ্য মাসআলা]
৯. আত্মপরিচয়ে আলকুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. তাফসীরুল কুরআন সূরা ফাতিহা ও বাকারা
১২. তাফসীরুল কুরআন আমপারা
১৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মকছুদুল মোমেনীন
১৪. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী (স)
১৫. মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬. কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭. শেষ মনযিলের পথে
১৮. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৯. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন
২০. ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
২১. সুনির্বাচিত হাদিস সঞ্চয়ন
২২. মুক্তি প্রমাণের আলোকে পর্দার বিধান
২৩. আল কুরআনে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়
২৪. আসহাবুর রাসূল (স) (১ম খণ্ড)
[বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী]
২৫. ছোটদের প্রিয়নবীর প্রিয়কথা
২৬. ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার
২৭. রোযা কি, কেন রাখবেন, কিভাবে রাখবেন
২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার
২৯. নারী ও ইসলাম
৩০. তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি
৩১. পরিবেশ ও ইসলাম
৩২. মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বাংলাদেশ
৩৩. মক্কা মদীনা ও হজ্বের বিধি-বিধান
৩৪. দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ
৩৫. হিজাব, পর্দা ও ফ্যাশন
৩৬. আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র
৩৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (স) উৎপত্তি, ভিত্তি ও আপত্তি
৩৯. মাও. মওদূদীর সঙ্গে মরিয়ম জামিলার পত্রালাপ
৪০. জান্নাতের পথ পাথেয়
৪১. আল কুরআনে আস সালাত
৪২. আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল
৪৩. ডাঃ জাকির নায়েক রচনাসমগ্র (১)
৪৪. হাদীসে কুদসী
৪৫. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জিহাদ




www.pathagar.com

# বই কিনুন। বই পড়ুন। প্রিয়জনকে বই উপহার দিন

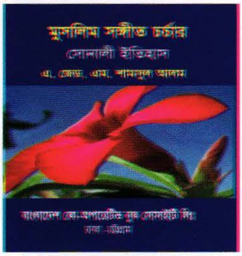


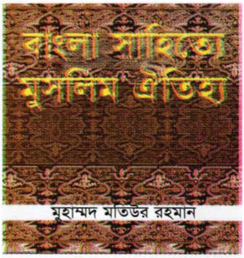

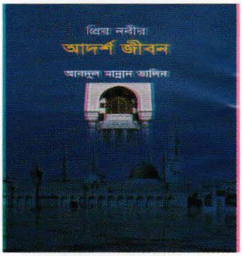


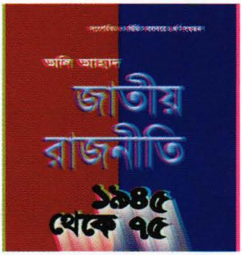


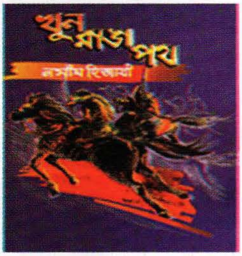


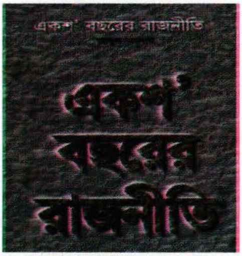


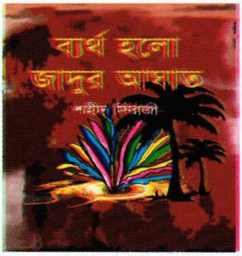


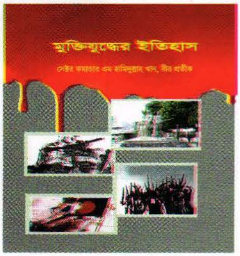


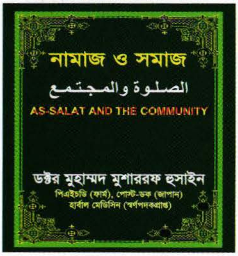


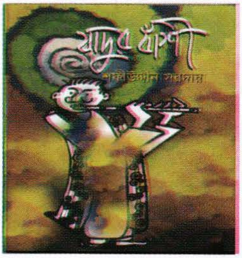


একটি ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

## বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

BCBS
Estd-1949

**প্রধান কার্যালয় :** নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম, ফোন: ৬৩৭৫২৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৬০০২

**মতিঝিল কার্যালয় :** ১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, পিএবিএক্স- ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪ মোবাইল: ০১৭১১-৮১৬০০১

**বিক্রয় কেন্দ্র :** ১৫০-১৫২ নিউমার্কেট ঢাকা, ফোন : ৯৬৬৩৮৬৩ ❐ ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার ঢাকা, ফোন : ৭১৬৩৮৮৫




www.pathagar.com

# সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
# বার্ষিক প্রতিবেদন
(মে ২০১২–জুন ২০১৩)

**শরীফ বায়জীদ মাহমুদ**

## প্রারম্ভিকা
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, সুস্থ ধারার মননশীল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি দেশের গন্ডি পেরিয়ে বহি:বিশ্বেও সাড়া জাগিয়েছে। একদল সুদক্ষ সংগঠকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এর সার্বিক কার্যক্রম। পাঠক, আপনাদের জানার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে বিগত বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

## সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাত স্মারক ২০১৩
সীরাতুন্নবী সা. স্মারক ২০১৩ কবি মোশাররফ হোসেন খান এর সম্পাদনায় এবারও প্রকাশিত হয়। শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের চমৎকার প্রচ্ছদে এ স্মারক দেশের খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের লেখায় সমৃদ্ধ। সমকালীন বাংলা ভাষায় এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত স্মারক হিসাবে সুধী মহলে সমাদৃত। এর মূল্য রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা।

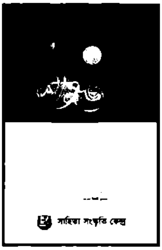

## সাহিত্য সংস্কৃতি মাসিক বুলেটিন প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৯ থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মাসিক বুলেটিন **"সাহিত্য সংস্কৃতি"** নামে প্রকাশ শুরু হয়। কবি আসাদ বিন হাফিজের সম্পাদনায় এ বুলেটিনে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন

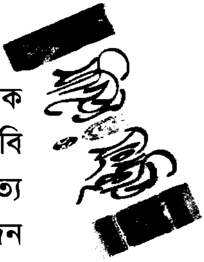



www.pathagar.com

ছাড়াও দেশের এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অংগনের গুরুত্বপূর্ণ খবর স্থান পায়।

## ইসলামিক টিভিতে হেরার আলো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব প্রযোজনায় অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এর পরিচালনায় প্রতি শুক্রবার রাত ৯ টায় ইসলামিক টিভিতে **"হেরার আলো"** নামে একটি মনোজ্ঞ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক নাটক, ডকুফিল্ম, গান, আবৃত্তি, প্রতিবেদন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে টক শো-সহ বৈচিত্রপূর্ণ সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। টক-শোতে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ, শাহ আবদুল হান্নান, আবুল আসাদ, আলমগীর মহিউদ্দিন, ড. এম কোরবান আলী, কবি আল মুজাহিদী, মাহবুবুল হক, আব্দুল হাই শিকদার, আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, আসাদ বিন হাফিজ, শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন ও তোফাজ্জল হোসাইন খান প্রমুখ।

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও নবী সা. দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৩

অক্ষর সৌন্দর্য চর্চার নাম ক্যালিগ্রাফি। ইসলামী সভ্যতায় এই ক্যালিগ্রাফি এক বিশেষ প্রেরণার দাবীদার। মূলত : উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনকালে নতুন স্টাইলে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু হয়। বাংলাদেশে এর চর্চা শুরু হয়েছে স্বাধীনতাত্তোরকালে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। বিগত প্রায় এক যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে দেশের



www.pathagar.com

খ্যাতিমান ও নবীন শিল্পীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে পক্ষকালব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। একদিকে যেমন এ প্রদর্শনীর খবর বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে, অন্যদিকে প্রতিটি প্রদর্শনী হাজাররো নারী, পুরুষ, শিশু, যুবার পদচারণায় মুখরিত ছিল। যার ফলে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প পেয়েছে ভিন্ন মর্যাদা, দেশের শিল্প জগতে এসেছে নতুন মাত্রা। এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়।

এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ৩ বছর যাবত শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামকে সাজানো হয়েছিল এক নতুন আলোয়। সকাল ৯ টা থেকে ক্ষুদে ক্যালিগ্রাফাররা একে একে

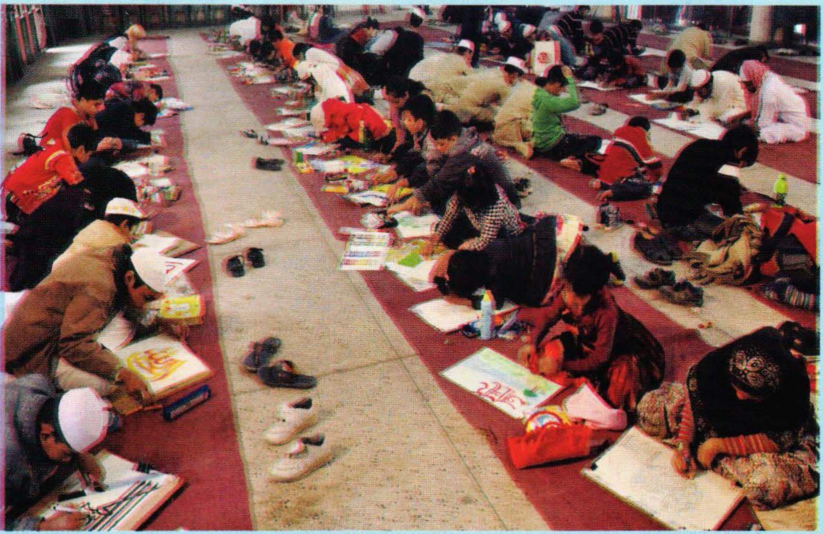

একান্ত মনে ছবি আঁকছে প্রতিযোগীরা

এসে নাম রেজিস্ট্রেশন করে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সকাল ১০টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত চলে প্রতিযোগিতা। বিচরকদের বিচারকার্য শেষে দুপুর ১২টায় শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও নবী সা. দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা



www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. আব্দুস সাত্তার

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার।

আলোচনায় অংশ নেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম, প্রতিযোগিতা বাস্তাবায়ন কমিটির আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন প্রতিযোগিতা বাস্তাবায়ন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

www.pathagar.com

ক গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারীকে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কমিটির সমন্বয়ক ও কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

খ গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারীকে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ



www.pathagar.com

প্রধান অতিথি ড. আব্দুস সাত্তার তাঁর বক্তৃতায় বলেন আজকের শিশু-কিশোররা জাতির ভবিষ্যত। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় যারা অংশ গ্রহণ করেছে তারা প্রায় সবাই সুন্দর এঁকেছে।

পুরস্কার নিচ্ছে বিজয়ী প্রতিযোগী

আমি আশাবাদী এ শিল্প চর্চার মাধ্যমে তারা সবাই ভবিষ্যতে দেশ গড়ায় ভূমিকা রাখবে।

বাংলা ও আরবি দুই ভাষার বর্ণমালাকে শৈল্পিক সুষমায় ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে উপস্থাপন করে প্রতিযোগতায় অংশ নেয়া খুদে শিল্পীরা। দুই গ্রুপে এ প্রতিযোগতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক-গ্রুপে (শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী, বয়স অনুর্ধ্ব ১২), ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুলের ছাত্রী নুর-ই-জান্নাত হেরা প্রথম, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজের ছাত্র সাদী মোহাম্মদ শাদমান দ্বিতীয় এবং চেতনা একাডেমির ফাহিম মোহাম্মদ তৃতীয় স্থান লাভ করে।

খ গ্রুপে (৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী, বয়স অনুর্ধ্ব ১৭) জামেয়া উলুমের ছাত্র মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রথম, আই ই এস স্কুলের আলমগীর হোসাইন



www.pathagar.com

দ্বিতীয় এবং তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসার মো: মাহমুদুল হাসান তুহিন তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া দুই গ্রুপে ১০ জন প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার এবং অংশগ্রহণকারী সব প্রতিযোগীকে

পুরস্কার নিচ্ছে বিজয়ী ক্ষুদে প্রতিযোগী

সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ, সার্টিফিকেট, বই, সিডি ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি আসাদ বিন হাফিজ

বিশেষ অতিথি শিল্পী হামিদুল ইসলাম



www.pathagar.com

প্রতিযোগীতার আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল

কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদুর রহমান

প্রতিযোগীতার সমন্বয়ক ও কেন্দ্রের সহকারী
সেক্রেটারী শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে অতিথিবৃন্দ



www.pathagar.com

# পত্রপত্রিকায় ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগীতা

**আমার দেশ** | বুধবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ২৪ মাঘ ১৪১৯

নবী দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা অতিথিদের সঙ্গে

## শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি

ঢাকা, শনিবার ২০ মাঘ ১৪১৯ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

### সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র ৩য় শিশু কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার বলেন, আজকের শিশু-কিশোররাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় যারা অংশ গ্রহণ করেছে তারা সবাই সুন্দর এঁকেছে। আমি আশাবাদী শিল্প চর্চার মাধ্যমে তারা সবাই ভবিষ্যতে দেশ গড়ায় ভূমিকা রাখবে। গতকাল [illegible] জাতীয় প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে

**মানবকণ্ঠ**

শনিবার ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

## শিশু কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

১২ রবিউল আউয়াল হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর জন্ম দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

www.pathagar.com

# পত্রপত্রিকায় ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগীতা

**প্রশিক্ষণঃ** সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের শিল্পসম্পাদক ইব্রাহীম মন্ডলের পরিচালনায় প্রতি জুমআবার কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে ক্যালিগ্রাফি ক্লাস নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও কেন্দ্রের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন আয়োজন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের।



www.pathagar.com

# কেন্দ্রের অন্যান্য প্রকাশনা

১. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ১৯৯৭ ▪ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
২. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ১৯৯৭ ▪ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
৩. াহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ১৯৯৯ ▪ সম্পাদনা: খন্দকার আব্দুল মোমেন
৪. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০০ ▪ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৫. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০১ ▪ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৬. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০২ ▪ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৭. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৩ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
৮. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৪ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
৯. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৫ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১০. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৬ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১১. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৭ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১২. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৮ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৩. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৯ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৪. সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০১০ ▪ সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৫. নাবিক- ১৯৯৭ ▪ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৬. পিকনিক শালনায়- ১৯৯৯ ▪ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৭. চড়ুইভাতির এই মেলায়- ২০০১ ▪ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৮. এলো বৈশাখ- ২০০২ ▪ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৯. ১ম হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক- ২০০১ ▪ সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
২০. গাঙচিল মন নৌ-ভ্রমণ স্মারক-২০০২ ▪ সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
২১. ঐ নূতনের কেতন ওড়ে- ২০০৩ ▪ সম্পাদনা: শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
২২. হিজল বনের পাখি- ২০০৩ ▪ সম্পাদনা: শরীফ আবদুল গোফরান
২৩. ২য় হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক- ২০০৪ ▪ সম্পাদনা: হাসান আলীম
২৪. সীরাত গ্রন্থ প্রদর্শনী স্মারক- ২০০৪ ▪ সম্পাদনা: নাসির হেলাল
২৫. ৩য় হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক- ২০০৬ ▪ সম্পাদনা: হাসান আলীম
২৬. সমুদ্রের ঘ্রাণ- ২০০৭ ▪ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
২৭. লেখক সম্বর্ধনা স্মারক- ২০০৮ ▪ সম্পাদনা মোঃ আবেদুর রহমান
২৮. ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি স্মারক ▪ সম্পাদনা: মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
২৯. লেখক অভিধান ▪ সম্পাদনা: নাসির হেলাল
৩০. আশির দশক: নির্বাচিত কবিতা ▪ সম্পাদনা: হাসান আলীম
৩১. ১ম শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা স্মারক-২০১১ ▪ সম্পাদনা: শরীফ বায়জীদ মাহমুদ



www.pathagar.com

২০১৩ হিজরী ১৪২০

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র